শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া



মূলঃ শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ
ব্যাখ্যাঃ ড. ছ্বালিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান রহিমাহুল্লাহ

شرح العقيدة الواسطية

“শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসিত্বীয়া”

شيخ الإسلام الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى

মূল: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ

تأليف الشيخ الدكتور العلامة/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

ব্যাখ্যা: শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

نقله إلى اللغة البنغالية/ محمد عبد الله شاهد

অনুবাদ: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুস সুন্নাহ

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ: আগষ্ট ২০১৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ: আগষ্ট ২০১৯ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩০০ (তিনশত) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

- অনুবাদকের ভূমিকা ৯
- ড. ছ্বলেহ ইবনে ফাওযান এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৪
- ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৯
- লেখকের ভূমিকা ৩৭

ভূমিকা

- বিস্‌মিল্লাহ এর ব্যাখ্যা ৩৯
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার প্রাথমিক খুতবা ৪১
- ফিরকাতুন নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল ৪৯
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ৫১
- ঈমানের রুকনসমূহ ৫৩
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা ৬১
- আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ৬৫
- সকল রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ৭৩
- আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা ৭৭
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসূলগণ আক্বীদাহ ও অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তা সঠিক পথের দিশা ৮১

কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর দলীল-প্রমাণ

১. একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ছ্বিফাত সাব্যস্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করা ৮৩

২. সকল সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলার অবস্থান ও তার সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া এবং সকল সৃষ্টির শুরু ও শেষে বিদ্যমান থাকা ৯৭
৩. আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে ১০৫
৪. আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দর্শন ১১১
৫. আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা ১১৫
৬. আল্লাহ তা'আলা তার অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসেন, যেভাবে তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় ১৩১
৭. আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত করা ১৩৯
৮. কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, ক্রোধান্বিত হন, তিনি পছন্দ করেন এবং ঘৃণা করেন। সুতরাং তিনি এসব বিশেষণে ভূষিত ১৪৩
৯. ক্বিয়ামতের দিন বান্দাদের মাঝে ফায়ছালা করার উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নেমে আসা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় ১৪৯
১০. আল্লাহ তা'আলার জন্য চেহারা সাব্যস্ত করণ ১৫৫
১১. কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার জন্য দু'টি হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে ১৫৯
১২. আল্লাহ তা'আলার জন্য দু'টি চোখ সাব্যস্ত করা ১৬৫
১৩. আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করা ১৬৯
১৪. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করা ১৭৫
১৫. আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রসঙ্গ ১৮৩
১৬. আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তার সাদৃশ্য হওয়া অস্বীকার করা ১৮৮
১৭. আল্লাহ তা'আলার কোন শরীক নেই ১৯৪
১৮. আল্লাহ তা'আলার আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা ২০৩
১৯. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের (সৃষ্টির) উপর সমুন্নত ২১১
২০. আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথে আছেন ২১৭
২১. আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করা ২২৩

২২. কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে ২৩৯
২৩. ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে দেখবে ২৪৪

আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর প্রমাণে সুন্নাতের দলীল

❖ **সুন্নাতের মর্যাদা:** সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করণে দলিল গ্রহণ ২৪৯
❖ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে যে সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব-আবশ্যক ২৫৪

১. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে দুনিয়ার আসমানে তার নেমে আসা সাব্যস্ত করণ ২৫৭
২. আল্লাহ তা'আলা খুশি হন ও হাসেন ২৫৯
৩. আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্য হন এবং হাসেন ২৬৩
৪. আল্লাহ তা'আলার জন্য 'পা' সাব্যস্ত করা ২৬৫
৫. আল্লাহ তা'আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে ২৬৭
৬. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন ২৭০
৭. আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সাথেই আছেন। আরশের উপর তার সমুন্নত হওয়া শরী'আত পরিপন্থী নয় ২৭৮
৮. মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে ২৮৭
❖ যে সব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ২৯০
❖ উম্মাতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মর্যাদা ২৯১
❖ এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত, আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং সকল

মাখলুকের সাথে। মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে থাকা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয় ৩০৫

- আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তার আসমানে থাকার অর্থ ও তার দলীলসমূহ ৩১১
- এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া ও সৃষ্টির উপরে থাকা শরী'আত পরিপন্থী নয় ৩১৫
- এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার কালাম ৩১৮
- এ বিশ্বাস করা যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশের পর তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে ৩২৫

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়সমূহ

১. কবরে সংঘটিতব্য বিষয়সমুহ ৩২৭
২. বড় ক্বিয়ামত এবং তাতে সংঘটিতব্য বিষয়সমুহ ৩৩৭

- ক্বিয়ামতের দিন আরো যা সংঘটিত হবে ৩৪৩
- নাবী এর হাওয এবং তার স্থান ও বৈশিষ্ট্য ৩৫৫
- পুলছ্বিরাত, তার অর্থ, স্থান এবং এর উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম ৩৫৭
- জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে সেতু ৩৬১
- সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতের দরজা খুলবেন, সর্বপ্রথম তাতে প্রবেশ করবেন এবং নাবীর শাফা'আতের বর্ণনা ৩৬৩
- কতিপয় পাপীকে শাফা'আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা খালি থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা হবে? ৩৭০

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- তাক্বদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ৩৭৩
- তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের স্তর সমূহের ব্যাখ্যা:
  - প্রথম স্তর ও তাতে অর্ন্তভুক্ত বিষয়সমুহ ৩৭৭
  - তাক্বদীরের দ্বিতীয় স্তর ও সংশ্লিষ্ট বিষয় ৩৮৮
- তাক্বদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং পাপাচার নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় ৩৯১
- আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাক্বদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বান্দাই নিজস্ব ইচ্ছা ও ইখতিয়ার (স্বাধীনতা) দ্বারা তাদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে থাকে ৩৯৮

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য

- ঈমানের হাকীকত বা পরিচয় এবং কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম ৪০৫
- ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা আবশ্যক ৪১৮
- ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য ৪২৫
- খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার হুকুম ৪৩৬
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের মর্যাদা ৪৪০
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা ৪৪৪

- ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ৪৪৮
- কারামাতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব ৪৬০
- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়? ৪৮৬
- আক্বীদাহর বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে ৪৯৪

✉ অনুবাদকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্য। ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী-রসূলদের মধ্যে অন্যতম মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তার পরিবার পরিজন ও ছাহাবীদের উপর। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করবে তাদের উপরও।

অতঃপর-দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম সঠিক ইসলামী আক্বীদাহ গ্রহণ অপরিহার্য। এ জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাক্কী জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের বাতিল আক্বীদাহ বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এ পথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে সঠিক আক্বীদাহ বিহীন আমলের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপরই দুনিয়া ও পরকালীন জীবনে সৌভাগ্য অর্জন নির্ভর করে। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের প্রতিই মানুষের প্রয়োজন সর্বাধিক। বান্দা যতক্ষণ আল্লাহর প্রভুত্ব, উলুহীয়াত, তার অতি সুন্দর নামসমূহ এবং তার সুউচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন না করবে, ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে না। মানুষের মনে স্রষ্টার অস্তিত্ব, তার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী, তার সৃষ্টি ও কর্মসমূহ, সৃষ্টির সূচনা, তার পরিসমাপ্তি, সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টি, তাদের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক, তাক্বদীর এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবন ও তাতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব সন্দেহ ও প্রশ্ন জাগ্রত হয়, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামী আক্বীদাহই কেবল সে সব প্রশ্ন ও সন্দেহের জবাব দিতে সক্ষম।

পৃথিবীতে মুসলিমদের বিজয়, সাফল্য, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে ছিল তাদের নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ আক্বীদাহ বিশ্বাস। যতদিন মুসলিমদের আক্বীদাহ বিশ্বাস সঠিক ও সুদৃঢ় ছিল, ততদিন তারা সমগ্র পৃথিবীর শাসক ছিল। এ জন্যই কুরআন মানুষের আক্বীদাহ পরিশুদ্ধ করার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। নাবী-রসূলদের দাওয়াতের মূল বিষয়ই ছিল আক্বীদাহর সংশোধন। তারা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাতেন, তা হলো এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং অন্যসকল বস্তুর ইবাদত বর্জন করা। মক্কাতে একটানা তের বছর অবস্থান করে নাবী

ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আক্বীদাহ সংশোধনের কাজে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

কুরআন ও সুন্নাতে আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোন সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খিলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণ গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদাহর উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তি, পরিণাম, ক্বিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নার পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব বিষয় চোখেও দেখা যায় না।

কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)*।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করাই সঠিক আক্বীদাহর উপর টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নার সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে আল্লাহর অস্তিত্ব, তার গুণাবলী, আখিরাত এবং অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলিম দাঁড়িয়ে যায়। এরা হলো মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-তর্ক দার্শনিকদের জবাব দিতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের যুক্তিগুলো ছিল তুলনামূলক দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সংশয় ও সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছে, যার জবাব স্বয়ং কালামশাস্ত্রবিদগণ খুজেঁ না পেয়ে নিজেরাই সংশয়ে পড়েছেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী শেষ বয়সে উপনীত হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি কালামী পদ্ধতি ও দার্শনিক উপস্থাপন প্রক্রিয়ার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন। শেষ জীবনে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায় এবং তৃষ্ণার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি।

আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ বুদ্ধিভিত্তিক যেই যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নার যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাতের দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক ও কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। এ বিষয়ে তার অন্যতম গ্রন্থ **'আল-আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া'** বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কিতাবে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তার সুউচ্চ গুণাবলী, আখিরাতের বিভিন্ন বিষয়সহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রায় সকল বিষয়ই অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

৬৯৮ হিজরীর কোনো এক দিনে আসরের ছ্বলাতের পর এক বৈঠকে শাইখ এই মূল্যবান কিতাবটি লিখে শেষ করেছেন। শাইখ নিজেই এই কিতাব লিখার কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তাতারী শাসনাধীন ইসলামী সাম্রাজের মুসলিমদের মধ্যে যখন অজ্ঞতা ও যুলুম ছড়িয়ে পড়ল, দীনের মৌলিক শিক্ষা যখন প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো, চতুর্দিকে কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ল এবং সঠিক ইসলামী আক্বীদাহ মুসলিমগণ প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল, তখন ইরাকের দক্ষিণাঞ্চল বসরা ও কূফার মধ্যকার 'ওয়াসিত' শহরের জনৈক কাযী শাইখের কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামী আক্বীদাহর বিষয়গুলো এক সাথে উল্লেখ করে একটি কিতাব লিখার অনুরোধ জানালেন। শাইখ জবাবে বললেন, আক্বীদাহর বিষয়ে লোকেরা তো অনেক কিতাবই রচনা করেছে। কিন্তু ওয়াসিতের কাযী চাপাচাপি করেই বললেন যে, আমি কেবল আপনার পক্ষ হতেই এ বিষয়ে একটি পুস্তক কামনা করছি। তখন তিনি আসরের ছ্বলাতের পর এক বৈঠকে এই কিতাবটি লিখে দিলেন। ওয়াসিতের কাযীর অনুরোধে এবং ওয়াসিতের অধিবাসীদের জন্য যেহেতু এই কিতাবটি লিখা হয়েছে, তাই এটিকে আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়া বলা হয়। সেই সাথে واسط অর্থ যেহেতু মধ্যবর্তী এবং এই কিতাবে যেহেতু মধ্যমপন্থী উম্মাতের তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের

আক্বীদাহগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে, তাই কিতাবটির নাম 'আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া' হওয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আল আক্বীদাতুল ওয়াসিত্বীয়ার বিষয়গুলো নিয়ে শাইখের সাথে সমকালীন আলিমদের একাধিক 'মুনাযারা' বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে মিশরের তদানীন্তন সুলতানের পক্ষ হতে নিযুক্ত দামেস্কের গভর্ণরের উপস্থিতিতে ৭০৫ হিজরী সালের বিতর্ক অনুষ্ঠানটি অন্যতম। শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আক্বীদাহ ওয়াসিত্বীয়ার বিষয়গুলোর উপর তিনটি মুনাযারায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এতে তিনি দীনের সমস্ত মূলনীতি ও ছ্বহীহ আক্বীদাহর মাসআলাগুলো সংক্ষিপ্ত ও সহজ ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে, কিতাবটির মধ্যে তিনি আক্বীদাহর ক্ষেত্রে তর্কশাস্ত্রবিদদের মতামত ও বিদ'আতমুক্ত সালাফে সালেহীনের আক্বীদাহর বিবরণ দিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, আশায়েরা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ওয়াসিতীয়ায় সন্নিবেশিত আক্বীদাহগুলোর বিষয়ে যখন শাইখের চরম বিরোধিতা শুরু করলো, তখন শাইখুল ইসলাম তাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, তোমরা তা থেকে এমন একটি মাসআলা নিয়ে আসো, যাতে আমি কুরআন ও সুন্নাহর খেলাফ করেছি। শাইখুল ইসলামের মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওয়াসিতীয়ার একটি মাসআলাকেও কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হিসাবে প্রমাণ করতে পারেনি।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সমাজের মুসলিমগণ সঠিক আক্বীদাহ থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন। মুসলিমদের অধঃপতনের মূল কারণ হল দীনের সঠিক আক্বীদাহ ও শিক্ষা বর্জন করে শির্ক ও বিদ'আতে জড়িয়ে পড়া। বাংলাভাষী মুসলিম অঞ্চলগুলোতেও বয়ে যাচ্ছে শির্ক-বিদ'আতের সয়লাব। যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অর্ন্তভুক্ত হওয়ার দাবী করে তারাও সঠিক আক্বীদাহ হতে অনেক দূরে। শুধু তাই নয়, যারা সুস্পষ্ট কবর পূজা ও নানা রকম শির্ক-বিদ'আতে লিপ্ত তাদেরকেও সুন্নী বলে আখ্যায়িত করা হয়!!! আর এ কারণেই বিভ্রান্ত হচ্ছে আমাদের সমাজের সরল প্রাণ অগণিত মুসলিম। বাংলা ভাষা এখন বাংলাদেশের সীমানা পার হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে কোটি কোটি বাংলাভাষী মুসলিম। বাংলাভাষী মুসলিমদের তুলনায় ইসলামী বই-পুস্তকের সংখ্যা কম বলেই মনে হয়। এখন পর্যন্ত আক্বীদাহর মৌলিক গ্রন্থগুলোর ব্যাখ্যাসহ সঠিক ও নির্ভুল অনুবাদ না হওয়া বাংলাভাষী মুসলিমদের ছ্বহীহ আক্বীদাহ সম্পর্কে অজ্ঞতার অন্যতম কারণ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ বর্ণনায় ওয়াসিত্বীয়া যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব, তাই মুসলিম উম্মার নিকট এটি বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। এর ছোট-বড় অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। সম্ভবত অনুবাদও হয়েছে অনেক ভাষায়। ওয়াসিতীয়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহের মধ্য থেকে শাইখ **শাইখ ড. ছ্বালিহ ইবনে ফাওযান**

আল ফাওযান এর ব্যাখ্যাটি বাংলায় অনুবাদের জন্য বেছে নেয়ার কারণ হলো এটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল। বাংলাভাষী মুসলিমগণ যেহেতু এখনো আক্বীদাহর বড় বড় কিতাবগুলো পড়তে অভ্যস্থ হয়ে উঠেনি, তাই এটিই তাদের জন্য আক্বীদাহর জগতে প্রবেশের মূল ফটক হতে পারে ভেবে এবং বিশেষ করে জম'ঈয়তে আহলুল হাদীছ বাংলাদেশ সৌদি আরব শাখার তত্ত্বাবধানে ওয়াসিত্বীয়ার এ ব্যাখ্যাটিই অনুবাদের জন্য নির্বাচন করা হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ায় মহান স্রষ্টার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, তাওহীদের মধ্য থেকে শুধু তাওহীদুল আসমা ওয়াস ছিফাত, তাক্বদীর, ঈমানের বিভিন্ন মাসআলা, আখিরাত সম্পর্কিত গায়িবী বিষয়সমূহ, খিলাফাত ও ছাহাবীদের ফযীলত এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই ওয়াসিত্বীয়ায় স্থান পেয়েছে। তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়াদি এখানে আলোচিত হয়নি। সে হিসাবে এটি আক্বীদাহর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়; বরং তাতে আক্বীদাহর বিশেষ একটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আক্বীদাহর যেসব বিষয় বাদ পড়েছে, তা অবগত হওয়ার জন্য আমাদের অন্যতম কিতাব **'শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া'**[১] নামক বইটি পড়ার অনুরোধ রইল।

আর তাওহীদুল উলুহীয়ার বিষয়গুলো সঠিকভাবে বুঝার জন্য শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত **'কিতাবুত্ তাওহীদ'**[২] সংগ্রহ করা যেতে পারে। আল্লাহর অশেষ কৃপায় বইগুলো পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তার শুকরিয়া আদায় করছি। এতে যেসব ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, অনুবাদ জনিত কোন ভুল-ভ্রান্তি নযরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন। হে আল্লাহ! তুমি বইগুলোর লেখক, ভাষ্যকার, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্ত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করো। আমীন॥

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

১. মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক প্রকাশিত।
২. মাকতাবাতুস সুন্নাহ কর্তৃক প্রকাশিত।

শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ আল-কাসীম অঞ্চলের বুরায়দাহ শহরের নিকটবর্তী শামাসীয়ার অধিবাসী। তিনি ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৮ তারিখ মুতাবেক ১ রজব ১৩৫৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট থাকতেই তার পিতা মারা যান। অতঃপর তিনি ইয়াতীম অবস্থায় স্বীয় পরিবারে প্রতিপালিত হন। শহরের মসজিদের ইমামের নিকট তিনি কুরআনুল কারীম, কিরা'আতের মূলনীতি এবং লিখা শিখেন।

শামাসিয়ায় ১৩৬৯ হিজরী সালে যখন সরকারী মাদরাসা চালু করা হয়, তখন তিনি সেখানে ভর্তি হন। অতঃপর বুরায়দা শহরস্থ ফয়সালীয়া ইবতেদায়ী মাদরাসায় ১৩৭১ হিজরী সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় তাকে ইবতেদায়ী মাদরাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর বুরায়দাতে ১৩৭৩ হিজরী সালে যখন ইসলামিক ইন্সটিটিউট খোলা হয়, তখন তিনি তাতে ভর্তি হন। ১৩৭৩ হিজরী সালে তিনি এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি রিয়াদ শহরস্থ কুল্লীয়া শারঈয়া বা শারঈয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৩৮১ হিজরী সালে শিক্ষা সমাপনী ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামী ফিকাহর উপর এম,এ পাস করেন এবং একই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্ম জীবন:

শারঈয়া কলেজ থেকে ডিগ্রী অর্জন করার পর তিনি রিয়াদস্থ ইসলামিক ইন্সটিটিউটে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অতঃপর তাকে শারঈয়া কলেজের শিক্ষক হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। অতঃপর তাকে ইসলামী আক্বীদাহ বিভাগের উচ্চতর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অতঃপর তাকে বিচার বিষয়ক উচ্চতর ইন্সটিটিউটে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। অতঃপর তাকে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষে তাকে পুনরায় সেখানে শিক্ষক হিসাবে ফিরে আসেন। অতঃপর তাকে ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য নিয়োগ করা হয়। তিনি এখানো এই পদে বহাল রয়েছেন।

তিনি আরো যেসব সরকারী দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে هيئة كبار العلماء এর সদস্য, মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত রাবেতার পরিচালনাধীন ইসলামী ফিকাহ একাডেমীর সদস্য, ইসলামী গবেষণা ও ফতোয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটির সদস্য, হজ্জ মৌসুমে দাঈদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সদস্য এবং রিয়াদ শহরের মালায এলাকার আমীর মুতইব ইবনে আব্দুল আযীয আল-সউদ জামে মসজিদের ইমাম, খতীব ও

শিক্ষক। তিনি সৌদি আরব রেডিওতে نور على الدرب নামক প্রোগ্রামে শ্রোতাদের প্রশ্নের নিয়মিত উত্তর প্রদান করেন।

এ ছাড়াও তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি, গবেষণা, অধ্যায়ন, পুস্তিকা রচনা, ফতোয়া প্রদান করাসহ বিভিন্নভাবে ইলম চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। এগুলো একত্র করে কতিপয় পুস্তকও রচনা করা হয়েছে। তিনি মাস্টার্স ও ডক্টরেক ডিগ্রী অর্জনার্থী অনেক ছাত্রের গবেষণা কর্মে তত্বাবধায়ন করেছেন।

শাইখের উস্তাদবৃন্দঃ

১) মান্যবর শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সা'দী, ২) শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায, ৩) আব্দুল্লাহ ইবনে হুমায়েদ, ৪) শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন শানকিতী, ৫) শাইখ আব্দুর রায্যাক আফীফী, ৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুর রাহমান আস-সুকাইতী, ৬) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আল-বুলাইহী, ৭) শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সুবাইল, ৮) শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে সালেহ আলখুলাইফী, ৯) শাইখ ইবরাহীম ইবনে উবাইদ আল-আব্দ আল-মুহসিন, ১০) শাইখ হামুদ ইবনে উকালা আশ শুআইবী, ১১) শাইখ সালেহ আল-ইল্লী আন্ নাসের। এ ছাড়াও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ধার্মিক শাইখের কাছ থেকে হাদীছ, তাফসীর এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন।

শাইখের ছাত্রগণঃ

১) শাইখ ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল-সাদহান, ২) শাইখ আলী ইবনে আব্দুর রাহমান আশ শিবিল, ৩) শাইখ সাগীর ইবনে ফালেহ আলসাগীর, ৪) শাইখ ইউসুফ ইবনে সা'দ আলজারীদ, ৫) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আল-উসাইমী, ৬) শাইখ সালেহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হামাদ আলউসাইমী, ৭) মাসজিদুল হারামের ইমাম শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনে সুদাইস, ৮) মসজিদে নববীর ইমাম শাইখ আব্দুল মুহসিন আল কাসিম, ৯) শাইখ সালেহ ইবনে ইবরাহীম আলুস-শাইখ, ১০) শাইখ আয্যাম মুহাম্মাদ আল শুআইর। এ ছাড়াও তার অনেক ছাত্র রয়েছে। তারা নিয়মিত তার মজলিসে এবং নিয়মিত দারসগুলোতে অংশ গ্রহণ করতেন।

শাইখের ইলমী খেদমতঃ

লেখালেখির কাজে রয়েছে শাইখের অনেক খেদমত। তার মধ্য থেকে নিম্নে কতিপয় গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো।

১) التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية এটি ইলমে ফারায়েযের উপর রচিত শাইখের একটি কিতাব। এটি ছিল মাস্টার্স পর্বে তার গবেষণার বিষয়। বইটি এক খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

২) أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ইসলামী শরীয়াতে খাদ্যদ্রব্যের বিধিবিধান।

৩) **الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد**। আমরা এর বাংলা নাম দিয়েছি **ছহীহ আক্বীদাহর দিশারী। মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৪) **شرح العقيدة الواسطية** আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম ইমাম শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বীয়ার ব্যাখ্যা **"শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসেত্বীয়া"** এটি। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

৫) البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب এটি একটি বড় মাপের কিতাব। এতে তিনি বিভিন্ন কিতাবের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছেন।

৬) مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة আক্বীদাহ ও দাওয়া বিষয়ে শাইখের বিভিন্ন লেকচার এখানে জমা করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৭) الخطب المنبرية في المناسبات العصرية যুগোপযোগী অনেক বিষয়কে একত্র করে জুমআর খুৎবা হিসাবে লিখা হয়েছে। এটি দু'খন্ডে ছাপানো হয়েছে।

৮) ইসলামের সংস্কারক ইমামগণ

৯) বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তিকা

১০) বিদ'আত থেকে সাবধান। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১১) مجموع فتاوى في العقيدة والفقه ফতোয়া ও আক্বীদাহ বিষয়ক সংকলন

১২) شرح كتاب التوحيد- للإمام محمد بن عبد الوهاب এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহর লিখিত কিতাবুত তাওহীদের ব্যাখ্যা।

১৩) الملخص الفقهي ফিকাহর উপর লিখিত শাইখের এটি একটি বিশাল কিতাব।

১৪) إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان রমাদ্বান মাসের জন্য খাস করে অনেকগুলো দারস এখানে জমা করা হয়েছে।

১৫) হাজ্জ ও উমরাহকারীর জন্য যা করণীয়

১৬) কিতাবুত তাওহীদ। এটি সৌদি আরবের স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

১৭) কিতাবুদ দাওয়া

১৮) রমাদ্বানুল মুবারকের মজলিস

১৯) **عقيدة التوحيد** আক্বীদাতুত তাওহীদ। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২০) كشف الشبهات এর ব্যাখ্যা।

২১) যাদুল মুসতাকনি

২২) الملخص في شرح كتاب التوحيد এটি কিতাবুত্ তাওহীদের ব্যাখ্যা।

২৩) **شرح مسائل الجاهلية** এটি জাহেলী যুগের অনেক শিরক, কুফর এবং কুসংস্কারের প্রতিবাদে লিখিত হয়েছে। এটি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহিমাহুল্লাহ এর লিখিত মাসাঈলিল জাহিলিয়াহ নামক পুস্তিকার ব্যাখ্যা **"শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ"**। **মাকতাবাতুস সুন্নাহ** কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ হয়েছে।

২৪) حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস উপলক্ষে মীলাদ উদ্‌যাপন করা।

২৫) الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান এবং মানব জীবনে তার প্রভাব।

২৬) مجمل عقيدة السلف الصالح সালাফদের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

২৭) حقيقة التصوف সুফীবাদের হাকীকত।

২৮) من مشكلات الشباب যুবকদের সমস্যা

২৯) وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله আল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার-ফায়ছালা করা আবশ্যক

৩০) من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ

৩১) دور المرأة في تربية الأسرة পরিবার পরিচালনায় নারীর ভূমিকা

৩২) معنى لا إله إلا الله লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহএর ব্যাখ্যা

৩৩) **شرح نواقض الإسلام** ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা

৩৪) التوحيد في القران কুরআনুল কারীমে তাওহীদ

৩৫) سلسلة وصايا وتوجيهات للشباب ١-٤ যুবকদের জন্য কতিপয় উপদেশ ও নির্দেশনা সিরিজ ১-৪

শাইখের প্রশংসায় বিভিন্ন আলিমের মন্তব্যঃ

সৌদি আরবে যে সব বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ আলিম এখনো জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে শাইখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, শাইখ ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার পরে আমরা কার কাছে দীনের বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো? জবাবে ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বললেন, আপনারা সালেহ ফাওযান জিজ্ঞসা করবেন। এমনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনার পরে কাকে জিজ্ঞাসা করবো? তিনি জবাব দিলেন যে, আপনারা সালিহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। কেননা তিনি একজন ফকীহ এবং ধার্মিক। শাইখ ইবনে গুদাইয়্যান প্রায়ই বলতেন, আপনারা দীনের ব্যাপারে শাইখ সালেহ ফাওযানকে জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ যেন তার আনুগত্যের উপর তার বয়স বৃদ্ধি করেন, তার শেষ পরিণাম যেন ভালো করেন এবং যেন হকের উপর তাকে টিকিয়ে রাখেন।

আমরা শাইখের জন্য দু'আ করি, তিনি যেন তার হায়াতে বরকত দান করেন এবং দীনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তা যেন কবুল করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সত্য দীনসহ যুগে যুগে অগণিত নাবী রসূল প্রেরণ করেছেন। নির্ভেজাল তাওহীদই ছিল নাবী-রসূলদের দীনের মূল বিষয়। পৃথিবীর মানুষ এই তাওহীদকে যখনই ভুলে গেছে, তখনই তা পুনরুদ্ধারের জন্য নতুন নতুন নাবী-রসূল পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আগমনকারী সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের মূল বিষয়ও ছিল এই তাওহীদ। মক্কায় অবস্থান করে একটানা ১৩ বছর তিনি তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করে তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানগণ তার এই দাওয়াত গ্রহণ করলো এবং তারা তাকে সাহায্য করলো। আল্লাহ তা'আলা অল্প সময়ের মধ্যেই তার দীনকে বিজয়ী করলেন। আরব উপদ্বীপসহ পৃথিবীর সর্বত্রই এই দীনের দাওয়াত পৌঁছে গেল। তাওহীদের মাধ্যমে তারা সমগ্র জাতির উপর যে গৌরব, সম্মান, শক্তি, প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে মুসলিমগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। মুসলিমদের শক্তির মূলভিত্তি এই নির্ভেজাল তাওহীদের উপর শির্ক ও কুসংস্কারের আবর্জনা পড়ে যাওয়াই মুসলিমদের বিপর্যয়ের প্রধান ও মূল কারণ।

ইসলামের এই মূলভিত্তি নির্ভেজাল তাওহীদ থেকে যখনই মুসলিম জাতি দূরে চলে গেছে, দ্বীনি লেবাসে বিভিন্ন সময় শির্ক, বিদআত, কুসংস্কার ও বিজাতীয় আচার-আচরণ মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, তখনই নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে জাতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং সকল প্রকার আবর্জনা থেকে তাওহীদকে পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ করার জন্য ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে আল্লাহ তা'আলা বহু মর্দে মুজাহিদ প্রেরণ করেছেন। তারা পথহারা জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে এনেছেন, তাওহীদের দাওয়াতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন এবং দীনকে সকল প্রকার শির্ক-বিদ'আত থেকে সংস্কার ও সংশোধন করেছেন। তাদেরই ধারাবাহিকতায় হিজরী সপ্তম ও অষ্টম শতকে আগমন করেন বিপ্লবী সংস্কারক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ। বহু প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে তাওহীদ পুনরুদ্ধার ও সংস্কারে তিনি যে অতুলনীয় অবদান ও খেদমত রেখে গেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম জাতির জন্য তা দিশারী হয়ে থাকবে। তার বরকতময় জীবনী, দাওয়াত ও সংস্কারের সকল দিক উল্লেখ করতে গেলে বড় মাপের একটি গ্রন্থ রচনা করা দরকার। তাই আমরা স্বল্প পরিসরে শাইখের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, জীবনী ও সংস্কার আন্দোলনের কিছু দিক এখানে উল্লেখ করেছি।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচয়

তিনি হলেন আবুল আব্বাস তকীউদ্দীন শাইখুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনে আব্দুল হালীম ইবনে আব্দুস সালাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ। ৬৬১ হিজরী সালের ১০ রবীউল আওয়াল মাসে তিনি বর্তমান সিরিয়ার হারান এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এবং দাদা আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আব্দুস সালাম বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাম্বলী ফিকাহবিদ ছিলেন। সে হিসাবে তিনি এমন একটি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, যার সকল সদস্যই ছিলেন আলিম ও দীনদার। আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে শিশুকালেই তিনি ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। উল্লেখ্য যে, আলিমদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ছিলেন শাইখের নানী। তিনি ওয়াজ-নাসীহত ও ভাষণ-বক্তৃতা দানে খুবই পারদর্শী ছিলেন।

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা

ইমামের বয়স যখন সাত বছর, তখন মুসলিম অঞ্চলগুলো তাতারীদের আক্রমণের শিকার হয়। শাইখের জন্মস্থান হারান এলাকা তাতারীদের আক্রমণের কবলে পড়লে মানুষ জানের ভয়ে সবকিছু পানির দামে বিক্রি করে পালাচ্ছিল। এই ভীতি ও আতঙ্কের দিনে ইমামের পরিবারবর্গ ও দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তারা প্রয়োজনীয় সবকিছু ফেলে দিয়ে শুধু পারিবারিক লাইব্রেরীর বই-পুস্তকগুলো গাড়ী বোঝাই করলেন। শুধু কিতাবেই কয়েকটি গাড়ি পরিপূর্ণ হয়ে গেল। গাড়ীগুলো টানার জন্য প্রয়োজনীয় ঘোড়া ও গাধাও ছিল না। তাই গাধার পাশাপাশি পরিবারের যুবক সদস্যদেরও মাঝে মাঝে কিতাবের গাড়ী টানতে হতো। দামেস্কে পৌঁছার পর তথাকার লোকেরা শাইখের পরিবারকে অভ্যর্থনা জানালো। দামেস্কবাসীরা শাইখের পিতা ও দাদার জ্ঞান ও পান্ডিত্যের খ্যাতির কথা আগে থেকেই অবহিত ছিল। পিতা আব্দুল হালীম দামেস্কের বড় মসজিদ জামে উমুবীতে দারস দেয়ার দায়িত্ব লাভ করলেন। শীঘ্রই তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এলো। কিশোর ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে হাদীছ, ফিক্‌হ ও আরবী ভাষা চর্চায় মশগুল হলেন। সেই সাথে তিনি পিতার সাথে বিভিন্ন ইলমী মজলিসে শরীক হতে লাগলেন।

ইমামের মেধা ও স্মরণশক্তি

ইমামের খান্দানের সবাই মেধাবী ছিলেন। কিন্তু তাদের তুলনায় ইমামের স্মরণ শক্তি ছিল অসাধারণ। শিশুকাল থেকে তার অসাধারণ স্মরণশক্তি শিক্ষকদের অবাক করে দিয়েছিল। দামেস্কের লোকদের মুখে মুখে তার স্মরণশক্তির কথা আলোচনা হতো। একদা আলেপ্পো নগরীর একজন বিখ্যাত আলেম দামেস্কে আসেন। তিনি কিশোর ইবনে তাইমীয়ার স্মরণশক্তির কথা লোকমুখে আগেই শুনেছিলেন। ইমামের স্মরণশক্তি পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি দর্জির দোকানে বসে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে একদল ছেলেকে আসতে দেখা গেলো। দর্জি ইঙ্গিতের মাধ্যমে ইমামকে দেখিয়ে দিল। তিনি ইমামকে ডাকলেন। ইমামের খাতায় হাদীছের তের-চৌদ্দটি মতন লিখে দিয়ে বললেন, পড়ো। কিশোর ইমাম ইবনে তাইমীয়া গভীর মনোযোগের সাথে হাদীছগুলো একবার পড়লেন। তিনি এবার খাতা উঠিয়ে নিয়ে বললেন, মুখস্থ শুনিয়ে দাও। ইবনে তাইমীয়া তা মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন। এবার একগাদা সনদ লিখে দিয়ে পড়তে বললেন। পড়া হলে মুখস্থ বলতে বললেন। ইমাম সনদগুলোও মুখস্থ বললেন। শাইখ এতে অবাক হয়ে বললেন, বড় হয়ে এই ছেলে অসাধ্য সাধন করবে।

ইমামের জ্ঞান অর্জন ও চর্চা

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ মাত্র সাত বছর বয়সে শিক্ষালয়ে প্রবেশ করেন এবং মাত্র বাইশ বছর বয়সে তার জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ করে তুলেন। কুরআন, হাদীছ, ফিকহ এবং উসূলের সাথে সাথে তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি দুই শতাধিক উস্তাদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। কুরআনের তাফসীরের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। যে সব উস্তাদদের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে ইবনে কুদামা, ইবনে আসাকেরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটানা সাত থেকে বাইশ বছর পর্যন্ত জ্ঞান লাভের পর শিক্ষকতা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাইশ বছর বয়সে উপনীত হলে তার পিতা আব্দুল হালীম ইবনে তাইমীয়া মৃত্যু বরণ করেন। তার পিতা ছিলেন দামেস্কের সর্ববৃহৎ দারুল হাদীছের প্রধান মুহাদ্দিস। আব্দুল হালীমের মৃত্যুর পর এই পদটি শূন্য হয়ে যায়। সুযোগ্য পুত্র ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সেই পদ পূরণ করেন। তার দারসে যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আলেমগণ উপস্থিত হতে শুরু করেন। যুবক আলেমের জ্ঞান ও পান্ডিত্য সবাইকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। কিছু দিন পরেই দামেস্কের প্রধান মসজিদ জামে উমুবীতে তিনি পিতার স্থানে কুরআনের তাফসীর করার দায়িত্বে নিযুক্ত হন। তার জন্য বিশেষভাবে মিম্বার তৈরী করা হয়। প্রতি সপ্তাহেই তার তাফসীরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ছাত্রের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। কুরআনের তাফসীরের সাথে সাথে সমকালীন সব সমস্যার

কুরআনিক সমাধান বর্ণনা করতেন। তার হাতে তৈরী হয় যুগশ্রেষ্ঠ অসংখ্য আলেম। তাদের মধ্য হতে স্বনামধন্য লেখক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, ইমাম ইবনে কাছীর এবং ইমাম যাহাবীর নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

ইমামের মাযহাব

তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তারা সকলেই ছিলেন আলিম। তারা ফিক্হের ক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের তাকলীদ করতেন না। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের অনুসরণ করতেন, সুন্নাতের সাহায্য করতেন এবং সালাফী নীতি গ্রহণ করতেন। সুন্নাত ও সালাফী নীতির পক্ষে তিনি এমন এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন, যা তার পূর্বে অন্য কেউ পেশ করার সাহসিকতা প্রদর্শন করতেন না।

সত্য প্রকাশে ইমামের সাহসকিতা

তাতারীদের আক্রমণের খবর যখন সিরিয়ায় পৌঁছল, তখন সিরিয়ার বিভিন্ন শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে মুসলিমগণ আগেই অবহিত ছিল। তাই তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আশপাশের সকল এলাকা ছেড়ে লোকেরা রাজধানী দামেস্কের দিকে চলে আসতে লাগল। দামেস্কের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে খবর আসলো যে, মিশরের বাদশাহ প্রচুর সেনাবাহিনীসহ দামেস্কের মুসলিমদের সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসছেন। এই খবর শুনে নগরীতে প্রাণের সাড়া জাগল। মুসলিমগণ নতুন উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

৬৯৯ হিজরীর ২৭ রবীউল আওয়াল মাসে তাতারী সম্রাট কাজানের সাথে মিশরের সুলতানের সংঘর্ষ হলো। অনেক চেষ্টা করেও এবং অসীম সাহসিকতার সাথে লড়াই করেও মুসলিমরা শেষ রক্ষা করতে পারলো না। মুসলিমরা হেরে গেল। মিশরের সুলতান পরাজিত সেনাবাহিনী নিয়ে কায়রোর পথে রওয়ানা হলেন।

এবার দামেস্কবাসীরা পড়লো মহাসংকটে। তাতারী সম্রাট সেনাদলসহ এবার বিজয়ী বেশে নগরে প্রবেশ করবে। তাতারী বিভীষিকার কথা চিন্তা করে বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা শহর ত্যাগ করতে লাগল। এর আগেই শহরের বিচারক, পরিচিত আলেম-উলামা, সরকারী অফিসার, বড় বড় ব্যবসায়ী এমনকি দামেস্কের গভর্ণর নিজের শহরের মায়া ত্যাগ করে মিশরের পথে পাড়ি জমালেন।

জনগণের এক অংশও তাতারীদের হত্যাযজ্ঞের ভয়ে দামেস্ক ছেড়ে দিল। এখন কেবল সাধারণ জনগণের একটি অংশই দামেস্কে রয়ে গেল।

এদিকে কাজানের সেনাদল দামেস্কে প্রবেশের সময় ঘনিয়ে আসছিল। এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং শহরের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বসে একটা সিদ্বান্ত গ্রহণ করলেন। তারা সিদ্বান্ত নিলেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর নেতৃত্বে নগরবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল কাজানের নিকট যাবে। তারা নগরবাসীদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার একটি ফরমান লিখে আনবে।

এ উদ্দেশ্যে তাতারী সম্রাট কাজানের সামনে দলবল নিয়ে উপস্থিত হলেন ইসলামের অগ্রদূত ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ। কাজানের সম্মুখে ইমাম কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে ন্যায়-ইনসাফের পক্ষে এবং যুলুম নির্যাতনের বিপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি নির্ভয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং কাজানের কাছাকাছি হচ্ছিলেন। তার আওয়াজ ধীরে ধীরে উঁচু ও গুরুগম্ভীর হচ্ছিল। কুরআনের আয়াত ও হাদীছ শুনাতে শুনাতে তিনি কাজানের অতি নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো পরাক্রমশালী কাজান এতে মোটেই বিরক্তিবোধ করছিলেন না। বরং তিনি কান লাগিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। ইতিমধ্যেই কাজান ইমামের ভাষণে সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে গেলেন। ইমামের ভাষণ কাজানকে অনুবাদ করে শুনানো হলে তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই আলেমটি কে? আমি এমন সাহসী ও দৃঢ় সংকল্প লোক আজকের পূর্বে আর কখনো দেখিনি। ইতিপূর্বে আমাকে অন্য কেউ এমন প্রভাবিত করতে পারেনি।

লোকেরা ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে কাজানকে জানালো এবং ইমামের ইলম ও কার্যাবলী সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ কাজানকে সেদিন বলেছিলেন, হে কাজান! আপনি নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করেন। আমি জানতে পেরেছি, আপনার সাথে রয়েছেন কাযী, শাইখ, মুয়ায্যিন এবং ইমামগণ। এসব সত্ত্বেও আপনি মুসলিমদের উপর আক্রমণ করেছেন, তাদেরকে হত্যা করেছেন, তাদের নারীদেরকে বন্দী করেছেন এবং মুসলিমদের মালামাল লুণ্ঠন করেছেন। অথচ আপনার পিতা ও দাদা কাফির হওয়া সত্ত্বেও এ ধরণের কাজ করতে ইতস্ত করতেন। তারা নিজেদের ওয়াদা-অঙ্গীকার পালন করেছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আপনি আল্লাহর বান্দাদের উপর মারাত্মক যুলুম করেছেন।

সে সময় ইমামের সাথে ছিলেন প্রধান বিচারপতি নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস। তিনি লিখেছেন, ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ যখন কাজানের সাথে কথা শেষ করলেন, তখন তার ও সাথীদের সামনে খাবার রাখা হলো। সবাই খেতে লাগলেন। কিন্তু ইমাম হাত গুটিয়ে নিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব

দিলেন, এ খাবার হালাল নয়। কারণ গরীব মুসলিমদের থেকে লুট করা ছাগল ও ভেড়ার গোশত সংগ্রহ করা হয়েছে এবং মযলুম মানুষের কাছ থেকে জোর করে কাঠ সংগ্রহ করে তা পাকানো হয়েছে। অতঃপর কাজান ইমামকে দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম দু'আ করতে লাগলেন। দু'আতে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এই যুদ্ধের পিছনে কাজানের উদ্দেশ্য যদি হয় তোমার দীনকে সাহায্য করা, তোমার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা, তাহলে তুমি তাকে সাহায্য করো। আর যদি দুনিয়ার রাজত্ব লাভ এবং লোভ-লালসা চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তুমিই তাকে ধ্বংস করো। আশ্চর্যের বিষয় হলো ইমাম দু'আ করছিলেন, আর কাযান আমীন আমীন বলে যাচ্ছিলেন। কাযী আবুল আব্বাস নাজমুদ্দীন বলেন, ইমাম যখন কাযানের সামনে বক্তৃতা করছিলেন, তখন আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং নিজেদের জামা-কাপড় গুটিয়ে নিচ্ছিলাম। কি জানি কখন ইমামের উপর জল্লাদের তরবারী ঝলসে উঠবে এবং তার রক্তে আমাদের বস্ত্র রঞ্জিত হবে। কাযী নিযাম উদ্দীন আরো বলেন, কাযানের দরবার থেকে বের হয়ে এসে আমরা ইমামকে বললাম, আমরা আপনার সাথে যাবো না। আপনি তো আমাদেরকে প্রায় মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আপনার কারণে আমাদের উপর বিরাট মুছীবত চলে আসার উপক্রম হয়েছিল। ইমাম তখন ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, বরং আমিই তোমাদের সাথে যাবো না। অতঃপর আমরা সকলেই তাকে রেখে চলে আসলাম। ইমাম একাই রওয়ানা দিলেন। রওয়ানা দেয়ার সময় কাযান আবার দু'আ করার আবেদন করলেন। ইমাম পূর্বের দু'আর পুনরাবৃত্তি করলেন।

ইমামকে একাকী চলতে দেখে স্বয়ং কাযান একদল সৈন্য পাঠিয়ে ইমামের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। ইমামের একাকীত্বের খবর শুনে শহরের একদল লোক বের হয়ে এসে ইমামকে সঙ্গ দেয়ার কথাও জানা যায়। কাযী নাজমুদ্দীন আবুল আব্বাস বলেন, ইমাম নিরাপদে দামেস্কে ফিরে এলেন। ঐদিকে আমাদের অবস্থা এতই শোচনীয় হলো যে, রাস্তায় একদল লুটেরা বাহিনী আমাদের উপর আক্রমণ করলো এবং সর্বস্ব খুইয়ে নিল। আমরা একদম উলঙ্গ হয়ে শহরে ফিরলাম। অত্যন্ত মর্যাদার সাথে ইমাম তাতারীর দরবার থেকে ফিরে আসলেন এবং নগরবাসীর জন্য নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখিয়ে আনলেন। তাতারীরা যাদেরকে বন্দী করেছিল, তাদেরকেও ছাড়িয়ে আনলেন। তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী তিনি যেমন শুনেছিলেন, তেমনি নিজ চোখেও তাদের তান্ডব দেখেছিলেন। তারপরও তিনি একটুও বিচলিত হননি। তাতারী সম্রাটের মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে এবং তাতারী সেনাদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করতে তিনি একটুও ভীতি অনুভব করেননি। তিনি বলতেন, যার অন্তরে রোগ আছে সেই কেবল আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করতে পারে।

জিহাদের ময়দানে ইমাম

আল্লাহর দীনকে সকল প্রকার কুসংস্কার-আবর্জনা ও শির্ক-বিদ'আত হতে পরিষ্কার করার জন্য শাইখ যেমন আমরণ কলম ও জবান দ্বারা জিহাদ করেছেন, ঠিক তেমনি শাইখুল ইসলাম তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে ময়দানে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলিম উম্মার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে তাতারীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার জন্য মুসলিমদেরকে তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি নিজেও ময়দানে নেমে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে সম্রাট কাযানের নিকট প্রবেশ করে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে তার সাহসিকতা দেখে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। ৭০২ হিজরী সালের রামাযান মাসে তাতারীদের বিরুদ্ধে সিরিয়ার শাকহব নামক অঞ্চলে যেই যুদ্ধ হয়েছিল, তাতে তিনি মুজাহিদদের কাতারের সর্বাগ্রে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা এই যুদ্ধে তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। এমনি আরো অনেক যুদ্ধেই তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন। মিশরের সুলতান যখন তাতারীদের হাতে দেশ সমর্পন করে দিতে চেয়েছিলেন, তখন তিনি সুলতানকে ধমক দিয়েছিলেন। জিহাদের প্রতি মুসলিমদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং নিজে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে মুসলিমদের অন্তর থেকে তাতারী আতঙ্ক দূরীভূত করে। আল্লাহর দীনের প্রতি মুসলিমদের অবহেলার কারণে তাদের কপালে যে দুর্দশা নেমে এসেছিল, কুরআন ও সুন্নাহর পথ বর্জন করার ফলে তারা রাজনৈতিকভাবে তারা যে দুর্বলতা ও বিপর্যয়ের কবলে পড়েছিল, ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর সংস্কার ও জিহাদী আন্দোলনে মুসলিমরা নতুন করে জেগে উঠেছিল। মুসলিমগণ নতুন করে জিহাদী চেতনা ফিরে পায়। তাতারীরা ইসলামী সাম্রাজ্যের মূল কেন্দ্র বাগদাদ দখল করে খলীফাকে যবাই করে এবং লক্ষ লক্ষ মুসলিমের রক্তে রাজপথ রক্তাক্ত করে তাতারীরা যেভাবে একের পর এক অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সিরিয়ার দামেস্ক এবং মিশরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ মুসলিমদেরকে সুসংগঠিত করে সিরিয়া ও মিশরের দিকে তাতারীদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে না দিলে মুসলিমদের ভাগ্যাকাশ কেমন হতো, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

অন্যায় ও অপকর্ম নির্মূলে ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ

তাতারীরা দামেস্ক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর শহরে প্রকাশ্যে মদ পানসহ নানা অপকর্ম ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ তখন সিরিয়া এক সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন ছিল। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একদল ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শহরে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন এবং মদের দোকানগুলোতে ঢুকে পড়েন। মদের পেয়ালা ও কুঁজো ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন এবং দোকানের মদ নালায় ঢেলে দিলেন। অন্যায় ও

অপকর্মের আস্তানায় প্রবেশ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন, ইসলামের নির্দেশ বুঝাতেন এবং তাওবা করাতেন। প্রয়োজনে শাস্তি দিতেন। ইমামের অভিযানে সারা দামেস্ক শহর পুনরায় দ্বীনি পরিবেশ ফিরে পেল।

ভ্রান্ত তাসাউফের কবল থেকে ইসলামী আক্বীদাহর সংস্কারে ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগ থেকে খালেস ইসলামী তাসাউফের একটি ধারা চলে আসছিল। ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনই ছিল এর একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীতে এর কর্মধারায় নানা আবর্জনা এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে গেল যে, মুসলিমদের এক বিরাট গোষ্ঠিও এই আবর্জনা ধোয়া পানি পান করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগল। হিজরী অষ্টম শতকে এসে সুফীবাদ এক গোমরাহী ও ভ্রান্ত মতবাদে পরিণত হয়। তাসাউফের লেবাস ধরে নির্ভেজাল ইসলামী আক্বীদাহর বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রীক দর্শন, সর্বেশ্বরবাদ, অদ্বৈত্ববাদ ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আবর্জনা মিশ্রিত সুফীবাদের দাবীদাররা ইলমকে যাহেরী-বাতেনীতে বিভক্ত করতে থাকে, একজনের বক্ষদেশ থেকে অন্যজনের বক্ষদেশে জ্ঞানের গোপন বিস্তার হয় বলে প্রচার করতে থাকে এবং কামেল পীর-মুরশিদ ও আল্লাহর প্রেমে পাগল ভক্তের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান মেনে চলার প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত চিন্তা-বিশ্বাস তাসাউফের নামে মুসলিমদের বিরাট এক অংশের উপর চেপে বসে।

আল্লাহর অলী ও তার নেক বান্দাদের ব্যাপারে অমুসলিমদের ন্যায় মুসলিমরাও বাড়াবাড়ি শুরু করে। তাদের কাছে ফরিয়াদ জানাতে এবং নিজেদের দিলের মাকসুদ পূরা করতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আলেমগণও অলীদের কবরে ধরণা দিত।

ইসলামের নামে এই সব জাহেলীয়াতের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করে খালেস তাওহীদের দিকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য এমন একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল, যিনি তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে অবগত, জাহেলীয়াতের সকল চেহারা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং জাহেলীয়াতের মূলোৎপাটন করে মুসলিমদের জন্য সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের আমল থেকে নির্ভেজাল আক্বীদাহ ও আমল তুলে ধরেন। এই গুরু দায়িত্বটি পালন করার জন্য হিজরী অষ্টম শতকে আল্লাহ তা'আলা ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহকে তাওফীক দান করেন। তিনি মুসলিমদের সামনে ইসলামের পরিচ্ছন্ন আক্বীদাহ বিশ্বাস তুলে ধরেন এবং সকল প্রকার শির্ক-বিদআত থেকে ইসলামকে পরিশুদ্ধ করেন।

মুসলিমদের আক্বীদাহকে শির্কমুক্ত করা ও তার মূলোৎপাটনে ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর প্রচেষ্টা

মানুষের রক্ত-মাংসের দেহটার স্রষ্টা যেমন আল্লাহ, ঠিক তেমনি তার মধ্যে যেসব বিমূর্ত এবং অলৌকিক গুণাবলী রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এগুলোর জন্য কোন কৃতিত্ব মানুষের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। কিন্তু মানুষের গোমরাহীর ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায় থেকেই মানুষ মানুষের পূজা করে আসছে। এটা জীবিত ও মৃত উভয় পর্যায়েই স্থান করে নিয়েছে। পীর পূজা, আওলীয়া পূজা, কবর পূজা, মাযার পূজা প্রভৃতি ছড়িয়ে পড়েছে মানব সমাজে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মুসলিমগণ কোন দিন প্রকাশ্যে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমরা অবশ্য প্রকাশ্য শির্ক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়নি। কিন্তু শির্ক মিশ্রিত কার্যকলাপ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। মূর্তিপূজার পরিবর্তে তাদের একটি গ্রুপ আওলীয়া পূজা ও কবর পূজায় লিপ্ত রয়েছে। কবরের মধ্যে আবার বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে শহীদদের মাযার। এগুলোকে 'মাশহাদ' বলা হয়। আওলীয়াদের মাযার ও শহীদের মাশহাদ কিছু কিছু জাহেল মুসলিমদের কাছে মসজিদের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই তারা মসজিদের বদলে এগুলোতেই দান-খয়রাত করে, বাতি জ্বালায়, ধন-সম্পদ ওয়াক্ফ করে, এগুলোর উপর দালান-কোঠা ও গম্বুজ নির্মাণ করে। অনেক মাযারের চাকচিক্য ও গম্বুজ মসজিদের সৌন্দর্যকেও হার মানায়।

লোকেরা জাঁকজমকের সাথে বরকতের আশায় এগুলোর উদ্দেশ্যে সফর করে, গরু-ছাগল নিয়ে যায়। আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী হাজীদের কাফেলার মতোই দেখা যায় তাদের কাফেলা। এভাবে মসজিদের পরিবর্তে মাযার ও মাশহাদের দিকেই বিরাট এক শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে এই অবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুসলিমদেরকে উদ্ধার করার জন্য ইমাম ইবনে তাইমীয়ার রহিমাহুল্লাহ মত একজন মর্দে মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল। তিনি অজ্ঞ ও জাহেল মুসলিমদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এগুলো ইসলাম নয়; বরং ভিন্ন নামে মূর্তি পূজারই নামান্তর। তার রচনার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মুসলিমদের গোমরাহীর আলোচনা এবং কবর ও মাযার পূজার প্রতিবাদ। ৭০২ হিজরীতে সিরিয়া তাতারী আক্রমণ থেকে মুক্ত হবার পর ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ পুনরায় তার সংস্কারমূলক কার্যাবলী শুরু করেন। অধ্যাপনা, তাফসীর ও হাদীছের দার্‌স দান, ইসলামের নামে প্রচলিত শির্ক ও বিদ'আত বর্জনের আহবান করেন। সেই সাথে শির্ক, বিদআত ও জাহেলীয়াতের বিরুদ্ধে অভিযানও পরিচালনা করেন। এ যুগে ইয়াহূদী-খ্রিষ্টানদের

সাথে বসবাস করার কারণে ইসলাম বিরোধী অনেক আক্বীদাহ মুসলিমদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। সে সময় দামেস্কের অদূরে একটি বেদী ছিল। বেদীটি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিমদের মধ্যে অদ্ভুত ধরণের বিভিন্ন কাহিনী প্রচলিত ছিল। এটি মুসলিমদের জন্য বিরাট ফিতনায় পরিণত হয়েছিল। মুসলিমরা সেখানে মানত করতো। ৭০৪ হিজরীতে ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একদল মজুর ও পাথর কাটা মিস্ত্রি নিয়ে সেখানে হাযির হন। তাদের সহায়তায় বেদীটি কেটে টুকরা টুকরা করে নদীতে নিক্ষেপ করে শির্ক-বিদ'আতের এই আস্তানাটির মূলোৎপাটন করেন। মুসলিমরা বিরাট একটি ফিতনা থেকে মুক্তি পায়।

ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অষ্টম হিজরী শতকে দু'টি দার্শনিক মতবাদ মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠে। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ কে এ ভ্রান্ত মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। একটি হলো ওয়াহদাতুল উজুদ এবং অন্যটি হুলুল ও ইত্তেহাদ। আমাদের ভারতবর্ষের দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ দু'টিকে বলা হয় অদ্বৈতবাদ ও সর্বেশ্বরবাদ। পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশের সুফীদের মধ্যেও এ মতবাদ দু'টি প্রবেশ করে। আনন্দের বিষয় হলো, মুজাদ্দেদ আলফেসানী এই মতবাদ দু'টির বিরুদ্ধে প্রচন্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। তবে অতি দু:খের সাথে বলতে হয় যে, ভারতবর্ষের সুফীদের মধ্যে আজও এই মতবাদ দু'টির উপস্থিতি প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়।

এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করতে পারেন, আসলে এই মতবাদ দু'টির ব্যাখ্যা কী? ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এ মতবাদ দু'টির প্রধান প্রবক্তা মুহীউদ্দীন ইবনে আরাবীর উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন, অস্তিত্ব মাত্র একটি। সৃষ্টির অস্তিত্বই স্রষ্টার অস্তিত্ব। (নাউযুবিল্লাহ) তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টি, এ দু'টো পৃথক সত্তা হিসাবে তারা স্বীকার করে না। বরং তাদের মতে স্রষ্টাই হলো সৃষ্টি আর সৃষ্টিই হলো স্রষ্টা। তাদের মতে বনী ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। তারা আরো বলে, ফেরাউনের "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা" অর্থাৎ আমি তোমাদের মহান প্রভু, এই দাবীতে সত্যবাদী ছিল। ইবনে আরাবী নূহ আলাইহিস সাল্লামের সমালোচনা করে বলে যে, তার কাওমের লোকেরা মূর্তি পূজার মাধ্যমে আসলে আল্লাহকেই পূজা করেছিল (নাউযুবিল্লাহ)। আর তার সময়ের মহাপ্লাবন ছিল মারেফতে ইলাহীর প্লাবন। এ প্লাবনে তারা ডুবে গিয়েছিল।

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ওয়াহদাতুল উজুদ ও সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মতবাদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করাকে তাতারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের মতোই

সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। সৃষ্টি এবং স্রষ্টা কখনোই এক হতে পারে না। আমরা মস্তিষ্কের মধ্যে যা কল্পনা করি তার সবগুলোর অস্তিত্ব মস্তিষ্কের বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার মাথায় দশহাত বিশিষ্ট এবং তিন মুখ বিশিষ্ট মানুষের কল্পনা জাগতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে এই ধরণের মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে। মস্তিষ্কের বাইরে যেসব বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে, তা মূলতঃ দু'প্রকার: (১) সৃষ্টি ও (২) স্রষ্টা। পৃথিবীতে এমন কোন জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা এমনিতেই হয়ে গেছে। প্রত্যেক জিনিসের একজন উদ্ভাবক ও কারিগর রয়েছে। তাদের উভয়ের স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন নয়। বরং কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য এবং যে তা তৈরী করেছে, তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। মহান আল্লাহ স্বীয় জ্ঞান, কুদরত এবং ইচ্ছা দ্বারা এই আসমান-যমীন ও এতোদুভয়ের মধ্যকার সকল বস্তু তৈরী করেছেন। সুতরাং তিনি এবং তার তৈরী মাখলুক এক হয় কিভাবে? তার সুউচ্চ ছিফাত এবং সৃষ্টির সাধারণ স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য এক রকম হয় কিভাবে? আল্লাহ্ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন তিনি ছাড়া তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(সূরা আস সাজদাহ ৩২:৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। কিরূপে আল্লাহ্র পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। *(সূরা আল আন'আম ৬:১০১)*

বাস্তব কথা হচ্ছে, অস্তিত্ব একটি নয়; বরং দু'টি। একটি স্রষ্টার (আল্লাহর) অস্তিত্ব, আরেকটি সৃষ্টির অস্তিত্ব। কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি আরশের উপরে সমুন্নত, তার সুউচ্চ গুণাবলী সৃষ্টি জীবের গুণাগুণ, স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সাথে মিশ্রিত নন, কোন সৃষ্টির ভিতরে নন; যেমন সুফীরা ধারণা করে থাকে। বরং তিনি সৃষ্টির বহু উপরে, সকল সৃষ্টি তার নীচে, তিনি

আসমানের উপরে, আরশের উপর সমুন্নত। উপরে থাকাই আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত বা বিশেষণ।

দর্শন ও কালাম শাস্ত্রের প্রতিবাদ, কুরআন-সুন্নাহ্‌র আলোকে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী এবং সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপস্থাপন

কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর সত্তা, তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী, ফেরেশতা, আখিরাত ইত্যাদি গায়েবী বিষয়কে যে সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে, তা ইসলামের গৌরবময় যুগে মুসলিমদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তারা বিষয়গুলো শুনে তা সহজভাবেই বুঝে নিয়েছেন এবং বিশ্বাস করেছেন। আর এ বিষয়গুলো বোধশক্তি ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝার কোন সুযোগ নেই। অহীর উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। সেই সাথে গায়েবী বিষয়গুলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন গ্রীক দর্শনের কিতাবাদি আরবীতে অনুবাদ করা হলো, তখন থেকেই ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের উপর গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে। আব্বাসী খিলাফতকালে সরকারীভাবে এ কাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ফলে মুসলিমদের লাইব্রেরীগুলো গ্রীক দর্শনের কিতাবে ভরপুর হয়ে যায়। মুসলিম বিদ্বানগণের গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামী আক্বীদাহর উপরও গ্রীক দর্শনের প্রভাব পড়ে ব্যাপকভাবে। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তার কার্যাবলী, সৃষ্টির সূচনা ও সমাপ্তি, পরিণাম, ক্বিয়ামত, হাশর-নাশর, মানুষের আমলের ফলাফল এবং এ ধরণের অন্যান্য গায়েবী বিষয়গুলো জানার জন্য কুরআন-সুন্নাহর পথ ছাড়া আর কোন পথ নেই। চিন্তা-ভাবনা, আন্দাজ-অনুমান করে এ বিষয়গুলো জানা অসম্ভব। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর ধারে কাছে পৌঁছানো মানুষের বিবেক-বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এসব চোখেও দেখা যায় না। কুরআন সুস্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোন কিছুই তার সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)*"।

কাজেই এ বিষয়ে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হবে। কিন্তু গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিকরা কুরআন ও সুন্নাহর সহজ সরল উক্তিগুলো বাদ দিয়ে গায়েবী বিষয়গুলোর দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান শুরু করে। তাদের জবাব দেয়ার জন্য আরেক শ্রেণীর মুসলিম আলেম দাঁড়িয়ে যান। তারাও দার্শনিকদের জবাবে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতে থাকেন। কিন্তু তাদের উপস্থাপিত যুক্তি-

তর্ক দার্শনিকদের জবাবে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তাদের যুক্তিগুলো ছিল দুর্বল। এগুলো সংশয় দূর করার বদলে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং এমনসব জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, যার জবাব কালামশাস্ত্রবিদগণ খুজেঁ না পেয়ে তারা নিজেরাই সংশয়ে পড়েছে। ইমাম রাযী শেষ বয়সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, তিনি ইলমে কালাম, দর্শন শাস্ত্রের উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছেন। শেষে তিনি এ সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এর ফলে রোগীর রোগ নিরাময় হওয়ার চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসার্তের পিপাসা মোটেই নিবারণ হয় না। তিনি বলেন, কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতিই আমি নিকটতর পেয়েছি। আল্লাহর অস্তিত্ব, তার সত্তা ও গুনাবলী সম্পর্কে কালাম শাস্ত্রবিদ ও মুসলিম দার্শনিকগণ যে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেছেন, ইমাম ইবনে তাইমীয়া তাতে মোটেই সন্তুষ্টি ছিলেন না। কারণ তার মোকাবেলায় কুরআন-সুন্নাহর যুক্তি-প্রমাণ অনেক সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ, দ্ব্যর্থহীন ও হৃদয়গ্রাহী। তাই ইমাম ইবনে তাইমীয়া আল্লাহর সত্তা ও গুনাবলী এবং ঈমানের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের উপর যা আবশ্যক, কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন। এসব বিষয়ে তিনি একাধিক মূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন এবং দার্শনিক কালামীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেন। ওয়াসিত্বীয়া, তাদমুরীয়া এবং হামুবীয়া এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইমামের কারাবরণ

যুগে যুগে যারা সত্য দীনের খেদমতে নিজেদের জীবন ও যৌবন ব্যয় করেছেন, তাদের কেউই যুলুম-নির্যাতন থেকে রেহাই পান নি। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করার কারণে স্বার্থবাদী ও বিদ্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হন। সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদীদের লোকেরা তাদের মতবাদ প্রচার করার সাথে সাথে প্রকাশ্যে মদ পান এবং সমস্ত হারাম কাজেই লিপ্ত হতো। কারণ তাদের মতানুযায়ী অস্তিত্ব যখন মাত্র একটি তখন হালাল হারামের পার্থক্য থাকবে কেন? শরীয়তেরই বাধ্যবাধকতা থাকবে কেন? তাদেরকে যখন বলা হলো এই বক্তব্য তো কুরআন-হাদীছের বিরোধী, তখন তারা বললো, কুরআন-হাদীছের দলীলের মাধ্যমে নয়; বরং কাশফের মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত। মোটকথা কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা, অলী-আওলীয়াদের উসীলা ধরা, তিন তালাকের মাসআ'লাসহ আরো অনেক কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ হিংসুকদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। কুচক্রীরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এক পর্যায়ে তারা সরকারের সহায়তা লাভে সমর্থ হয়। মিশরের তদানীন্তন শাসককে তারা ইমামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে

তুলে। আর তখন সিরিয়া ও মিশর ছিল একই রাষ্ট্রভূক্ত। রাজধানী ছিল মিশরের কায়রোতে। সিরিয়া ছিল মিশরের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। তাই ষড়যন্ত্রকারীরা সহজেই সরকারকে প্রভাবিত করে ফেলে। তাদের প্ররোচনার ফলে শাহী ফরমানের মাধ্যমে ইমামকে কায়রোতে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। ২২ রামাযান জুমু'আর দিন তিনি মিশরে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে কেল্লার জামে মাসজিদে ছ্বলাত পড়ার পর তিনি আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু তার কিছু কিছু আক্বীদাহ-চিন্তা ইসলাম বিরোধী হওয়ার অভিযোগে তাকে কথা বলার অনুমতি না দিয়ে জনতাকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর কাযী ইবনে মাখলুফের নির্দেশে তাকে কেল্লার বরুজে কয়েকদিন আটক রাখার পর ঈদের রাতে মিশরের বিখ্যাত জুব কারাগারে পাঠিয়ে দেয়। তার কারাবরণের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ইতিহাসের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন মেয়াদে ২১বার কারা বরণ করেছেন। যতবারই তার উপর চাপ প্রয়োগ করে অন্যায় স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই তিনি সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শর্তসাপেক্ষ কারাগার থেকে বের হওয়ার সুযোগ তিনি একাধিকবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। জেলখানার ভিতরে তিনি দেখলেন কয়েদীরা নিজেদের মন ভুলাবার ও সময় কাটানোর জন্য আজে বাজে কাজ করছে। তাদের একদল তাস খেলছে। আরেকদল দাবা খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। ছ্বলাতের দিকে তাদের কোন খেয়াল নেই। খেলার ঝোকে ছ্বলাত কাযা হয়ে যাচ্ছে। ইমাম এতে আপত্তি জানালেন, তাদেরকে ছ্বলাতের প্রতি আহবান জানালেন এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশগুলো তাদের সামনে তুলে ধরলেন। তাদের পাপকাজগুলো সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার উপদেশ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই জেলখানার মধ্যে দ্বীনি ইলমের এমন চর্চা শুরু হয়ে গেল যে, সমগ্র জেলখানাটি একটি মাদরাসায় পরিণত হলো। অবস্থা এমন হলো অনেক কয়েদী মুক্তির ঘোষনা শুনেও আরো কিছুদিন শাইখের সংস্পর্শে থেকে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। মূলতঃ সুফীদের কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করা, কবর ও মাযারের উদ্দেশ্যে সফর করা, তালাকের মাসআ'লা, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি মাসআ'লা নিয়ে ইমামের সাথে বিরোধীদের দ্বন্দের কারণেই তাকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

কারাগারে থেকেও ইমামের কর্মতৎপরতা

সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে যারা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তারা দুনিয়ার কোন বাধাকে বাধা মনে করেন না। অনুকূল-প্রতিকূল যে কোন পরিবেশেই তারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অনুকূল পরিবেশের আশায় তারা কার্যক্রম স্থগিত রেখে চুপচাপ বসে থাকেন না। দামেস্কের কারাগারে ইমাম

ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ একই পন্থা অবলম্বন করলেন। ইবাদত-বন্দেগী ও কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি তিনি কলমযুদ্ধ অব্যাহত রাখলেন। বিশেষ করে নিজের লেখা বইগুলোতে দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিতে থাকলেন। জেলখানার ভিতরে তিনি যা লিখতেন এবং লোকদের প্রশ্নের যেসব জবাব দিতেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই কারাগারের দেয়াল ভেদ করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো। আস্তে আস্তে জেলের পরিবেশ তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। তিনি নিয়মিত লিখে যাচ্ছিলেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে। এক সময় তার কাছ থেকে দোয়াত-কলম, খাতাপত্র ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। এগুলো ছিনিয়ে নেয়ার পর জেলখানার ভিতর থেকে ছেড়া কাগজ সংগ্রহ করে কয়লা দিয়ে তার উপরই লিখা শুরু করলেন। এতেই বেশ কয়েকটি পুস্তিকা লিখা হয়ে গেল।

ইমামের উপর মিথ্যারোপ

ইমামের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ ছিল, তার সবগুলোই ছিল মিথ্যা ও বানোয়াট। সমকালীন স্বার্থান্বেষী মহল, এক শ্রেণীর সুফী সম্প্রদায়, কালামশাস্ত্রবিদ এবং বিদ'আতীরা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে মনের জ্বালা মেটানোর জন্য এবং পার্থিব ফায়দা হাসিল করার জন্যই অভিযোগগুলো করেছিল। হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বাতিলপন্থীদের মিথ্যা অভিযোগ নতুন কিছু নয়। আজও চলছে সেই ধারাবাহিকতা। কিন্তু বিরোধী ও বিদ'আতীরা তার উপর যেসব মিথ্যারোপ করেছে, তার মধ্যে আশ্চর্যজনক হলো বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন, আমি ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখ বৃহস্পতিবার দিন দামেস্ক শহরে পৌঁছলাম। তখন দামেস্ক শহরে হাম্বলী আলেমদের মধ্যে তকীউদ্দীন ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ছিলেন অন্যতম। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতেন, তবে তার মস্তিস্কে কিছু সমস্যা ছিল!! দামেস্কবাসীরা তাকে খুব সম্মান করতো। তিনি জামে উমুবীর মিম্বারে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন। পরের দিন (জুমু'আর দিন) আমি মাসজিদে গিয়ে দেখি, তিনি আলোচনা করছেন। সেদিন তার আলোচনার মধ্যে এটাও ছিল যে, তিনি বলে যাচ্ছিলেন, إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন আমার এই নামার মতোই"। এই কথা বলে তিনি মিম্বারের সিঁড়িসমূহের একটি সিঁড়িতে নেমে আসলেন। তখন মালেকী মাযহাবের ফকীহ ইবনে যাহরা রহিমাহুল্লাহ তার বিরোধীতা করলেন। এতে জনগণ উত্তেজিত হয়ে মালেকী ফকীহকে প্রচুর মারপিট করলো। মারপিটের কারণে ফকীহর মাথার পাগড়ী পড়ে গেল.....। এই ছিল ইবনে বতুতার মিথ্যাচার।

ইবনে বতুতার এই কথা যে মিথ্যা, তার প্রমাণ হলো, সে উল্লেখ করেছে, ৭২৬ হিজরীর রামাযান মাসের নয় তারিখে দামেস্কে প্রবেশ করলো। ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতে শাইখুল ইসলাম তখন দামেস্কের কারাগারে বন্দী ছিলেন। নির্ভরযোগ্য আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ ৭২৬ হিজরীর শাবান মাসে কারাগারে প্রবেশ করেছেন। আর ৭২৮ হিজরী সালের যুলকাদ মাসে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। (দেখুন: তাবাকাতুল হানাবেলা, বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি)

প্রিয় পাঠক বৃন্দ! লক্ষ্য করুন এই মিথ্যুকের প্রতি। সে বলছে যে, রামাযান মাসের কোন এক জুমু'আর দিন ইমামকে জামে উমুবীর মিম্বারে আলোচনা করতে দেখল। এখন প্রশ্ন হলো জামে উমুবীর মিম্বার কি কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল? বিশাল জামে উমুবী কি উপস্থিত সকল মানুষসহ কারাগারে প্রবেশ করেছিল? যাতে করে ইমাম সেখানে ভাষণ দিতে পারেন?

এখন কথা হলো, যারা বলে ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করেছেন এবং তিনি ছিলেন মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা কি ইবনে বতুতার সেই মিথ্যা তথ্যের উপর নির্ভর করেছে? আসল কথা হলো ইমাম কখনোই আল্লাহর কোন ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনা করেননি; বরং তিনি মুশাব্বেহাসহ অন্যান্য সকল বাতিল ফির্কার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। তার লেখনীগুলোই এর উজ্জল প্রমাণ। তিনি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন তার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সৃষ্টির ছিফাতের মত নয়। দুনিয়ার আকাশে তার নেমে আসা মাখলুকের নামার মত নয়। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেভাবে নেমে আসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ। আক্বীদাহ আল ওয়াসেতীয়ার বহু স্থানে তিনি এই মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ليس كمثله شيئ وهو السميع البصير "তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

ইমামের সুপরিসরে ইলমী খেদমত

ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই লিখতেন। জেলখানায় ঢুকিয়েও যখন তাকে লেখালেখি থেকে বিরত রাখা সম্ভব হলো না, তখন তার নিকট থেকে দোয়াত-কলম ও বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়া হলো। বই-পুস্তক ছিনিয়ে নেয়ার পর তিনি স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করেই লেখালেখি চালিয়ে যেতে থাকেন। তার লিখিত

গ্রন্থাদির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। নিম্নে আমরা তার কয়েকটি বহুল প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম উল্লেখ করছি।

(১) মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, এটি শাইখের সর্ববৃহৎ সংকলন, সৌদি আরব সরকার ৩৭ খন্ডে এটিকে ছাপিয়েছে

(২) আল আক্বীদাতুল ওয়াসেত্বীয়া

(৩) আল-ফুরকানু বাইনা আওলিয়াইর রহমান ওয়া আওলিয়াইশ শাইতান

(৪) আলকালিমুত তাইয়্যিব

(৫) মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবুবীয়াহ

(৬) যিয়ারাতুল কুবুর

(৭) শরহুল উমদাহ

(৮) আল জাওয়াবুস ছ্বহীহ

(৯) রিসালাতুদ তাদমুরীয়াহ

(১০) রিসালাতুল হামবীয়া

(১১) মুকাদ্দিমাহ ফীত্ তাফসীর

(১২) ইক্তেযাউস্ সিরাতিল মুস্তাকীম

(১৩) আর্ রাদ্দু আলা ইবনে আরাবী

(১৪) আস্ সিয়াসা আশ্ শারঈয়াহ এবং

(১৫) আলউ-বুদীয়াহ। এছাড়া দীনের বিভিন্ন বিষয়ে তার আরো অনেক মূল্যবান কিতাব রয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে জানতে চাইলে পাঠকদেরকে মাকতাবাতুস শামেলার দ্বারস্থ হওয়ার অনুরোধ করা হলো।

পরলোকের পথে যাত্রা

ইমামের বয়স শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময় একদিন দামেস্কের গভর্ণর কারাগারে ইমামকে দেখতে আসলেন। গভর্ণর তার কাছে ক্ষমা চাইলেন। জবাবে ইমাম বললেন: আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমি তাদেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছি, যারা আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। সুলতানের বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় নয়; বরং উলামায়ে কেরামের ফতোয়ার

কারণেই আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু আমি ঐসব লোকদেরকে ক্ষমা করতে পারিনা, যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু। সত্য দীনের প্রতি আক্রোশের কারণে যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে এবং আমাকে কারারুদ্ধ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে।

৭২৮ হিজরীর ২২ যুলকাদ মাসে ৬৭ বছর বয়সে উপনীত হয়ে দামেস্কের কারাগারে মৃত্যু বরণ করেন। তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ এ সময় তার কাছেই ছিলেন। দুর্গের মুআয্যিন মাসজিদের মিনারে উঠে ইমামের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করেন। মুহূর্তের মধ্যে শহরের সমস্ত মাসজিদে অলিতে-গলিতে, রাজপথে এবং সর্বত্রই ইমামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলো। শেষবারের মত ইমামকে দেখার জন্য দুর্গের পথে জনতার ঢল নামলো। দুর্গের দরজা খুলে দেয়া হলো। গোসলের পর তার জানাযা শহরের বৃহত্তম মাসজিদ জামে উমুবীতে আনা হয়। জামে উমুবী এবং রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বে আর কোথাও এত বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

সালাফদের মানহাজের পক্ষে দীর্ঘ সংগ্রাম, যুক্তি-তর্ক, লেখালেখি, ফতোয়া দান, শিক্ষকতা, দাওয়াত এবং আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এভাবেই চলে গেলেন একজন যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক। দীনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে পার্থিব জীবনের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পাননি। এমনকি বিবাহ করার সুযোগও পাননি। ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ চলে গেছেন। কিন্তু তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য এবং দীনের পথে তার ত্যাগ-তিতিক্ষা আমাদের আজকের আলেম সমাজকে সজাগ করবে, প্রেরণা যোগাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। দীনের ব্যাপারে যাতে কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করেন, দীনের উপর কোন প্রকার যুলুম বরদাশত করতে তিনি মুহূর্তকালের জন্যও প্রস্তুত হননি।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার দীনের অতন্দ্র প্রহরী, সেবক ও মর্দে মুজাহিদ আমাদের প্রাণের শাইখকে তোমার রহমতের প্রশস্ত চাদর দ্বারা ঢেকে নাও, তোমার সুবিশাল জান্নাতে তার ঠাই করে দাও এবং নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের সংশ্রবে জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছে দাও। আমাদেরকেও তাদের সাথে কবুল করে নাও। আমীন

লেখকের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য। ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীগণের উপর। অতঃপর, এটা ইমাম ইবনে তাইমীয়ার আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়ার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। যা নিম্নোক্ত বইগুলো থেকে সংকলন করা হয়েছে।

১. আর রওদ্বাতুন নাদিয়্যাহ শারহুল আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বীয়া-শাইখ যাইদ ইবনে আব্দুল আযিয ইবনে ফাইয়ায
২. আত-তাম্বিহাতু সুন্নিইয়াতু আলাল আক্বীদাতিল ওয়াসিত্বীয়া-শাইখ আব্দুর আযিয ইবনে নাসির রশীদ
৩. আত-তাম্বিহাতুল লুত্বফিয়্যাহ ফি-মা ইহতাওয়াত আলাইহিল ওয়াসিত্বীয়া মিনাল মাবাহিসিল মানিফা-শাইখ আবদুর রহমান ইবনে নাসির সা'দী
৪. নুকিলাত মিন ফাওয়াইদি আলক্বাতিহা আলা নুসখাতি ওয়াক্বতিত্বলাব।

আর আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা তাফসীরের বইসমূহ থেকে নেয়া হয়েছেঃ যেমন, ফাতহুর ক্বদীর-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ শাওকানী, তাফসীরুল কুরআনিল আযিম-শাইখ ইসমাঈল ইবনে কাসীর।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বইটি কয়েকবার প্রকাশ করেছে। বইটি সম্পূর্ণ করার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আর যারা সার্বিক সহযোগিতা করেছে আল্লাহ তা'আলা তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন, মুসলিমদেরকে সংশোধন করার সামর্থ দিন।

আমি আল্লাহর কাছে এর উপকার কামনা করছি, আক্বীদাহর এ গুরুত্বপূর্ণ বইটিকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। আর ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নাবী মুহম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সকল সাথীবর্গের উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম নাযিল করুন। আমীন।

ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করে বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা পুস্তকটি লেখা শুরু করেছেন। সূরা আত তাওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা রয়েছে। বিস্‌মিল্লাহ দ্বারা শুরু করার মাধ্যমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতেরও অনুসরণ করা হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাজা-বাদশাহদের কাছে পত্র লিখতেন তখন শুরুতে বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম লিখতেন।

বিস্‌মিল্লাহ (بِسْمِ الله): এখানে با হরফে জারটি استعانة (ইস্তেআনা) তথা সাহায্য প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে যে শব্দ কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে, তাকে ইসম বলা হয়। আরবী ব্যাকরণ বিদদের পরিভাষায় যে শব্দ কোন কালের সাথে যুক্ত না হয়েই সরাসরি নিজের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে اسم (ইসম) বলা হয়।

جر (জার) এবং مجرور মাজরুর মিলে একটি উহ্য বিষয়ের সাথে متعلق (সম্পৃক্ত) হয়েছে। সেই উহ্য বিষয়টি 'আল্লাহ' শব্দের পরে হওয়া উচিত। যাতে করে এটি 'হাসর' তথা সীমিত অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ অর্থটি যেন এমন হয় যে, আমি আল্লাহর নামেই শুরু করছি, অন্য কারো নামে নয় এবং তার কাছেই কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে সাহায্য চাচ্ছি, অন্য কারো কাছে নয়।

কেউ কেউ বলেছেন: এখানে উহ্য শব্দটি হচ্ছে فعل বা ক্রিয়া। অর্থাৎ بسم الله أقرأ أو أكتب "আমি আল্লাহর নামে পড়ছি বা লিখছি। এমনি যখন যে কাজ শুরু করা হবে, তখন সেই কাজের অর্থবোধক একটি فعل (ক্রিয়া) উহ্য থাকবে। আবার কেউ কেউ মাসদার উহ্য মেনে থাকেন। অর্থাৎ بسم الله ابتدائي তথা আল্লাহ তা'আলার নামেই আমার শুরু

আল্লাহ (الله): শব্দটি মহান পবিত্র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট একটি নাম। এর অর্থ হচ্ছে, তিনিই সমস্ত মাখলুকের ইবাদত ও উলুহীয়াতের একমাত্র অধিকারী ও

হকদার। এই মহান নামটি أله يألهه ألوهة থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে عُبِدَ يُعْبَدُ عبادة অর্থাৎ তার ইবাদত ও দাসত্ব করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ বা মাবুদ।

আর্ রহমান আর রহীম (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ): আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ও অতি সুন্দর নাম সমূহের মধ্য হতে রহমান ও রহীম দু'টি সম্মানিত নাম। এই নাম দু'টি প্রমাণ করে, যেমন রহমত আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি তেমন রহমত ও দয়ার গুণেই গুণান্বিত।

আল্লাহ্ তা'আলার الرحمن 'রহমান' নামটি সমস্ত সৃষ্টির উপর তার ব্যাপক রহমতের প্রমাণ বহন করে। আর الرحيم 'রহীম' নামটির মধ্যে এমন রহমত রয়েছে, যা শুধু মুমিনদের জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾

"এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান" *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩)।*

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার প্রাথমিক খুতবা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

الحَمْدُ للهِ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَكَفَى باللهِ شَهِيدًا وأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا به وَتَوْحِيدًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تسليمًا مَزِيدًا

"সেই আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি তার রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তাকে সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী করেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। তার কোন শরীক নেই। আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি।

আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তার রসূল। আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার এবং তার ছাহাবীদের উপর অপরিমিত ছ্বলাত (দরুদ) ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এই মূল্যবান কিতাবটি আল্লাহর প্রশংসা, তাওহীদ, রিসালাতের সাক্ষ্য এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে শুরু করেছেন।

এর মাধ্যমে তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতের অনুসরণ করেছেন। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল আলোচনা ও ভাষণ আল্লাহর প্রশংসা, তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য এবং তার নিজের প্রতি ছ্বলাত ও সালাম পেশ করার মাধ্যমেই শুরু করতেন। সেই সাথে শাইখুল ইসলাম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ হাদীছের উপরও আমল করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন:

«كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ، فَهُوَ أَقْطَعُ»

"প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ যেই কাজ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা দিয়ে শুরু করা হয় না, তা বরকতশূন্য। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩] অন্য বর্ণনায় আল্লাহর প্রশংসার স্থলে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এসেছে।[৪]

أقطع শব্দের অর্থ হচ্ছে বরকতশূন্য হওয়া ও বরকত থেকে খালি হওয়া। হাদীছের এই উভয় বর্ণনাকে এইভাবে একত্রিত করা যেতে পারে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে হাকীকী। আর আল-হামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে নিসবী ইযাফী।[৫]

الحمد لله: এখানে আলিফ লাম ইস্তেগরাক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক এবং হকদার হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা।[৬]

---

৩. তবে হাদীছের সনদ দুর্বল। দেখুন: সুনানে আবূ দাউদ, হা/৪৮৪০।

৪. তবে হাদীছের সনদ খুবই দুর্বল। দেখুন: ইরওয়াউল গালীল, হা/১।

৫. কিতাব লেখার শুরুতে সর্বপ্রথম যা দিয়ে শুরু করা হয় এবং যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে না তাকে ইবতেদায়ে হাকীকী প্রকৃত প্রথম বা শুরু বলা হয়। আর যার পূর্বে অন্য কিছু থাকে, তাকে ইবতেদায়ে নিসবী ইযাফী বা তুলনামূলক প্রথম বা শুরু বলা হয়। সুতরাং কোন কিতাব বা ভাষণ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে হাকীকী। এরপর অন্য কিছু লেখা বা বলার আগে আলহামদুলিল্লাহ যুক্ত করা হচ্ছে ইবতেদায়ে ইযাফী। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বিসমিল্লাহ দ্বারা কিতাবটি লেখা শুরু করেছেন। বিসমিল্লাহ'র পূর্বে অন্য কিছু লিখেননি। সে হিসাবে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে হাকীকী। অতঃপর তিনি আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন। সে হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করা হচ্ছে ইবতেদায়ে ইযাফী। কারণ তা 'বিসমিল্লাহ'র পরে এসেছে। 'আলহামদুলিল্লাহ'র পরে যা লেখা হয়েছে, তার তুলনায় আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে প্রথমে।

সুতরাং যে হাদীছে বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথা এসেছে, তা দ্বারা ইবতেদায়ে হাকীকী উদ্দেশ্য। আর যেখানে আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করার কথা এসেছে, সেখানে ইবতেদায়ী ইযাফী উদ্দেশ্য। আলেমগণ কুরআনের অনুসরণ করে এভাবেই বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করার হাদীছ এবং আলহামদুলিল্লাহ্ দ্বারা শুরু করার হাদীছের মধ্যে বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সমন্বয় করেছেন। কুরআন মাজীদও প্রথমে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করা হয়েছে। অতঃপর সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামীন দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

৬. সকল নিয়ামত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই সকল প্রশংসাও আল্লাহর জন্যই হওয়া আবশ্যক। حمد (হামদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা। এটি ذم (নিন্দা) এর বিপরীত। হামদ এবং شكر পরস্পর সমার্থবোধক হলেও হামদ شكر -এর চেয়ে অধিকতর ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। শোকর সাধারণত নিয়ামত ও অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু হামদ এর জন্য তা শর্ত নয়। অর্থাৎ হামদ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানকারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা। তা নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা নিয়ামত ছাড়া হোক। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এত ব্যাপক যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকবার حمد (প্রশংসা) করার পূর্বে যে আল্লাহর নিয়ামত পেতে হবে, এমনটি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি যে নিয়ামত সর্বদা প্রসারিত করে রেখেছেন, তার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করাকে পরিভাষায় হামদ বলা হয়। আর নির্দিষ্ট কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে

الحمد। প্রশংসা: শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, উত্তম গুণাবলী ও ভালো কর্মের প্রশংসা করা। আর ইসলামের পরিভাষায় হামদ এমন কাজের নাম, যার মাধ্যমে নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা করে। এটি ذم (নিন্দার) বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।

الله। আল্লাহ: একটু পূর্বে আল্লাহর সম্মানিত এই নামের ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্তভাবে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الذي أرسل رسوله। যিনি তার রসূলকে পাঠিয়েছেন: অগণিত নেয়ামতের কারণে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা আবশ্যক। আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যত নিয়ামত দিয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাধিক বড় নিয়ামত হচ্ছে তিনি তার রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য প্রেরণ করেছেন।

الرسول। রসূল: আভিধানিক অর্থে রসূল এমন পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যাকে রিসালাত তথা বার্তাসহ পাঠানো হয়। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় এমন পুরুষকে রসূল বলা হয়, যার প্রতি কোন একটি আসমানী শরী'আতের অহী পাঠানো হয়েছে এবং তাকে সেই শরী'আতের তাবলীগ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে।[৭]

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাকে পরিভাষায় شكر বলা হয়। কেউ কেউ حمد এর সংজ্ঞায় বলেন, هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কৃত অনুগ্রহের উপর প্রশংসা বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে প্রশংসিত সত্তার সৌন্দর্য বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, (১) শোকর শুধু নিয়ামতের বিনিময়েই হয়ে থাকে, কিন্তু হামদের জন্য নিয়ামত শর্ত নয়। নিয়ামত ছাড়াও তা হতে পারে। (২) হাম্দ শুধু জবানের কথার মাধ্যমে হয়, কিন্তু শোকর জবান, হাত, অন্তর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও হয়। (আল্লাহই অধিক জানেন)

৭. আর এমন পুরুষকে নাবী বলা হয়, যার প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তাবলীগ ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার আদেশ করা হয়নি। সে হিসাবে كل رسول نبي وليس العكس অর্থাৎ প্রত্যেক রসূলই নাবী। কিন্তু প্রত্যেক নাবীই রসূল নন। নাবী কেবল পূর্বের রসূলদের শরী'আত অনুযায়ী স্বীয় উম্মাতকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন। যেমন বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নাবীই তাদের পূর্বের শরী'আত অনুযায়ী লোকদেরকে পরিচালিত করতেন। তাদেরকে মূসা (আলাইহিস সালাম) এর শরী'আত মেনে চলা ও তাওরাতের অনুসরণ করা এবং বনী ইসরাঈলকে তা শিক্ষা দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। আর রসূলকে স্বতন্ত্র শরী'আত দিয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তাকে তা প্রচার করার এবং বিরোধীদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার হুকুমও করা হয়।

الهدى **হিদায়াত:** হিদায়াত হচ্ছে উপকারী ইলম। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব সত্য খবর, কল্যাণকর আদেশ-নিষেধ এবং অন্যান্য উপকারী বিধানমালা নিয়ে এসেছেন, তার সবগুলোই হিদায়াতের মধ্যে শামিল।

হিদায়াতের প্রকারভেদ: হিদায়াত শব্দটি দেখিয়ে দেয়া ও বর্ণনা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾

"আর আমি সামূদ জাতির সামনে হেদায়াত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা পথ দেখার চেয়ে অন্ধ হয়ে থাকা পছন্দ করলো" *(সূরা হামীম সাজদাহ ৪১:১৭)*। সুতরাং এই কাজ অর্থাৎ সঠিক রাস্তা দেখানো রসূলদের কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

নিশ্চয়ই তুমি সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করো"। *(সূরা আশ শূরা ৪২:৫২)*

হিদায়াতের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে সঠিক পথ কবুল করার তাওফীক দেয়া এবং ইলহাম করা। এটি কোন রসূল করতে পারেন না। বরং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ এটি করতে সক্ষমও নয়। নিম্নের আয়াতে এই প্রকার হিদায়াতের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾

"হে নাবী! তুমি যাকে চাও তাকে হিদায়াত দান করতে পারবে না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন *(সূরা আল কাসাস: ৫৬)*।

دين الحق **সত্য দীন:** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ আমল। দীন শব্দটি কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এর দ্বারা প্রতিদান ও বিনিময় উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ "প্রতিদান দিবসের মালিক" *(সূরা আল ফাতিহা ১:৪)*।

আবার কখনো সাধারণভাবে ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা ইবাদত করা (বশ্যতা স্বীকার ও নত হওয়া) উদ্দেশ্য হয়। দীনকে হকের দিকে সম্বোধিত করা মাওসুফকে ছিফাতের দিকে সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মূলতঃ الدين الحق ছিল। الحق শব্দটি حق

يحق-এর মাসদার। এর অর্থ সুসাব্যস্ত হয়েছে, সত্যে পরিণত হয়েছে, আবশ্যক হয়েছে। হকের বিপরীত হচ্ছে বাতিল।

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه যাতে তিনি সকল দীনের উপর সত্য দীনকে বিজয়ী করেন: অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'আলা দলীল-প্রমাণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং জিহাদের মাধ্যমে এই দীনকে সকল দীনের উপর সমুন্নত করেন এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্য হতে যারা এই দীনের বিরোধীতা করবে, তাদের উপর তিনি এই দীনকে বিজয়ী করবেন। চাই তারা আরব হোক কিংবা অনারব হোক অথবা অন্য কোন দীনের অনুসারী হোক। আল্লাহর এই ওয়াদা বাস্তবায়ন হয়েছে। মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় উত্তমভাবে জিহাদ করেছেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এর মাধ্যমে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা সুপ্রশস্ত হয়েছে। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমসহ সকল দিকেই এই দীন ছড়িয়ে পড়েছে।

وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا সাক্ষ্য হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রসূলকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহই এর সাক্ষী। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। তিনি তার রসূলের সকল অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত এবং শত্রুদের মোকাবেলায় তিনি তার সাহায্যকারী। আল্লাহ তার রসূলকে সাহায্য করেছেন এবং তার দাওয়াতকে শক্তিশালী করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এতে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর সত্য রসূল। তিনি যদি মিথ্যুক হতেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পৃথিবীতেই তাড়াতাড়ি কঠিন শাস্তি দিতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾

"যদি এ নাবী নিজে কোন কথা বানিয়ে আমার কথা বলে চালিয়ে দিতো তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং ঘাড়ের রগ কেটে দিতাম"। *(সূরা আল হাক্কাহ ৬৯:৪৪-৪৬)*

وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই: অর্থাৎ আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার পর জবান দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই।

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ তিনি এক, তার কোন শরীক নেই: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদানের মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক যে অর্থ রয়েছে, এই শব্দ দু'টির মধ্যে

তারই তাগিদ (গুরুত্ব) রয়েছে। অর্থাৎ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ -এর মাধ্যমে তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের মর্মার্থকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সকল মাবুদ হতে উলুহীয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং শুধু আল্লাহর জন্যই তাকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং وحده (তিনি এক) এটি হচ্ছে ইছবাত তথা ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই, -এই কথার তাগিদ। لا شَرِيكَ لَه তার কোন শরীক নেই, এটি হচ্ছে নাফীর জন্য তাগিদ স্বরূপ।

إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا আমি তাওহীদের এই স্বীকৃতি প্রদান করছি: إقرارا ও توحيدا এ শব্দ দু'টি হলো মাসদার। এ দু'টি শব্দ পূর্বোক্ত তাওহীদের সাক্ষ্য **وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ** -এর মর্মার্থকে শক্তিশালী করেছে। অর্থাৎ আমি জবানের মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভাষায় তাওহীদের স্বীকারোক্তি প্রদান করছি এবং আমার প্রতিটি ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেস (আন্তরিকতার সাথে) করছি। চাই সে ইবাদত মুখের কথার মাধ্যমে হোক কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে হোক অথবা অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে হোক।

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল: অর্থাৎ আমি অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করছি এবং জবানের মাধ্যমে স্বীকার করছি যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত মানুষের নিকট রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। রসূলের রিসালাতের এই সাক্ষ্যকে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। এ দু'টি সাক্ষ্য প্রদানের একটি অন্যটির পক্ষ হতে যথেষ্ট নয়। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার রসূল, এই কথার দ্বারা আহলে ইফরাত তথা রসূলকে নিয়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্তদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে আহলে তাফরীত অর্থাৎ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনকে প্রত্যাখ্যান কারীদের এবং তা থেকে যারা এমনভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, যাতে মনে হয় তিনি আল্লাহর রসূলই নন, এর মাধ্যমে তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। সুতরাং তিনি আল্লাহর বান্দা, এই সাক্ষ্য তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করাকে এবং তার নিজস্ব মর্যাদার উপরে উঠানোকে অস্বীকার করেছে। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, এই সাক্ষ্য দেয়ার দাবী হচ্ছে, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা, তিনি যে আদেশ করেছেন, তাতে তার আনুগত্য করা, তিনি যেই সংবাদ দিয়েছেন তা সত্যায়ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে তিনি যেই শরী'আত নিয়ে এসেছেন, তাতে কেবল তারই অনুসরণ করা।

صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا আল্লাহ তার উপর, তার পরিবার এবং ছাহাবীদের উপর অপরিমিত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন: ছ্বলাত শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'আ। আল্লাহর পক্ষ হতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত পেশ করার অর্থ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো, যা ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আবুল আলীয়া হতে স্বীয় ছ্বহীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরুদ পেশ করেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের কাছে রসূলের প্রশংসা করেন।

وعلى آله তার পরিবারের উপর: কোন ব্যক্তির 'আল' বলতে ঐ সমস্ত লোককে বুঝানো হয়, যারা তার সাথে আত্মীয়তার মজবুত বন্ধনে বা অন্য কোন গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর'আল' দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? এ বিষয়ে একাধিক মত রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম মত হচ্ছে, এখানে 'আল' দ্বারা ঐ সমস্ত লোক উদ্দেশ্য, যারা দীনের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে।

وأصحابه এবং তার ছাহাবীগণের উপর: أصحاب শব্দটি صاحب শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ছাহাবীগণ। এখানে আমের (ব্যাপকার্থবোধক শব্দের) উপর খাসকে (নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দকে) আতফ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে 'আল' উল্লেখ করা হয়েছে। 'আলে'র মধ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবী এবং পরবর্তীতে যারা আগমন করবে ও তার দীন পালন করবে তারাও শামিল। যেই মুসলিম ঈমানদার অবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছেন এবং ঈমানদার অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনিই হলেন ছাহাবী।

وسلم تسليمًا مزيدًا আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর উপর অগণিত সালাম বর্ষণ করুন: سلام (সালাম) শব্দটি ইসলামের অভিবাদন, সম্মান, শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা প্রদান অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথবা সালাম অর্থ মুক্ত ও নিরাপদ হওয়া। অর্থাৎ সকল ত্রুটি ও মন্দ স্বভাব থেকে মুক্ত হওয়া। مزيدا শব্দটি زيادة ক্রিয়ামূল হতে ইসমে মাফউল। 'যিয়াদাহ' অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধি হওয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا ﴾

"আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি ছ্বলাত পেশ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পাঠাও *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৬)*।[৮]

আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অনুসরণ করতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এখানে ছ্বলাত ও সালামকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।

---

৮. আভিধানিক দিক থেকে ছ্বলাত শব্দটি দু'আ অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যবহারের স্থান অনুযায়ী ছ্বলাতের বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ হতে নাবী-রসূল কিংবা সৎ বান্দাদের প্রতি ছ্বলাত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের নিকট তার নাবীর ও সৎ বান্দাদের প্রশংসা করেন, তাদের নাম বুলন্দ করেন, তাদের কাজে বরকত দেন এবং তাদের প্রতি নিজের রহমত বর্ষণ করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতারা তোমাদের জন্য দু'আ করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন, তিনি মুমিনদের প্রতি বড়ই মেহেরবান" (সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩)।

ছ্বলাত শব্দটি ফেরেশতাদের পক্ষ হতে আল্লাহর নাবীর জন্য ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে তারা আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ যেন তাকে সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেন, তার শরী'আতকে প্রসার ও বিস্তৃতি দান করেন এবং একমাত্র তাকে মাকামে মাহমুদ তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নাবীর প্রতি দুরূদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাও" (সূরা আল আহযাব: ৫৬)। আর ফেরেশতাদের পক্ষ হতে সাধারণ মুমিনদের জন্য যখন ছ্বলাত শব্দটি ব্যবহৃত হবে, তখনো এর দ্বারা মুমিনদের জন্য ফেরেশতাদের দু'আ ও মাগফিরাত কামনা উদ্দেশ্য। আর ছ্বলাত শব্দটি যদি এক মুমিনের পক্ষ হতে অন্য মুমিনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখনো এর দ্বারা দু'আ উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"হে নাবী! তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত নিয়ে তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করো এবং তাদের জন্য রহমতের দু'আ করো। তোমার দু'আ তাদের সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন" (সূরা আত তাওবা ৯:১০৩)। আর ছ্বলাত শব্দটি যখন বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে তখন এর দ্বারা মুসলিমদের নিকট পরিচিত সে ইবাদতই উদ্দেশ্য হবে, যা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট নিয়মে কতিপয় কাজ ও কথার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যার শুরু তাকবীরে তাহরীমাহ দ্বারা এবং শেষ সালামের দ্বারা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "কাজেই তুমি নিজের রবের জন্যই ছ্বলাত সম্পাদন করো এবং তার জন্যই কুরবানী করো" (সূরা আল কাওছার: ২)।

الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ

মুক্তিপ্রাপ্ত দল

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا اعْتِقَادُ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ.

অতঃপর এই হচ্ছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্য হতে নাজাত (মুক্তি) ও সাহায্য প্রাপ্ত দল

ব্যাখ্যা: বাক্যের এক রীতি থেকে অন্য রীতিতে স্থানান্তরিত হওয়ার সময় আরবী ভাষায় أما بعد ব্যবহার করা হয়। ভাষণ দেয়ার সময় এবং চিঠি লিখার সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে أما بعد ব্যবহার করা সুন্নাত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দেয়া এবং চিঠি লিখার সময় 'আম্মা বা'দ' ব্যবহার করতেন।

এই কিতাবটি সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামী আক্বীদাহ ও ঈমানের যেসব বিষয়কে শামিল করেছে, শাইখুল ইসলাম هذا ইসমে ইশারার মাধ্যমে সে দিকেই ইংগিত করেছেন। শাইখুল ইসলাম هو الإيمان بالله.....الخ দ্বারা আক্বীদাহর বিষয়গুলোর বর্ণনা শুরু করেছেন।

اعتقاد শব্দটি বাবে ইফতিআলের মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বলা হয় اعتقد كذا সে এ রকম আক্বীদাহ গ্রহণ করেছে। ইহা ঠিক ঐ সময়ই বলা হয়, যখন কেউ কোন বিষয়কে তার নিজের আক্বীদাহ হিসাবে গ্রহণ করে। আর যে বিষয়ের সাথে মানুষ তার অন্তরের বন্ধন তৈরী করে তাকে আক্বীদাহ বলা হয়। যেমন আপনি বলে থাকেন اعتقدت عليه القلب والضمير "আমি এই বিশ্বাসের উপর অন্তর-মনকে বেধে দিয়েছি। আক্বীদাহ শব্দটি আরবদের কথা عقد الحبل إذا ربطه থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে তাকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখল। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে কোন জিনিসকে রশি দিয়ে বেধে রাখে। অতঃপর এই শব্দটি অন্তরের বিশ্বাস ও সুদৃঢ় সংকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

ফির্কাহ অর্থ হচ্ছে দল ও জামা'আত। নাজী ফির্কা ঐ জামা'আতকে বলা হয়, যারা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস ও অকল্যাণ থেকে রেহাই পাবে। তাদের বৈশিষ্ট্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ হাদীছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন:

وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ

"আমার উম্মাতের একটি দল সব সময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে সমস্ত লোক তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।[৯]

المنصورة সাহায্যপ্রাপ্ত: অর্থাৎ তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদের বিরোধীদের উপর আল্লাহর সাহায্য ও মদদ পেয়ে শক্তিশালী থাকবে। এখানে 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত' কথাটির মর্ম হচ্ছে ক্বিয়ামতের আগে যেই বাতাস এসে প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করবে, সেই বাতাস থেকে উদ্দেশ্য হল এ বাতাসই হবে সেই সময়ের মুমিনদের জন্য ক্বিয়ামত স্বরূপ। আর যেই ক্বিয়ামতের দিন দুনিয়ার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তা কেবল নিকৃষ্টতম লোকদের উপরই কায়েম হবে। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ

যতদিন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলা হবে, ততদিন ক্বিয়ামত হবে না।[১০]

ইমাম আবু আব্দুল্লাহ হাকিম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

"ক্বিয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর একটি বাতাস প্রেরণ করবেন। এই বাতাসের সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর সুঘ্রাণের মত এবং রেশমের মত নরম। সেদিন যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও এই বাতাসের কারণে মৃত্যু বরণ করবে। এরপর কেবল খারাপ লোকেরাই বেঁচে থাকবে। এই নিকৃষ্ট লোকদের উপরই ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।[১১]

---

৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৪১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২০, তিরমিযী হা/২২২৯, আবূদাউদ হা/৪২৫২।
১০. ছ্বহীহ মুসলিম ১৪৮, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান, তিরমিযী ২২০৭, মুসনাদে আহমাদ।
১১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৪।

أَهلُ السنة والجماعة

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।

أهلِ السنة والجماعة আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত: الفرقة শব্দ হতে বদল হিসাবে أهلِ শব্দের লাম বর্ণে যের ـِ দিয়ে পড়া হয়েছে। অথবা উহ্য মুবতাদার খবর হিসাবে তাতে পেশ ـُ দিয়ে পড়া যেতে পারে। বাক্যের প্রকাশ্য রূপটি এমন هم أهلُ السنة والجماعة অর্থাৎ সেই নাজাতপ্রাপ্ত ফির্কার লোকেরা হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত।[১২]

السنة সুন্নাত: সুন্নাত ঐ পথকে বলা হয়, যার উপর স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন। অন্য অর্থে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও সমর্থন সমূহকে সুন্নাত বলা হয়।

বিদ'আতীরা যেমন বিভিন্ন মত ও পথের দিকে নিজেদেরকে সম্বোধিত করে, ফির্কায়ে নাজিয়ার লোকেরা তাদের খেলাফে সবকিছু বাদ দিয়ে যেহেতু শুধু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাতকেই মেনে চলেন, সেই কারণে তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়।

---

১২. আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা হয় ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের পথের অনুসারী। তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে থাকে। এ জন্য তাদেরকে আহলুস্ সুন্নাত বা আহলুল হাদীছ বলা হয়। এমনিভাবে তারা এই উম্মাতের প্রথম সারির মুহাজির ও আনসারদের পথ অনুসরণ করেন। কারণ তারা ছিলেন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথী। তারা অতি নিকটে থেকে অহী নাযিল প্রত্যক্ষ করেছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে দীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর তারাই অনুসরণের অধিক হকদার।

বিদ'আতীদেরকে তাদের বিদ'আতের দিকেই সম্বন্ধ করা হয়; সুন্নাতের দিকে নয়। যেমন বলা হয় কাদরীয়া সম্প্রদায়ের লোক, মুরজীআ সম্প্রদায়ের লোক ইত্যাদি।

কখনো তাদেরকে তাদের ইমামের দিকেও সম্বন্ধ করা হয়। যেমন জাহমীয়াদেরকে তাদের ইমাম জাহাম ইবনে সাফওয়ানের দিকে সম্বন্ধ করে জাহমীয়া বলা হয়।

আবার কখনো বিদ'আতীদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের দিকেও নিসবত করা হয়। যেমন আবু বকর ও উমার এবং তাদের খিলাফতকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে শিয়াদের একটি দলকে রাফেযী এবং আলী রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর দল ত্যাগ করে যারা তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদেরকে খারিজী বলা হয়।

الجماعة। জামা'আত: আভিধানিক অর্থে মানুষের ঐক্যবদ্ধ একটি দলকে জামা'আত বলা হয়। তবে এখানে জামা'আত দ্বারা ঐ সব লোক উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত দ্বারা সুসাব্যস্ত ও প্রমাণিত হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা হলো ছাহাবী এবং যারা উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ করে, যদিও তাদের সংখ্যা কম হয়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন:

الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ

যারা সত্যের অনুসরণ করে, তারাই হচ্ছেন জামা'আত। আপনি যদি একাই সত্যের অনুসরণ করেন, তাহলে আপনি একাই একটি জামা'আত সমতুল্য।

অর্থাৎ যখন আপনি ব্যতীত হকের অনুসারী অন্য কোন লোক থাকবে না, তখন আপনি একাই একটি জামা'আত বলে গণ্য হবেন।

أركان الإيمان

ঈমানের রুকনসমূহ

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

তা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর বিষয়গুলো হলো: (১) আল্লাহর প্রতি, (২) ফেরেশতাদের প্রতি, (৩) আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, (৪) নাবী-রসূলগণের প্রতি, (৫) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং (৬) তাক্বদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ব্যাখ্যা: এখানে هو 'তা' দ্বারা ফির্কা নাজিয়ার আক্বীদাহ-বিশ্বাসকে বুঝানো হয়েছে।

الإيمان। **বিশ্বাস:** ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সত্যায়ন করা। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর পুত্ররা যখন তাদের ভাই ইউসুফকে কূপে ফেলে দিয়ে তাদের পিতার কাছে এসে বলল:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ في الآية (١٧) من سورة يوسف

"আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউসুফের ১৭ নং আয়াতে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ভাইদের কথা উদ্ধৃত করেছেন। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়:

أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح

জবানের স্বীকারোক্তি, অন্তরের বিশ্বাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল করাকে ঈমান বলা হয়।

আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান দিবসের প্রতি এবং তাক্বদীরের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, এই ছয়টি হচ্ছে ঈমানের রুকন। আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের যে সঠিক পদ্ধতিতে এই

ছয়টি রুকনের বর্ণনা এসেছে, একসাথে সেই রুকনগুলোর প্রতি বিশ্বাস না করলে কারো ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। **এ রুকনগুলো হচ্ছে:**

১। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالله): আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, তিনিই প্রত্যেক জিনিসের একমাত্র রব ও মালিক। তিনি ছিফাতে কামালিয়ার (পূর্ণ গুণাবলীর) দ্বারা গুণান্বিত এবং প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা যে, তিনিই একমাত্র বান্দার ইবাদতের হকদার, এতে তার কোন শরীক নেই এবং ইলম ও আমালের মাধ্যমে এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকা।

২। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة): ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য হলো, অন্তর দিয়ে ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা যে, তারা ঠিক সে রকমই, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾

"তারা তো মর্যাদাশীল বান্দা, তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলে না এবং শুধু তার হুকুমেই কাজ করে" *(সূরা আল আম্বিয়া ২১:২৬-২৭)।*

আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতা ও তাদের বিভিন্ন গুণাবলীর বিবরণ দিয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, তাদের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর হুকুম মুতাবেক তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করে। এই সবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।[১৩]

---

১৩. **কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছের আলোকে ফেরেশতাদের কিছু গুণাগুণ, কাজ-কর্ম ও দায়িত্ব-কর্তব্যের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো:** আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ "এরপর আল্লাহর হুকুমে সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে" (সূরা আন নাযিআত: ৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾ "অতঃপর একটি বড় জিনিস বন্টনকারী" (সূরা আয যারিয়াত: ৪)। ঈমানদার ও রসূলদের অনুসারীদের নিকট এরা হচ্ছেন ফেরেশতা। যারা সৃষ্টিকর্তা ও নাবী-রসূলদেরকে অস্বীকার করে, তারা বলে থাকে যে, উক্ত আয়াত দু'টিতে তারকার কথা বলা হয়েছে।

কুরআন ও সুন্নাহয় বিভিন্ন প্রকার ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার মাখলুকের দায়িত্বও অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের দায়িত্বে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মাতৃগর্ভে শিশুর

দায়িত্বে ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। সে শুক্রবিন্দু থেকে শুরু করে শিশুর গঠন পর্যন্ত যাবতীয় কাজ পরিচালনা করে। বান্দা যেই আমল করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য এবং লিখে রাখার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। মৃত্যুর জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কবরে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। মহাশুন্যের গ্রহ-নক্ষত্রের জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। তারা তা ঘুরান ও পরিচালনা করেন। চন্দ্র-সূর্যের নিয়ন্ত্রণের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন জ্বালানো, জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়া এবং জাহান্নামের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। জান্নাত, জান্নাতের পরিচালনা, তাতে বৃক্ষাদি লাগানো এবং তাতে বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত স্থাপন করার জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং ফেরেশতারা আল্লাহর সর্বাধিক বড় সৈনিক। তাদের মধ্যে রয়েছে এমন সব ফেরেশতা, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ "শপথ সেসব (ফেরেশতার), যারা একের পর এক প্রেরিত হয় (সূরা মুরসালাত: ১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (৩) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (৪) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ "শপথ ঐ সমস্ত ফেরেশতাগণের, যারা মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। তারপর তাকে ফেঁড়ে বিচ্ছিন্ন করে। অতঃপর মানুষের মনে আল্লাহর স্মরণ জাগিয়ে দেয়"। (সূরা মুরসালাত: ৩-৫) ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (১) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (২) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (৩) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴾ "সেই ফেরেশতাদের কসম! যারা ডুব দিয়ে টানে এবং ঐ সমস্ত ফেরেশতার কসম, খুব আস্তে আস্তে বের করে নিয়ে যায়। আর সেই ফেরেশতাদেরও শপথ! যারা বিশ্বলোকে দ্রুত গতিতে সাঁতরে চলে অতঃপর বারবার (হুকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়"। (সূরা নাযিআত: ১-৪) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের কাজ সম্পর্কে আরো বলেন, ﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (১) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (২) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾ "সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মানদের কসম, তারপর যারা ধমক ও অভিশাপ দেয়। তাদের কসম, তারপর তাদের কসম যারা উপদেশ বাণী শুনায়"। (সূরা সাফফাত: ১-৩)

ফেরেশতাদের মধ্যে আরো রয়েছে একদল রহমতের ফেরেশতা। রয়েছে আযাবের ফেরেশতা। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে আরশ বহন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আরো এমন ফেরেশতা রয়েছে, যাদেরকে ছুলাত কায়েম, তাসবীহ পাঠ এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনার মাধ্যমে আসমানসমূহ আবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো এমন অনেক ফেরেশতা, যাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। الملك শব্দটির লাম বর্ণে যবর দিয়ে পড়লে এমন অর্থ প্রদান করে যাতে বুঝা যায় যে, তারা সেই বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত, যারা বার্তা প্রেরকের বার্তা পৌঁছিয়ে দেয়। তাদের হাতে কিছু নেই। বরং সকল কিছুর চাবিকাঠি পরাক্রমশালী একক সত্তার হাতে। তারা শুধু তার আদেশ বাস্তবায়ন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ "তারা তো মর্যাদাশালী বান্দা। তারা তার সামনে অগ্রবর্তী হয়ে কথা বলেন না এবং শুধু তার হুকুমে কাজ করেন"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ "যা কিছু মানুষের সামনে আছে তা তিনি জানেন এবং যা কিছু তাদের

৩। আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান (الإيمان بالكتب): অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রসূলদের উপর যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, সেগুলোকে সত্যায়ন করা। আরো বিশ্বাস করা যে, কিতাবগুলোতে যা আছে, তা আল্লাহর কালাম। তা সত্য, আলোর দিশারী এবং তাতে রয়েছে মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট হিদায়াত।[১৪]

অগোচরে আছে সে সম্পর্কেও তিনি অবগত"। (সূরা আল বাকারা: ২৫৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ "যাদের পক্ষে সুপারিশ শুনতে আল্লাহ সম্মত তাদের পক্ষে ছাড়া আর কারো সুপারিশ তারা করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত"। (সূরা আম্বীয়া: ২৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ "তারা (ফেরেশতারা) ভয় করে নিজেদের রবকে যিনি তাদের উপরে আছেন এবং যা কিছু হুকুম দেয়া হয় সেই অনুযায়ী কাজ করে"। (সূরা আন নাহাল: ৫০)

সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছেন আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদের মধ্যে কতক ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। কেউবা তাসবীহ পাঠে মশগুল। তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে সুনির্দিষ্ট দাড়াবার স্থান। তিনি তা অতিক্রম করতে পারেন না। সে আদিষ্ট কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। সেই কাজ করতে কোন প্রকার ত্রুটি করেন না এবং তাকে যেই কাজের আদেশ করা হয়েছে, তার সীমালঙ্ঘন করেন না। যারা আল্লাহর নিকটবর্তী, তাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ "তারা নিজেদেরকে বড় মনে করে তার ইবাদত থেকে বিমুখ হয় না এবং না ক্লান্ত হয়। দিন রাত তার প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকেন, বিরাম বা বিশ্রাম নেন না"। (সূরা আল আম্বীয়া ২১: ১৯-২০)

ফেরেশতাদের প্রধান ও নেতা হলেন তিনজন। জিবরীল, মীকাঈল এবং ইসরাফীল। তারা সকল মানুষ, প্রাণী, জীব ও উদ্ভিদের হায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অহীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। অহীর মাধ্যমেই রূহ এবং অন্তর জীবন্ত হয়। মিকাঈল বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃষ্টির মাধ্যমে যমীন, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ জীবিত হয়। ইসরাফীল শিঙ্গায় ফুৎকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর মাধ্যমে সৃষ্টি মৃত্যুর পর পুনঃজীবন ফেরত পাবে। সুতরাং ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি ও আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর দূত। তারা তার মাঝে এবং তার বান্দাদের মাঝে দূত স্বরূপ। তারা আল্লাহর নিকট থেকে সৃষ্টি জগতের সকল প্রান্তে তার আদেশ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অবতরণ করে এবং তার নিকট উন্নীত হয়। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করে। তাদের কেউ তাতে দ্বিতীয়বার প্রবেশের সুযোগ পাবে না।

১৪. আল্লাহ তা'আলা তার নাবী ও রসূলদের উপর যেসমস্ত কিতাব নাযিল করেছেন সেগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করা আহলে সুন্নাতের অন্যতম আক্বীদাহ। কুরআন মাজীদে যেসব কিতাবের নাম এসেছে যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়নি, সেসব কিতাবের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক।

৪। **রসূলদের প্রতি ঈমান (الإيمان بالرسل):** আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য যে সমস্ত নাবী ও রসূল পাঠিয়েছেন তাদের সকলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। তারা যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন তাতে তারা সত্যবাদী। তারা তাদের প্রভুর রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না; বরং তাদের সকলের উপর ঈমান রাখি।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রতি ঈমান রাখি এবং তাদের মধ্য হতে যাদের নাম উল্লেখ করেননি তাদের সকলের প্রতি আমরা ঈমান রাখি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾

"আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং এমন আরো অনেক রসূল রয়েছেন, যাদের কথা তোমাকে বলিনি"। *(সূরা আন-নিসা ৪:১৬৪)*

রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন أولوا العزم অর্থাৎ আল্লাহর দিকে দাওয়াত প্রচারে সুদৃঢ় ইচ্ছার অধিকারী রসূলগণ।[১৫] তারা হলেন নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের পরে ছিলেন অন্যান্য রসূলগণ। অতঃপর নাবীগণ। নাবী-রসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশেষ হচ্ছেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ।

নাবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হচ্ছে: নাবী ঐ পুরুষ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার কাছে শরী'আতের অহী পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তাকে তাবলীগ করার আদেশ দেয়া হয়নি। আর রসূল ঐ পুরুষ লোককে বলা হয়, যার কাছে আল্লাহর শরী'আত পাঠানো হয়েছে এবং সেই শরী'আতের তাবলীগ করার আদেশও দেয়া হয়েছে।[১৬]

---

১৫. তারা ছিলেন ঐ সমস্ত রসূল, যারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ছিলেন পর্বত সদৃশ সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন এবং আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে নিজ নিজ গোত্রের পক্ষ হতে যেসব যুলুম-নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তাতে সীমাহীন ধৈর্যধারণকারী।

১৬. শাইখ এখানে নাবী ও রসূলের মধ্যকার যেই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন, তাতে কোন কোন আলেম আপত্তি করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে নতুন শরী'আত দিয়ে কাউকে নাবী করে পাঠানো হবে, অথচ তাকে সেই শরী'আত প্রচার করার আদেশ দেয়া হবে না, এটি কিভাবে হতে পারে? তাই তারা অন্যভাবে নাবী ও রসূলের মধ্যকার পার্থক্য নিরুপন করেছেন। তাদের মতে রসূল হচ্ছেন সেই পুরুষ ব্যক্তি, যাকে আলাদা শরী'আতসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাকে সেই শরী'আত মানুষের মধ্যে

৫। পুনরুত্থান দিবসের প্রতি ঈমান (الإيمان بالبعث):

এর অর্থ হচ্ছে ক্বিয়ামত দিবসে মৃতদেরকে তাদের কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। কবর হতে জীবিত অবস্থায় বের করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র সুন্নাতে আমল অনুযায়ী তাদেরকে যে পদ্ধতিতে বিনিময় দেয়ার বর্ণনা দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই তাদেরকে বিনিময় প্রদান করবেন।

৬। তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করা (الإيمان بالقدر خيره وشره): তাক্বদীরের ভালো ও মন্দের[১৭] উপর ঈমান আনয়ন করার অর্থ হচ্ছে, অন্তর

প্রচার করার আদেশ করা হয়েছে। আর নাবী হচ্ছেন সেই পুরুষ ব্যক্তি, যাকে তার পূর্বের রসূলের শরী'আত অনুযায়ী স্বীয় উম্মতকে সংশোধন ও পরিচালনা করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

১৭. তাক্বদীরকে ভালো ও মন্দ এই দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। তাক্বদীরের ভালো বিষয়গুলো তো সুস্পষ্ট। মানুষ ইহপরকালে যেসব কল্যাণ অর্জন করবে, তা আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত আছেন এবং তিনি তা নির্ধারণ করেছেন। এমনি তাক্বদীরের মন্দ বিষয়গুলোও আল্লাহ তা'আলা তার ইলমে আযালীর (চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর জ্ঞানের) মাধ্যমে অবগত আছেন। তাক্বদীরের মধ্যে যেহেতু অকল্যাণও রয়েছে, তাই স্বভাবত একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি আল্লাহ তা'আলা মন্দ জিনিসও সৃষ্টি করেন এবং বান্দার জন্য নির্ধারণ করেন? আল্লাহর কাজের মধ্যেও কি অকল্যাণকর কিছু আছে?

এই প্রশ্নের জবাবে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন এবং তিনি বেশ কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। পাঠক সমীপে এখানে তা উল্লেখ করা হলো।

তিনি বলেন, এখানে তাক্বদীরের অকল্যাণ বলতে ঐসব অকল্যাণ উদ্দেশ্য, যা রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারিত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে। তাক্বদীরের অকল্যাণ তথা ঐ নির্ধারণের অকল্যাণ উদ্দেশ্য নয়, যা আল্লাহর ক্রিয়া ও কাজ। কেননা আল্লাহর কাজের মধ্যে কোন অকল্যাণ নেই। তার সকল কাজই ভালো এবং তার প্রত্যেকটি কাজই হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। তবে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা তিনি নির্ধারণ করেছেন, তার কোন কোনটিতে অকল্যাণ রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভাগ্যে যা নির্ধারিত রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন, তাতে অকল্যাণ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কোন فعل বা কাজের মধ্যে অকল্যাণ নেই। এই জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, والشر ليس إليك তোমার দিকে অকল্যাণের সম্বন্ধ শোভনীয় নয়।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ পেশ করা দরকার। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করেছেন এবং যা নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে ক্ষতির সৃষ্টিও রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে সাপ, বিচ্ছু, হিংস্র জীব-জন্তু, বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যধি, অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি এবং এ ধরণের আরো কিছু। এগুলো মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কেননা এগুলো মানুষের চাহিদার পরিপন্থী। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে পাপাচার, অশ্লীলতা, কুফুরী, অবাধ্যতা, হত্যা এবং

আরো বহু অন্যায় কাজ-কর্ম। এসব মানুষের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এগুলো কল্যাণকর। কেননা আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক বিরাট ও সুমহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। যে ব্যক্তি তা জানতে পেরেছে, সে তো তার হিকমত জানলোই। পক্ষান্তরে যে তা জানতে পারেনি, সে তো সে সম্পর্কে অজ্ঞই রয়ে গেল।

সুতরাং আমাদের জানা আবশ্যক যে, তাক্বদীরে যেই অকল্যাণ থাকার কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ এবং তার নির্ধারিত বস্তু ও বিষয়গুলোর দিক থেকেই। আল্লাহর ঐ তাক্বদীরের দিক বিবেচনায় নয়, যার দ্বারা আল্লাহর নির্ধারণ এবং আল্লাহর কাজ বুঝায়। কেননা আল্লাহ বান্দার জন্য অকল্যাণ কিছুতেই করেন না।

অতঃপর হে পাঠক! আপনি জেনে রাখুন যে, আল্লাহর যেই সৃষ্টি অকল্যাণকর, তার মধ্যে মূলতই অকল্যাণ থাকতে পারে; কিন্তু অন্যদিক বিবেচনায় তাও কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদেরকে তাদের কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করানো হয়, হয়তো তারা ফিরে আসবে"। (সূরা আর রূম: ৪১)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিপর্যয়ের ফলাফলও ভালো। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায় বিষয়টিতে তথা বিপর্যয় ও বিশৃংখলার যেই অকল্যাণ রয়েছে, তা তুলনামূলক ও আপেক্ষিক। অর্থাৎ একদিক থেকে অকল্যাণকর এবং অন্যদিক থেকে কল্যাণকর। সম্পূর্ণরূপে এবং প্রকৃতপক্ষে তা ক্ষতিকর নয়। কেননা অচিরেই এর ফলাফল ভালো হবে।

ব্যভিচারী ও মদখোরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টিও উদাহরণ স্বরূপ আসতে পারে। ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে একশটি বেত্রাঘাত করাসহ একবছর পর্যন্ত দেশান্তর করতে হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, এটি তার জন্য কষ্টকর। কেননা তার চাহিদার জন্য এটি উপযোগী নয়। কিন্তু অন্যদিকে এটি তার জন্য কল্যাণকর। শাস্তি প্রয়োগ করার কারণে তার গুনাহর কাফফারা হবে। এটি ভালো। কেননা দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তির চেয়ে সহজতর। সুতরাং দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করা তার জন্য ভালো। এই শাস্তি প্রয়োগের আরেকটি কল্যাণকর দিক হলো, তা দেখে অন্যরা সাবধান হবে। ফলে তা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হবে। কেননা অন্যরা যখন ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা করবে এবং যখন সে জানতে পারবে যে, অমুক যেনাকারীকে যেই শাস্তি দেয়া হয়েছে, তার উপরও তা প্রয়োগ করা হবে, তখন সে এই জঘন্য অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। যাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হলো, তার জন্য এই শাস্তি অন্য একদিক থেকেও ভালো হতে পারে। তা এই যে সে ভবিষ্যতে আর ব্যভিচারের দিকে অগ্রসর হবে না।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যেও কিছু সৃষ্টি ক্ষতিকর। এটি শুধু মানুষকে কষ্ট দিবে- এ জন্য আল্লাহ তা সৃষ্টি করেননি। বরং নির্ধারিত বস্তু হিসাবে গণ্য করার দিক থেকে তা ক্ষতিকর। উদাহরণ স্বরূপ রোগ-ব্যধির কথা বলা যেতে পারে। মানুষ যখন অসুস্থ হয়, তখন তার সেই অসুস্থতা অব্যশই কষ্টদায়ক। কিন্তু বাস্তবে সেই অসুখের মধ্যে তার জন্য বিরাট এক কল্যাণ রয়েছে। এর মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ হয়। কখনো মানুষের এমন গুনাহ থাকে, যা তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মাফ হয় না। গুনাহ মাফ হওয়ার পথে কোন না কোন প্রতিবন্ধক থাকার কারণেই এ রকম হয়। নিয়ত ও ইখলাসের মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে এবং আল্লাহর সাথে সত্যবাদী না হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে, তাই এসব অসুস্থতা এবং শাস্তির মাধ্যমে এই গুনাহগুলো মাফ করে দেয়া হয়।

দিয়ে এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টি করার আগেই সমস্ত বস্তুর তাক্বদীরসমূহ এবং তার সময়কাল সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টির ভাগ্যে কী রয়েছে এবং তা সে কখন পাবে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই অবগত আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম মুতাবেক তাকে লাওহে মাহফুযে লিখে দিয়েছেন। অতঃপর স্বীয় ক্ষমতা ও ইচ্ছা দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টিকে তার নির্ধারিত সময়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ভালোমন্দ প্রত্যেক সৃষ্টিই তার ইলম, তার নির্ধারণ, তার ইচ্ছা অনুপাতেই হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না।

এই ছিল ঈমানের মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইনশা-আল্লাহ এই মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসছে।

রোগ-ব্যধির অন্যতম কল্যাণ হচ্ছে যে, সুস্বাস্থ্যের মূল্য বুঝা। সুস্বাস্থ্য যে একটি আল্লাহ তা'আলার কত বড় নিয়ামত, মানুষ তা মূল্যায়ন করতে জানে না। তবে সে যখন অসুস্থ হয়, কেবল তখনই এর মূল্য বুঝতে সক্ষম হয়। আমরা যখন সুস্থ থাকি, তখন সুস্থ থাকার মূল্য বুঝি না। কিন্তু যখন অসুস্থ হয়ে যাই, তখন স্বাস্থ্যের মূল্য বুঝি। কথায় বলে, الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لايعرفها إلا المرضى..... সুস্থতা সুস্থ লোকের মাথার মুকুট স্বরূপ। অসুস্থ ব্যতীত অন্য কেউ তা দেখতে পায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অসুস্থ হওয়াও ভালো। যাতে করে আপনি সুস্থতার মূল্য অনুভব করতে পারেন।

অসুস্থ হওয়ার আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে কোন কোন রোগের মধ্যে এমন জিনিস থাকে, যা শরীরের অন্যান্য রোগ জীবাণু ধ্বংস করে দেয়। রোগ ছাড়া অন্য কিছু এই জীবাণুকে হত্যা করতে পারে না। ডাক্তারগণ বলেন, কতক রোগ শরীরের অন্যান্য বড় বড় রোগজীবাণু হত্যা করে। অথচ আমরা টের পাই না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, **প্রথমত:** যেই অকল্যাণ দ্বারা তাক্বদীরকে বিশেষিত করা হয়েছে, আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু ও নির্ধারিত বস্তুর দিক থেকে হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা করেন, তার সবকিছু কল্যাণের জন্যই করেন। এই কথার দলীল হচ্ছে, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ অকল্যাণকে তোমার দিকে সম্বোধিত করা শোভনীয় নয়।

দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু মাখলুকের মধ্যে যেই অকল্যাণ রয়েছে, তা শুধুই ক্ষতিকর নয়। কেননা এই অকল্যাণ থেকে কখনো এমন অনেক কল্যাণ চলে আসে, যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন মুছীবতে নিপতিত হলো, তার জন্য ঐ মুছীবত একদিক থেকে কষ্টদায়ক এবং অন্যদিক মূল্যায়নে তা তার জন্য কল্যাণকর। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট তাক্বদীরের স্তর সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে আরো আলোচনা সামনে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

الإيمان بصفات الله

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস করা

الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه.

কোন রকম পরিবর্তন, বর্জন ও সাদৃশ্যকরণ ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل

আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে নিজেকে যে সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং তার রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র সুন্নাতে আল্লাহর যে মহান গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, কোন প্রকার تحريف (পরিবর্তন), تعطيل (অস্বীকার ও বাতিল), تكييف (পদ্ধতি ও ধরন বর্ণনা) এবং কোন প্রকার تمثيل (উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ) করা ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করাও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল।

.....

ব্যাখ্যা: যেসব মূলনীতির উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তা সংক্ষেপে উল্লেখ করার পর এবার সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু করেছেন। মূলনীতিগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি সর্বাগ্রে প্রথম মূলনীতি অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে আল্লাহর ঐ সুমহান ছিফাতগুলোর প্রতি বিশ্বাস করাও শামিল হবে, যদ্বারা তিনি তার কিতাবে নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা যদ্বারা তার সম্মানিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র সুন্নাতে তাকে গুণান্বিত করেছেন। ঐ ছিফাতগুলো আমরা আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করবো, যেভাবে তা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। এই ছিফাতগুলো যে শব্দে বর্ণিত হয়েছে এবং

সেগুলো যে অর্থ প্রদান করেছে, তা সহকারেই আমরা আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত করি। **শব্দগুলোর কোন পরিবর্তন করি না, তার অর্থগুলোও বাদ দেই না এবং আল্লাহর সুমহান ছিফাতগুলোকে আমরা মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করি না।** এগুলো সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আমরা কেবল আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের উপরই নির্ভর করি। কোন অবস্থাতেই আমরা এতে কুরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত সীমা অতিক্রম করি না। কেননা আল্লাহর ছিফাতগুলো توقيفية তথা অহীর উপর নির্ভরশীল।

التحريف পরিবর্তন: তাহরীফ অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করা এবং কোন জিনিসকে তার আসল অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা। বলা হয় انحرف عن كذا লোকটি এই অবস্থান থেকে সরে গিয়েছে। এই কথা ঠিক তখনই বলা হয়, যখন লোকটি তার সঠিক অবস্থান থেকে সরে যায়। আল্লাহর ছিফাতে তাহরীফ দুইভাবে হতে পারে।

(১) তাহরীফে লাফযী: যে শব্দসমূহের মাধ্যমে আল্লাহর ছিফাতগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে অন্য শব্দ দ্বারা বদল করাকে তাহরীফে লাফযী তথা শাব্দিক পরিবর্তন বলা হয়। এই প্রকার তাহরীফ এক শব্দের সাথে অন্য শব্দ বা অক্ষর যুক্ত করে অথবা অক্ষর কমানোর মাধ্যমে হতে পারে কিংবা শব্দের মধ্যকার অক্ষরের হরকত (জের, যবর ও পেশ) পরিবর্তন করার মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ তা'আলার বাণী: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ "দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নত হয়েছেন" *(সূরা ত্বহা ২০:৫)* -এর মধ্যে استوى শব্দকে পরিবর্তন করে استولى বানিয়ে ফেলেছে। আল্লাহর আয়াতের মধ্যে তারা একটি অক্ষর তথা ي এবং واو -এর মাঝখানে লাম অক্ষর বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনি তারা আল্লাহর বাণী: وَجَاءَ رَبُّكَ "এবং তোমার রব আগমন করবেন" *(সূরা আল ফাজর ৮৯:২২)* -এর মধ্যে একটি শব্দ বাড়িয়ে বলেছে وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ "এবং তোমার রবের আদেশ আগমন করবে"। এখানে তারা أمر শব্দটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর 'আসা' ছিফাতকে আল্লাহর আদেশ আসা দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে। এমনি তারা আল্লাহর বাণী: وَكَلَّمَ اللَّهُ ﴿مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ "আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। *(সূরা আন নিসা ৪:১৬৪)*

এখানে তারা আল্লাহ তা'আলার সুমহান নাম اللهُ শব্দের ها অক্ষরের পেশকে যবর দ্বারা পাঠ করে থাকে। তখন অর্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কথা

বলেননি; বরং মূসা (আলাইহিস সালাম)আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। অর্থাৎ অহীর মাধ্যমে কথা বলা যে আল্লাহ তা'আলার গুণসমূহের অন্যতম একটি গুণ, এটিকে অস্বীকার করার জন্য তারা পেশকে যবর দ্বারা বদল করার মাধ্যমে আল্লাহর কালামকে মূসার কালামে পরিণত করতে চাচ্ছে।

(২) তাহরীফে মা'নবী। আর দ্বিতীয় প্রকার তাহরীফ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতসমূহের অর্থকে পরিবর্তন করে ফেলা। যেসব শব্দের মধ্যে আল্লাহর ছিফাতের বর্ণনা এসেছে, সেগুলোর আসল অর্থ পরিবর্তন করে অন্য অর্থ প্রদান করাকে تحريف معنوي তথা শব্দগত পরিবর্তন বলা হয়। যেমন الرحمة (দয়া করা) আল্লাহর ছিফাতসমূহের অন্যতম একটি ছিফাত। কিন্তু বিদ'আতীরা এটিকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে না। তারা বলে রহমত অর্থ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানের ইচ্ছা করা। এমনি তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা ক্রোধান্বিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করা।

التعطيل বাতিল ও অকর্মন্য করা: তা'তীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে খালি করা। যেমন বলা হয় عطله অর্থাৎ তাকে খালি করে দিল। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার ছিফাতগুলো অস্বীকার করা। তাহরীফ ও তা'তীলের মধ্যে পার্থক্য হলো কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে যে সঠিক অর্থটি সাব্যস্ত হয়, তা অস্বীকার করে তাকে অন্য একটি ভুল অর্থ দ্বারা বদল করাকে تحريف বলা হয়। আর সঠিক অর্থকে অন্য অর্থ দিয়ে বদল না করে সঠিক অর্থকেই অস্বীকার করার নাম تعطيل। যেমন 'মুফাওবেযা' সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। এরা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করে; কিন্তু সেগুলোকে অন্য অর্থ দ্বারা বদল করে না। সে হিসাবে প্রত্যেক محرف (রদবদলকারীই) معطل (বাতিল কারী); কিন্তু প্রত্যেক বাতিল কারী রদবদলকারী নয়।

التكييف আল্লাহর ছিফাতের ধরন ও আকৃতি নির্ধারণ করা: যেমন আরবীতে বলা হয় كيف الشيئ সে বস্তুটির ধরন বর্ণনা করলো। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন সে বস্তুটির জন্য নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত ধরন ও আকার নির্ধারণ করে। আল্লাহর ছিফাতের কাইফিয়াত বর্ণনা করার অর্থ হলো তার জন্য নির্দিষ্ট ধরন ও আকৃতি নির্ধারণ করা এবং তার জন্য বিশেষ কোন অবস্থা স্থির করা। আল্লাহর ছিফাতের ধরন ও আকৃতি স্থির করা কোন মানুষের জন্য সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহর ছিফাতের প্রকৃত অবস্থা ও ধরন ঐ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার ইলম কেবল আল্লাহ তা'আলার কাছেই রয়েছে। মাখলুকের পক্ষে সেই জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। আল্লাহর ছিফাত তার পবিত্র সত্তার অনুগামী। তাই আল্লাহর পবিত্র সত্তার ধরন সম্পর্কে মারেফত হাসিল করা যেমন সম্ভব নয়, অনুরূপ ছিফাতের প্রকৃত রূপ ও ধরন সম্পর্কে জানাও সৃষ্টির পক্ষে অসম্ভব।

ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ কে -আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো- ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন" *(সূরা ত্বহা ২০:৫)।*

كيف استوى আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন? জবাবে ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বললেন:

الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة

'আরশের উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়া জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয়। তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। তবে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদ'আত'।[১৮] আল্লাহ তা'আলার সব ছিফাতের ক্ষেত্রে একই বক্তব্য প্রযোজ্য।

التمثيل তামছীল তথা আল্লাহর ছিফাতের উপমা ও নমুনা বর্ণনা করা: আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যে, আল্লাহর ছিফাতগুলো মানুষের ছিফাতসমূহের মতোই। যেমন কেউ বলল আল্লাহর হাত আমাদের হাতের মতোই এবং আল্লাহর শ্রবণ আমাদের শ্রবণের মতোই। আল্লাহ তা'আলা এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)।* সুতরাং আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাবে না যে, তা আমাদের ছিফাতের অনুরূপ কিংবা আমাদের ছিফাতের সাথে তুলনীয় অথবা হুবহু আমাদের ছিফাতের মতোই। যেমন বলা জায়েয নয় যে, আল্লাহর সত্তা আমাদের সত্তার অনুরূপ অথবা তা আমাদের সত্তার সাথে তুলনীয়।

সুতরাং তাওহীদপন্থী মুমিনগণ আল্লাহর সকল ছিফাত ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করেন, যেভাবে সাব্যস্ত করলে তার মর্যাদাও বড়ত্বের জন্য শোভনীয় হয়। অপরপক্ষে معطلة (আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসী) লোকেরা আল্লাহর সকল ছিফাতকে অথবা তার কতক ছিফাতকে অস্বীকার করে এবং মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহর ছিফাতকে এমনভাবে সাব্যস্ত করে, যা আল্লাহ তা'আলার শান ও মর্যাদার সাথে শোভনীয় নয়; বরং তা কেবল মাখলুকের জন্যই প্রযোজ্য হয়।

---

১৮ .অতঃপর সে বিদ'আতী লোককে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর নির্দেশে তার মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। কেননা এটি এমন প্রশ্ন, যা সালাফে সালেহীনের কোন লোক নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করেননি।

موقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

বরং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টি জগতের কোনো কিছুই আল্লাহর মতো নয়, অথচ তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাকে তারা তার থেকে বাদ দেয় না এবং আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে না।

.....

ব্যাখ্যা: কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্ তা'আলার যেসব ছিফাত (গুণাবলী) রয়েছে, কোন প্রকার تحريف (পরিবর্তন করা), تعطيل (অস্বীকার ও বাতিল করা), تكييف (ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করা) এবং কোনো প্রকার تمثيل (উদাহরণ, উপমা ও দৃষ্টান্ত পেশ করা) ব্যতীতই সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।

এ কথা বলার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান কী তা বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং তিনি বলেছেন, সঠিক ও বিশুদ্ধ পদ্ধতিতেই তারা আল্লাহ তা'আলার সেই ছিফাতগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। ছিফাতগুলোকে প্রকৃত অর্থসহকারেই তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেন এবং একই সাথে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুর সাথেই সেই ছিফাতগুলোর সাদৃশ্য ও তুলনা করা থেকে দূরে থাকেন।

সুতরাং আহলুস সুন্নাতের লোকেরা ছিফাতগুলোকে অস্বীকারও করেন না এবং সেগুলোকে সৃষ্টির মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করেন না। বরং সূরা শুরার ১১ নং আয়াতে যেভাবে আল্লাহর ছিফাতের বর্ণনা এসেছে, তারা সেভাবেই বিশ্বাস করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

"সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"।

আল্লাহর বাণী: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ "সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়"-এই কথা দ্বারা ঐ সব লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করে। অর্থাৎ যারা বলে আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মতোই।

আর আল্লাহর বাণী: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" -এর দ্বারা আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর মধ্যে আল্লাহর জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং এই সম্মানিত আয়াতটি আসমা ওয়াস ছিফাতের (আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর) অধ্যায়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি সংবিধান ও মূলনীতিতে পরিণত হয়েছে। কেননা এটি একই সাথে আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করে এবং মাখলুকের মধ্যে সেই ছিফাতগুলোর উপমা ও দৃষ্টান্ত হওয়াকে অস্বীকার করে। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আসবে, ইনশা-আল্লাহ।

فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সুমহান গুণে গুণান্বিত করেছেন, সেটা তারা অস্বীকার করেন না:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এই কথার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করেন যে, সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার সদৃশ নয়। এই বিশ্বাস তাদেরকে আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায় না। যেমনটি করে থাকে আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের ছিফাত থেকে পবিত্র করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত এক শ্রেণীর লোক। এমনকি তাদের বাড়াবাড়ি এই পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে তার সকল উত্তম গুণাবলী থেকে শূন্য করে ফেলেছে। তাদের খোড়া যুক্তি হচ্ছে, আল্লাহর জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা এ থেকে পালানোর জন্য কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত আল্লাহর সকল ছিফাতকে অস্বীকার করেছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে আল্লাহ তা'আলার জন্য রয়েছে এমনসব সুউচ্চ গুণাবলী, যা তার পবিত্র সত্তার জন্য শোভনীয় ও প্রযোজ্য। আর মাখলুকের জন্যও রয়েছে এমন ছিফাত ও কাজ, যা তার জন্য প্রযোজ্য ও শোভনীয়। মূলতঃ মহান স্রষ্টার সুউচ্চ ছিফাত ও সৃষ্টির সাধারণ ও নগণ্য ছিফাতের মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্যতা নেই। সুতরাং হে মুআত্তেলা (আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী)

সম্প্রদায়! তোমরা যেই আশঙ্কায় (স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তুলনা হয়ে যাওয়ার ভয়ে) আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করছো, তা মোটেই আবশ্যক নয়।

وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ তারা আল্লাহর কালামকে আসল স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে না:

পূর্বে تحريف এর অর্থ অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ আহলুস সুন্নাতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করে না। তারা কুরআন ও সুন্নার শব্দসমূহ অন্য শব্দ দিয়ে বদল করে না এবং তার আসল ও প্রকৃত অর্থগুলোকেও অন্য অর্থ দিয়ে পরিবর্তন করে না। অতঃপর তারা তার আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যাও করে না। যেমন করে থাকে মুআত্তেলা সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা আল্লাহর কালাম استوى (ইস্তাওয়াকে) استولى (ইস্তাওলা) দ্বারা ব্যাখ্যা করে।

এমনি তারা আল্লাহর কালাম: وَجَاءَ رَبُّكَ "এবং তোমার রব আগমন করবেন" *(সূরা ফাজর ৮৯:২২)*। এর মধ্যে একটি শব্দ বাড়িয়ে وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ "এবং তোমার রবের আদেশ আগমন করবে"-এর দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এখানে তারা أمر শব্দটি বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর 'আসা' ছিফাতকে 'আল্লাহর আদেশ আসা' দ্বারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

তারা আল্লাহর "রহমত তথা সৃষ্টির প্রতি দয়া করা" ছিফাতকে নিয়ামত ও ছওয়াব প্রদানের ইচ্ছা দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এমনি আরো অনেক ছিফাতকে তারা বাতিল অর্থ দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর নাম ও আয়াতসমূহের বিকৃতি করেন না, তারা আল্লাহর ছিফাত সমূহের ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করেন না এবং তার ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করেন না।

.....

ব্যাখ্যা: وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতসমূহের বিকৃতি করেন না: إلحاد (ইলহাদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাঁকা হওয়া, একদিকে ঝুঁকে পড়া, কোন জিনিস থেকে সরে আসা, ইত্যাদি। এখান থেকেই কবরকে লাহাদ বলা হয়। কবরকে লাহাদ বলার কারণ হলো, তাকে খনন করার সময় গর্ত খননের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতির ব্যতিক্রম করে কিবলার দিকে বাঁকা করে দেয়া হয়। আর আল্লাহর অতি সুন্দর নাম, তার সুউচ্চ গুণাবলী এবং আয়াতসমূহের মধ্যে ইলহাদ হচ্ছে তার প্রকৃত ও সঠিক অর্থ বাদ দিয়ে বাতিল অর্থের দিকে নিয়ে যাওয়া। আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে ইলহাদ কয়েক প্রকার।

প্রথম: আল্লাহর নামে দেবতার নাম রাখা: আল্লাহর অন্যতম নাম الإله থেকে মুশরিকরা তাদের এক দেবতার নাম রেখেছে اللات (লাত), আল্লাহর নাম العزيز থেকে তারা তাদের আরেক মূর্তির নাম রেখেছে العزى (উয্যা) এবং আল্লাহর নাম المنان থেকে তারা তাদের আরেক বাতিল মাবুদের নাম রেখেছে مناة (মানাত)।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার এমন নাম রাখা, যা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের শানে শোভনীয় নয়: যেমন খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে أب (FATHER বা পিতা) বলে। দার্শনিকরা আল্লাহকে موجب (আসল সংঘটক) কিংবা علة فاعلة (প্রভাবশালী উপকরণ) বলে থাকে।

তৃতীয়: আল্লাহ তা'আলাকে এমন ত্রুটিযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করা, যা থেকে তিনি নিজেকে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছেন: যেমন অভিশপ্ত ইয়াহূদীরা বলে থাকে ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ "নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী" *(সূরা আলে ইমরান ৩:১৮১)*। তারা আরো বলে:

﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আল্লাহর হাত বাঁধা। আসলে বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত এবং তারা যে কথা বলছে সে জন্য তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে। আল্লাহর দুই হাত সদা প্রসারিত। যেভাবে চান তিনি খরচ করেন" *(সূরা আল মায়িদা ৫:৬৪)।*

তারা আরো বলে থাকে আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং তার মধ্যকার সকল বস্তু সৃষ্টি করার পর শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। মূলতঃ আল্লাহ তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

চতুর্থ: আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতগুলোর অর্থ ও হাকীকত অস্বীকার করা: যেমন জাহমীয়ারা বলে আল্লাহর নামগুলো শুধু শব্দের মধ্যেই সীমিত। এগুলো কোন গুণ বা অর্থকে নিজের মধ্যে শামিল করে না। তারা বলে আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে, السميع (সর্বশ্রোতা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি শুনেন কিংবা এটি প্রমাণ করে না যে, শ্রবণ করা তার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট। আল্লাহর অন্যতম নাম হচ্ছে البصير (সর্বদ্রষ্টা), কিন্তু এই নামটি প্রমাণ করে না যে, তিনি দেখেন কিংবা দেখা তার গুণ এবং আল্লাহ তা'আলার আরেকটি নাম হচ্ছে الحي (চিরজীবন্ত), কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, তার হায়াত বা জীবন আছে। আল্লাহর অন্যান্য নাম ও ছিফাতের ক্ষেত্রেও তারা একই রকম কথা বলে থাকে।[১৯]

পঞ্চম: আল্লাহর ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করা: যেমন মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়ের লোকেরা করে থাকে। তারা বলে থাকে, আল্লাহর হাত আমার দুই হাতের মতোই। অন্যান্য ছিফাতের বেলাতেও তারা একই রকম কথা বলে। আল্লাহ তাদের এই ধরণের কথার অনেক উর্ধ্বে।

যারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও আয়াতের মধ্যে ইলহাদ করে, তাদেরকে তিনি কঠোর আযাবের ধমক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

১৯. আশ'আরী ও মাতুরীদিগণ হুবহু উক্ত আক্বীদাহ পোষণ করেন। আশ'আরীগণ মাত্র সাতটি গুণকে এবং মাতুরীদিগণ মাত্র আটটি গুণকে স্বীকার করেন। বাকীগুলোর তাবীল (ব্যাখ্যা) করে থাকেন। আশ'আরীগণ যেসব ছিফাতে বিশ্বাস করে, তা হলো, الحياة (জীবন), العلم (জ্ঞান), الإرادة (ইচ্ছা পোষণ করা), القدرة (ক্ষমতা), السمع (শ্রবণ করা), البصر (দেখা) এবং الكلام (কথা বলা)। মাতুরীদিগণ অষ্টম যেই ছিফাতটি সাব্যস্ত করে, তা হলো, التكوين (আকৃতি দান করা বা গঠন করা)।

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো সুন্দরতম নাম রয়েছে। সুতরাং তাকে সেই নামেই ডাকো এবং তার নামসমূহের মধ্যে যারা বিকৃতি করে, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো। তারা যা করে আসছে, তার ফল অবশ্যই তারা পাবে" *(সূরা আল 'আরাফ ৭:১৮০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾

"যারা আমার আয়াতসমূহের বিকৃতি (উল্টা অর্থ) করে, তারা আমার অগোচরে নয়" *(সূরা ফুস্সিলাত ৪১:৪০)*।

وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِه بِصِفَاتِ خَلْقِه তারা আল্লাহর ছিফাত সমূহের ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করেন না এবং তারা তার ছিফাতসমূহকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনাও করেন না: تكييف এবং تمثيل এর ব্যাখ্যা একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ

"কারণ আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কেউ নেই, তার কোন সমকক্ষও নেই এবং তার কোন শরীকও নেই। আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস (তুলনা) করা যাবে না। তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। তার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তার সৃষ্টির কথার চেয়ে তার কথাই সর্বাধিক সুন্দর"।

.....

ব্যাখ্যা: لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ কারণ আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ অন্য কেউ নেই: পূর্বে যে বলা হয়েছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাত সমূহের ধরন ও আকৃতি বর্ণনা করে না এবং তার ছিফাতগুলোকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করে না, তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কেউ নেই।

سبحانه সুবহানাহু: سبحان শব্দটি غفران শব্দের ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বাবে তাফ-ঈলের মাসদার التسبيح থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সকল দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা।

لَا سَمِيَّ لَهُ তার সমতুল্য কেউ নেই: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নামের সমপর্যায়ের এমন কোন নাম নেই, যে তার নামের সমান মর্যাদা ও সম্মানের দাবী রাখে। আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৬৫ নং আয়াতে বলেন:

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

তোমার জানা মতে তার সমতুল্য কেউ আছে কি?

এখানে প্রশ্ন করা হলেও তার অর্থ হচ্ছে নাফী তথা এটি বলা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই এবং তার নাম ও সত্তার মতো অন্য কোন নাম ও সত্তা নেই।

وَلَا كُفْءَ لَهُ তার কোনো সমকক্ষ নেই: কুফু অর্থ সমকক্ষ, অনুরূপ। অর্থাৎ আল্লাহর অনুরূপ অন্য কেউ নেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা ইখলাসের মধ্যে বলেছেন, ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ "এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই"।

وَلَا نِدَّ لَهُ তার কোন শরীকও নেই: الند অর্থ হচ্ছে সদৃশ, অনুরূপ, সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ, শরীক ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারার ২২নং আয়াতে বলেন, ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ "কাজেই জেনে-বুঝে তোমরা অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ো না"।

وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ আল্লাহ তা'আলাকে তার সৃষ্টির উপর কিয়াস করা যাবে না: কিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে তুলনা করা, সদৃশ তৈরি করা ইত্যাদি। অর্থাৎ সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তুলনা করা যাবে না এবং মাখলুকের সাথে তাকে সাদৃশ্যও করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহালের ৭৪ নং আয়াতে বলেন: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ﴾

"কাজেই তোমরা আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না।[২০]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা), তার অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং তার কর্মকে মাখলুকের সত্তা, নাম ও গুণাবলী এবং তাদের কাজ-কর্মের সাথে

---

২০. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, السمي والكفء والند এই তিনটি শব্দের অর্থ পরস্পর পাশাপাশি। মূলতঃ এই তিনটি শব্দই সমার্থবোধক।

তুলনা করা যাবে না। সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ এবং মহান সৃষ্টিকর্তাকে কিভাবে ত্রুটিপূর্ণ মাখলুকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের অনুরূপ হওয়ার অনেক উর্ধ্বে।

فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَتَعَالَى তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত: পূর্বে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব এবং তাকে যে কোন মাখলুকের সাথে তুলনা করা যাবে না। তার কারণ হিসাবে শাইখুল ইসলাম উপরোক্ত কথা বলেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, তাই যেসব ছিফাত তিনি তার নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব ছিফাত তার প্রভুর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তা সাব্যস্ত করা আমাদের উপর আবশ্যক। কেননা মানুষেরা তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও বেষ্টন করতে অক্ষম। তিনি এমন ছিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত, যে পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি পৌঁছতে পারে না। সুতরাং তিনি নিজের জন্য যেসব ছিফাত সাব্যস্ত করে সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাদেরও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক। তার জন্য যা শোভনীয়, সে সম্পর্কে তিনিই অধিক অবগত আছেন, আমরা তা অবগত নই।

وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ আল্লাহ তা'আলার কালাম সর্বাধিক সত্য এবং তার কথা সৃষ্টির কথার চেয়ে অধিক সুন্দর: তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন, তা বাস্তব ও সত্য। আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কথাকে সত্যায়ন করা এবং তার বিরোধীতা না করা। তিনি কুরআন মাজীদে যেসব শব্দ নাযিল করেছেন, তা সর্বোত্তম, সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট।[২১] তার জন্য যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী শোভনীয়, তা তিনি নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন এবং সুস্পষ্ট ও পূর্ণরূপে তা বর্ণনা করেছেন। আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সেসব নাম ও গুণাবলীর স্বীকৃতি প্রদান করা এবং তা কবুল করে নেওয়া।

---

২১. আল্লাহর কালাম সর্বোত্তম, সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট, এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে, মাখলুকের কালাম বা কথার তুলনায় আল্লাহর কালাম উত্তম। কারণ আল্লাহর কালাম এত উত্তম, সত্য এবং সুস্পষ্ট, যার সাথে মাখলুকের কোন কথার তুলনাই চলে না। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর কালামই একমাত্র নির্ভুল, সত্য ও সুস্পষ্ট।

الإيمان بصدق جميع الرسل

রসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলার রসূলগণ সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসাবে সমর্থিত। তারা ঐসব লোকদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলামের এই কথাটি তার পূর্বোক্ত উক্তি: তিনি তার নিজের সম্পর্কে এবং অন্যদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, এর সাথে সংযুক্ত। صدق (সিদ্ক) সত্য খবর সেই খবরকে বলা হয়, যা বাস্তবের হুবহু অনুরূপ হয়। অর্থাৎ রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী এবং অন্যান্য বিষয়ে যেসব খবর দিয়েছেন, তাতে তারা সত্যবাদী।

ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে যে খবর এসেছে, তাতে তারা সত্যায়িত। কেননা তা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে কোনো কথা বলেন না।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার রসূলদের কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে, শাইখুল ইসলাম উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তার সনদকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা রসূলদের জন্য যা বলেছেন, তা সত্য। আর রসূলগণ সেই সত্যকে সৃষ্টির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর যেসব ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তা কবুল করে নেয়া আবশ্যক।

রসূলদের কথা ঐসব লোকদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত, যারা আল্লাহ সম্পর্কে না জেনেই কথা বলে। যারা আল্লাহর শরী'আত, দীন, তার নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে বিনা ইলমে কথা বলে, তাদের কথা রসূলদের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। শুধু তাই নয়; বরং তারা কেবল ধারণা ও কল্পনার বশবর্তী হয়েই আল্লাহ সম্পর্কে কথা বলে অথবা কেবল তাই বলে, যা তারা শয়তান থেকে সংগ্রহ করে। যেমন বলে থাকে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার, বিদ'আতী এবং যিন্দীক (অন্তরে কুফরী লুকায়িত রেখে মুখে

ইসলাম প্রকাশকারী), যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী, স্বার্থান্বেষী ও নিকৃষ্ট আলেমরা। আল্লাহ তা'আলা সূরা শু'আরায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾

"হে লোকেরা! আমি কি তোমাদের জানাবো শয়তানরা কার উপর অবতীর্ণ হয়? তারা প্রত্যেক মিথ্যুক বদকারের উপর অবতীর্ণ হয়। তারা আকাশ থেকে চুরি করে শোনা কথা কানে ঢুকিয়ে দেয় এবং তাদের বেশির ভাগ লোকই মিথ্যুক" *(সূরা শু'আরা ২৬:২২১-২২৩)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারায় আরো বলেন:

﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ﴾

"কাজেই তাদের জন্য ধ্বংস অবধারিত, যারা স্বহস্তে কিতাব লিখে তারপর লোকদের বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে *(সূরা আল-বাকারা ২:৭৯)*।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তার নিজের সম্পর্কে এবং সৃষ্টি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত, তার কালাম যেহেতু সর্বাধিক সত্য, তার কথা যেহেতু সৃষ্টির কথার চেয়ে অধিক উত্তম, রসূলগণ তার সম্পর্কে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, সেসব সংবাদের প্রত্যেকটিতেই যেহেতু তারা সত্যবাদী এবং রসূলদের ও আল্লাহর মাঝে যেই واسطة (মাধ্যম) রয়েছে এবং যে মাধ্যমে রসূলদের কাছে আল্লাহর নিকট থেকে অহী আসে, তা যেহেতু একটি সত্য ও নির্ভুল মাধ্যম, সেটি যেহেতু সম্মানিত ফেরেশতাদের মাধ্যম, তাই আল্লাহ যা বলেছেন এবং তার রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব সংবাদ দিয়েছেন, তার উপর নির্ভর করা ও তা বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিশেষ করে আল্লাহর আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা সাব্যস্ত করতে হবে এবং যা নিজের সত্তা হতে সরিয়ে রেখেছেন ও দূর করে দিয়েছেন, তা সরিয়ে ফেলতে হবে। সেই সাথে বিদ'আতী লোকেরা রূপক অর্থের দোহাই দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর যেসব আসমা ওয়াস ছিফাতকে অস্বীকার করেছে, তাদের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। রসূলগণ আল্লাহর আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ হতে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছেন, বিদ'আতীরা তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সেগুলোকে অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করেছে কিংবা এমন লোকদের অন্ধ অনুসরণ করেছে, যারা গোমরাহীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে আদর্শ ও অনুসরণীয় হওয়ার অযোগ্য।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَلِهَذَا قَالَ الله تعالى ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ؛ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ

এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: " কাফির-মুশরিকরা তোমার রব সম্পর্কে যেসব কথা তৈরি করেছে তা থেকে তোমার রব পবিত্র, তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। আর সালাম আল্লাহর রসূলদের প্রতি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যই" *(সূরা সাফফাত:১৮০-১৮২)।*

সুতরাং নাবী-রসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যেসব অশোভনীয় কথা বলেছে, তা থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সেই সাথে রসূলদের উপরও তিনি সালাম পেশ করেছেন। কারণ তারা আল্লাহর যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলামের কথা: لهذا (এই কারণেই....) -এতে তিনি তার পূর্বের কথার কারণ বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সেখানে বলেছেন আল্লাহর কালাম এবং রসূলদের কথা সর্বাধিক সত্য ও সর্বোত্তম।

সুবহান: سبحان শব্দটি غفران শব্দের ন্যায় একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)। বাবে তাফ-ঈলের মাসদার التسبيح থেকে এটিকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সকল দোষ-ত্রুটি হতে আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

তোমার রব: ربك যিনি রহমত ও নিয়ামত দ্বারা তার সৃষ্টিকে প্রতিপালন করেন এবং যিনি সৃষ্টির একমাত্র মালিক ও প্রভু, তিনিই হলেন রব।

রাব্বুল ইয্যাত: رب العزة রাব্বুল ইয্যাত অর্থ হচ্ছে ক্ষমতাবান, মর্যাদাবান এবং প্রতাপশালী। এখানে মাওসুফকে (রবকে) ছিফাতের দিকে ইযাফত (সম্বোধিত) করা হয়েছে। মূল বাক্যটি এ রকম ছিল: الرب العزيز প্রবল ক্ষমতাধর প্রভু।

يَصِفُونَ তারা আল্লাহর সাথে যেসব ওয়াস্ফ (দোষ) যুক্ত করে: অর্থাৎ নাবী-রসূলদের বিরোধীরা আল্লাহর সাথে এমনসব দোষ-ত্রুটি যুক্ত করে, যা তার বড়ত্বের জন্য অশোভনীয়।

وَسَلَامٌ সালাম: কেউ কেউ বলেছেন سلام (সালাম) শব্দটি السلام থেকে নেওয়া হয়েছে, যা ইসলামের সম্ভাষণ অর্থে ব্যবহৃত। আবার কেউ বলেছেন سلام শব্দটি সালামত তথা السلامة من النقص والعيب থেকে নেওয়া হয়েছে, যা অপছন্দনীয় বস্তু ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

على المرسلين রসূলগণের উপর: তারাই রসূল, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকট প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের রবের রিসালাত সৃষ্টির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছে। المرسلون শব্দটি مرسل এর বহুবচন। নাবী ও রসূলের সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করার সময় উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

الْعَالَمِينَ সৃষ্টিজগৎ: عالم এর বহুবচন হচ্ছে الْعَالَمِينَ। আল্লাহ ছাড়া বাকী সবই সৃষ্টিজগতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। **উপরের আয়াত তিনটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:** শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার উক্তি: فسبح بنفسه..الخ দ্বারা আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন। **উপরোক্ত আয়াতসমূহে যেসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:**

(১) গোমরাহ ও অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য অশোভনীয় যেসব দোষ-ত্রুটি যুক্ত করে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করা।

(২) উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা রসূলদের সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহর পক্ষ হতে তারা যা নিয়ে এসেছে এবং আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তারা যে সংবাদ দিয়েছে, তা কবুল করে নেওয়া আবশ্যক।

(৩) রসূলদের উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পেশ করা এবং তাদেরকে সম্মান করা ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত।

(৪) রসূলগণ আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তার বিরোধী প্রত্যেক বিষয় প্রত্যাখ্যান করা ওয়াজিব। বিশেষ করে আল্লাহর আসমা ওয়াস ছিফাতের ব্যাপারে রসূলগণ যে সংবাদ দিয়েছেন, তার বিরোধী হয় এমন প্রত্যেক কথার প্রতিবাদ করা জরুরী।

(৫) আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করা এবং তার নেয়ামাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ নিয়ামত।

الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات

আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ গুণাবলী ও বড়ত্বের বৈশিষ্ট্য এবং নিজেকে যে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন তার বর্ণনা

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি নিজেকে যে সুন্দর নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজের সত্তার জন্য ছিফাতে কামালিয়া সাব্যস্ত করেছেন এবং নিজেকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত করেছেন। সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্ ছিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যে সংবাদ নিয়ে এসেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না। কেননা সেটিই হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাকীম।

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তার জন্য আসমা ও ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে কুরআনের মধ্যে যেই মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ এখানে তাই বর্ণনা করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তথা আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে মুমিনদেরও উক্ত মূলনীতির উপর চলা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সকল নাম ও গুণের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। অর্থাৎ একদিকে যেমন তিনি নিজের জন্য আসমা এবং ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন, অন্যদিকে নিজের পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ত্রুটিকে নাফী করেছেন।

এ ক্ষেত্রে নাকোচ অর্থ হচ্ছে, যেসব দোষ-ত্রুটি আল্লাহ তা'আলার কামালিয়াতের পরিপন্থী, তার সত্তা হতে সেগুলো সরিয়ে ফেলা ও দূর করে দেয়া। যেমন তার পবিত্র সত্তার জন্য সমকক্ষ, শরীক, তন্দ্রা-নিদ্রা, মৃত্যু এবং ক্লান্তি ইত্যাদির ধারণা হওয়াকে নাফী করেছেন। আর ইছবাত হচ্ছে, ছিফাতে কামালিয়া তথা সুউচ্চ গুণাবলী এবং বড়ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা। যেমন সূরা আল হাশরের ২৩-২৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি مَلِك (মালিক), قُدُّوس (অতি পবিত্র) سَلَام (পরিপূর্ণ শান্তিদাতা) مؤْمِن (নিরাপত্তা দানকারী), مُهَيْمِن (রক্ষক), عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী), جَبَّار (প্রতাপশালী) এবং مُتَكَبِّر (অতী মহিমান্বিত)। তারা যাকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, خَالِق (সৃষ্টিকারী), بَارِي (উদ্ভাবক) এবং مُصَوِّر (রূপদাতা), তার জন্য রয়েছে অনেক সুন্দরতম নাম। আর তিনিই عَزِيز (মহাপরাক্রমশালী) ও حَكِيم (প্রজ্ঞাবান)" *(সূরা আল হাশর ৫৯:২৩-২৪)*। আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর বিষয়ে এমনি আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যার বেশ কিছু নমুনা সম্মানিত শাইখ সামনে উল্লেখ করবেন।

فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ "সুতরাং রসূলগণ আল্লাহর আসমা ওয়াস্ ছিফাত ও অন্যান্য বিষয়ে যেই সংবাদ নিয়ে এসেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা থেকে সরে যায় না": তারা তা থেকে সরে অন্যদিকে ঝুঁকে পড়ে না এবং তারা তা থেকে বিচ্যুতও হয় না; বরং রসূলদের অনুসরণ করে এবং তাদের নীতির উপরই চলে। আল্লাহ তা'আলার জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা এবং সমস্ত মন্দ ও অশোভনীয় বৈশিষ্ট্য থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করাও রসূলদের আনীত দীনের মধ্যে গণ্য। রসূলগণ উপরোক্ত মহান মূলনীতিটি অর্থাৎ ছিফাতে কামালীয়াগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা এবং অশোভনীয় স্বভাব থেকে আল্লাহকে পবিত্র করার মূলনীতিটি সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু রসূলদের শত্রুরা সেই মূলনীতি থেকে সরে পড়েছে।

فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ কেননা সেটিই হচ্ছে সীরাতে মুস্তাকীম: আসমা এবং ছিফাতের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী-রসূলদের পথ থেকে সরে না যাওয়ার কারণ হলো এ ক্ষেত্রে নাবী-রসূলদের পথই হচ্ছে সীরাতুল মুস্তাকীম।

সীরাতুল মুস্তাকীম বলা হয় ঐ সোজা পথকে, যাতে কোন ভিন্নতা ও দলাদলি নেই। সূরা আল ফাতিহায় এই সীরাতুল মুস্তাকীমের কথাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ

করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اهْـدِنَا الصِّـرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ "হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সোজা পথ দেখাও" *(সূরা আল ফাতিহা ১:৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾

"এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ করো। অন্যান্য পথে গমন করো না। কারণ সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেবে *(সূরা আল আন'আম ৬:১৫৩)*।

আমরা ছ্বলাতের প্রত্যেক রাক'আতে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করি, তিনি যেন আমাদেরকে এই সরল ও সোজা পথে পরিচালিত করেন।

ما جاء به المرسلون في الاعتقاد وغيره وسلكه أهل السنة هو صراط الله المستقيم

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হচ্ছে রসূলগণ আক্বীদাহ ও অন্যান্য বিষয়ে যা নিয়ে এসেছেন তাই আল্লাহর সঠিক পথ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

"ঐ সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নাবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ"।

.....

ব্যাখ্যা: আক্বীদাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে নাবী-রসূলগণ আল্লাহর পক্ষ হতে যা নিয়ে এসেছে এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যে পথে চলেছে, তাই হচ্ছে ছিরাতুল মুস্তাকীম। এটিই হচ্ছে সেই সব লোকের পথ, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তিনি তাদেরকে সর্বপ্রকার নিয়ামত পূর্ণরূপে দান করেছেন, যা তাদেরকে চিরকাল সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে রাখবে। এই নিয়ামাতপ্রাপ্ত লোকেরাই ঐ সব লোক, যাদের পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার কাছে দু'আ করার আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং এই চার প্রকার লোকেরাই আল্লাহর সর্বপ্রকার ও পূর্ণ নিয়ামত পেয়ে ধন্য হবে। তারা হলো:

এক. النبيون নাবীগণ: النبي এর বহুবচন হচ্ছে النبيون। তারা হলো ঐসব মহাপুরুষ, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নবুওয়াত ও রিসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। নাবী ও রসূলের সংজ্ঞা এবং উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

দুই. الصديقون সত্যবাদীগণ: الصديق এর বহুবচন الصديقون। যে ব্যক্তি সত্য বলায় এবং সত্যকে সত্যায়ন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তাকে সিদ্দীক বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য পূর্ণ মুখলিছ (নিবেদিত ও নিষ্ঠাবান) হওয়ার সাথে সাথে যে ব্যক্তি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ অনুসরণ করে, সেই সিদ্দীক।

তিন. وَالشُّهَدَاءِ শহীদগণ: شهيد এর বহুবচন الشُّهَدَاءِ। আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে ব্যক্তি নিহত হয়, তাকে শহীদ বলা হয়। শহীদ শব্দটি شهادة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য দেয়া,

উপস্থিত হওয়া। শহীদকে শহীদ বলার কারণ হলো, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে এবং রহমতের ফেরেশতাগণ তার সাথে উপস্থিত থাকেন।

চার. الصَّالِحِينَ সৎকর্মশীলগণ: صالح এর বহুবচন الصالحون। সালেহ (সৎকর্মশীল) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহর হকসমূহ এবং আল্লাহর সৃষ্টির হকসমূহ আদায় করে।

صـــراط শব্দটিকে কখনো আল্লাহর দিকে ইযাফত (সম্বন্ধিত) করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ "এটিই আমার সঠিক পথ। সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর *(সূরা আনআম ৬:১৫৩)*।

সীরাতকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করার কারণ হলো, আল্লাহই এই পথকে মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তাকে তাদের জন্য ঠিক করেছেন। আর মানুষ যেহেতু সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলে, তাই সীরাতকে মানুষের দিকেও ইযাফত করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ "আমাদেরকে ঐসব লোকের পথ দেখাও, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো"*(সূরা আল ফাতিহা ১:৭)*।

যারা এ পথে চলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে তাদের ফযীলত ও সম্মানের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। আরো জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা হলো ঐ সব লোক, যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন। তারা হলেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকগণ *(সূরা আন নিসা ৪:৬৯)*।

এই পথের পথিক যখন জানতে পারবে যে, তাতে রয়েছে নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ, তখন তার অন্তর থেকে সমসাময়িক লোকদের থেকে একাকীত্বের অনুভূতি দূর হয়ে যাবে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এমন কিছু নমুনা ও দলীল উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য আসমা ও ছিফাত সাব্যস্ত করে। বিভিন্ন অধ্যায় ও শিরোনামে তিনি সেই দলীলগুলো বর্ণনা করেছেন।

الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم

কুরআনুল কারীম থেকে আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করার প্রমাণ ভিত্তিক পদ্ধতি

١ –الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى

১। একই সাথে নেতিবাচক ও ইতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি নাকোচ করা এবং তার পবিত্র সত্তার জন্য পূর্ণতার গুণাবলী সাব্যস্ত করা

ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে সূরা ইখলাসের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

قَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ حَيْثُ يَقُولُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

না বোধক ও হ্যাঁ বাচক বক্তব্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সমস্ত সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান সূরা ইখলাসে বর্ণিত গুণাবলী অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"বলো: তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই" *(সূরা আল ইখলাস ১১২: ১-৪)।*

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম পূর্বোক্ত বাক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেই বাক্যটি হচ্ছে, وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনি নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন, তাতে তিনি নাফী এবং ইছবাতকে একত্রিত করেছেন। আর এখানে তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তার উপর দলীল পেশ করা শুরু করেছেন। সূরা ইখলাসের অনেক ফযীলত থাকার কারণে তিনি সর্বপ্রথম এই সূরাকেই উল্লেখ করেছেন। এই সূরাকে সূরা ইখলাস হিসাবে নামকরণ করার কারণ

হলো এটিকে আল্লাহর ছিফাতের জন্য খালেস (বাছাই ও নির্দিষ্ট) করা হয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করে, সূরা ইখলাস তাকে শির্ক থেকে মুক্ত করে। তাই ইখলাস অর্থ মুক্ত করা।

الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান: সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। কারণ কুরআনে যেসব ইলমের সমাহার ঘটেছে, তা মূলতঃ তিন প্রকার:

(১) তাওহীদের জ্ঞান
(২) অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলি ও ভবিষ্যতের খবরাদি এবং
(৩) হালাল-হারামসহ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম।

সূরা ইখলাসের মধ্যে শুধু আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের বর্ণনা রয়েছে। তাই এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। তার দলীল হলো যেমন ছ্বহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ»

"এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে (قل هو الله أحد) তথা সূরা ইখলাস বার বার পাঠ করতে শুনল। সকাল হলে সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বিষয়টি জানালো। লোকটি শুধু সূরা ইখলাস পাঠকে খুব অল্প মনে করছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই ইহা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান"।[২২]

---

২২ . ছ্বহীহ বুখারী ৫০১৩, আবূ দাউদ ১৪৬১। ছ্বহীহ বুখারী ৫০১৩, আবূ দাউদ ১৪৬১। ছ্বহীহ বুখারীতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক আনসারী ছাহাবী মসজিদে কুবায় ইমামতি করতেন। যখনই তিনি সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা দিয়ে কিরাত আরম্ভ করতেন তখন প্রথমে সূরা ইখলাস পড়ে নিতেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। আর এরূপ তিনি প্রতি রাকা'আতেই করতেন। মুসল্লীগণ তাকে বললেন, আপনি প্রথমে এই সূরা দিয়ে কিরাত শুরু করছেন তারপর তা যথেষ্ট নয় ভেবে অন্য সূরা পাঠ করছেন। আপনি হয় শুধু এই সূরাটি পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে অন্য কোন সূরা পাঠ করুন। তিনি বললেন, আমি তা পরিত্যাগ করতে রাজি নই। তোমরা যদি চাও তাহলে এভাবেই তোমাদের ইমামতি করবো। আর যদি অপছন্দ কর তবে তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিবো। তারা মনে করতেন, তিনি তাদের মাঝে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি এবং অন্য কেউ তাদের ইমামতি করুক এটাও অপছন্দ করতেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাদের নিকট আগমন

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার হাদীছগুলো প্রায় মুতাওয়াতের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। সূরা ইখলাসে মহান আল্লাহ বলেন: قل অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কেননা এটি যদি মুহাম্মাদের বা অন্যের কালাম হতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে قل শব্দটি প্রয়োগ করতেন না।

هُوَ اللهُ أَحَدٌ আল্লাহ একক: অর্থাৎ আল্লাহ এক, তার কোন সমকক্ষ, সহযোগী, সদৃশ এবং শরীক নেই।

اللهُ الصَّمَدُ আল্লাহ অমুখাপেক্ষী: অর্থাৎ আল্লাহ এমন মর্যাদাবান নেতা যিনি স্বীয় নেতৃত্বে, মর্যাদায় এবং মহত্বে পরিপূর্ণ হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই 'ছ্বমাদ'[২৩]

করলেন। তারা ব্যাপারটি তার কাছে পেশ করলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা গ্রহণ করতে কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? আর কেনইবা তুমি উক্ত সূরাটি প্রতি রাক'আতে পাঠ করছ? জবাবে তিনি বললেন, আমি তা খুব ভালোবাসি। তিনি বললেন, "এই ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।"

আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে অপর বর্ণনায় এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তার ছাহাবীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একরাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারে? ছাহাবীদের কাছে বিষয়টি খুব কঠিন মনে হলো। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে কার এমন সাধ্য আছে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূরা ইখলাস, যাতে রয়েছে আল্লাহ এক অদ্বিতীয় এবং অমুখাপেক্ষী- কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান

২৩. ছ্বমাদ শব্দের আরো অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, যার পেট নেই তাকে ছ্বমাদ বলা হয়। সুতরাং যার পেট নেই তার খাদ্য গ্রহণ বা দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর প্রতি কোন প্রয়োজন নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন الله الصمد এর ব্যাখ্যা হচ্ছে পরবর্তী আয়াত, الذي لم يلد و لم يولد। কুরআন দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করাই কুরআনের ব্যাখ্যা করার সর্বাধিক বিশুদ্ধ পদ্ধতি। ছ্বমাদ শব্দের ব্যাখ্যায় আরো যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে, ১) এমন জমাট জিনিস, যার পেট নেই। ২) যে লক্ষ্যের দিকে যেতে মনস্থ করা হয়; যে সবল জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। ৩) এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়। ৪) উঁচু ইমারত। ৫) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন, ছ্বমাদ হচ্ছেন এমন এক সত্তা যার উপরে আর কেউ নেই। ৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন, তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যার নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনিই হচ্ছেন ছ্বমাদ। ৭) যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতার অধিকারী, তিনিই ছ্বমাদ। ৮) আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, যিনি কারো উপর নির্ভরশীল নন, সবাই যার উপর নির্ভরশীল, তিনিই ছ্বমাদ। ৯) যার মধ্য থেকে কোনো জিনিস

নামের মধ্যে সমস্ত ছিফাতে কামালীয়া তথা পূর্ণতার গুণাবলী বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেছেন, ছ্বমাদ বলা হয় এমন সত্তাকে যার প্রতি সমস্ত মাখলুকের প্রয়োজন হয় এবং তারা সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনে তার দিকেই ধাবিত হয় ও তাকেই উদ্দেশ্য করে।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি: অর্থাৎ তার কোন সন্তান নেই, পিতাও নেই। এতে ইয়াহূদী, নাসারা এবং আরবের ঐসব মুশরিকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর জন্য সন্তান নির্ধারণ করত। (ইয়াহূদীরা উযাইরকে এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে। আর আরবের মুশরিকরা বলত: ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ আর তার সমতুল্য কেউ নেই: অর্থাৎ তার সমান, সদৃশ ও সমকক্ষ কেউ নেই। মোটকথা, সূরা ইখলাস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তা আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের (গুণাবলীর) ক্ষেত্রে নাকোচ ও ইছবাতকে (সাব্যস্তকরণ) একত্রিত করেছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ "আল্লাহ্ একক। তিনি অমুখাপেক্ষী"-এতে রয়েছে ইছবাত। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী: তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"এতে রয়েছে নাকোচ করা।

কোনো দিন বের হয়নি এবং যে পানাহার করে না, সে-ই ছ্বমাদ। ১০) সুদ্দী বলেছেন, আকাংখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই ছ্বমাদ বলা হয়। ১১) সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেছেন, যিনি নিজের সকল গুণ ও কাজে পূর্ণতার অধিকারী হন, তিনিই ছ্বমাদ। ১২) রাবী ইবনে আনাস বলেছেন, যার উপর কখনো বিপদ-আপদ আসে না, তিনিই সামাদ। ১৩) মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন: যিনি সকল প্রকার দোষ ত্রুটি মুক্ত। ১৪) ইবনে কাইসান বলেছেন, অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না, তিনিই ছ্বমাদ। ১৫) হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন, যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই, তিনিই ছ্বমাদ। ১৬) ইবরাহীম নাখয়ী বলেছেন, যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে যায়, তিনিই ছ্বমাদ। ১৭) আবু বকর আমবারী বলেছেন, সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার উপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য যার শরণাপন্ন হয়, তিনিই হচ্ছেন ছ্বমাদ। ১৮) যার উপর এসে নেতৃত্ব খতম হয়ে গেছে এবং নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন্ন হয়, তাকেই বলা হয় ছ্বমাদ। (আল্লাহই অধিক অবগত)

ما وصف الله به نفسه في آية الكرسي
আল্লাহ তা'আলা নিজেকে আয়াতুল কুরসির মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াতে নিজেকে যেই সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই। এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন। তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়। আর তিনি সমুন্নত, মহান"। *(সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫)* যে ব্যক্তি রাতে ইহা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে।

.....

ব্যাখ্যা: وَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي أَعْظَمِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আয়াতে নিজেকে সুমহান গুণে গুণান্বিত করেছেন:

অর্থাৎ পূর্বোক্ত বাক্যে নাকোচ ও ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অতিক্রান্ত হয়েছে। কুরআনের সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আয়াত তথা আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত সত্তাকে যেসব সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাও নাকোচ ও ইছবাতের মাধ্যমেই করেছেন। অর্থাৎ তাতে যেমন আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য সুউচ্চ ও সমুন্নত গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন, ঠিক তেমনি তার পবিত্র সত্তা হতে সকল প্রকার মানবীয় দোষ-ত্রুটি দূরীভূত করেছেন।

الأيــة -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে চিহ্ন, নিদর্শন ইত্যাদি। কুরআনের একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত এমন বাক্যকে আয়াত বলা হয়, যাকে একটি فاصلة (বিরামচিহ্ন) এর মাধ্যমে পূর্বাপর বাক্য থেকে আলাদা করা হয়। তবে এখানে যে আয়াতটির কথা চলছে, তাকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। কারণ এতে কুরসীর উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতুল কুরসী কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার বিষয়টি ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ছ্বহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أُبَيٍّ بن كعب ــ رضي الله عنه ــ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: "أَيُّ آيَــةٍ فِــي كِتَابِ اللهِ أَعْظَمُ؟ " قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَرَدَّدَهَا مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ أُبَيٌّ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ، فقــال النبي ــ صلى الله عليه وسلم: لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ

একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করলেন: কুরআনে সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি? জবাবে উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহ এবং তার রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। উবাই কয়েকবার কথাটি পুনরাবৃত্তি করার পর বললেন: তা হলো আয়াতুল কুরসী। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার জন্য দু'আ করে বললেন: হে আবুল মুনযির! তোমার জন্য এ ইলম সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হোক![২৪]

---

২৪. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২১২৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম ৮১০, আবূ দাউদ ১৪৬০। আয়াতুল কুরসীর ফযীলতে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে ছ্বহীহ বুখারীর এই হাদীছটিও অন্যতম। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে রমাদ্বানের যাকাত পাহারা দেয়ার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। এক আগন্তুক আমার নিকট এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি অভাবগ্রস্ত, আমার উপর পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত এবং আমার প্রয়োজন খুবই তীব্র। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কি? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তীব্র অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার কারণে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা "সে আবার আসবে" এ থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। আমি তার অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। দ্বিতীয় দিনও সে এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে আবার গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি

মর্যাদার দিক দিয়ে আয়াতুল কুরসী কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত হওয়ার কারণ হলো তাতে এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নাম ও সুমহান গুণাবলীকে সাব্যস্ত করেছে এবং আল্লাহর সত্তাকে এমনসব মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র করেছে, যা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে শোভনীয় নয়।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই:

অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তিনি ব্যতীত যেসব মাবুদের ইবাদত করা হয়, তা একদম বাতিল। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম অতি সুন্দর নাম الحي। (চিরজীবন্ত)। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা এমন চিরবিদ্যমান সত্তা, যার

অভাবগ্রস্ত। আমার উপর পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার ন্যস্ত। আমি আর আসবো না। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কী? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে তীব্র অভাবের ও পরিবারের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করার কারণে তার প্রতি আমার দয়া হল। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তৃতীয়বারও আমি তার আগমণের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে থাকলাম। এবারও সে এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য দ্রব্য তুলে নিতে লাগল। আমি তাকে গ্রেফতার করে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব। এ নিয়ে তিনবার হল। প্রত্যেকবারই তুমি বল যে আর আসবে না। কিন্তু তুমি আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দেব, যদ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন আয়াতুল কুরসী (তথা সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে। (তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেই আসবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দীর খবর কী? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সে বলেছে যে, আমি তোমাকে এমন কতিপয় বাক্য শিক্ষা দিবো যদ্বারা আল্লাহ আমার উপকার সাধন করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটি কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে তখন আয়াতুল কুরসী (তথা সূরা বাকারা ২৫৫ নং আয়াত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত) পাঠ করবে। (তুমি যখন তা পাঠ করবে) তখন থেকে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবেন। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটেই আসবে না। আর ছাহাবীগণ ছিলেন কল্যাণ অর্জনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, সে সত্য বলেছে অথচ সে মিথ্যুক। তুমি কি জান তিন রাত্রি যাবৎ তুমি কার সাথে কথা বলছিলে? আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, সে হলো শয়তান।

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, জান্নাতে যাওয়ার পথে মৃত্যু ব্যতীত তার সামনে অন্য বাধা থাকবে না।

জন্য রয়েছে পূর্ণতম জীবন। আল্লাহ তা'আলার হায়াত যেহেতু পূর্ণাঙ্গ, তাই তার হায়াত কখনো শেষ হবে না।

আল্লাহর আরেকটি নাম الْقَيُّومُ আল কাইয়্যুম (সবকিছুর ধারক)। যিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যকে প্রতিষ্ঠাকারী তিনিই হচ্ছেন আল কাইয়্যুম। সুতরাং কোন মাখলুকের প্রতিই আল্লাহ তা'আলার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ সমস্ত মাখলুকই তার প্রতি মুখাপেক্ষী।

বর্ণিত হয়েছে যে, الْحَيُّ الْقَيُّومُ **তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক:** হচ্ছে ইসমে আযম, যা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সেই দু'আ কবুল করেন এবং এর উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তা দান করেন। الْحَيُّ الْقَيُّومُ ইসমে আযম হওয়ার কারণ হলো 'আলহাই' নামটি আল্লাহর ছিফাতে যাতীয়া (সত্তা) এর উপর প্রমাণ বহন করে। তথা এটি আল্লাহর ঐ সব ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত যা, কখনোই আল্লাহর পবিত্র সত্তা হতে আলাদা হয় না। আর 'আলকাইয়্যুম' নামটি আল্লাহর ছিফাতে ফেলিয়া অর্থাৎ তার কর্ম সম্পর্কীয় ছিফাত থাকার প্রমাণ করে। সুতরাং আল্লাহর সকল ছিফাতের মূলভীত্তি হচ্ছে এই দুইটি সম্মানিত ও মহান নাম।[২৫]

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ **তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না:** তিনিই যেহেতু সকল সৃষ্টির সার্বক্ষণিক ধারক ও বাহক, তাই তন্দ্রা ও নিদ্রা তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। হালকা ঘুমকে 'সিনাহ' বলা হয়। এটি শুধু চোখের মধ্যেই হয়।

---

২৫. الحي والقيوم আল্লাহ তা'আলার এই পবিত্র নাম দু'টিতে আল্লাহর দু'টি সুমহান ছিফাত রয়েছে। একটি হচ্ছে হায়াত তথা আল্লাহর জীবন। আল্লাহর হায়াত হচ্ছে এমন পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত হায়াত, যাতে কোনো প্রকার ত্রুটি নেই। আল্লাহর হায়াতের সাথে সৃষ্টির হায়াতের কোন তুলনাই হতে পারে না। সৃষ্টির হায়াতের শুরু রয়েছে এবং তার পরিসমাপ্তিও রয়েছে। রোগ-ব্যাধি, তন্দ্রা-নিদ্রা ইত্যাদির কারণে মাখলুকের জীবিত থাকার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি চলে আসে। মৃত্যুর মাধ্যমে সৃষ্টির দুনিয়ার হায়াত শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর হায়াতের কোন শুরু নেই, শেষও নেই। তার হায়াত ও জীবন এত চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ যে, তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শই করতে পারে না।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর বিষয়ে এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা ও বুঝা আবশ্যক যে, হায়াত হচ্ছে আল্লাহর এমন একটি ছিফাত-গুণ, যার উপর বাকী ছিফাতগুলো ভিত্তিশীল। এটি হচ্ছে আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত। তা কখনো আল্লাহর যাত থেকে আলাদা হয় না। আল্লাহর এই হায়াত বিশেষণ ছাড়া তার বাকী ছিফাতগুলো অকল্পনীয়।

আর আল্লাহর কাইয়্যুমিয়াত তথা সবকিছুকে ধারণ ও সংরক্ষণ করা তার এমন একটি বিশেষণ, যার উপর আল্লাহর বাকীসব কর্মগত ছিফাতের ভিত্তি। আল্লাহর এই ছিফাতের ফলেই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সকল সৃষ্টি টিকে আছে।

আর ঘুম তন্দ্রা থেকে অধিক গভীর ও শক্তিশালী হয়। ঘুম মৃত্যুর ছোট ভাই। এই প্রকার ঘুম অন্তরে হয়।

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই: অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তাদের সকলের স্রষ্টা একমাত্র তিনি, এগুলোর মালিকানাও একমাত্র তার এবং সকলেই তার অনুগত। সুতরাং তিনি উর্ধ্ব জগৎ এবং নিম্ন জগতের সবকিছুরই মালিক।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করবে? অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে তার নিকট সুপারিশ করার মতো কেউ নেই।

الشفاعة শব্দটি الشفع (যুক্ত করা) থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি الوتر (বেজোড়)এর বিপরীত। শাফাআ'তকারী যেহেতু স্বীয় প্রার্থনার সাথে অন্যের জন্য প্রার্থনা করাকেও যুক্ত করে নেয়, তাই সুপারিশকারীকে الشافع (সুপারিশকারী) বলা হয়। তাই যার জন্য সুপারিশ করা হয়, সেই লোক প্রথমে বেজোড় (একা) থাকার পর সুপারিশকারী তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিয়ে জোড়ে পরিণত করে।

আর পারিভাষিক অর্থে শাফাআ'ত অর্থ হচ্ছে **سؤال الخير للغير** অন্যের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করা। অর্থাৎ মুমিন ব্যক্তি তার রবের কাছে অন্যান্য মুমিনের জন্য এই দু'আ করবে যে, তিনি যেন তাদের গুনাহ ও অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন। তবে শাফাআ'তের বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর মালিকানাধীন।

إِلَّا بِإِذْنِهِ আল্লাহর অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত শাফাআ'ত হবে না। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার কারণেই অনুমতি ছাড়া কেউ তার নিকট ক্বিয়ামতের দিন অন্য কারো জন্য সুপারিশ নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত ও ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে পরিবেষ্টন করে আছে। অতীত ও ভবিষ্যতের কোন জিনিসই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন:

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণ তার ইলম থেকে কিছুই জানতে পারে না। তবে তারা শুধু সেটুকুই জানতে পারে, যা তিনি রসূলদের মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়েছেন।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ তার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে:[২৬] আল্লাহর কুরসী সত্য, আর তাতে আল্লাহর মর্যাদা ও মহানত্বের পরিপূর্ণতা সাব্যস্ত হয়। আর এ কারণে সকল সৃষ্টিই তুচ্ছ।

وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়: আসমান-যমীনসহ উর্ধ্বজগৎ ও নিম্ন জগতের সবকিছু সংরক্ষণ করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন ও ভারী অনুভব হয় না। কেননা তার শক্তি ও ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত।

وَهُوَ الْعَلِيُّ আর তিনি সর্বোচ্চ: অর্থাৎ সকল দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টির উপরে হওয়া সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত। আল্লাহর যাত সুউচ্চ। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টির উপরে।

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى আরশে সমুন্নত *(সূরা ত্বহা ২০:৫)*। তিনি আরশেরও উপরে। আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্ব সর্বোচ্চ। সুতরাং তার জন্য রয়েছে পরিপূর্ণ ছিফাতসমূহ এবং সুমহান গুণাবলী। আল্লাহ তা'আলার শক্তি এবং ক্ষমতাও সর্বোচ্চ। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান, সকল সৃষ্টির পরিচালক এবং কোন কিছুই তার জন্য অসম্ভব নয়।

---

২৬ . আল্লাহর কুরসী সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। কেউ বলেছে- তা হচ্ছে আল্লাহর আরশ। অর্থাৎ আরশ ও কুরসী একই জিনিস। কেউ বলেছেন- কুরসী আর আরশ এক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ছাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর দু'পা রাখার স্থান। সেটি এমন কুরসী, যার বিশালতা ও প্রশস্ততা সমস্ত আসমান-যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুতরাং কেউ যেন এমন না ভাবে যে, কুরসী দ্বারা এখানে ঐরকম চেয়ার উদ্দেশ্য, যার উপর আমরা বসি। আল্লাহর কুরসীর ব্যাপারে এ রকম ধারণা করা ঠিক নয়। আল্লাহর কুরসী রয়েছে, এই কথা থেকে এমন ধারণা করা যাবে না যে, তিনি চেয়ারে বসে আছেন। নাউযুবিল্লাহ। কুরসীর যে বিবরণ কুরআন ও সুন্নাহয় এসেছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। আরশের সাধারণ অর্থ রাজা-বাদশাহর সিংহাসন। কিন্তু আল্লাহর আরশ আল্লাহর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি এবং তা সকল সৃষ্টির ছাদ। আরশের ব্যাপারেও এমন ধারণা ঠিক নয় যে, রাজা-বাদশাহগণ যেভাবে সিংহাসনে বসেন, আল্লাহ তা'আলাও সেভাবে সিংহাসনে বসে আছেন। কুরআনের কিছু কিছু বাংলা অনুবাদে আল্লাহ আরশে সমাসীন বলে যে অনুবাদ করা হয়েছে, তা ভুল। الرحمن على العرش استوى এই আয়াতের অনুবাদ কোন কোন অনুবাদ গ্রন্থে এভাবে করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন। এই অনুবাদ সঠিক নয়। সঠিক অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত।

الْعَظِيمُ। (সুমহান) হচ্ছেন এমন সত্তা, যার মধ্যে বড়ত্বের সকল ছিফাতই বিদ্যমান। সুতরাং নাবী, ফেরেশতা এবং মুমিন বান্দাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ সম্মান।

সুতরাং আয়াতুল কুরসীর মধ্যে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার এতগুলো গুণ বিদ্যমান, তাই এটি কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাবান আয়াত হওয়ার দাবী রাখে এবং এটি তার পাঠকারীকে সকল প্রকার অকল্যাণ ও শয়তান থেকে হেফাজতকারী হিসাবে পরিগণিত হওয়ারও হকদার। আয়াতুল কুরসী থেকে এই দলীল পাওয়া গেল, আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং নিজেকে যেসব নামে নামকরণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে তিনি আয়াতুল কুরসীতে শির্কের নেতিবাচক বক্তব্য এবং তাওহীদের ইতিবাচক বক্তব্য একত্রিত করেছেন। আয়াতুল কুরসী আল্লাহর জন্য একদিকে যেমন সুমহান, সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করেছে, অন্যদিকে তার পবিত্র সত্তা হতে সকল দোষ-ত্রুটি এবং অশোভনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে দূর করে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ। "তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই" এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য ইবাদত অস্বীকার করা হয়েছে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: الْحَيُّ الْقَيُّومُ। "তিনি চিরজীবন্ত ও সবকিছুর ধারক" এতে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর জন্য রয়েছে হায়াত (পূর্ণ জীবন), অবিনশ্বরতা এবং সবকিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ও ধারণ করার গুণাবলী।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ "তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করতে পারে না"। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে তন্দ্রা ও নিদ্রাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তারই"। এতে উর্ধ্ব জগতের এবং নিম্ন জগতের পূর্ণ মালিকানা কেবল আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে পারে?"। আল্লাহর জন্য যেহেতু রয়েছে পূর্ণ বড়ত্ব, মর্যাদা এবং তিনি যেহেতু তার সৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী, তাই বিনা অনুমতিতে তার নিকট শাফাআ'ত অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ "তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন"। এতে আল্লাহর জন্য প্রত্যেক বস্তু, ঘটনা এবং বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। চাই তা অতীতের বিষয় হোক কিংবা ভবিষ্যতের।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ "তার জ্ঞান থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে যে জিনিসের জ্ঞান মানুষকে দিতে চান, সেটুকুর কথা ভিন্ন" সমস্ত মাখলুক যে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী এবং কোন সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর যে কোন প্রয়োজন নেই এখানে তা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ "তার কুরসী আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে"। এখানে আল্লাহর জন্য কুরসী এবং পূর্ণ বড়ত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। সেই সাথে আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার তুলনায় সৃষ্টি খুবই ছোট ও নগণ্য।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ "আর আসমান ও যমীনকে ধারণ করা তার জন্য মোটেই কঠিন নয়"। এতে আল্লাহ তা'আলা থেকে অক্ষমতা, অপারগতা এবং ক্লান্তি অস্বীকার করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ "আর তিনি সুউচ্চ, সমুন্নত ও মহান"। এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সকল মাখলুকের উপরে থাকা, সমুন্নত হওয়া এবং বড়ত্বের গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح

আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর বড় বড় ছিফাতের আলোচনা হয়েছে বলেই যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করবে, সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না।

.....

এ বক্তব্যের দ্বারা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ঐ হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা রয়েছে,

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ} [البقرة: ٢٥٥]، حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ

যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে তথা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন তুমি আয়াতুল কুরসী তথা ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـــومُ.... পাঠ করো। কেননা তুমি যদি তা পাঠ করো, তাহলে সারা রাত আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত তোমার নিকট শয়তান আসতেই পারবে না।[২৭]

জিন ও ইনসানের মধ্য হতে প্রত্যেক বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারীকে শয়তান বলা হয়। شطن থেকে شيطان এর উৎপত্তি হয়েছে। شطَن অর্থ بعُد (দূর হয়েছে)। শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে চলে গেছে বলেই তাকে শয়তান বলা হয়। অথবা شيطان এর উৎপত্তি হয়েছে شاط يشيط হতে। যখন কোন জিনিস খুব কঠিন ও শক্ত হয়, তখনই কেবল তাকে উদ্দেশ্য করে এ রকম কথা বলা হয়।

২৭ . ছহীহ বুখারী ২৩১১, ছহীহ ইবনে খুযাইমা ২৪২৪, তিরমিযী ২৮৮০, মুসনাদে আহমাদ।

٢ –الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته

২। আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টির উপরে থাকা ও নিকটবর্তী হওয়া এবং সকল সৃষ্টির পূর্বে ও সকল সৃষ্টির শেষে বিদ্যমান থাকা।

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى
هو الأول والآخر والظاهر والباطن

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনিই الأَوَّلُ প্রথম, তিনিই الآخِرُ সর্বশেষ, তিনিই الظَّاهِرُ সবকিছুর উপরে, তিনিই الْبَاطِنُ মাখলুকের অতি নিকটে) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন: "তিনিই الأَوَّلُ (প্রথম), তিনিই الآخِرُ (সর্বশেষ), তিনিই الظَّاهِرُ (সবকিছুর উপরে), তিনিই الْبَاطِنُ (মাখলুকের অতি নিকটে), আর তিনি সর্ব বিষয়ে عَلِيم (মহাজ্ঞানী)" *(সূরা আল হাদীদ ৫৭: ৩)।*

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার বাণী: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ "তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ"- ছ্বহীহ মুসলিমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত দু'আর মাধ্যমে এই আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি তার দু'আয় বলেছেন,

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ»

"হে আল্লাহ! তুমিই أَوَّل (সর্বপ্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই آخِر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই ظَاهِر (সকল সৃষ্টির

উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই بَاطِن (মাখলুকের অতি নিকটে এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই"।[২৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর এ চারটি নামের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন। এ বরকত সম্পন্ন নামগুলোর মাধ্যমে জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই পরিবেষ্টন করে আছেন।

---

২৮. ছ্বহীহ মুসলিম ২৭১৩। ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুয্ যিক্র ওয়াদ্ দু'আ। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন বলেছেন, الباطن। অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে হওয়ার সাথে সাথে তিনি তাদের অতি নিকটে। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার উপরে হওয়া মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়ার বিরোধী নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়াকে আল্লাহর ইলম ও ক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলেও মূলতঃ আল্লাহর জন্য কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহর ছিফাত ও কর্মকে মাখলুকের ছিফাত ও কর্ম দ্বারা বুঝা অসম্ভব। কোন সৃষ্টির জন্য একই সময় ছাদের উপরে ও ছাদের নীচে স্বশরীরে থাকা এবং একই সময় সিংহাসনের উপরে থাকা ও সিংহাসনের নীচে থাকা অসম্ভব। কোন রাজা যখন তার সিংহাসন ছেড়ে বাইরে যায়, তখন তার সিংহাসন খালি হয়ে থাকে। কারণ তার জন্য একই সময় ও একই সাথে সিংহাসনে থাকা এবং দেশের বাইরে থাকার ধারণা অকল্পনীয়। কিন্তু সুমহান ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার জন্য একই সময় ও একই সাথে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া এবং রাতের শেষাংশে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়। মাখলুকের নিকটবর্তী হলে আরশ খালি হওয়া জরুরী নয়। যারা আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করেছে, তারা তাদের ক্ষুদ্র ক্ষমতা দ্বারা আল্লাহর বিশাল ছিফাত ও ক্ষমতাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে বলেই বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আল্লাহর ছিফাতকে অস্বীকার করেছে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়। তা এই যে, কুরআন মাজীদে জান্নাত ও জাহান্নাম বাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে, তা কি 'আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ' এই কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়?

এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয় এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্বস্ব ক্ষেত্রে, সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। আখিরাতে আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে জান্নাত বা দোযখ চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে- এমনটি নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকবে। পরিশেষে ফেরেশতারাও ধ্বংস হবেন।

কিন্তু জান্নাতবাসীগণ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহে এবং জাহান্নামী কাফিররা ও জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত।

আল্লাহ তা'আলার নাম: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ "তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সমস্ত যামানাকে পরিবেষ্টন করে আছেন। অর্থাৎ তিনি যামানা ও কালসীমার উর্ধ্বে। সবকিছুর আগে তিনি একাই ছিলেন এবং সবকিছু শেষ হওয়ার পরও তিনি থাকবেন।

আর আল্লাহ তা'আলার নাম: وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "তিনি সকল সৃষ্টির উপরে এবং তিনিই সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী" দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন সকল যামানাকে বেষ্টন করে আছেন তেমনি সকল স্থানকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার এই চারটি নাম পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক। চারটি নামের মধ্যে الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ এই দু'টি নাম আল্লাহ তা'আলার অবিনশ্বরতা ও চিরস্থায়িত্বের জন্য। আর الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ এই দু'টি নাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে হওয়া ও তাদের নিকটে হওয়া বুঝায়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত প্রথম থেকেই যেসব বস্তু রয়েছে, তার প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। অর্থাৎ যেসব বস্তু সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব থেকেই আল্লাহ আছেন।[২৯] আর আল্লাহ ব্যতীত যত বস্তু আছে, তার প্রত্যেকটি শেষ হওয়ার পরেও আল্লাহ তা'আলা থাকবেন। সুতরাং আল্লাহই প্রথম এই কথার অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পূর্বে আল্লাহ বিদ্যমান থাকা আর আল্লাহই শেষ এই কথা অর্থ হচ্ছে সবকিছুর পর আল্লাহর অবশিষ্ট থাকা।[৩০]

---

২৯. ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِى الذِّكْرِ كُلَّ شَىْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ

"আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার আরশ ছিল পানির উপর। তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিস লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং আসমান ও যমীন সৃষ্টি করলেন। (ছুহীহ বুখারী, হা/ ৩১৯১)

৩০. সৃষ্টিজগতের ছোট বড় প্রত্যেক বস্তুরই একটি সূচনা ও শুরু রয়েছে। সে বস্তুটি যত পুরাতনই হোক কিংবা যার বয়স যতই বেশী হোক, তার একটা শুরু রয়েছে। অতীতের যে সময়টাতে তার সৃষ্টি হয়েছে, তার পূর্বে সেই বিষয়টির কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর পূর্বেই আরেকটি সৃষ্ট বস্তু রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে যেটিকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে, তা অস্তিত্বহীন থেকে প্রথম অস্তিত্বে এসেছে। আল্লাহ তা'আলাই সেটিকে প্রথম অস্তিত্বে এনেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমার সৃষ্টির পূর্বে আমার কোন অস্তিত্ব ছিল না, আপনার বেলাতেও না। পিতামাতার মাধ্যমে আমরা সৃষ্টি হয়েছি। এভাবে আদম (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত গিয়ে মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শেষ হয়। আদমকে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। এমনি সৃষ্টিজগতের সকল সৃষ্টির ক্ষেত্রে একই কথা। এই পৃথিবী

আর আল্লাহ তা'আলা الظاهر (প্রকাশমান) হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর উপরে। الظهور থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য الظاهر নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। যুহুর শব্দটির ভাষাগত দাবী হচ্ছে উপরে হওয়া। বস্তুর উপরের অংশকেই যাহের বলা হয়।[৩১]

আল্লাহ তা'আলা বাতেন হওয়ার অর্থ হচ্ছে তিনি নিম্নজগতের (পৃথিবী ও তার মধ্যকার) প্রত্যেক সৃষ্টিকে এমনভাবে বেষ্টন করে আছেন যে, তিনি মাখলুকের আপন নফসের চেয়েও অধিক নিকটে। এটি হচ্ছে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ।[৩২]

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: **وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আর তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল বিষয়কে পূর্ণরূপে পরিবেষ্টন করে আছে। উর্ধ্ব জগতের এবং নিম্নজগতের কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সবকিছুই তিনি অবহিত। আসমান ও যমীনে একটি সরিষার দানা পরিমাণ জিনিসও তার ইলম থেকে অনুপস্থিত নয়।

উপরের আয়াত থেকে আল্লাহর জন্য এমন চারটি সম্মানিত নাম সাব্যস্ত হলো, যার দাবী হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। তিনি অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যৎ তথা সকল যামানা ও তার মধ্যে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার সবকিছুকেই জ্ঞানের মাধ্যমে বেষ্টন করে আছেন। সেই সাথে সকল স্থান ও তাতে ছোট-বড় যত প্রকার মাখলুক রয়েছে, সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত।

কখন সৃষ্টি হয়েছে কিংবা এর বয়স কত বিজ্ঞানীরা অনুমান করে বললেও তার সঠিক বয়স আমরা জানি না। কিন্তু এটি অতীতের নির্দিষ্ট এমন একটি সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার পূর্বে এই পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এমন কোন শুরু ও সূচনা নেই, যেখান থেকে তিনি অস্তিত্বে এসেছেন এবং যে সময়ের পূর্বে তিনি ছিলেন না। কেননা তিনি হচ্ছেন সবকিছুর স্রষ্টা। তাই সকল সৃষ্টির পূর্বে তার অস্তিত্ব থাকা এবং তার ইচ্ছাতেই সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পরও তার বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। এক কথায় তিনি সময়ের সীমারেখার অনেক উর্ধ্বে।

৩১. প্রত্যেক সৃষ্টিই স্বীয় ফিতরাতের (প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত স্বভাবের) দাবীতেই উপরের দিকে হাত উঠায়। এ বিষয়ে তাকে শিক্ষা না দেয়া হলেও সে উপরের দিকেই হাত উঠায়। হাত না উঠালেও অন্তর উপরের দিকে ধাবিত করে। কারণ সকল সৃষ্টির উপরে আল্লাহ তা'আলা। আর সকল মাখলুক তার নীচে। উপরের দিকে হাত উঠানো শুধু মানুষের সাথে খাস নয়। এমনকি জীবজন্তু এবং কীট-পতঙ্গও অনুভব করে যে, তার সৃষ্টিকর্তা ও রিযিক দাতা উপরে। তাই স্বীয় প্রয়োজনে সে উপরের দিকে হাত ও অন্তর ধাবিত করে।

৩২. সুতরাং কেউ যেন এরূপ মনে না করে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির (আরশের) উপরে থেকে তার কাজ-কর্ম এবং অন্তরের ইচ্ছা ও নিয়্যাত সম্পর্কে অবগত নন। বরং আল্লাহ আরশের উপর থেকেও মাখলুকের সবকিছুই অবহিত। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে হওয়া সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়ার পরিপন্থী নয়।

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى
وتوكل على الحي الذي لا يموت

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وقوله سبحانه ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ وقوله ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

আল্লাহ্ বলেন: "তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না" *(সূরা আল ফুরকান ২৫:৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: তিনি প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞ" *(সূরা আল আন'আম ৬: ১৮, সূরা সাবা ৩৪:১)*।

.....

ব্যাখ্যা: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ "তুমি সেই চিরজীবন্ত সত্তার উপর ভরসা করো, যিনি কখনোই মৃত্যু বরণ করবেন না" *(সূরা আল ফুরকান ২৫:৫৮)*। অর্থাৎ তোমার সকল বিষয় সেই চিরজীবন্ত সত্তার নিকট সোপর্দ করে দাও, যার কখনোই মৃত্যু হবে না।

التوكل (তাওয়াক্কুল)এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে التفويض তথা অন্যের নিকট কোন বস্তু সোপর্দ করা। আরবরা বলে থাকে, وكلت أمري إلى فلان أي فوضته অর্থাৎ আমার বিষয়টি অমুকের নিকট সোপর্দ করলাম। আর পরিভাষায় উপকারী বস্তু অর্জন করার জন্য এবং ক্ষতিকর জিনিস দূর করার জন্য অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করাকে توكل বলা হয়। অন্তর দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা ইবাদতের অন্যতম একটি প্রকার। সুতরাং বান্দার সকল কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করা অপরিহার্য।[৩৩]

---

৩৩. শুধু তাই নয়, আল্লাহর উপর ভরসা করা ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "তোমরা যদি মুমিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করো।" (সূরা আল মায়িদা: ২৩) কুরআনের আরো অনেক স্থানে আল্লাহ

কল্যাণ অর্জনের জন্য কিংবা অকল্যাণ দূর করার জন্য উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়; বরং পরিশ্রম ও চেষ্টা করার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করার পূর্ণ মিল রয়েছে। তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে আল্লাহর হায়াতকে খাস করার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যিনি চিরজীবন্ত, কল্যাণ লাভের জন্য কেবল তার উপরই ভরসা করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ চিরজীবন্ত নয় কিংবা অন্য কারো হায়াত চিরস্থায়ী নয়। মাখলুকের হায়াত যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়, তাই যে ব্যক্তি মাখলুকের উপর ভরসা করে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট কথা, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হায়াতে কামেলা (পূর্ণাঙ্গ জীবন) সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে তার পবিত্র সত্তার মৃত্যু হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের মধ্যেও আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করার বেলায় নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা হয়েছে।

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞঃ আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম الحكيم এর দু'টি অর্থ রয়েছে।

হাকীমের এক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের মধ্যে সৃষ্টিগত ও শরী'আতগত উভয় প্রকার আদেশের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়ছালাকারী।

আর হাকীমের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে محكم অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ প্রজ্ঞাবান এবং সকল বস্তুকে যথাযথ স্থানে মজবুতভাবে স্থাপনকারী। সে হিসাবে এটি الحكمة থেকে গৃহীত। প্রত্যেক বিষয়কে তার নিজ নিজ স্থানে স্থাপন করাকে হিকমত বলা হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলাই তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালাকারী। তিনি যা সৃষ্টি করেন এবং তার সৃষ্টিকে তিনি যেই আদেশ করেন, তাতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ একটি হিকমাত (রহস্য ও উদ্দেশ্য)। আল্লাহ তা'আলা কোন সৃষ্টিকেই অযথা সৃষ্টি করেননি। মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর, তিনি কেবল তাই ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার الخبير নামটি الخبرة থেকে গৃহীত। الخبرة অর্থ হলো বস্তুসমূহের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে

তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। সুতরাং কল্যাণ অর্জনের নিয়্যাতে কিংবা অকল্যাণ দূর করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্ক কায়েম করল, সে বিনা সন্দেহে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করল। তবে দুনিয়ার কাজ-কর্ম অন্যকে দিয়ে সম্পাদন করানোকে অন্যের উপর توكل তথা ভরসা করা বলে না। ইহাকে توكيل তথা উকীল বানানো বলা হয়। কোন মানুষকে উকীল বানিয়ে কর্ম সম্পাদন করা জায়েয। তবে উকীলের উপর ভরসা করা যাবে না। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য অন্তর দিয়ে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করতে হবে।

থাকা। বলা হয় خبرت الشيئ إذا عرفته على حقيقته আমি জিনিসটি সম্পর্কে অবগত আছি। ইহা আপনি ঠিক ঐ সময় বলে থাকেন, যখন আপনি তাকে তার আসল অবস্থাসহ জানতে পারেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন الخبير অর্থাৎ তিনি এমন সত্তা, যিনি স্বীয় ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল বস্তুর অপ্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা ঠিক সেভাবেই অবগত আছেন, যেভাবে তিনি সেগুলোর প্রকাশ্য অবস্থা সম্পর্কে অবহিত।[৩৪]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত নামসমূহ থেকে দু'টি নাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হচ্ছে الحكيم (প্রজ্ঞাবান) অপরটি হচ্ছে الخبير (সর্বজ্ঞ)। একই সাথে এ নাম দু'টি আল্লাহর ছিফাতসমূহ থেকে দু'টি ছিফাতও সাব্যস্ত করছে। তা হচ্ছে হিকমাত ও খিবরাত তথা আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও চাক্ষুস জ্ঞান।

৩৪ .অর্থাৎ তার সমস্ত কাজই হয় পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ভিত্তিক। তিনি যা করেন একদম ঠিকই করেন। নিজের প্রত্যেকটি সৃষ্টি কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, তার প্রয়োজন কী, তার প্রয়োজনের জন্য কী উপযোগী, এ পর্যন্ত সে কী করেছে এবং সামনের দিকে আরো কী করবে এ সব সম্পর্কে তিনি পূর্ণজ্ঞান রাখেন। নিজের তৈরি দুনিয়া সম্পকে তিনি বেখবর নন এবং প্রতিটি অণু-পরমাণুর অবস্থাও তিনি পুরোপুরি জানেন।

٣ –إحاطة علمه بجميع مخلوقاته

৩। আল্লাহ তা'আলার ইলম (জ্ঞান) সকল সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয়) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾

"তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, যা তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা অবতীর্ণ হয় ও যা কিছু আকাশে উঠে *(সূরা সাবা ৩৪:২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা অবগত নয়, জলে ও স্থলের সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন। তার অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি শস্য দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এমনিভাবে শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(সূরা আল আন'আম ৬:৫৯)*।

.....

ব্যাখ্যা: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ﴾ **'যমীনে যা প্রবেশ করে':** তার অন্যতম হচ্ছে বৃষ্টির পানি, শস্যের দানাসমূহ, গুপ্ত ধনসমূহ, মৃত ব্যক্তিদের লাশ ইত্যাদি।

আর وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا **'যমীন হতে যা বের হয়':** তার মধ্যে রয়েছে, উদ্ভিদ, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ **'আসমান থেকে যা নাযিল হয়':** তার মধ্যে রয়েছে বৃষ্টি, ফেরেশতা, আল্লাহর হুকুম আহকাম এবং অন্যান্য বিষয়।

আর وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا **'যা কিছু আকাশে উঠে':** বনী আদমের আমল ও আল্লাহর ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সব কিছুকেই তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে আছেন।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ **"গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে:** অর্থাৎ অদৃশ্যের ভান্ডারসমূহ অথবা গায়েব সম্পর্কে ইলম অর্জনের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকটেই। لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব থেকে কিছু জানার দাবী করলো, সে কুফরী করলো।

ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হাদীছে গায়েবের চাবিসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مفاتحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا اللَّهُ ثم قرأى هذه الأية ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾

"গায়েবের চাবি হচ্ছে পাঁচটি। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। ক্বিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা তিনিই জানেন।[৩৫] কেউ জানে না, সে আগামীকাল কী উপার্জন করবে এবং কেউ

---

৩৫. যদি প্রশ্ন করা হয় আজকাল ডাক্তারগণও তো বলে দিতে পারে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান আছে? না মেয়ে সন্তান? উত্তর হল সন্তানের গঠন পূর্ণ হওয়ার পরই ডাক্তারগণ যন্ত্রের সাহায্যে তা বলতে পারে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা বলতে পারে না। তাছাড়া ডাক্তারগণ শুধু ছেলে না মেয়ে এটি বলতে পারে। সন্তান সৌভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য হবে? তার স্বভাব-চরিত্র ভালো হবে না মন্দ

জানে না, সে কোন যমীনে মৃত্যু বরণ করবে" *(সূরা লুকমান ৩১:৩৪)*।[৩৬]

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ স্থলভাগে যা আছে তিনি তা জানেন। অর্থাৎ পৃথিবীর বসতি এলাকায় এবং খালি জায়গায় যে সমস্ত বাসিন্দা, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং অন্যান্য যেসব রয়েছে, তা তিনি অবগত আছেন। এমনি والبحر জলভাগে যেসব প্রাণী, মূল্যবান মনি-মুক্তা এবং অনুরূপ মাখলুক রয়েছে, তাও তিনি জানেন।

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ **তার অবগতি ব্যতীত একটি পাতাও ঝরে না:** স্থলভাগ, জলভাগ এবং অন্যান্য স্থানের বৃক্ষসমূহের কোন পাতাই إِلاَّ يَعْلَمُهَا আল্লাহর অবগতি ছাড়া ঝরে পড়ে না। এমনি বৃক্ষের পাতাসমূহ কখন ও কোথায় পড়ে, তাও তিনি জানেন।

وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ **ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে এমন একটি দানাও নেই, যে সম্পর্কে তিনি অবগত নন:** অর্থাৎ যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানসমূহে কিংবা মাটির নীচের শস্যদানা বা ক্ষুদ্রতম দানা পরিমাণ বস্তু সম্পর্কে তিনি অবগত।

وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ **শুষ্ক ও আদ্র সবকিছুই:** অর্থাৎ সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই তিনি অবগত। এটি خاص-এর পর عام স্বরূপ। অর্থাৎ প্রথমে কিছু খাস বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে, শুষ্ক ও আদ্র সকল বস্তু সম্পর্কেই তিনি জানেন।

إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ **একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে:** এগুলো থেকে যাই হোক না কেন, তার সবই লাওহে মাহফুযে লিখিত রয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে সাব্যস্ত করা হয়েছে গায়েবের ইলম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে নেই। আল্লাহ তা'আলার ইলম প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এতে তাক্বদীর এবং লাওহে মাহফুযে তা লিখার কথাও প্রমাণিত হয়।

হবে? সে কি ধনী হবে না ফকীর হবে? এ সমস্ত বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। মেঘ দেখে আমরা বলতে পারি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বৃষ্টি হবেই, নিশ্চিতরূপে এ কথা কেউ বলতে পারে না।

৩৬. ছহীহ বুখারী হা/৪৬২৭, ছহীহ মুসলিম হা/৯-১০, ইবনে মাজাহ হা/৬৪।

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

{وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِه} {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا} وقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِه ﴾

"আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না *(সূরা ফাতির ৩৫:১১)*।[৩৭]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

---

৩৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তিই দুনিয়ায় জন্মলাভ করে তার সম্পকে প্রথমেই লিখে দেয়া হয় সে দুনিয়ায় কত বছর বাঁচবে। কেউ দীর্ঘায়ু হলে তা হয় আল্লাহর হুকুমে এবং স্বল্পায়ু হলেও হয় আল্লাহর ফায়ছালা অনুযায়ী।

আমাদের সমাজের কতিপয় লোক বলে থাকে যে, পূর্বে নবজাত শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল বেশী এবং বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি এ মৃত্যুর হার কমিয়ে দিয়েছে। তাদের এ যুক্তি কেবল তখনই পেশ করা যেত যখন কোন উপায়ে আমরা জানতে পারতাম যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তির আয়ু লিখেছিলেন দু'বছর এবং আমাদের চিকিৎসা উপকরণ তার বয়স ৫০ বছর বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ ধরনের কোন জ্ঞান যেহেতু কারো কাছে নেই, তাই সে কখনোই এই ধরণের কথা বলতে পারে না। গণনার দিক দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার এখন কমে গেছে অথবা আগের তুলনায় মানুষের গড় আয়ু এখন বেশী হচ্ছে, এটি একটি নিছক ধারণা মাত্র। সংখ্যা ও গণনা তথ্যের উপর ভিত্তি করে একথা বলা যায় না যে, মানুষ এবার আল্লাহর ফায়ছালা বদলে দেবার শক্তি অর্জন করেছে। আল্লাহ বিভিন্ন যুগে জন্মলাভকারী মানুষের আয়ু বিভিন্নভাবে নির্ধারণ করেছেন। এটিও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ফায়ছালা যে, অমুক যুগে মানুষকে অমুক রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা দান করা হবে এবং অমুক যুগে মানুষকে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির অমুক উপায় দান করা হবে। (আল্লাহই ভালো জানেন)

যাতে তোমরা জানতে পারো, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে" *(সূরা তালাক ৬৫:১২)*। **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:**

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা, শক্তিধর ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী" *(সূরা আয যারিয়াত ৫১: ৫৭-৫৮)*।

.....

ব্যাখ্যা: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ **"আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না:** অর্থাৎ আল্লাহর অবগতি ব্যতীত কোন নারী বা অন্য কোন প্রাণীর গর্ভধারণ এবং প্রসব হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন জিনিসই আল্লাহর ইলম ও তদবীরের বাইরে নয়। কোন দিন কোন নারী বা অন্য কোন প্রাণীর গর্ভে সন্তান ও বাচ্চা আসবে, কোন দিন সে তা প্রসব করবে এবং ছেলে সন্তান প্রসব করবে? না মেয়ে সন্তান? আল্লাহু তাও জানেন।

لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান: এখানে لام এর সম্পর্ক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পূর্বোক্ত বাণী: خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ এর সাথে। অর্থাৎ তিনি সাত আসমান ও সাত যমীন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারো।

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا এবং যাতে আরো জানতে পারো যে, আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে: অর্থাৎ যাতে তোমরা এই কথা জানতে পারো যে, আল্লাহর ইলম সবকিছুকে ঘিরে আছে। সৃষ্টির কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। সেটি যাই হোক না কেন।

علمًا শব্দটি **تمييز** হিসাবে অথবা **مفعول مطلق** হিসাবে মানসুব হয়েছে। কেননা **أحاط** অর্থ **علم** যার অর্থ তিনি অবগত হয়েছেন। উপরের দু'টি আয়াত থেকে আল্লাহর এমন ইলম-জ্ঞান প্রমাণিত হচ্ছে, যা সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। সেই সাথে সকল বস্তুর উপর আল্লাহর ক্ষমতাও প্রমাণিত হলো।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ 'আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা': আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন রিযিক দাতা নেই। তিনি সকল সৃষ্টিকেই রিযিক দেন এবং তাদের কল্যাণে সবকিছুই

সরবরাহ করেন। তিনি বিনা হিসাবে সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেন। সুতরাং তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করো না।

ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ প্রবল শক্তিধর ও পরাক্রমশালী: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ শক্তির অধিকারী। তার শক্তিতে কোন প্রকার দুর্বলতা অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর المتين অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বোচ্চ শক্তি ও প্রবল ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং তার কাজে কোন কষ্ট, ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অনুভব হয় না। আল্লাহ তা'আলার المتين নামটি المتانة ক্রিয়ামূল থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে কঠিন ও শক্তিমান হওয়া। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে আল্লাহর রায্যাক নামটি প্রমাণিত হলো। সেই সাথে আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন ছিফাত তথা পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণিত হলো যাতে কোন প্রকার দুর্বলতা ও ক্লান্তি আসতে পারে না। একই সাথে এই আয়াতগুলো দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা আবশ্যক। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই।

٤ –إثبات السمع والبصر لله سبحانه

৪। আল্লাহ্ তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি সাব্যস্ত করণ

وقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} وقوله: {إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر

"কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)*। আল্লাহ আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সর্বোত্তম উপদেশ দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই শোনেন ও দেখেন" *(সূরা আন নিসা ৪: ৫৮)*।

.....

ব্যাখ্যা: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়"। এ আয়াতের প্রথম অংশ,

﴿فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের নিজ থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপ অন্যান্য জীব-জন্তুর জোড়া বানিয়েছেন " *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যিনি সকল মানুষকে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন এবং অনুরূপ অন্যান্য জীবজন্তুর জোড়া বানিয়েছেন, তার মতো আর কিছুই নেই। কেননা তিনি সেই একক অমুখাপেক্ষী সত্তা, যার কোন নযীর (সদৃশ) নেই। তিনি السميع (সর্বশ্রোতা), যিনি সকল ভাষার সকল আওয়াজই

শুনেন। তিনি البصير (সর্বদ্রষ্টা), তিনি সবকিছুই দেখেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই তার কাছে গোপন নয়।[৩৮]

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) তার তাফসীরে বলেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে এ আয়াতটি বুঝতে সক্ষম হবে এবং যথাযথভাবে তা নিয়ে গবেষণা করবে, আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলীর ক্ষেত্রে মতভেদকারীদের মতভেদ করা সত্ত্বেও সে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট পথে চলতে পারবে।

সে যদি আল্লাহর বাণী: وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْر **"তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"**: নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে। কেননা আল্লাহর অনুরূপ কোন জিনিস হওয়াকে পরিহার করার পর আল্লাহর জন্য উপরোক্ত দু'টি নাম ও ছিফাত সাব্যস্ত

---

৩৮. আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্পর্কে আরো কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো। আওস ইবনে সাবেতের স্ত্রী খাওলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। সব কিছু দেখেন এবং শুনেন"। (সূরা মুজাদালাহ: ০১) আল্লাহ ইয়াহূদীদের প্রতিবাদ করে বলেন,

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

"তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় গোপন পরামর্শ শুনি না? হাঁ, শুনি। আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে"। (সূরা আয যুখরুফ: ৮০) আল্লাহ তা'লা মূসা ও তার ভাই হারূন (আলাইহিমাস সালাম) কে লক্ষ্য করে বলেন, قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى "আল্লাহ বললেন, তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি। (সূরা ত্বহা: ৪৬)

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আল্লাহর শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি রয়েছে। তবে তার দেখা ও শুনা কোন সৃষ্টিজীবের মত নয়। কোন মানুষ যখন বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে বাহিরের কিছুই দেখতে পায় না এবং বাহিরের কোন কথাও শুনতে পায় না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থেকে মাখলুকের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তুই দেখতে পান এবং সকল কথাই শুনেন।

করার দ্বারা আল্লাহর আসমা ও ছিফাতের প্রতি বিশ্বাস মুমিনের অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করে, অন্তর থেকে সকল ব্যধি সরিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে শীতল করে তুলে।

সুতরাং হে সত্যের সন্ধানী! তুমি এই উজ্জল প্রমাণ এবং মজবুত দলীলের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করো। এর মাধ্যমেই তুমি অনেক বিদ'আতকে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারবে, গোমরাহীর ইমামদের ভিত্তিকে ধ্বংস করতে পারবে এবং যুক্তিবাদীদের নাকে মাটি লাগাতে পারবে। বিশেষ করে যখন তুমি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীকে তার সাথে যুক্ত করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

তিনি লোকদের সামনের ও পেছনের সব অবস্থা জানেন। তারা তাদের জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না *(সূরা ত্বহা ২০:১১০)*।

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا **নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করেন:** এটি সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতের শেষাংশ। আয়াতের পূর্বের অংশ হচ্ছে,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়ছালা করার সময় আদল বা ন্যায়নীতি সহকারে ফায়ছালা করো"।

نعم শব্দটি প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত শব্দসমূহের অন্যতম। এর শেষে যুক্ত **ما** সম্পর্কে একাধিক কথা রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন এটি হচ্ছে **نكرة موصوفة**। সম্ভবত বাক্যটি এ রকম ছিল, **نعم شيئا يعظكم به** একটি উত্তম বিষয় দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলেছেন এখানে **ما** মাওসুল হিসাবে এসেছে। আসল বাক্যটি এ রকম ছিল, **نعم الشيئ الذي يعظكم به** অর্থাৎ যেই বিষয়টি দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তা কতই না উত্তম! **يعظكم** (উপদেশ দিচ্ছেন) অর্থ হলো তিনি তোমাদেরকে আমানত আদায় করার এবং মানুষের মাঝে ন্যায়ের সাথে ফায়ছালা করার আদেশ দিচ্ছেন।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا **আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা:** অর্থাৎ তোমরা যা কিছু বল আল্লাহ তা'আলা তা শুনেন এবং যা কিছু করো, তা তিনি দেখেন। উপরের আয়াত দু'টি থেকে আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রমাণিত হলো। আয়াত দু'টির প্রথমটিতে বলা

হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মাখলুকের অনুরূপ নন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তাতে আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে নাফী ও ইছবাতকে একত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ একই সাথে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে ত্রুটি ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিহার করা হয়েছে এবং তার যাতে পাকের জন্য অতি উত্তম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

٥ –إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى

৫। আল্লাহ তা'আলার জন্য ইচ্ছা বিশেষণ সাব্যস্ত করা

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى:

ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে বললে না কেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

وقوله: {وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ} {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} وقوله: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّـي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

"তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন মাশা-আল্লাহ (আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে) বললে না কেন? আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন শক্তি নেই"[৩৯] *(সূরা কাহাফ ১৮: ৩৯)*। **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:**

---

৩৯ .সূরা কাহাফের ৩২ নং থেকে ৪৩ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসী হঠকারী কাফিরদের জন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যুগে যুগে যে কোন অহংকারী, আল্লাহদ্রোহী এবং পরকালীন জীবনে অবিশ্বাসীর জন্য এটি একটি বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আসেনি। সুতরাং কুরআন যা বলেছে, তার অতিরিক্ত কিছু যুক্ত করার কোন সুযোগ নেই। তাই আমরা ইসরাঈলী কিংবা দুর্বল বর্ণনা পরিত্যাগ করে শুধু কুরআনের আলোকে সেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করবো। কুরআন বলছে, অতীতকালে দু'জন লোক ছিল। তাদের মধ্যে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও ছিল। তাদের একজন ছিল মুমিন এবং অন্যজন ছিল কাফির। তবে কুরআন ও হাদীছ তাদের নাম, তারা কোথায় এবং কোন সময় ছিল, তা বলেনি।

মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ধন-সম্পদ থেকে তেমন কিছু না দিলেও তাকে দিয়েছিলেন সর্ববৃহৎ একটি নিয়ামত। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী, তার ফায়ছালা ও তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আখিরাতে আল্লাহর নিয়ামত অর্জনই ছিল তার সকল কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনার মূলকেন্দ্র বিন্দু। মূলতঃ এটি এমন সম্পদ, যা দুনিয়ার কোন মূল্য দ্বারাই মূল্যায়ন করা যায় না।

তার সেই কাফির বন্ধুটির জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তার ছিল প্রচুর সম্পদ, বাগ-বাগিচা এবং সন্তান-সন্ততি। কোন মানুষকে এ সবকিছু দেয়ার পিছনে আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও ইচ্ছা হলো তিনি তাকে পরীক্ষা করতে চান। সে কি এগুলো পেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে? নাকি অকৃতজ্ঞ হয়? সে কি সীমালঙ্ঘন করে? নাকি আল্লাহর আনুগত্য করে?

আল্লাহ তা'আলা সে অবিশ্বাসী লোকটিকে দু'টি বাগান দিয়েছিলেন। বাগানে ছিল আঙ্গুর, খেজুরসহ বিভিন্ন ফলমূলের বৃক্ষাদি। বাগানের মধ্যে ঝর্ণাও প্রবাহিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা এ বাগান দু'টির বর্ণনা দিয়ে বলেন,

﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا﴾

"তাদের একজনকে আমি দুটি আংগুর বাগান দিয়েছিলাম এবং সেগুলোর চারদিকে খেজুর গাছের বেড়া দিয়েছিলাম আর তার মাঝখানে রেখেছিলাম কৃষি ক্ষেত। দুটি বাগানই ভালো ফল দান করতো এবং ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারা সামান্যও ত্রুটি করতো না। এ বাগান দুটির মধ্যে আমি একটি নদী প্রবাহিত করেছিলাম"। (সূরা কাহাফ: ৩২-৩৩)

এসব কিছু পেয়ে একদিন সে তার দরিদ্র ভাইয়ের সাথে কথা প্রসংগে বললো, "আমি তোমার চেয়ে বেশী ধনশালী এবং আমার জনশক্তি তোমার চেয়ে বেশী। অহংকার ও গর্বের সাথে এ সব কথা বলতে বলতে সে তাকে নিয়ে বাগানে প্রবেশ করল। সে বলতে লাগল, এগুলো সবসময়ই আমার কাছে থাকবে, আমি মনে করি না যে, আমার এ সম্পদগুলো কোন দিন ধ্বংস হবে। তার দাপট ও অহংকার এখানেই শেষ হলো না; বরং সে অহংকার বশতঃ ক্বিয়ামতকেও অস্বীকার করে বলল, আমি মনে করি না যে, ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। সে আরো বলল, ক্বিয়ামত যদিও সংঘটিত হয় এবং আমাকে যদি কখনো আমার রবের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি এর চেয়েও বেশী জমকালো জায়গা পাবো। যদি পরকাল থেকেই থাকে তাহলে আমি সেখানে এখানকার চেয়েও বেশী সচ্ছল থাকবো। কারণ এখানে আমার সচ্ছল ও ধনাঢ্য হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমি আল্লাহর প্রিয়।

দুনিয়া পূজারী আখিরাতে অবিশ্বাসী লোকদের অবস্থা এ রকমই হয়ে থাকে। তারা দুনিয়ার ভোগসামগ্রী পেয়ে আখিরাতকে ভুলে যায়। সে মনে করে, তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে এবং তার ধন-সম্পদ কখনো শেষ হবে না। যাই হোক তার দরিদ্র সাথী কথাবার্তার মধ্যে তাকে বললো, "তুমি কি কুফরী করছো সেই সত্তার সাথে যিনি তোমাকে মাটি থেকে তারপর শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ বানিয়ে দাঁড় করিয়েছেন? আর আমার ব্যাপারে বলবো, আমার রব তো সেই আল্লাহই এবং আমি তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

এবার দরিদ্র বন্ধু বাগান ওয়ালাকে নছীহত করতে গিয়ে বলল, বরং তোমার উচিত ছিল যেই আল্লাহ তোমাকে এই সম্পদ দিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অহংকার বর্জন করা। তোমার সম্পদ টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তোমার রবকে খুশি করার এটিই একমাত্র উত্তম পন্থা। আর যখন তুমি নিজের বাগানে প্রবেশ করছিলে তখন একথা বলা উচিত ছিল, مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ "আল্লাহ যা চান তাই হয়, তার প্রদত্ত শক্তি ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই।

এরপর মুমিন লোকটি তার সাথীকে অহংকার, সীমালঙ্ঘন ও তাকাব্বরী করার ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল, আর তুমি যদি সম্পদ ও সন্তানের দিক দিয়ে আমাকে তোমার চেয়ে কম পেয়ে থাকো, তাহলে জেনে রেখো আল্লাহ তা'আলা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। এটি অসম্ভব নয় যে,

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন"। *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৩)* **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,**

﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশুই হালাল করা হয়েছে। তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন"। *(সূরা আল মায়িদা ৫:১)*

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর বাণী: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ "তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে" لَوْلَا শব্দটি এখানে هلا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করার সময় مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বললে না কেন? অর্থাৎ আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে তোমার নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করতে। আল্লাহর জন্য পূর্ণ ক্ষমতার স্বীকৃতি দিয়ে এই কথা বললে না কেন যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।

কোন কোন সালাফ বলেছেন, যার কাছে কোন জিনিস ভালো লাগে, সে যেন বলে مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ।

আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভালো কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানের উপর আকাশ থেকে এমন কোনো আপদ পাঠাবেন, যার ফলে তোমার বাগান দু'টি বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরে পরিণত হবে। অথবা তোমার বাগানের নদীর পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি তাকে কোনোক্রমেই উঠাতে পারবে না।

পরিশেষে তার বাগানের উপর বিরাট এক বিপর্যয় চলে আসল। চতুর্দিক থেকে বিপদ এসে বাগানের সমস্ত ফল ও ফসল বিনষ্ট করল এবং সে নিজের বাগানকে লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে দেখে নিজের নিয়োজিত পুঁজির জন্য আফসোস করতে থাকলো এবং বলতে লাগলো, "হায়! যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক না করতাম"। এবার সে তার পূর্বোক্ত কথার জন্য অনুতপ্ত হলো। সে সময় আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার মতো কোনো গোষ্ঠীও ছিল না, আর সে নিজেও এ বিপদের মুকাবেলা করতে সক্ষম ছিল না।

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ **"আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো না, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন":** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যদি ইচ্ছা করতেন, তারা যুদ্ধ না করুক, তাহলে তারা পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ করত না। কেননা আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু হওয়া অসম্ভব। আল্লাহর হুকুম প্রতিহত করার মতো কেউ নেই এবং তার ফায়ছালা ঠেকানোরও কেউ নেই।[৪০]

أُحِلَّتْ لَكُمْ **তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে:** এখানে মুমিনদেরকে লক্ষ্য করে

---

৪০. অর্থাৎ রসূলদের মাধ্যমে তাওহীদ, রিসালাত এবং শরী'আতের জ্ঞান লাভ করার পরও মানুষের মধ্যে যে কুফরী ও পাপাচার, সীমালঙ্ঘন দেখা যাচ্ছে ও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং মতবিরোধ থেকে আরো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপক যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে, এর কারণ এ ছিল না যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে অক্ষম ছিলেন। পৃথিবীতে যে কুফুরী, সীমালঙ্ঘন, আল্লাহর নাফরমানী, যুলুম ও মতবিরোধ যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে তা থেকে মানুষকে বিরত রাখার পরিপূর্ণ শক্তি আল্লাহ তা'আলার আছে। তিনি চাইলে নাবীদের দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না। কেউ কুফরী ও বিদ্রোহের পথে চলতে পারতো না। আল্লাহর দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো থাকতো না। তবে মানুষের কাছ থেকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য করা তার ইচ্ছাই ছিল না। তিনি পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মানুষকে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাকে বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও বাছাই করার স্বাধীনতা দান করার প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় ঈমান ও আনুগত্যের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয়। নাবী-রসূলদেরকে তিনি মানুষের উপর দারোগা বানিয়ে পাঠাননি। কিন্তু মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অপব্যবহার করেছে এবং আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে কুফরী ও সীমালঙ্ঘনকেই বেছে নিচ্ছে। ঐদিকে নাবী-রসূলগণ তাদেরকে জোর জবরদস্তি করে তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের পথে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। কারণ জোর করে আনুগত্যের পথে এনে তাদেরকে দিয়ে আনুগত্যের কাজ করিয়ে নিয়ে পুরস্কার দেয়ারও কোন অর্থ হয় না। বরং নাবীদেরকে তিনি পাঠান যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান জানাবার জন্য। সুতরাং যারা জেনেবুঝে এবং আল্লাহ প্রদত্ত ইচ্ছা শক্তিকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করবে, তাদেরকে তিনি অফুরন্ত নিয়ামত দান করবেন। আর যারা নিজেদের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে বিপথে পরিচালিত করবে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তাদেরকে পরকালে শাস্তি দিবেন।

কাজেই পৃথিবীতে যত যুলুম, পাপকাজ, মতবিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে, তার পেছনে একটি মাত্র বিষয় কাজ করেছে যে, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন। আর মানুষ স্বীয় ইচ্ছা শক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীনতা দিয়ে ভালো-মন্দের যে কোন একটি নির্বাচন করে বলেই ক্বিয়ামতের দিন তাকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য ইনসাফপূর্ণ হবে। তিনি যদি সৎকাজে বাধ্য করে পুরস্কার দেন কিংবা অন্যায় কাজ যদি শুধু আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং এতে যদি বান্দার কোন ইচ্ছা, স্বাধীনতা ও সংকল্প না থাকে, তাহলে পাপকাজ করার কারণে কাউকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য যুলুম বলে বিবেচিত হত এবং আল্লাহর আদলের ব্যাঘাত ঘটতো। অথচ আল্লাহ তা'আলা যুলুম থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

এই কথা বলা হয়েছে।

بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ চতুষ্পদ গৃহপালিত সব পশু: চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু বলতে এখানে উট, গরু, ছাগল এবং ভেড়া উদ্দেশ্য।

إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া: এই বাক্যটি بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ থেকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ যেগুলোর আলোচনা সামনে আসছে, সেগুলোর গোশত খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল নয়। ঐ হারাম পশুগুলো উক্ত আয়াতের সামান্য পরেই অর্থাৎ সূরা আল মায়িদার ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾

"তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব, রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত প্রাণী এবং কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন প্রাণী, তবে তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করেছ সেটি ছাড়া। আর যা কোন বেদীমূলে (পূজার ঘরে, অলী-আওলীয়ার নামে, কবর ও মাজারের উদ্দেশ্যে) যবেহ করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও শুভ-অশুভ নির্ধারনের তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়। এগুলো ফাসিকী তথা আনুগত্য বহির্ভূত কাজ"।

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ কিন্তু ইহ্‌রাম বাধাঁ অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিও না: এই বাক্যটি بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র বিষয়। অর্থাৎ গৃহপালিত চতুষ্পদ সব জন্তুই তোমাদের জন্য হালাল। তবে এগুলো থেকে যেগুলো বন্য, সেগুলো শিকার করে ভক্ষণ করাও হালাল। কিন্তু যখন তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে, তখন এগুলো শিকার করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। আল্লাহর বাণী: وَأَنتُمْ حُرُمٌ হাল (অবস্থা জ্ঞাপক) হিসাবে নসব বা যবরের স্থানে রয়েছে। যারা হাজ্জ কিংবা উমরাহ অথবা উভয়টির ইহরাম বেঁধেছে, তাদেরকে حرم বলা হয়। ইহা محرم এর বহুবচন।

إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ **নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন:** অর্থাৎ আল্লাহ যা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যা ইচ্ছা হারাম করেন।[৪১] তার ইচ্ছায় ও কর্মে আপত্তি উত্থাপন করার কেউ নেই। উপরের আয়াতগুলোতে আল্লাহর ছিফাত হিসাবে ইচ্ছা, শক্তি এবং আদেশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত। আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলো তার জন্য সাব্যস্ত করা জরুরী।

ما وصف الله به نفسه في قوله تعالى

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে তার কথার (আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন) মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾

"আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন। যাতে মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে *(সূরা আল আন'আম ৬:১২৫)*।

.....

ব্যাখ্যা: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার ইচ্ছা করেন: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে সত্য কবুলের জন্য উপযুক্ত করেন, তার অন্তরকে তার জন্য প্রশস্ত করে দেন।[৪২] مِنْ

---

৪১. যাতে মানুষের জন্য উপকার ও কল্যাণ রয়েছে এবং যা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা তা হালাল করেন। আর ক্ষতিকর এবং যাতে অকল্যাণ রয়েছে, তা হারাম করেন। যেমন শূকর, মৃত জন্তু ইত্যাদি মানুষের জন্য ক্ষতিকর বলেই হারাম করেছেন।

৪২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান ও হিদায়াতকে ভালোবাসে এবং সেদিকে স্বীয় ইচ্ছাকে ধাবিত করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ঈমানের পথ সহজ করে দেন ও তাকে সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর চলতে সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও আনুগত্যের কাজকে পছন্দ করে না, কুরআন- হাদীছের

শব্দটি فعل مضارع কে জযমদাতা এবং ইসমে শর্ত। يُرِدْ ফেলে (ক্রিয়া) মুযারেটি (ভবিষ্যত কালীন ক্রিয়া) শর্ত হিসাবে জযম যুক্ত।

আর **يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ "তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন"**। বাক্যটি শর্তের জবাব হিসাবে مجزوم (জযম যুক্ত)। الشرح অর্থ হচ্ছে الشق (বিদীর্ণ করা, চেরা, ফাটানো ইত্যাদি)। এর মূল অর্থ হচ্ছে التوسعة (প্রশস্ত করা)। বলা হয়ে থাকে شرحت الأمر। তথা বিষয়টিকে প্রশস্ত করলাম। এই কথা আপনি ঠিক ঐ সময় বলেন, যখন আপনি তা প্রশস্ত করে বর্ণনা করেন এবং খোলাখুলি বয়ান করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ঈমান ও তাওহীদ কবুলের তাওফীক দেন এবং তার অন্তরকে সত্য কবুলের জন্য উপযুক্ত করেন, তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা সত্য দীন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেন। এর ফলে সে উন্মুক্ত হৃদয়ে ইসলাম কবুল করে নেয়।

وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তা'আলা সত্য কবুল করা হতে ফিরিয়ে রাখতে চান, **يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا** তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। ফলে তা সত্য কবুল করার জন্য উন্মুক্ত হয় না। **حَرَجًا** অর্থাৎ একদম সংকীর্ণ করে দেন, যার ফলে অন্তরে ঈমান ও হিদায়াত প্রবেশের কোন রাস্তাই থাকে না। ضَيِّقًا শব্দের অর্থকে জোরালো করার জন্য حرجا শব্দটি আনয়ন করা হয়েছে।

كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ মনে হয় সে কষ্ট করে আকাশের দিকে উঠার চেষ্টা করছে: يصعد শব্দটি মূলত يتصعد ছিল। تا-কে সোয়াদ দ্বারা পরিবর্তন করে সোয়াদের মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। অর্থাৎ যার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে, তার জন্য হিদায়াত কবুল করে নেয়ার বিষয়টি ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে কোন অসম্ভব কাজ সম্পাদন করার জন্য বার বার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে তা সম্পাদন করতে পারছে না। যেমন কেউ আকাশে উঠার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। যেই কাফিরের উপর ঈমান কবুল করে নেয়া খুব ভারী অনুভব হয়, তাকে ঐ ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আকাশে উঠার মতো সাধ্যাতীত কাজ সম্পাদন করতে চায়। উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য ইরাদাহ সাব্যস্ত হলো। কাউকে হিদায়াত

কথা যার কাছে ভালো লাগে না এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনার প্রতিও যে কর্ণপাত করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎপথে চলার তাওফীক দেন না এবং তাকে সাহায্যও করেন না।

করা আবার কাউকে গোমরাহ করা উভয়টিই আল্লাহর ইচ্ছাধীন।[৪৩]

ইরাদাহ বা ইচ্ছার প্রকারভেদ[৪৪]

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের আগ্রহের অনুরূপ ব্যবহারই করে থাকেন। কেউ যদি কল্যাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহ তাকে কল্যাণের দিকেই নিয়ে যান। আর যদি খারাপ পথে ধাবিত হয়, তাকে শাস্তি স্বরূপ সেদিকেই নিয়ে যান। নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দরিদ্র মুসলিমদের থেকে বিমুখ হয়ে মক্কার নের্তৃস্থানীয় কাফিরদের হিদায়াতের প্রতি গুরুত্ব দিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ধমক দিয়ে এই আয়াতগুলো নাযিল করেন,

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ﴾

"ভ্রু-কুঁঞ্চিত করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ সেই অন্ধ লোকটি তার কাছে এসেছে। তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেত। অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো। আর যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায়। তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও। অথচ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার উপর এর কোন দায়িত্ব থাকে না। আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে। তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো। কখনো নয়, এটি তো একটি উপদেশ। যার ইচছা এটি গ্রহণ করবে"। (সূরা আবাসা: ১-১২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (٤) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴾

"আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা ধরনের। কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন সম্পদ দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে ও আল্লাহর নাফরমানি থেকে দূরে থেকেছে। এবং সত্য কথাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। অচিরেই তাকে আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো। অর্থাৎ তাকে আনুগত্যের কাজ করার তাওফীক দিবো এবং তার জন্য তা সহজ করে দিবো। আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে। এবং সত্যকে মিথ্যা গণ্য করেছে। অচিরেই তাকে আমি কঠিন পথের সন্ধান দেবো"। (সূরা লাইল: ৫-১০) অর্থাৎ আমি তাকে কুফরী ও নাফরমানীর পথ সহজ করে দেবো। ফলে তার জন্য ঈমান ও আনুগত্যের পথে চলা দুষ্কর হয়ে যায়। কুরআনের অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি ভালো ও ন্যায় পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর অনুগ্রহ করেন এবং তাকে সেই পথে চলার তাওফীক দান করেন।

আর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কুফরী ও নাফরমানীর পথে চলে, আল্লাহ তাকে তার অবস্থাতেই ছেড়ে দেন এবং এটি সেই তাক্বদীর অনুযায়ীই হয়ে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম মুতাবেক আগেই লিখে রেখেছেন। (ইবনে কাছীর)

৪৪. আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কিত মাসআলাটি আক্বীদাহর মাসআলাসমূহের অন্যতম একটি গুরুত্বপূণ বিষয় হওয়ার কারণে তা অধিকতর খোলাসা বা স্পষ্ট করার জন্য এ বিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর বিশ্লেষণটি এখানে যোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

তিনি বলেন, ইরাদাহ তথা আল্লাহর ইচ্ছা দুই প্রকার। (১) ইরাদায়ে কাওনীয়া। এটি সম্পূর্ণরূপেই المشيئة-এর সমার্থবোধক। সেই হিসাবে أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) এবং شاء الله (আল্লাহ চেয়েছেন)এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রকার ইরাদার ব্যাপারে **প্রথম কথা** হচ্ছে, যেসব বিষয় ও কাজ আল্লাহ ভালোবাসেন এবং যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না, তার সব ক্ষেত্রেই এ প্রকার ইরাদাহ বিদ্যমান থাকে।

শাইখ বলেন, এর উপর ভিত্তি করে আপনাকে যদি কেউ যখন প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কি কুফুরীর ইচ্ছা করেন? অন্য কথায় কুফুরীও কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? উত্তরে আপনি বলুন, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছার অধীনে কুফুরীও সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা যদি সৃষ্টিগতভাবে কুফুরী হওয়ার ইচ্ছা না করতেন, তাহলে কখনোই পৃথিবীতে কুফুরী হতো না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইরাদায়ে কাওনীয়ার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যার ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই সংঘটিত হয়। অন্য কথায় আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই হয় এবং তা না হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

(২) দ্বিতীয় প্রকার ইরাদাহ হচ্ছে ইরাদায়ে শারঈয়া। এটি المحبة (ভালোবাসা) এর সমার্থক। এ প্রকার ইরাদায় أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) অর্থ হলো, أحب الله আল্লাহ ভালোবেসেছেন ও পছন্দ করেছেন।

এ প্রকার ইরাদার ক্ষেত্রে **প্রথম কথা** হচ্ছে, এটি আল্লাহর ভালোবাসা ও পছন্দের সাথে খাস বা নির্দিষ্ট। সুতরাং তিনি ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে কুফুরী ও পাপাচার পছন্দ করেন না। আর **দ্বিতীয় কথা** হচ্ছে, তাতে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু কখনো তা হয় আবার কখনো হয় না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দা তার ইবাদত করুক। কিন্তু জরুরী হিসাবে সকল সৃষ্টির পক্ষ হতে এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয় না। দেখা যাচ্ছে কিছু সংখ্যক মানুষ তার ইবাদত করে আর অন্যরা তার ইবাদত করে না। কিন্তু ইরাদায়ে কাওনীয়া এর বিপরীত। সেখানে আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবেই হবে।

সুতরাং দু'দিক থেকে দু'প্রকার ইরাদার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। (১) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে যা ইচ্ছা করা হয়, তা সংঘটিত হওয়া অবধারিত। আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে তা আবশ্যক নয়।

(২) ইরাদায়ে শারঈয়া কেবল ঐ সব বস্তুর মধ্যেই সীমিত, যা হওয়া আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। আর ইরাদায়ে কাওনীয়া হচ্ছে ব্যাপক। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন আর যা পছন্দ করেন না, উভয়টিই এর মধ্যে শামিল।

এর উপর ভিত্তি করে এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা কিভাবে এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালোবাসেন না? অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা কিভাবে কুফুরী, পাপাচার এবং সীমালঙ্ঘন হওয়ার ইচ্ছা করেন? অথচ তিনি তা পছন্দ করেন না।

এর উত্তর হচ্ছে অন্যায় ও ক্ষতিকর বস্তু সংঘটিত হওয়া একদিক থেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং অন্যদিক বিচারে তা অপছন্দনীয়। এর মধ্যে যে বিরাট কল্যাণ নিহিত থাকে, সে দিক বিচারে এটি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এতে যেহেতু আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে, সে হিসাবে এটি তার কাছে

فالإرادة الربانية نوعان:

আল্লাহ তা'আলার إرادة ইরাদাহ (ইচ্ছা) দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: إرادة كونية قدرية ইরাদায়ে কাওনীয়া কাদারীয়া বা ক্ষমতাগত ইচ্ছা। অর্থাৎ ভালোমন্দ এমনকি পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত হয়েছে। এই প্রকার ইরাদাহ এবং المشيئة একই জিনিস। উভয়টি পরস্পর সমার্থবোধক। এ প্রকার ইচ্ছার উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا﴾

"আমি যখন কোনো জনবসতিকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার সমৃদ্ধিশালী লোকদেরকে নির্দেশ[৪৫] দেই, ফলে তারা সেখানে নাফরমানী করতে থাকে *(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

অপ্রিয়। সুতরাং একই জিনিস দুইদিক বিচারে একই সাথে প্রিয় এবং অপ্রিয় হওয়াতে কোন দোষ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মানুষ তার কলিজার টুকরা শিশু সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। যাতে করে ডাক্তার শিশুর পেট ফেড়ে ভিতর থেকে দূষিত জিনিস বের করে দেয়। অথচ অন্য কেউ তার শিশুর গায়ে সুইয়ের একটি খোঁচা দিতে চাইলেও সে রাজী হয় না বরং সে তার সাথে ঝগড়া করে। অপরপক্ষে সে নিজেই পেট ফেড়ে ফেলার জন্য শিশুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার শিশুর পেট কাটে ও চিরে ফেলে। পিতা এ দৃশ্য খুশি মনেই দেখে। এতে তার শিশুর কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কি কারণে সে রাজী হয়? রাজী হওয়ার কারণ হলো, এ মূহুর্তে শিশুর কষ্ট হলেও অন্য কারণে অর্থাৎ শিশুর জন্য এমন এক বিরাট স্বার্থ ও কল্যাণ হাসিলের আশায় সে একটি অপছন্দনীয় বিষয় পছন্দ করে, যা ভবিষ্যতে অর্জিত হবে।

৪৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মত রয়েছে। (১) আয়াতে 'নির্দেশ' মানে প্রকৃতি, সৃষ্টি ও শাশ্বত বিধানগত নির্দেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রকৃতি ও শাশ্বত বিধান হিসাবে সবসময় এমনটিই হয়ে থাকে। যখন কোন জাতির ধ্বংস হবার সময় এসে যায়, তার বিত্তবানরা ফাসিক হয়ে যায়। আর ধ্বংস করার ইচ্ছা করা মানে এ নয় যে আল্লাহ বিনা কারণে কোন নিরপরাধ জনবসতি ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, বরং এর মানে হচ্ছে, যখন কোন জনবসতি অসৎকাজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন তখন এ সিদ্ধান্তের প্রকাশ এ পথেই হয়ে থাকে। সম্মানিত শাইখ এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। (২) এ আয়াত বা অনুরূপ আয়াত থেকে এটি বুঝার কোন সুযোগ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার সমৃদ্ধ ও বিত্তশালীদেরকে পাপ কাজের আদেশ দেন এবং তারা সে আদেশেই পাপ কাজ করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। যেমনটি মনে করে থাকে জাহেলের দলেরা; বরং অধিকাংশ আলিমের মতে আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ﴾

"আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে দুর্ভাগ্য কবলিত করার ফায়ছালা করেন তখন তা প্রতিহত হয় না *(সূরা আর রা'দ ১৩:১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

"আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষদেশ খুব সংকীর্ণ করে দেন"।

দ্বিতীয় প্রকার: ইরাদাহ হচ্ছে إرادة دينية شرعية ইরাদায়ে দ্বীনিয়া শারঈয়া অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শরী'আতগত ইচ্ছা। এই প্রকার ইচ্ছার মাধ্যমেই তিনি তার বান্দাদের উপর শরী'আতের সকল হুকুম-আহকাম বিধিবদ্ধ করেছেন। এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾

"আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করার ইচ্ছা করেন *(সূরা আন নিসা ৪: ২৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾

"আল্লাহ তোমাদের উপর সংকীর্ণতা চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে"। *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)*

যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তারা তার অপব্যবহর করে এবং পাপ কাজে লিপ্ত হয়। আল্লাহর আদেশ লংঘনের ফলে তারা ধ্বংসের হকদার হয় বলেই আল্লাহ তাদেরকে পূর্বের নির্ধারণ ও ফায়ছালা অনুযায়ী ধ্বংস করেন; এমনটি নয় যে, আল্লাহর আদেশেই পাপ কাজ হয় এবং আল্লাহর হুকুমেই ধ্বংস হয়। কেননা কুরআনের একাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তা'আলা কেবল আনুগত্যের আদেশ করেন। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজের আদেশ করেন না এবং অন্যায়, পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনকে পছন্দও করেন না।

ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়ার মধ্যে পার্থক্য:

(১) ইরাদায়ে কাওনীয়া তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছার মাধ্যমে যা হয়, আল্লাহ কখনো তাকে ভালোবাসেন ও তাতে সন্তুষ্ট থাকেন আবার কখনো তা তিনি ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। আর ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে যা সংঘটিত হয়, তাকে তিনি অবশ্যই ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন। সুতরাং সকল প্রকার পাপকাজ এবং অকল্যাণও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে শামিল। সে হিসাবে সৃষ্টি ও বিধানগত দিক থেকে তিনি পাপাচার সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজকে ভালোবাসেন না এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকেন না। তিনি তাতে লিপ্ত হওয়ার আদেশও করেননি; বরং তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

(২) ইরাদায়ে কাওনীয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা সৃষ্টি করা মূল উদ্দেশ্য হয় না; বরং তা অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইবলীস এবং সকল প্রকার পাপাচার ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে মুমিন বান্দাগণ নফ্সে আম্মারা ও শয়তানের সাথে সর্বদা জিহাদে লিপ্ত থাকে। শয়তানের প্ররোচনা ও ধোঁকায় নিপতিত হয়ে মানুষ পাপকাজে লিপ্ত হয়ে গেলেও আল্লাহর কাছে তারা তাওবা করে এবং ক্ষমা চায়। এমনি আরো ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও অকল্যাণ সৃষ্টি করেছেন।[৪৬]

---

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা শুধু ক্ষতি ও অকল্যাণের উদ্দেশ্যেই অকল্যাণ সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে মুক্ত। প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ হিকমত রয়েছে। আমরা কখনো তা থেকে কিছু বুঝতে পারি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অকল্যাণ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর হিকমত বুঝতে পারি না।

বিষয়টি সহজভাবে বুঝানোর জন্য কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন কুরাইশ নেতা ও মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তি আবু তালিবের ঈমান না আনা এবং ক্বিয়ামতের দিন তার শাস্তি ভোগ করার উদাহরণটি পেশ করা যেতে পারে। সম্ভবত তার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার হিকমতটি এমন ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার বাপ-দাদাদের দীনের উপর রেখেই তার দ্বারা তার প্রিয় বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিফাযত করবেন এবং মুসলমানদের চরম বিপদের সময় এমন কল্যাণ সাধন করবেন, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইতিহাসে লেখা থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আবু তালেবকে তার পিতৃধর্মে লিপ্ত রেখে মুসলমানদের জন্য প্রচুর কল্যাণ সাধন করেছেন। কিন্তু সে যেহেতু তার ভাতিজার নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি, তাই আল্লাহ তা'আলার ন্যায় বিচারের কারণেই পরকালের নিয়ামত তার ভাগ্যে জুটবে না।

বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে বুঝানোর জন্য খিযির (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক মিসকীন লোকদের নৌকা ছিদ্র করা ও একজন নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করার উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। এর পিছনে আল্লাহ তা'আলার কী হিকমত লুকায়িত ছিল- মূসা (আলাইহিস সালাম) প্রথমে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি খিযির (আলাইহিস সালাম) এর কাজের জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। পরক্ষণেই খিযির (আলাইহিস সালাম) স্বীয় কর্ম-কাণ্ডের হিকমত খোলাসা

করে বলে দিয়েছেন। মূলতঃ শুধু শুধু ক্ষতির জন্যই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় কোন অন্যায় কর্ম সংঘটিত হয় না। আল্লাহর প্রত্যেকটি কাজের পিছনেই কোন না কোন হিকমত ও কল্যাণ থাকে।

নৌকা ছিদ্র করা মিসকীন লোকদের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু তার মধ্যে যেই কল্যাণ রয়েছে, তা সেই ক্ষতির চেয়ে বহুগুণ উপকারী। কারণ ভালো নৌকাগুলো জালেম বাদশাহর লোকেরা ছিনিয়ে নেয়। ত্রুটিপূর্ণ নৌকার উপর তারা হস্তক্ষেপ করে না। সুতরাং নৌকা একেবারেই না থাকার চেয়ে ছিদ্র অবস্থায় তা থাকা তাদের জন্য কল্যাণকর।

খিযির (আলাইহিস সালাম) যেহেতু জানতে পারলেন ছেলেটি বড় হয়ে কাফির হবে এবং পিতামাতাকে কষ্ট দিবে, তাই হত্যা করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অন্যায় হলেও এ হত্যাকাণ্ডের পিছনেই রয়েছে ছেলেটির জন্য কল্যাণকর এবং তার পিতামাতার জন্যও কল্যাণকর। ছেলেটির জন্য এ বয়সে নিহত হওয়া এ দিক থেকে উপকারী যে, এখনো তার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়নি। সে নিহত হওয়ার পর জান্নাতে যাবে। অপরপক্ষে, বড় হয়ে কুফুরী ও পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামে যাওয়া তার জন্য ক্ষতিকর ছিল। ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে পিতামাতাকে এমন সৎ সন্তান দান করবেন, যারা পিতামাতার প্রতি আনুগত্য থাকবে।

এমনি প্রচুর বৃষ্টি অনেক সময় কারো জন্য ক্ষতিকর হলেও তাতে আম মানুষের জন্য প্রচুর কল্যাণ থাকে। অনেক সময় বন্যায় কারো ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাড়িঘর নষ্ট হওয়া অবশ্যই তাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু এর মধ্যেও তাদের কল্যাণ থাকতে পারে। যেমন ধরুন ঝড়ে কোন গ্রামের কতিপয় লোকের বাড়িঘর ধ্বংস হলো আবার কারো বাড়িঘর অক্ষত রইল। যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো তারা মনক্ষুন্ন হলো। আর যাদের বাড়িঘর নষ্ট হলো না, তারা খুশি হলো। পরক্ষণই যখন সরকারী ঘোষণা আসল, যাদের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে, তাদের প্রত্যেককে উত্তরায় একটি বাড়ি দেয়া হবে, তখন যাদের বাড়িঘর ধ্বংস হয়নি, তারাও কামনা করল যে, তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হলেই ভালো হতো। সুতরাং আল্লাহর প্রত্যেক কাজই ভালো। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন কোন কাজ ক্ষতিকর দেখা যায়।

আল্লাহ তা'আলা মদপানসহ অন্যান্য সকল ক্ষতিকর কাজ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কাজে লাগিয়ে সে আল্লাহর এ নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে মানুষ মদপানে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। শুধু তাই নয় এ তাওবাও তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদতে পরিণত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মদ পান করে শুধু আল্লাহর নাফরমানী করা হোক এই জন্যই আল্লাহর ইচ্ছায় মদ সৃষ্টি হয়নি; বরং সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরী হয় কিংবা ভুল করে মদ পান করা হলেও তা থেকে তাওবা করে মদ্যপায়ী আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হতে পারে।

মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা অযথা কোন কিছুই সৃষ্টি করেন না এবং তার কোন কর্মও হিকমত ছাড়া সংঘটিত হয় না। যা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারি না। তাই আমাদের সকল অবস্থাতেই আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা কিছু নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত জিনিস নির্ধারণ করেন এবং তা সংঘটিত করেন। কিছু কিছু জিনিস প্রিয় হওয়া সত্ত্বে তা সংঘটিত করেন না। কেননা যেই নিকৃষ্ট জিনিসটি তিনি নির্ধারণ করেন, তার পথ ধরে অন্য এমন একটি প্রিয় জিনিস (ফলাফল) অর্জিত হয়, যা আল্লাহর কাছে ঐ প্রিয় বস্তু হতেও অধিক প্রিয় হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ঐদিকে শারঈ ইচ্ছার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তা মূলতঃই উদ্দেশ্য হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও শরী'আতগত এই উভয় দিক

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾

"আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে। তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমনি আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ্ জানতে চান, কারা ঈমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর আল্লাহ্ অত্যাচারীদেরকে ভালোবাসেন না। আর এ কারণে আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করার ইচ্ছা করেন এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৯-১৪১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চান যে, মুমিনদের মধ্য হতে এমন কতিপয় মুমিন বিদ্যমান থাকুক, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, তার সন্তুষ্টির আশায় তাদের জীবন কুরবানী করবে এবং শহীদ হয়ে তার নৈকট্য হাসিল করবে। এটি আল্লাহর কাছে সমস্ত মানুষের ঈমান আনয়ন থেকেও উত্তম। এই জন্যই তিনি নির্ধারণ করেছেন যে, পৃথিবীতে কাফির থাকুক, কুফুরী থাকুক এবং কাফিরদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকুক। যাতে করে তার বান্দাদের মধ্য হতে কতিপয়কে শহীদ হিসাবে গ্রহণকরতে পারেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ

ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা যদি গুনাহ না করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবেন এবং তোমাদের বদলে অন্য এমন জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে। অতঃপর তারা তাওবা করবে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। (ছ্বহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৭১৪১)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, বান্দারা পাপ কাজ করবে এবং তা করার পর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকবে। অপরাধ হয়ে যাওয়ার পর তাওবা করা আল্লাহর কাছে একাধারে আনুগত্যের উপর বিদ্যমান থাকার চেয়ে অধিক প্রিয়। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য পাপকাজ নির্ধারণ করেছেন। ঠিক তেমনি বান্দার দ্বারা পাপ হওয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার الغفور গফুর (ক্ষমাকারী), الرحيم রহীম (দয়াকারী) ইত্যাদি অতি সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাতের প্রভাব প্রকাশিত হয়। সুতরাং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় বিষয় তথা পাপ কাজ থাকার কারণেই আল্লাহর অনেক সুমহান গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই দেখা গেল আল্লাহ তা'আলা যেসব অকল্যাণ সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, তাতে অন্যান্য প্রিয় ফলাফল অর্জিত হয়। সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা আবশ্যক। বলাবহুল্য যে, পূর্বোক্ত হাদীছে আল্লাহ পাক আদৌ পাপের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছেন না; বরং পাপ হয়ে গেলে যাতে বান্দা নিরাশ হয়ে ক্ষমা চাওয়া থেকে বিরত না হয়, তা বলা উদ্দেশ্য। তাই তো মূলনীতি হচ্ছে, পাপ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর ভয়কে প্রাধান্য দেয়া, যাতে পাপ না সংঘটিত হয়। পক্ষান্তরে শত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাপ যদি হয়েই যায়, তাহলে এহেন মুহূর্তে আশাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যাতে ক্ষমা চাওয়ার আগ্রহ হারিয়ে না যায়।

থেকেই ইচ্ছা করেছেন যে, বান্দারা তার আনুগত্য করুক। কেননা তিনি আনুগত্যের কাজকে ভালোবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

(৩) আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত ইচ্ছা অবশ্যই সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, সাথে সাথে তা সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু বলেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। *(সূরা ইয়াসীন ৩৩:৮২-৮৩)*

আর শারঈ ইচ্ছার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা সকল ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক নয়। কখনো তা সংঘটিত হয়, আবার কখনো হয় না।

একটি জ্ঞাতব্য বিষয়:

অনুগত একনিষ্ঠ মুমিন মুখলিছ বান্দার মধ্যে ইরাদায়ে কাওনীয়া এবং ইরাদায়ে শারঈয়াহ উভয়টিই একত্রে বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ও নির্ধারণের দিক থেকে সৎকাজ সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য ইরাদায়ে শারঈয়ার মাধ্যমে আদেশ দিয়েছেন।[৪৭] আল্লাহর যেই বান্দা আল্লাহর এই হুকুম কবুল করে নিয়েছে, তার মধ্যে আল্লাহর দু'টি ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে।

আর অপরাধীর অপরাধের মধ্যে শুধু ইরাদায়ে কাওনীয়াই বাস্তবায়ন হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের পথ বর্জন করে, তার দ্বারা অপরাধটি হয় শুধু এই

---

৪৭. ইরাদায়ে শারঈয়ার দ্বারা যা হয়, তা আল্লাহর কাছে প্রিয় হলেও তা সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ও বাস্তবায়ন হয় না। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য যা কিছু ইসলামী শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং যত আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা এই প্রকার ইরাদার সাথে খাস। যেমন ছ্বলাত কায়েম করা, সিয়াম রাখা, যাকাত প্রদান করাসহ ইত্যাদি আরো অনেক আমল করার আদেশ। এই কাজগুলো বাস্তবায়ন হওয়া আল্লাহর কাছে প্রিয়। সে সাথে দৃষ্টি নত রাখা, চুরি-ডাকাতি না করা, যেনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি আরো অনেক হারাম কাজ থেকে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ সব কাজ থেকে বান্দার বিরত থাকা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। কতক বান্দার দ্বারা এ প্রকার ইরাদাহ বাস্তবায়িত হয়। আবার অনেকের দ্বারা বাস্তবায়িত হয় না। না হওয়ার কারণ হলো আল্লাহ সকল মানুষকে সৎকাজের উপর বাধ্য করেননি। তিনি ইচ্ছা করলে বাধ্য করতে পারতেন, সেই ক্ষমতা তার অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তা না করে পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে ভালো-মন্দের যে কোন একটি করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। কুরআন, সুন্নাহর দলীল এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা মানুষের এ স্বাধীনতার বিষয়টি প্রমাণিত ও স্বীকৃত।

হিসাবে যে, আল্লাহ তা'আলা উক্ত অপরাধের স্রষ্টা;[৪৮] তাতে আদৌ আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টি থাকে না।

আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়:

যারা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত উভয় প্রকার ইরাদাহ সাব্যস্ত করেনি এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেনি, তারা পথভ্রষ্ঠ হয়েছে। যেমন জাবরীয়া এবং কাদরীয়া (মু'তাযিলা) সম্প্রদায়ের লোকেরা। জাবরীয়ারা শুধু আল্লাহর ইরাদায়ে কাওনীয়া সাব্যস্ত করেছে। কাদরীয়ারা শুধু আল্লাহ তা'আলার ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত করেছে। আর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার ইরাদাই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও করেছে।[৪৯]

---

৪৮. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে ভালো বা মন্দের যে কোন একটি বেছে নেয়ার যে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছেন, মানুষ তার সেই স্বাধীনতার অপব্যবহর করে বলেই তার দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়। আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন; এ জন্য নয়। সে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকেই অবগত আছেন। ফলে তিনি তা লিখিয়েছেন। তাই এ কথা বলার আদৌ কোনো অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা লিখিয়ে রেখেছেন বলেই বান্দারা পাপ করে থাকে।

৪৯. আল্লাহর ইচ্ছার ক্ষেত্রে জাবরীয়া ও কাদরীয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ ভালোভাবে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা করার প্রয়োজন রয়েছে। জাবরীয়ারা বলে থাকে ভালোমন্দ সবকিছুই আল্লাহর একটিমাত্র ইচ্ছা তথা সৃষ্টিগত ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয় এবং আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু তার এই একটি ইচ্ছারই বাস্তবায়ন হয়। এমনকি বান্দার কর্মে সে স্বাধীনও নয়। তারা মনে করে এতে বান্দার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে খর্ব করা হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ এবং বাস্তবতা তাদের এই মতবাদকে বাতিল প্রমাণিত করেছে।

আর কাদরীয়া ও মু'তাযিলাদের মতে আল্লাহর জন্য শুধু ইরাদায়ে শারঈয়া সাব্যস্ত। অর্থাৎ আল্লাহ শুধু তার বান্দাদেরকে ভালো কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। আর বান্দারা তাদের কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কথায় তারাই তাদের কর্মের স্রষ্টা ও ইচ্ছা পোষণকারী। এমনকি বান্দার দ্বারা কাজ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেনও না। (নাউযুবিল্লাহ) এটিও একটি বাতিল ও তাওহীদ বিরোধী কথা। কারণ (নাউযুবিল্লাহ) এতে একাধিক স্রষ্টা থাকা আবশ্যক হয়।

এ সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে কাদরীয়া ও জাবরীয়া সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের কথার জবাব বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আমাদের অন্যতম অনুবাদগ্রন্থ শারহুল আক্বীদাহ আত্-তাহাবীয়া পড়ার অনুরোধ করা গেল। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)

٦ –إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله

৬। আল্লাহ তা'আলা তার অলীদেরকে ঠিক সেভাবেই ভালোবাসেন, যেভাবে তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।[৫০]

وقوله: {وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} {فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، وقوله: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ}. وقوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ} وقوله: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ}.

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

---

৫০. আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত (বিশেষণ) হচ্ছে তিনি তার বন্ধুদেরকে ভালোবাসেন। অন্যান্য ছিফাতের মতোই ভালোবাসাও আল্লাহর একটি ছিফাত। আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদর জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এটি তার জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে যে কয়টি আয়াত উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়াও এমর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"জান্নাত তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে। যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। মূলতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন"। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৩-১৩৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

"যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং তাকওয়া অর্জন করবে, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন। (সূরা আলে-ইমরান: ৭৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কতিপয় ব্যক্তির কাজ এবং স্বভাবকে ভালোবাসেন। যেমন তিনি মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, মুত্তাকী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী এবং অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তবে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা বান্দার ভালোবাসার মত নয়।

"আর তোমরা ইহসান (অনুগ্রহ) করো, কেননা আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালোবাসেন"। *(সূরা আল বাকারা ২:১৯৫)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"সুবিচার করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন" *(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

"কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো। কারণ আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন"। *(সূরা আত তাওবা ৯:৭)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা তাওবা করে এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন"। *(সূরা আল বাকারা ২:২২২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ ﴾

"বলো! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾

"আল্লাহ এমন বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন। আর তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবেন *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ﴾

"আল্লাহ সেসব লোকদের ভালোবাসেন, যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সিসা গলিয়ে ঢালাই করা এক মজবুত দেয়াল" *(সূরা আছ ছফ ৬১:৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

"তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু"। *(সূরা আল বুরুজ ৮৫: ১৪)*

.....

ব্যাখ্যাঃ যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত إرادة (ইচ্ছা) সাব্যস্ত করেছে, তা উল্লেখ করার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে ঐসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহু তা'আলার আরেকটি ছিফাত المحبة (ভালোবাসা) সাব্যস্ত করে। যারা বলে আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালোবাসা একই সমান এবং তারা এই উভয় ছিফাতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করে না, এই অধ্যায়ে শাইখুল ইসলাম তাদেরও প্রতিবাদ করেছেন। তারা বলে থাকে, আল্লাহর ইচ্ছা ও ভালোবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং উভয়ের প্রত্যেকটির জন্য অন্যটি আবশ্যক। সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তা অবশ্যই ভালোবাসেন। পূর্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন জিনিসেরও ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালোবাসেন না এবং তাকে পছন্দও করেন না। যেমন কাফিরের কুফরী এবং সমস্ত পাপাচার। এগুলোকে তিনি স্বীয় ইচ্ছায় বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তা বান্দার দ্বারা সংঘটিত হওয়া তিনি পছন্দ করেন না। আর তিনি এমন বিষয়েরও ইচ্ছা করেন, যা তিনি ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন। যেমন ঈমান আনয়ন করা এবং সকল প্রকার আনুগত্যের কাজকে তিনি ভালোবাসেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحْسِنُوٓاْ অর্থাৎ তোমরা ইহসান করো। এটি হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে আদেশ। তিনি তার বান্দাদেরকে ইহসান করার আদেশ করেছেন। পূর্ণরূপে এবং সর্বোত্তমভাবে কর্ম সম্পাদন করাকে ইহসান বলা হয়। ইহসান হচ্ছে আনুগত্যের সর্বোচ্চ পর্যায়।[৫১]

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ **নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদেরকে ভালোবাসেনঃ** এটি হচ্ছে ইহসানের আদেশ করার কারণ। আল্লাহ তা'আলা ইহসান করার আদেশ করেছেন। কেননা তিনি ইহসান করাকে এবং যারা ইহসান করে, তাদেরকে

---

৫১. الإحسان এর একাধিক প্রকার রয়েছে। (১) দীনের সর্বোচ্চ স্তরকে ইহসান বলা হয়। এটি বান্দা ও তার রবের মধ্যকার স্তর। এটি শুধু আল্লাহর জন্যই সাব্যস্ত। হাদীছে এসেছে, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) যখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুন, তখন তিনি বললেন,

(أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)

"ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ। যদি তাকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন" (২) মানুষের পারস্পরিক অনুগ্রহ এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য অর্থ ব্যয় করাকেও ইহসান বলা হয়। (৩) পরিপূর্ণ ও সর্বোত্তমভাবে কাজ করার নামও ইহসান।

ভালোবাসেন। বান্দারা যখন জানতে পারবে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহসান কারীদেরকে ভালোবাসেন, তখন তারা আদেশ পালনের জন্য উৎসাহ পাবে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَأَقْسِطُوا অর্থাৎ তোমরা ন্যায় বিচার করো। এখানে আল্লাহ তা'আলা ইক্বসাত করার আদেশ দিয়েছেন। ইক্বসাত হচ্ছে লেনদেন ও বিচার-ফায়ছালা করার সময় নিকটবর্তী ও দূরবর্তীর মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য না করে সকলের প্রতি ইনসাফ করার নাম।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন: এটি হচ্ছে ইনসাফের আদেশ করার কারণ। তিনি ইনসাফ করাকে ভালোবাসেন বলেই বান্দাদেরকে তা করার আদেশ দিয়েছেন। বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার দাবী হচ্ছে তিনি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ কাজেই যতক্ষণ তারা তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি রক্ষা করে চলবে ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য সোজা-সরল থাকো: অর্থাৎ মুশরিকরা যতক্ষণ তোমাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে চলবে এবং চুক্তির বরখেলাফ করবে না, তোমরাও ততক্ষণ তাদের সাথে সম্পাদিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলবে। এই সময়ের মধ্যে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালোবাসেন: এটি অঙ্গীকার ও চুক্তি ঠিক রাখার আদেশ করার কারণ। তিনি ওয়াদা-অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষা করার আদেশ করেছেন। কেননা এটি ঐ সমস্ত মুত্তাকীদের আমলের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, চুক্তি রক্ষা করা এবং তা ঠিক রাখা মুত্তাকীদের কাজ। ছাওয়াবের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার সাথে সাথে পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম التقوى।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন: تواب এর বহুবচন হচ্ছে التوابين। التوبة ক্রিয়ামূল থেকে এটি صيغة المبالغة তথা আধিক্য বাচক শব্দ। তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা। শরী'আতের পরিভাষায় পাপাচার থেকে ফিরে আসা এবং তা বর্জন করাকে التوبة বলা হয়। তাওবা শব্দটি বান্দার পক্ষ হতে ব্যবহৃত হলে এই অর্থ হবে।

আর যখন তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হবে, তখন التواب আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন বান্দা تواب (অধিক

তাওবাকারী) এবং আল্লাহ তা'আলা التواب তথা অধিক হারে বান্দার তাওবা কবুলকারী।

বান্দার তাওবা হচ্ছে তার মালিক ও রবের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহর তাওবা দুই প্রকার:

(১) বান্দাকে তাওবা করার তাওফীক দেয়া।

(২) বান্দার তাওবা কবুল করা।

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন: متطهر এর বহুবচন المتطهرين। এটি الطهارة ক্রিয়ামূল থেকে إسم فاعل। বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাকে তাহারাত বলা হয়। এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি দুই প্রকার লোককে ভালোবাসেন। তারা হচ্ছেন তাওবাকারী এবং পবিত্রতা অর্জনকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّه

বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

এ আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার শানে নুযুল বা কারণ হচ্ছে, যেমন ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এবং অন্যরা বলেছেন, একদল লোক দাবী করলো যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা পরীক্ষা করলেন। কেননা এই আয়াত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির বিপক্ষে ফায়ছালাকারী, যে আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে, কিন্তু সে মুহাম্মাদী তরীকার উপর নয়। বরং সে তার দাবীতে মিথ্যুক।

يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন: মুহাম্মাদী তরীকার অনুসরণ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে যে পরিমাণ ভালোবাসতে চাচ্ছ, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা অর্জন করতে পারবে। তোমাদের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি তোমাদের ভালোবাসার চেয়ে অনেক বেশী। **আল্লাহ তা'আলা বলেন,**

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

তাহলে আল্লাহ আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে।

এটি পূর্বোক্ত বাক্যের মধ্যে যে শর্ত রয়েছে, তার জবাব। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার দীন থেকে সরে পড়বে, তাহলে সে সরে যাক। তার বদলে আল্লাহ তা'আলা এমনসব লোক সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে তার মহান কুদরতের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলছেন, যেসব লোক তার দীনের সাহায্য করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং তার শরী'আত কায়েম করা হতে বিমুখ হবে, তিনি তাদের বদলে তাদের চেয়ে উত্তম লোক সৃষ্টি করবেন। তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা হবে সুউচ্চ। তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসবেন। তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেসব ছাহাবী ও তাবেয়ী রিদ্দার যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অতঃপর তাদের পরে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা আগমন করবে, তাদের মধ্য হতে যারা মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তারাও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করে ধন্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ আল্লাহ সেইসব লোকদের ভালোবাসেন যারা তার পথে লড়াই করে: এখানে আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়তার সাথে সংবাদ দিয়েছেন, যারা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন। যারা জান ও মাল দিয়ে কালেমায়ে তাওহীদকে বিজয়ী করার জন্য তার রাস্তায় জিহাদ করে, তাদেরকে তিনি ভালোবাসেন। صفاً অর্থাৎ তারা যুদ্ধের সময় নিজেদেরকে কাতারবন্দী করে নেয় এবং নিজেদের স্থান থেকে সরে যায় না।

كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ তারা যেন সিসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় এক মজবুত প্রাচীর: তারা সীসা ঢালা এমন প্রাচীরের ন্যায় পরস্পর কাতারবন্দী থাকে, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলিত থাকে। তাতে কোন প্রকার ছিদ্র এবং ত্রুটি থাকে না।

وهو الغفور তিনি ক্ষমাশীল: আল্লাহ তা'আলা অত্যাধিক ক্ষমাশীল। الغفر শব্দের অর্থ হচ্ছে الستر অর্থাৎ ঢেকে রাখা। গুনাহ করার পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাওবা করে আল্লাহ তা'আলা তার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ তার গুনাসমূহ ঢেকে রাখেন এবং তার অপরাধসমূহ মাফ করে দেন। আল্লাহর الودود নামটি الود থেকে নেওয়া হয়েছে। নির্ভেজাল ও পরিশুদ্ধ ভালোবাসাকে ودٌّ বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ওয়াদুদ। এর অর্থ হচ্ছে, যারা তার আনুগত্য করে, তিনি তাদেরকে খুব বেশী ভালোবাসেন।

আল্লাহ তা'আলা তার এ দু'টি সম্মানিত নাম الغفور এবং الودود–কে একসাথে উল্লেখ করার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার গুনাহ মাফ করেই ক্ষান্ত হন না; বরং তিনি প্রথমে বান্দাকে ক্ষমা করেন অতঃপর তাকে ভালোবাসেন।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন কোন ব্যক্তিকে, কোন কোন আমলকে এবং কিছু কিছু স্বভাব-চরিত্রকে ভালোবাসেন। তিনি কোন জিনিসকে ভালোবাসেন আবার তার হিকমতের দাবী অনুযায়ী কোন বিষয়কে ভালোবাসেন না। তিনি ইখলাসের সাথে আমলকারী, মানুষের প্রতি অনুগ্রহকারী, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকারী, মুত্তাকী, তার রসূলের আনুগত্যকারী, আল্লাহর পথে জিহাদকারী, তাওবাকারী, পবিত্রতা অর্জনকারী এবং অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে ভালোবাসেন। উপরের আয়াতগুলোতে উভয় পক্ষ হতেই ভালোবাসা সংঘটিত হয় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বান্দার পক্ষ হতে ভালোবাসা হয় এবং আল্লাহর পক্ষ হতেও হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّه

বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।

এখানে ঐ সব লোকের প্রতিবাদ রয়েছে, যারা উভয় পক্ষ হতেই ভালোবাসা সংঘটিত হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে। যেমন জাহমীয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা। তারা বলেছে, আল্লাহ ভালোবাসেন না। বান্দার পক্ষ হতেও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হয় না। আল্লাহর জন্য বান্দাদের ভালোবাসার ব্যাখ্যা তারা এভাবে করেছে যে, বান্দারা আল্লাহকে ভালোবাসে, এর মানে হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করাকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ তার বান্দাকে ভালোবাসেন, এর মানে হচ্ছে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন ও তাদেরকে ছওয়াব প্রদান করেন। এমনি আরো অনেক অপব্যাখ্যাই তারা করে থাকে। এই تأويل (অপব্যাখ্যা) সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতভাবেই তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার শানে যেরকম ভালোবাসা শোভনীয় হয়, তিনি সেভাবেই ভালোবাসেন। আল্লাহর ভালোবাসা তার অন্যসব ছিফাতের (বিশেষণের) মতোই। আল্লাহর ভালোবাসা মাখলুকের পরস্পরের ভালোবাসার মতো নয়।

٧ –إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وتعالى

৭। আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণ সাব্যস্ত

وقوله: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا} {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} {وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} {فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন, {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} "পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্ তা'আলার নামে শুরু করছি" *(সূরা আল ফাতিহা ১:১)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ "হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো"। *(সূরা মুমিন ৪০:৭)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ "এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান"। *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৪৩)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ "আর আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে"। *(সূরা আল 'আরাফ ৭:১৫৬)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ "তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন *(সূরা আল আন'আম ৬:৫৪)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿وَهُوَ الْغَفُورُالرَّحِيمُ﴾ "আর তিনি ক্ষমাকারী ও দয়ালু *(সূরা ইউনুস ১২:১০৭)।*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ "অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল"। *(সূরা ইউসুফ ১২:৬৪)*

.....

ব্যাখ্যা: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম এর ব্যাখ্যা পূর্বে কিতাবের শুরুতেই অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে আবার উল্লেখ করার কারণ হলো তাতে আল্লাহ তা'আলার অন্যতম

ছিফাত রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন পরের আয়াত গুলোতেও আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার الرحمن নামটি এমন একটি ছিফাতের প্রমাণ করে, যা তার পবিত্র সত্তার সাথে সদা প্রতিষ্ঠিত। আর الرحيم তার নামটি এমন ছিফাতের প্রমাণ করে, যার সম্পর্ক হয় রহমত প্রাপ্তদের সাথে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا **"এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান"**। কুরআনের কোথাও رحمن بهم বলা হয়নি। এতে বুঝা যায়, প্রথমটি আল্লাহ তা'আলার وصف (স্থায়ী বিশেষণ)এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি তার فعل বা ক্রিয়ার জন্য।[৫২] রহমান নামটি প্রমাণ করছে যে, রহমত আল্লাহ তা'আলার ওয়াস্ফ তথা স্থায়ী বিশেষণ। আর রহীম নামটি প্রমাণ করছে যে, তিনি স্বীয় রহমত দ্বারা সৃষ্টির উপর দয়া করেন।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا **হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো**। এখানে ঐ সব ফেরেশতাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা দয়াময় আল্লাহর আরশ বহন করে আছেন এবং যারা আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করছেন। তারা মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেন হে আমাদের রব! তুমি তোমার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছো। তোমার রহমত ও ইলম প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। رَّحْمَةً وَعِلْمًا শব্দদ্বয় ফায়েল হতে পরিবর্তিত হয়ে تمييز হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে। এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ও প্রশস্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুনিয়াতে প্রত্যেক মুমিন ও কাফির আল্লাহর রহমত উপভোগ করছে। আর আখিরাতে শুধু মুমিনগণই আল্লাহর রহমত পাবেন।

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا **এবং তিনি মুমিনদের প্রতি খুবই দয়াবান:** এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি মুমিনদের প্রতি দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত দয়ালু। দুনিয়াতে তাদের উপর আল্লাহর রহমত এভাবে হয়েছে যে, তিনি তাদেরকে সে সত্যের সন্ধান দিয়েছেন, যা অন্যরা পায়নি এবং তাদেরকে এমন পথ

---

৫২. এ থেকে বুঝা যাচ্ছে রহমান নামটি আল্লাহর যে গুণ বুঝায়, তা আল্লাহ তা'আলার সাথে সদা যুক্ত। এর মানে হচ্ছে রহম করার মতো কোন সৃষ্টি পাওয়া গেলেও তিনি রহমান আর না পাওয়া গেলেও তিনি রহমান। আর রহীম নামটি কেবল তখনই আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন রহম করার মতো মাখলুক পাওয়া যাবে।

দেখিয়েছেন, যা থেকে অন্যরা গোমরাহ হয়েছে। আর আখিরাতে তাদের উপর এভাবে রহমত করবেন যে, তিনি তাদেরকে ভয়াবহ বিপদের দিন নিরাপদ রাখবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

অত্র আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলার রহমত ও ক্ষমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিম-কাফির তথা প্রত্যেক সৃষ্টিই আল্লাহর রহমত উপভোগ করছে। কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর রহমত শুধু মুমিনদের প্রতিই সীমিত হবে। সে দিন আল্লাহ তা'আলা শুধু তার মুমিন বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ **তোমাদের প্রতিপালক রহমত করাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন:** অর্থাৎ তিনি তার পবিত্র সত্তার উপর রহমত করাকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এটি তার পক্ষ হতে দয়া ও অনুগ্রহ স্বরূপ। এটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও নির্ধারণগত লিখা, তার উপর অন্য কেউ লিখে দেয়নি।

وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ **আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াময়:** আল্লাহ তা'আলা এখানে তার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ক্ষমা ও দয়ার বিশেষণে বিশেষিত। ঐ ব্যক্তির জন্যই কেবল তার ক্ষমা ও রহমত, যে তার নিকট তাওবা করে এবং তার উপরই ভরসা করে। যে কোন গুনাহ থেকেই তাওবা হোক না কেন। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন। যেমন শিরক বা অন্যসব গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা শিরককারীর তাওবা কবুল করেন, তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর রহম করেন।

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا **অবশ্যই আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হিফাযতকারী:** আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নাবী ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম)এর কথা বর্ণনা করেছেন। যখন তার ছেলেরা তার নিকট তাদের ভাই ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে পাঠানোর আবেদন করলো এবং ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) কে হিফাযত করার অঙ্গীকার করলো, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার হিফাযতই তোমাদের হিফাযতের চেয়ে অধিক উত্তম। ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) স্বীয় পুত্রের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম الحفيظ (হিফাযতকারী)। হিফাযত বিশেষণের মাধ্যমেই তিনি তার সকল বান্দাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদের আমলসমূহকে সংরক্ষণ করেন।

আর তিনি মুমিন বান্দাদেরকে ঐসব বিষয় থেকে বিশেষভাবে হিফাযত করেন, যা তাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিতে পারে। সেই সাথে তিনি তাদেরকে ঐ বিষয় হতেও হিফাযত করেন, যা তাদের দীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের ছিফাত (বিশেষণ) সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য ছিফাতের ন্যায় আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত। তাতে জাহমীয়া, মু'তাযিলা এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য বিদ'আতী সম্প্রদায়ের যে সব লোক সৃষ্টির সাথে আল্লাহর তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আল্লাহ তা'আলার রহমত ও মাগফিরাত বিশেষণকে অস্বীকার করে, এখানে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মু'তাযিলা ও জাহমীয়ারা বলে, দয়া করা মাখলুকের বৈশিষ্ট্য। তারা এ আয়াতগুলোকে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করেছে, এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল বা মিথ্যা। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য এই বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার দয়া মানুষের দয়ার মতো নয় যে, তাতে তাশবীহ বা সাদৃশ্য আবশ্যক হবে। যেমনটি তারা ধারণা করে থাকে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থাৎ তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)।*

কোন বস্তুর নাম এক হলেই তার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য এক হওয়া জরুরী নয়। সৃষ্টিকর্তার জন্য রয়েছে এমন সব ছিফাত, যা তার জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট এবং মাখলুকের রয়েছে এমন সব ছিফাত, যা তার জন্য শোভনীয় ও নির্দিষ্ট। আল্লাহই ভালো জানেন।

٨ –ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم واتصافه بذلك

৮। কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, ক্রোধান্বিত হন, ঘৃণা করেন এবং তিনি অপছন্দ করেন। সুতরাং তিনি এ সব বিশেষণে বিশেষিত

وقوله: { رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} وقوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ} وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾ وقوله: {فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ} وقوله: {وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ} وقوله: {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট *(সূরা আল মায়িদা ৫:১১৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, তথায় সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তার উপর লা'নত করেছেন *(সূরা আন নিসা ৪:৯৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴾

"এই শাস্তির কারণ হলো, তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ এবং তারা তার সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি *(সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾

"অবশেষে তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩: ৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ ﴾

" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন। তাই তিনি তাদের শিথিল করে দিলেন *(সূরা আত তাওবা ৯:৪৬)*। **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,**

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

"আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বলো, যা তোমরা নিজেরাই করো না" *(সূরা আছ ছফ ৬১:৩)*।

ব্যাখ্যা: رَضِيَ اللَّـهُ عَـنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট *(সূরা আল মায়িদা ৫:১১৯)***:** অর্থাৎ খালিসভাবে আল্লাহর জন্য তারা যেই আমল করেছে, তাতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তাদের আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেই নিয়ামাত দান করেছেন, তাতে তারা আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বোচ্চ নিয়ামাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

"আল্লাহর সন্তুষ্টিই হচ্ছে সর্বাধিক বড়" *(সূরা আত তাওবা ৯:৭২)*।

আল্লাহর প্রতি মুমিনদের সন্তুষ্টির ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেই স্বীয় মর্যাদা অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে। এমনকি তাদের প্রত্যেকেই ধারণা করবে, তাকে যা দেয়া হয়েছে, অন্য কাউকে তা দেয়া হয়নি।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে: মুমিনকে হত্যাকারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে, এ কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ভুলবশতঃ কোন মুমিনকে হত্যা করা হলে উক্ত শাস্তির সম্মুখীন হবে না।[৫৩]

---

৫৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যাকারীর তাওবা কবুল হবে না। সে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে জাহান্নামে প্রবেশ করলেও অন্যান্য দলীল দ্বারা বুঝা যায় যে, তাওহীদপন্থী মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করলেও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। তাই এখানে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এর অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী তাকেই বলা হয়, যে ব্যক্তি কোন মানুষকে নিরপরাধ জেনেও এমন অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে, যার আঘাতে সাধারণত মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার ধারণাই করা হয়।

فَجَزَاؤُهُ তার শাস্তি: অর্থাৎ আখিরাতে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। জাহান্নাম হচ্ছে পরকালের আগুনের শাস্তির একটি স্তরের নাম।

خَالِدًا فِيهَا তথায় সে চিরকাল থাকবে: অর্থাৎ সে জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। এখানে চিরকাল বলতে দীর্ঘ সময় অবস্থান উদ্দেশ্য।

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন: এই বাক্যটিকে এমন আরেকটি বাক্যের উপর আতফ করা হয়েছে, যা আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গ থেকেই বুঝা যায়। মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে যে, **جعل جزاءه جهنم وغضب عليه** অর্থাৎ তার শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন এবং তার উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন।

وَلَعَنَهُ তার উপর লা'নত করেছেন: অর্থাৎ তাকে তার রহমত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া এবং বিতাড়িত করাকে লা'নত বলা হয়।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ এই শাস্তির কারণ হলো: অর্থাৎ এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে কঠোরভাবে কাফিরদের জান কবয করার ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদের রূহ কবয করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের উপর আঘাত করবে।

اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ: তার কারণ তারা এমন পন্থা অবলম্বন করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। তারা এমনসব পাপাচার এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে লিপ্ত ছিল, যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ "তারা তার সন্তুষ্টিকে পছন্দ করেনি: তারা যেই ঈমান ও সৎ আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, তাকে অপছন্দ করেছে।

অধিকাংশ আলিমের মতে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করা ভয়াবহ অপরাধ হলেও তা যেহেতু শির্ক নয়, সে হিসাবে ক্ষমা পেতে পারে। একশত মানুষকে হত্যাকারীর হাদীছকে তারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। (আল্লাহই অধিক জানেন)

فَلَمَّا آسَفُونَا তারা যখন আমাকে ক্রোধান্বিত করলো: অর্থাৎ রাগান্বিত করলো।

انتَقَمْنَا مِنْهُمْ তাদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম: অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিলাম। কঠিন শাস্তি দেয়াকে এখানে ইনতিকাম হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের অংশগ্রহণ অপছন্দ করেছেন: অর্থাৎ তোমাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের জন্য তাদের বের হওয়াকে তিনি অপছন্দ করেছেন।

فَثَبَّطَهُمْ তিনি তাদেরকে শিথিল করে দিয়েছেন: অর্থাৎ তোমার সাথে বের হওয়া থেকে তাদেরকে আটকিয়ে দিয়েছেন। এ আটকিয়ে দেয়া ছিল আল্লাহর ফায়ছালা ও নির্ধারণগত। যদিও শরী'আতগত দিক থেকে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বাহ্যিকভাবে তাদেরকে এ জন্য সক্ষমও করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক হিকমাতের কারণে বের হওয়ার তাওফীক দেননি, যা কেবল তিনিই অবগত আছেন।[৫৪] আর তা তিনি পরের

---

৫৪. সম্মানিত শাইখ এখানে খুব সংক্ষেপে আক্বীদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা ভালো করে বুঝার জন্য বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টিজগতে যা আছে, তার সবই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ ভালো বা মন্দ যেসব কাজ-কর্ম সম্পাদন করে, তারও স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা। সে হিসাবে ভালোমন্দ আল্লাহর ইচ্ছাতেই সৃষ্টি হয়েছে। কেননা আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছু হয় বলে বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আরো কোন সৃষ্টিকর্তা আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক। ভালোমন্দ সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ভালোটা গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন এবং খারাপ ও মন্দ পথ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ করেছেন। মানুষ ঈমান আনয়ন করুক এবং সৎ আমল করুক, আল্লাহ তা'আলা এটাই পছন্দ করেন। মন্দ কাজের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা হলেও মানুষ তাতে লিপ্ত হোক, এটি তিনি পছন্দ করেন না। সে জন্যই নাবী-রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষের জন্য হিদায়াত ও কল্যাণের পথ বাতলে দিয়েছেন এবং সে পথে চলে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের আদেশ করেছেন। সে সাথে নাবী-রসূলগণ যেসব রাস্তা মানুষকে গোমরাহী ও অকল্যাণের দিকে নিয়ে যায় এবং যা তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা থেকেও সতর্ক করেছেন।

শুধু ভালো ও মন্দের পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং নাবী-রসূল পাঠিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি; বরং আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে স্বেচ্ছায় ভালো বা মন্দ নির্বাচন করার ইচ্ছা, শক্তি ও স্বাধীনতাও সৃষ্টি করেছেন। সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য হিদায়াতের পথ বেছে নিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে স্বেচ্ছায় অকল্যাণের পথও বেছে নিতে পারে। যে ব্যক্তি ভালো পথে তার ইচ্ছাকে পরিচালিত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দেন এবং ভালো পথে চলতে সাহায্যও করেন। কিন্তু যে তা না করে নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে এবং মন্দ পথে নিজের ইচ্ছা ও শক্তিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তাকে সেদিকেই ছেড়ে দেন এবং তাকে বাধ্য করে ভালোর দিকে নিয়ে আসেন না। বিষয়টি মানুষের বোধশক্তি ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত ও বাস্তব। তবে মানুষের এ ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীন। তিনি ইচ্ছা করলেই মানুষের এ স্বাধীনতা খর্ব করতে পারেন। কারণ আল্লাহ

আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে,

﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾

"যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো তাহলে তোমাদের মধ্যে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়াতো না *(সূরা আত তাওবা ৯:৪৭)*।

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ আল্লাহর কাছে এটা অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ যে: অর্থাৎ ঘৃণার দিক দিয়ে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। المقت অর্থ হচ্ছে البغض তথা ঘৃণা করা। تمييز শব্দটি مقتا হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে।

أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ তোমরা এমন কথা বলো যা তোমরা নিজেরাই করো না: অর্থাৎ তোমরা নিজেদের নফস্ থেকে ভালো কাজের অঙ্গীকার প্রদান করে থাকো, কিন্তু তোমরা সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো না।

এ আয়াতের শানে নুযুল (অবতীর্ণের কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, এক প্রকার লোক জিহাদ ফরয হওয়ার পূর্বে বলতো যে, আমাদের ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা যদি সর্বাধিক প্রিয় আমল সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিতেন, তাহলে আমরা তা সম্পাদন করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সংবাদ দিলেন যে, সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ঐ সমস্ত পাপিষ্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, যারা ঈমানের পথ প্রত্যাখ্যান করেছে ও ঈমান আনয়ন করতে অস্বীকার করেছে। অতঃপর যখন জিহাদের আয়াত নাযিল হলো, তখন মুমিনদের কেউ কেউ জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো এবং তা তাদের কাছে খুব কঠিন মনে হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা নিজেরাই করো না? *(সূরা আছ ছ্বফ ৬১:২)*

তা'আলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যদি মানুষের এ স্বাধীনতাকে খর্ব করেন, তাতে সৃষ্টির উপর তার পরিপূর্ণ কুদরত (ক্ষমতা) তথা একচ্ছত্র আধিপত্য পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলেও তার আরেকটি বিশেষণ আদল (ন্যায়বিচার) বাদ পড়ে যায়। তাই তিনি মানুষের কর্মে মানুষকে কিছুটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে স্বেচ্ছায় ভালো আমল করলে তাকে বিনিময় দেয়া এবং নিজের স্বাধীনতার অপব্যবহার করে মন্দ কাজে লিপ্ত হলে শাস্তি দেয়া যায়। এতে করে দু'টি ছিফাতই তথা কুদরত ও আদল উভয়ই ঠিক থাকে এবং ভালোর ফলস্বরূপ পুরস্কার দেয়া এবং মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য ইনসাফপূর্ণ হয়। (আল্লাহই ভালো জানেন)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ক্রোধান্বিত হওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া, অভিশাপ করা, প্রতিশোধ নেয়া, অপছন্দ করা, ঘৃণা করা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম ছিফাত (বিশেষণ)। এই সবগুলোই ছিফাতে ফেলিয়া তথা কর্মগত বিশেষণ। এই বিশেষণগুলো আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এগুলোকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। আহলুস সুন্নাতের লোকেরা সেভাবেই তার পবিত্র সত্তার জন্য সাব্যস্ত করেন।[৫৫]

৫৫. উপরোক্ত আয়াতগুলো এবং আরো অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় যে, আল্লাহর অন্যতম গুণ হচ্ছে তিনি মুমিন ও মুত্তাকীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং যারা পাপ কাজে লিপ্ত হয় তাদের উপর রাগান্বিত হন। এগুলো আল্লাহর কর্মগত ছিফাত তথা বিশেষণের অন্তর্ভুক্ত। তিনি যখন এবং যার উপর ইচ্ছা সন্তুষ্ট হন এবং যার উপর ইচ্ছা অসন্তুষ্ট হন। তবে তার সন্তুষ্ট হওয়া এবং রাগান্বিত হওয়া মানুষের সন্তুষ্ট হওয়া বা রাগান্বিত হওয়ার মত নয়, যেমনটি ধারণা করে থাকে কতিপয় বাতিল ফির্কার লোকেরা।

٩ –ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله

৯। ক্বিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই নেমে আসবেন, যেভাবে নামা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।

وقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ} وقوله: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} {كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلآئِكَةُ تَنزِيلاً}

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾

"তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, যখন মেঘমালার ছায়াসহ স্বয়ং আল্লাহ তাদের সামনে আগমন করবেন, বিপুল পরিমাণ ফেরেশতাগণও তাদের সামনে আসবেন। তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে *(সূরা আল বাকারা ২:২১০)।* **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,**

﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

"তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন। অথবা তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে[৫৬] *(সূরা আল আন'আম ৬:১৫৮)।* **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,**

---

৫৬. এখানে উল্লেখিত শব্দগুলো চিন্তার যথেষ্ট খোরাক যোগায়। এর ফলে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা কেবল একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চলছে। ঈমানের বিষয়গুলো স্বচক্ষে না দেখে মানুষ বিশ্বাস করে কি না, আল্লাহ তা'আলা এটিই পরীক্ষা করতে চান। কাজেই মহান আল্লাহ নাবী প্রেরণ, আসমানী কিতাব অবতরণ এমন কি মুজিযা সমূহের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি-বিবেকের পরীক্ষা ও নৈতিক শক্তি যাচাই করার ব্যবস্থা রেখেছেন। কখনো তিনি সত্যকে এমনভাবে আবরণমুক্ত করে দেননি যার ফলে মানুষের পক্ষে তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। কেননা এরপর তো আর পরীক্ষার কোন অর্থই থাকে না এবং পরীক্ষায় সাফল্য ও ব্যর্থতা অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময়ের অপেক্ষায় থেকো যখন আল্লাহ ও তার রাজ্যের ফেরেশতাগণ সামনে এসে যাবেন। কারণ তখন তো সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। ঈমান আনা ও আনুগত্যের মস্তক অবনত করার মূল্য ও মর্যাদা ততক্ষণই দেয়া হবে যতক্ষণ

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۞ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

"কখনোই নয়, পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে *(সূরা ফাজর ৮৯:২১)*। **আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,**

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا﴾

"সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে এবং ফেরেশতাদেরকে দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে" *(সূরা আল ফুরকান ২৫: ২৫)*।

.....

ব্যাখ্যা: هَلْ يَنظُرُونَ তারা কেবল সেই সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে,: শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণকারী যেসব কাফির ইসলামে প্রবেশ করেনি, এখানে তাদের জন্য হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। ينظرون অর্থ অপেক্ষা করছে। نظر এবং انتظر শব্দদ্বয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ যখন আল্লাহ তা'আলা আসবেন: ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য আগমন করবেন। তারা শুধু সেই দিনের অপেক্ষায় বসে আছে, যেদিন আল্লাহ বিচার করবেন এবং প্রত্যেককে আমল অনুযায়ী বদলা দিবেন।

فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ মেঘমালার ছায়াসহ: ظلل **শব্দটি** ظلة -এর বহুবচন। যা আপনাকে ছায়া দেয়, তাকেই যুল্লাহ বলা হয়। আর হালকা-পাতলা সাধা মেঘমালাকে

প্রকৃত সত্য মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু মানুষ শুধুমাত্র যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাকে গ্রহণ করে নিজের ঈমানী শক্তির প্রমাণ দেবে। অন্যথায় যখন প্রকৃত সত্য সকল প্রকার আবরণ মুক্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, মানুষ স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখবে, তার মহাপ্রতাপ, সীমাহীন ও বিশ্ব সংসারের বিশাল রাজত্ব তার নির্দেশে পরিচালিত হতে দেখবে, ফেরেশতাদের দেখবে আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনায় প্রতি মুহূর্তে সক্রিয় এবং মানুষের এ সত্তাকে আল্লাহর প্রচন্ড শক্তির আগ্রাসনে একান্ত অসহায় দেখতে পাবে- এসব কিছু চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার পর যদি কেউ ঈমান আনে ও সত্যকে মেনে চলতে আগ্রহী হয় তাহলে তার এ ঈমান আনার ও সত্যকে মেনে চলার কোনো দামই থাকবে না। সে সময় কোন পাক্কা কাফির ও নিকৃষ্টতম অপরাধীও অস্বীকার করার সাহস দেখাবে না। আবরণ উন্মোচন করার মুহূর্ত আসার আগে ঈমান আনার ও আনুগত্য করার সুযোগ রয়েছে। আর যখন সে মুহূর্তটি এসে যাবে তখন আর পরীক্ষা থাকবেনা এবং পরীক্ষার সুযোগও থাকবে না। বরং তখন চূড়ান্ত মীমাংসা ও ফায়ছালার সময়।

বলা হয় গামাম। মেঘমালাকে غمام হিসাবে নাম রাখার কারণ হলো, মেঘমালা তার নীচের প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তিকে ঢেকে ফেলে। মূলতঃ غم يغم ستر يستر অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ ঢেকে রাখা।

وَالْمَلَآئِكَةُ ফেরেশতাগণ: ক্বিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ মেঘমালার সাথে আগমন করবেন।

وَقُضِيَ الْأَمْرُ তখন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে: অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের ব্যাপারটি নিস্পত্তি হয়ে যাবে।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে: অর্থাৎ তাদের রূহ কবয করার জন্য ফেরেশতাগণ আগমন করবে। এখানে মৃত্যুর ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ কিংবা তোমার পালনকর্তা আগমন করবেন: অর্থাৎ তোমার রব তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য স্বয়ং চলে আসবেন।

أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ অথবা তোমার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে: এখানে নিদর্শন বলতে আখিরী যামানায় পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় উদ্দেশ্য। আখিরী যামানায় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। এটি ক্বিয়ামতের অন্যতম একটি বড় আলামত। যখন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তখন কারো তাওবা কবুল হবে না।

كَلَّا কখনোই নয়: এটি এমন একটি অব্যয়, যা তার পূর্বে উল্লেখিত বিষয় হতে ধমক দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ইয়াতীমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার না করা ঠিক নয় এবং মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করার উৎসাহ না দেয়া ঠিক নয়। সেই সাথে মীরাসের ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলা এবং মালকে প্রচুর ভালোবাসাও ঠিক নয়।

إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا পৃথিবীকে যখন চূর্ণবিচূর্ণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে: অর্থাৎ যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে এবং তাকে পরপর খুব জোরে ধাক্কা দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর উপরস্থ সকল নির্মিত বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বালুকণায় পরিণত হবে।

وَجَاءَ رَبُّكَ তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন: আল্লাহ তা'আলা নিজেই

বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করার জন্য নেমে আসবেন।

وَالْمَلَكُ ফেরেশতারা: এখানে ফেরেশতা বলতে সকল ফেরেশতা উদ্দেশ্য।

صَفًّا صَفًّا সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে: হাল হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে। অর্থাৎ তারা কাতারের পর কাতারবন্দী অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা সকল জিন-ইনসানকে ঘিরে ফেলবে। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ একেক কাতারে দাঁড়িয়ে পৃথিবী এবং তার সকল দিক থেকে ঘিরে ফেলবে। ক্বিয়ামতের দিন সাত আসমানের ফেরেশতাদের মোট সাতটি কাতার হবে।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ সেদিন আকাশ ফুড়ে একটি মেঘমালার উদয় হবে: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আকাশ ফেটে যাবে। আকাশ ফেটে নূরের এমন একটি বিরাট মেঘমালার উদয় হবে, যা দৃষ্টিসমূহকে ধাঁধিয়ে ফেলবে।

وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ফেরেশাতাদের দলে দলে নামিয়ে দেয়া হবে: ফেরেশতাদেরকে সেদিন দলে দলে পৃথিবীতে নামানো হবে। তারা নেমে এসে হাশরের ময়দানে সমস্ত সৃষ্টিকে ঘিরে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য নেমে আসবেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাসহ (নিজেই) আগমন করবেন। যেভাবে আগমন করা তার মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য শোভনীয়, বান্দাদের মধ্যে বিচার-ফায়ছালা করার জন্য তিনি সেভাবেই নেমে আসবেন। আল্লাহ তা'আলার নেমে আসা তার কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতভাবেই ইহাকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা আবশ্যক। আল্লাহর আগমন করাকে তার আদেশ ও রহমত আসার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা বৈধ নয়। যেমন করে থাকে আল্লাহর ছিফাতকে অবিশ্বাসকারী সম্প্রদায়। তারা বলে থাকে وَجَاءَ رَبُّكَ তোমার রব আসবেন অর্থ হচ্ছে তোমার রবের আদেশ আসবে। এই ব্যাখ্যা আল্লাহর আয়াতকে পরিবর্তন করার শামিল।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার দিকে যেই আগমন ও আসার সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দুই প্রকার। একটি হচ্ছে مطلق (সাধারণ ও কোন কিছু ছাড়াই) আগমন করা। আরেকটি হচ্ছে مقيد (কয়েদযুক্ত তথা কোন কিছু নিয়ে) আগমন করা। আল্লাহর আগমন দ্বারা যদি তার রহমত, আযাব এবং অনুরূপ অন্য কিছু আসা উদ্দেশ্য হয়, তখন সেই আগমনকে কয়েদযুক্ত করা হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,حتى جاء الله بالرحمة والخير পরিশেষে আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ আগমন

করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾

"আমি এদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যামূলক করেছি *(সূরা আল 'আরাফ ৭:৫২)*

আর আল্লাহর দিকে যেই মুতলাক (সাধারণ) আগমনের সম্বন্ধ করা হয়েছে, তা দ্বারা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আগমন উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ﴾

তারা কেবল সে সময়ের অপেক্ষায় বসে আছে, যখন মেঘমালার ছায়াসহ স্বয়ং আল্লাহ তাদের সামনে আগমন করবেন? *(সূরা আল বাকারা ২:২১০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

"তোমার রব এমন অবস্থায় আসবেন, যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে" *(সূরা আল ফাজর ৮৯:২২)*।

١٠ – إثبات الوجه لله سبحانه

১০। আল্লাহ তা'আলার চেহারা সাব্যস্ত করণ:

وقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ} {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"একমাত্র তোমার সেই রবের চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে, যিনি মহিয়ান ও মহানুভব *(সূরা আর রহমান ৫৫: ২৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّاوَجْهَهُ

"তার চেহারা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে" *(সূরা আল ক্বছাছ ২৮:৮৮)*।

ব্যাখ্যা: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ একমাত্র তোমার পালনকর্তার চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে। এ আয়াতের পূর্বে রয়েছে,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

"ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংস হবে"*(সূরা আর রহমান ৫৫: ২৬)*।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে,

যমীনের সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে এবং সকল বস্তুই ধ্বংস হবে। মহান প্রভুর চেহারা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তা'আলার কখনো মৃত্যু হবে না। তিনি সেই চিরজীবন্ত সত্তা, যার কখনোই মৃত্যু হবে না।

ذُو الْجَلَالِ **যিনি মহিমময়:** অর্থাৎ বড়ত্ব ও মর্যাদার অধিকারী।

وَالإِكْرَامِ **মহানুভব:** অনুগ্রহ ও সম্মানের অধিকারী। অর্থাৎ তিনি নাবী-রসূল এবং তার সৎ বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করার মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। কেউ

কেউ বলেছেন: الإكرام। অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা এমন প্রত্যেক জিনিসের উর্ধ্বে, যা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ সব জিনিসই ধ্বংস হবে: আসমান ও যমীনে যা আছে, তার প্রত্যেকটিই ধ্বংস হবে এবং মৃত্যু বরণ করবে।

إِلَّا وَجْهَهُ কেবল তার চেহারাই অবশিষ্ট থাকবে: وجه শব্দটি মুস্তাসনা হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, সবকিছু ধ্বংস হওয়ার পর কেবল তিনিই অবশিষ্ট থাকবেন। সমস্ত মাখলুক মৃত্যু বরণ করার পরও তার মৃত্যু হবে না।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার চেহারা থাকার কথা প্রমাণিত হলো। আল্লাহর চেহারা আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত।

প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে। যে রকম চেহারা আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় তার চেহারা ঠিক সে রকমই। তা কোন মাখলুকের চেহারার মতো নয়।[৫৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

তার সদৃশ কোন কিছুই নেই *(সূরা আশ শূরা ৪২:১১)*

আমরা আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী সম্প্রদায়ের লোকদের মতো কথা বলি না। তারা বলে আল্লাহর চেহারা দ্বারা আসল অর্থ উদ্দেশও নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সত্তা কিংবা ছওয়াব, অথবা দিক অথবা অন্যান্য উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যাগুলো একাধিক কারণে বাতিল।

---

৫৭. আল্লাহর চেহারা আল্লাহর মতোই। যেমন মাখলুকের চেহারা মাখলুকের মতোই। আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করলে এই প্রশ্ন করা বোকামি যে, তাহলে কি আল্লাহর চেহারা মানুষের মত? আল্লাহর চেহারা কেমন? এই প্রশ্ন করা যাবে না। যেই আয়াতে আল্লাহর চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যেমন ছাহাবীগণ শুনেছেন, তেমনি আমরাও শুনছি। তারা যেমন প্রশ্ন ও আপত্তি ছাড়াই মেনে নিয়েছে, আমাদেরও বিনা প্রশ্নে তাতে বিশ্বাস করা ও তা মেনে নেয়া আবশ্যক। সৃষ্টি জগতের সকল প্রাণীর চেহারা যেমন এক রকম নয়; বরং প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই যেহেতু শোভনীয় চেহারা রয়েছে, তাই স্রষ্টার জন্যও সে রকম চেহারা রয়েছে, যা তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়। তাই দলীলের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য যেসব সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে, আমরা তা সাব্যস্ত করি। তা আমরা অস্বীকার করি না এবং সৃষ্টির ছিফাতের সাথে তার সাদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অযৌক্তিক ধারণার উপর নির্ভর করে তার অপব্যাখ্যাও করি না।

(ক) হাদীছে আল্লাহর চেহারাকে আল্লাহর সত্তার উপর আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে আল্লাহর সত্তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর তার চেহারা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর যাত (সত্তা) এবং তার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলেছেন:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"আমি মহান আল্লাহর সত্তা, তার সম্মানিত চেহারা এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতার ওয়াসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করছি"।[৫৮]

আতফের অন্যতম দাবী হচ্ছে, তা পরস্পর ভিন্ন জিনিস বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

(খ) উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহর চেহারাকে তার সত্তার দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَجْهُ رَبِّكَ "তোমার পালনকর্তার চেহারা"। আর চেহারাকে বিশেষিত করা হয়েছে ذُوالْجَلَالِ والإكرام মহিয়ান ও দয়াবান, এই দু'টি বিশেষণের মাধ্যমে। وجه (চেহারা) দ্বারা যদি যাত বা সত্তা উদ্দেশ্য হত, তাহলে উক্ত আয়াতের মধ্যে الوجه শব্দটি সিলা হিসাবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ তা رب এর ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হত; الوجه -এর ছিফাত হতো না। তখন এভাবে বলা হতো, وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ। তা না বলে যখন ذُوالْجَلَالِ والإكرام বলা হয়েছে, তাতে বুঝা গেল যে, তা চেহারার ছিফাত হয়েছে, সত্তার ছিফাত হয়নি। ঐদিকে আবার الوجه (চেহারা) আল্লাহর সত্তার ছিফাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) কোন জাতির ভাষাতেই এটি পাওয়া যায় না যে, কোন জিনিসের চেহারা বলতে যাত (সত্তা) কিংবা ছওয়াব বুঝায়। আরবী ভাষায় الوجه বলতে প্রত্যেক বস্তুর অগ্রভাগ ও সামনের অংশ বুঝায়। কেননা কোন বস্তুর দিকে অগ্রসর হলে সর্বপ্রথম অগ্রভাগই সামনে পড়ে। যেসব বস্তুর দিকে চেহারাকে ইযাফত বা সম্বন্ধ করা হবে সেসব বস্তু অনুযায়ীই চেহারার অর্থ হবে। وجه শব্দটিকে যদি কোনা সময়ের দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে ইহার অর্থ হবে প্রথম সময়। যেমন বলা হয়, وجه النهار তথা

৫৮. ছ্বহীহ: সুনানে আবু দাউদ, হা/৪৬৬।

দিবসের প্রথমাংশ। কোন প্রাণীর দিকে ইযাফত করলে তার অর্থ হবে সেই প্রাণীর অঙ্গ বিশেষ। যেমন বলা হয়, وجــه الفــرس তথা ঘোড়ার চেহারা। আর যদি কোন পাহাড় বা দেয়ালের দিকে ইযাফত করা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে পাহাড় বা দেয়ালের চূড়া। যেমন বলা হয়, وجه الجبل তথা পাহাড়ের উপরের অংশ, وجه الجدار দেয়ালের সামনের অংশ ইত্যাদি। আর যখন চেহারাকে আল্লাহর দিকে ইযাফত করা হবে, তখন ইহার অর্থ হবে তার অন্যতম ছিফাত,[৫৯] যা কোন মাখলুকের ছিফাতের অনুরূপ নয়।[৬০]

---

৫৯. যারা বলেন এখানে চেহারা দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে وَجْهُ رَبِّكَ তোমার প্রভুর চেহারা। চেহারাকে সত্তার দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। যা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, চেহারা সত্তা থেকে ভিন্ন। মোট কথা 'رب' দ্বারা আল্লাহর সত্তা এবং 'وَجْه' দ্বারা তার একটি গুণকে বুঝানো হয়েছে। হাদীছেও আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِه

"একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে পাঁচটি কথা বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না, নিদ্রামগ্ন হওয়া তার জন্যে সমিচীন নয়, তিনি ন্যায় দন্ডের পাল্লা নামান এবং উঠান, দিবসের আমলের পূর্বেই তার নিকট রাতের আমলসমূহ উঠানো হয় এবং রাতের আমলের পূর্বেই দিনের আমল উঠানো হয়। তার পর্দা হচ্ছে নূর। তিনি যদি তা উন্মুক্ত করেন তার চোখের দৃষ্টি যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তার চেহারার আলোতে জ্বলে যাবে। ছ্বহীহ মুসলিম ১৭৯।

৬০. আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেরকম চেহারা বা মুখমন্ডল শোভনীয়, তার চেহারা সেরকমই। তা কোন মাখলুকের চেহারার মত নয়। আল্লাহর চেহারাকে তার ছাওয়াবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা অবৈধ। কেননা চেহারাকে ছাওয়াবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলে তাকে তার মূল অর্থ থেকে অন্য অর্থে পরিবর্তন করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে, যা অবৈধ। সালাফে সালেহীন থেকে এই ধরণের ব্যাখা পাওয়া যায় না। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে আল্লাহর যেহেতু চেহারা আছে, তাই তার নাক ও কান..... আছে কি?

এর জবাবে আমরা বলবো যে, জানি না। কেননা কুরআন ও হাদীছে নাক বা কানের কথা উল্লেখ নেই। তাই আমরা আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করতে পারি না এবং অস্বীকারও করতে পারি না। কেননা নিজের পক্ষ হতে অনুমান করে আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ছিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না এবং আল্লাহর যে ছিফাত কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ নেই, তা আমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা হতে নাকোচও করি না।

١١ – إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم

১১। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলার দু'টি হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৬১]

وقوله: {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وقوله {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء}

৬১. পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে আল্লাহর হাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার হাত আছে, আমরা তাতে বিশ্বাস করি। তার জন্যে যেমন হাত প্রযোজ্য তেমনই তার হাত। মাখলুকের হাতের সাথে তার হাতের কোন তুলনা নেই। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, তাহলে কি আল্লাহর হাতের আঙ্গুল আছে? এর জবাবে আমরা বলবো যে, ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা আল্লাহর আঙ্গুল থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلاَئِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"একজন ইয়াহূদী পন্ডিত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাত কিতাবে দেখতে পাই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ মন্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানিকে এক আঙ্গুলে, কাদাঁকে (ভূ-তলের সমস্ত জিনিসকে) এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই বাদশাহ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদী পন্ডিতের এ কথা শুনে এমন ভাবে হাসলেন যে, তার দন্ত দেখা যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহ্র মর্যাদা ও ক্ষমতা মুতাবেক কদর করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে"। (সূরা যুমার: ৬৭) (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৮১১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾

"যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫)* আল্লাহ আরো বলেন:

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আর ইয়াহূদীরা বলে: আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে; বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন" *(সূরা আল মায়িদা ৫:৬৪)।*

ব্যাখ্যা: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ " সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? (সূরা সোয়াদ ৩৮:৭৫) আয়াতে ইবলীসকে সম্বোধন করে ধমক দেয়া হয়েছে। অভিশপ্ত ইবলীস যখন আদম (আলাইহিস সালাম) কে সাজদা করা হতে বিরত রইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় রহমত থেকে বিতাড়িত করলেন এবং বললেন:

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ "যাকে আমি নিজের দু'হাতে[৬২] সৃষ্টি করেছি: অর্থাৎ আমি যাকে কোন

---

৬২. ছ্বহীহ হাদীছে يد الله (আল্লাহর হাত), كف الله (আল্লাহর হাতের তালু), كف الرحمن (রহমানের হাতের তালু) এবং আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সংক্রান্ত ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। এ জাতীয় বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আলিমগণ আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাত সম্পর্কিত হাদীছগুলো এবং দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সুসাব্যস্ত ও সুপ্রমাণিত বলেছেন। আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, কোন প্রকার ধারণা করা যাবে না এবং এ কথা বলা যাবে না যে, كيف (তা কিভাবে?)। ইমাম মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা এবং আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রুহ. থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছগুলোর ব্যাপারে কথা হচ্ছে أمروها بلا كيف অর্থাৎ যেভাবে এসেছে, সেভাবেই ছেড়ে দাও। এ কথা বলো না যে, কিভাবে? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কথাও তাই।

কিন্তু জাহমীয়ারা এ বর্ণনাগুলোকে অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হচ্ছে এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে সৃষ্টির সাথে তাশবীহ (তুলনা) হয়ে যায়। (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক জায়গায় আল্লাহর হাত, চোখ, শ্রবণ, দৃষ্টি ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। জাহমীয়ারা এ আয়াতগুলোর তাবীল (ব্যাখ্যা) করেছে। আলিমগণ এগুলোর যে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছে। তাদের কথা আল্লাহ তা'আলা আদমকে স্বীয় হাত দিয়ে সৃষ্টি

কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নিজের দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি, তাকে সাজদা করা হতে কোন জিনিস তোমাকে ফিরিয়ে রাখল? এ থেকে আদম (আলাইহিস সালাম) এর জন্য সম্মান ও মর্যাদা সাব্যস্ত হয়।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ আর ইয়াহূদীরা বলে: ইয়াহূদীদের কথা, ﴿ هُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ "আমরা তোমার নিকট ফিরে আসলাম বা তাওবা করলাম" থেকে ইয়াহুদ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। তখন তাদের জন্য এটি একটি সম্মানজনক নাম ছিল। তাদের শরী'আত মানসুখ হয়ে যাওয়ার পর যদিও তাতে এখন সম্মানের কোন অর্থ নেই, তথাপিও এই নামটি তাদের জন্য লাযেম হয়ে আছে।

আবার কেউ কেউ বলেছেন ইয়াকুব (আলাইহিস সালাম) এর অন্যতম পুত্র ইয়াহুদা ইবনে ইয়াকুবের দিকে নিসবত (সম্বন্ধ) করেই তাদেরকে ইয়াহূদী বলা হয়েছে।

يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এখানে ইয়াহূদীদের সম্পর্কে বলছেন, তারা আল্লাহকে কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেছে। যেমন তারা আরো বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন ফকীর এবং তারা হলো ধনী। আল্লাহর হাত বাঁধা হয়ে গেছে, তাদের এই কথা দ্বারা মূলতঃ তারা এটি উদ্দেশ্য করেনি যে, আল্লাহর হাতে বেড়ী লাগিয়ে বেঁধে দেয়া হয়েছে।

غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ তাদের হাতই বাঁধা হয়ে গেছে: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ কথার মাধ্যমে তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং তারা যেই মিথ্যা রচনা করেছে, তার মোকাবেলায় উপরোক্ত কথা বলা হয়েছে। আসলে তাদের এরূপই হয়েছিল। তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচুর কৃপণতা এবং মারাত্মক হিংসা। আপনি ইয়াহূদীদেরকে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক কৃপণ হিসাবে দেখতে পাবেন।

وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا তাদের এই কথা বলার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত করা

করেননি। তাদের কথা হচ্ছে হাত অর্থ কুদরত (শক্তি)!! ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন, তাশবীহ (তুলনা) তখনই হবে, যখন বলা হবে আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতোই, আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মতোই। এমনিভাবে আল্লাহর শ্রবণ, আল্লাহর দৃষ্টি বান্দার দৃষ্টির মতোই। এটি তাশবীহ (তুলনা)।

আর আল্লাহ যেমন বলেছেন, সেভাবেই বলা হবে অর্থাৎ হাত, শ্রবণ, দৃষ্টি এবং এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তা কিভাবে? অথবা এটি বলা হবে না যে, আল্লাহর হাত সৃষ্টির হাতের মতোই এবং শ্রবণ শ্রবণের মতোই, অর্থাৎ কোনো তুলনা করা হবে না। তখন কেবল তেমনই হবে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ "কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি শুনেন এবং দেখেন"। (সূরা আশ শূরা: ১১) {দেখুন, তাফসীরে তাবারী, (৬/২০) ঈষৎ পরিবর্তিত)}

হয়েছে: এ বাক্যকে পূর্বের বাক্যের সাথে আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। এখানে بـ হরফে জারটি سببية কারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই কথার কারণে তারাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিবাদে আরো বলেছেন:

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত: অর্থাৎ দান করার ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছেন। দানের মাধ্যমে তার দুই হাত সদা প্রসারিত।

يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন: এটি স্বতন্ত্র বাক্য। এ বাক্যটি আল্লাহর পূর্ণ বদান্যতার বিষয়টি জোরালোভাবে বর্ণনা করেছে। তার ইচ্ছা অনুপাতেই তিনি ব্যয় করেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন ব্যয়ের হাত সম্প্রসারিত করেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, তখন তা সংকোচিত করেন। সুতরাং তার হিকমতের দাবী অনুসারে তিনিই সম্প্রসারণকারী এবং তিনিই সংকোচনকারী।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে কারীমা হতে মহান আল্লাহর দু'টি হাত থাকার কথা প্রমাণিত হলো। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় তার দু'টি হাত রয়েছে। এই হাত দু'টি কোন মাখলুকের দুই হাতের মতো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

তার সদৃশ কোন কিছুই নেই *(সূরা আশ শূরা ৪২: ১১)*।

যারা আল্লাহর প্রকৃত দুই হাতকে অস্বীকার করে, এখানে তাদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। সেই সাথে যারা ধারণা করে, হাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত অথবা নিয়ামত উদ্দেশ্য তাদেরও প্রতিবাদ রয়েছে। কেননা হাত দ্বারা যদি কুদরতী হাত উদ্দেশ্য হতো, যেমন বাতিলপন্থীরা ধারণা করে থাকে, তাহলে আল্লাহর উভয় কুদরতী হাত দ্বারা আদমকে খাসভাবে সৃষ্টি করার মধ্যে কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকার কথা বাতিল বলে প্রমাণিত হতো। অর্থাৎ আদমের জন্য কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হতো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে এমনকি ইবলীসকেও স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদমকেও যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারাই সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী:

﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾

"যাকে আমি নিজের দুই হাতে সৃষ্টি করেছি" *(সূরা ছ্বদ:৭৫)*

এর মধ্যে আদমের জন্য ইবলীসের উপর কী ফযীলত থাকতে পারে? হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইবলীসের জন্যও এই কথা বলার সুযোগ থাকতো যে, আমাকেও তো তোমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছো।

আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি কুদরত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার কুদরত মাত্র দু'টি হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ মুসলিমদের ঐক্যমতে এ কথা বাতিল বলে প্রমাণিত। কেননা আয়াতের মধ্যে আল্লাহর দুই হাত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সেই সাথে আরো বলা যেতে পারে যে, হাত দ্বারা যদি নিয়ামত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাত্র দু'টি নিয়ামত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা আল্লাহর নিয়ামাত অসংখ্য, মাত্র দু'টি নয়।[৬৩]

---

৬৩. আল্লাহ তা'আলার যে প্রকৃত পক্ষেই হাত রয়েছে, সে ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে আরো অনেক দলীল রয়েছে। নিম্নে তা থেকে কতিপয় দলীল বর্ণনা করা হলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأُخْرَى الْقَبْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ)

"আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ। রাতদিন খরচ করার পরও তাতে কমতি হয় না। তোমরা কি বলতে পারবে আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় হতে এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন? তার ডান হাতে যা আছে, তা হতে কিছুই কমেনি। তার আরশ ছিল পানির উপর। তার অপর হাতে রয়েছে দাড়িপাল্লা। তিনি তা উঠান এবং নামান" (ছ্বহীহ বুখারী ৭৪১৯)। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

" إِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةِ الأَرْضَ، وَتَكُونُ السَّمَوَاتُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ "

"ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে তার ডান হাতে। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশা" (ছ্বহীহ বুখারী ৭৪১২)।। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

(لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ بِيَدِهِ عَلَى نَفْسِهِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي)

"আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করলেন তখন নিজ হাতে লিখে দিলেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে (মুসনাদে আহমাদ-উত্তম সনদ)। আদম ও মূসা (আলাইহিস সালাম) এর পরস্পর ঝগড়ার হাদীছে এসেছে,

(فَقَالَ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ)

"আদম (আলাইহিস সালাম) বললেন, তুমি মূসা (আলাইহিস সালাম)। তোমাকে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্যে হতে মনোনিত করেছেন এবং নিজ হাতে তিনি আপনার জন্য তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন" (ছ্বহীহ: সুনানে আবূ দাউদ ৪৭০১)।

এখানে আল্লাহর বাক্যালাপ ও তার হাত- এটি ছিফাতে জাতিয়া তথা সত্তাগত গুণ। কথা বলা একই সাথে ছিফাতে জাতিয়া তথা সত্তাগত গুণ ও ছিফাতে ফে'লীয়া তথা কর্মগত গুণ। তাওরাত লেখা এটি হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত গুণ।

যারা আল্লাহর হাতকে কুদরতী হাত দ্বারা ব্যাখ্যা করে তাদের জবাবঃ

(১) যারা বলে আল্লাহর কোনো হাত নেই; বরং হাত বলতে আল্লাহর কুদরতকে বুঝানো হয়েছে, তাদের কথা বাতিল এবং কুরআনের আয়াত পরিবর্তনের শামিল। কারণ কুরআনের আয়াত থেকে যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কোনো রূপ পরিবর্তন ছাড়াই তার উপর ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। এটাই ছাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তী যুগের সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ।

(২) হাত দ্বারা যদি কুদরত তথা ক্ষমতা উদ্দেশ্য হতো তাহলে আদমকে বিশেষভাবে দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করার কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুককে এমনকি ইবলীসকেও কুদরতের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যদি আদমকে নিজ হাতে সৃষ্টি না করে থাকেন তাহলে একথা বলার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যে, "আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি তার সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল?"

(৩) যদি হাত দ্বারা কুদরত উদ্দেশ্য হয় তাহলে আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা দু'টির মাঝে সীমিত হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। কারণ (يد) তথা হাত শব্দটি দ্বিবচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যেহেতু আল্লাহর ক্ষমতা দু'টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় সেহেতু এখানে আল্লাহর প্রকৃত হাতকেই বুঝানো হয়েছে।

(৪) হাত বলতে ক্ষমতা কেবল তার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে যার প্রকৃত পক্ষেই হাত রয়েছে। এ কথা তো কখনও বলা হয় না যে, এব্যাপারে বাতাসের হাত আছে। কারণ বাস্তবে বাতাসের কোন প্রকৃত হাত নেই। তাই রূপকার্থে বাতাসের জন্য হাত সাব্যস্ত করা শোভা পায় না।

(৫) যারা বলে হাত অর্থ আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা উদ্দেশ্য, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো যে হাদীছে আল্লাহর আঙ্গুলের কথা বলা হয়েছে তারা সে হাদীছের কি উত্তর দিবেন? আমরা কি কখনো এরকম ব্যবহার করি যে, এ ব্যাপারে আমার আঙ্গুল আছে তথা ক্ষমতা আছে?! ছুহীহ বুখারীতে (৪৮১১) বর্ণিত হয়েছেঃ

جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ইয়াহূদীদের একজন পন্ডিত নাবী (সা.)এর কাছে এসে বলল: "হে মুহাম্মাদ! আমরা তাওরাতে পেয়েছি যে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত যমিনকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত গাছপালাকে, এক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত পানি ও কাদাঁকে এবং এক আঙ্গুলে রাখবেন অবশিষ্ট সমস্ত মাখলুককে। ইয়াহূদীর এ কথা সমর্থন করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন। এমন কি তার দাঁতগুলো প্রকাশিত হলো। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ বাণী তিলাওয়াত করলেনঃ

١٢ – إثبات العينين لله تعالى

১২। আল্লাহ তা'আলার দু'টি চোখ সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} {وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ} {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي}

আল্লাহ তা'আলা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

"হে নাবী! তোমার রবের ফায়সালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো *(সূরা আত-তূর ৫২:৪৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ﴾

"আর নূহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম, যা আমার চোখের সামনেই চলছিলো। এ ছিলো সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো" *(সূরা আল ক্বমার ৫৪:১৩-১৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾

"আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও"। *(সূরা ত্বহা ২০: ৩৯)*

.....

ব্যাখ্যা: الصبر শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা দেয়া ও আটকিয়ে রাখা। দুঃখ-বেদনায় পড়ে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে নফসকে আটকিয়ে রাখা, জবান দিয়ে

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তারা আল্লাহর যথাযোগ্য বড়ত্ব ও মর্যাদা উপলব্দি করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে ভাঁজকৃত অবস্থায় তার ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর তারা যাকে শরীক করে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে"। (সূরা আয যুমার ৩৯: ৬৭)

অভিযোগ করা ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং হাত দিয়ে গালে চপেটাঘাত করা ও পরিহিত জামা বুকের দিক থেকে ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে আটকিয়ে রাখাকে শরী'আতের পরিভাষায় সবর বলা হয়।

لِحُكْمِ رَبِّكَ তোমার রবের ফায়ছালা ও হুকুম আসা পর্যন্ত সবর করো। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ফায়ছালা ও শরী'আতের ফায়ছালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا নিশ্চয়ই তুমি আমার চোখে চোখেই আছো: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার হেফাযতের অধীনেই আছো। সুতরাং কাফিররা তোমাকে কষ্ট দিবে, এই পরোয়া করো না। কষ্ট দেয়ার জন্য তারা কখনোই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না।

وَحَمَلْنَاهُ আরোহন করিয়ে দিলাম: নূহ আলাইহিস সালামকে।

عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত: অর্থাৎ লম্বা ও প্রশস্ত কাঠ দিয়ে তৈরী নৌকার মধ্যে তাকে উঠালাম। সেই কাষ্ঠগুলোতে অনেকগুলো পেরেক মেরে দেয়া হয়েছিল। دسر (পেরেক) শব্দটি دسار এর বহুবচন। **تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا** আমার চোখের সামনে দিয়েই চলছিল: অর্থাৎ আমার দৃষ্টি পড়ার স্থান দিয়ে এবং আমার হেফাযতেই চলছিল।

جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ এ ছিল সেই ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিলো: অর্থাৎ আমি নূহ (আলাইহিস সালাম) ও তার অনুসারীদেরকে নাজাত দিয়ে তার জাতির অবিশ্বাসী লোকদের সাথে যেই আচরণ করেছিলাম এবং মহাপ্লাবনের পানিতে ডুবিয়ে মেরে যেই শাস্তি তাদেরকে দিয়েছিলাম তা মূলতঃ নূহ (আলাইহিস সালাম)এর সাথে কুফুরী করার কারণে ও তার আদেশ অমান্য করার কারণেই।

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي আমি নিজের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলাম: এখানে মূসা (আলাইহিস সালাম) কে সম্বোধন করে এই কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি তোমার উপর আমার ভালোবাসা স্থাপন করলাম এবং তোমাকে ভালোবাসলাম। সেই সাথে আমার সৃষ্টির কাছেও তোমাকে প্রিয় করে দিলাম।

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي এবং এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও: অর্থাৎ আমার দৃষ্টির সামনেই যাতে তুমি প্রতিপালিত হও এবং ফিরআউনের ঘরে তোমাকে যেন খাওয়ানো হয়, আমি তোমার জন্য সেই ব্যবস্থা করলাম। সেই সাথে সর্বদা আমি তোমাকে দেখছি, তোমার প্রতি আমার দৃষ্টি রাখছি

এবং তোমাকে হিফাজত করছি। উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা গেল যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য যেমন দু'টি চোখ শোভনীয়, তার জন্য ঠিক সেরকমই দু'টি চোখ রয়েছে। কুরআনুল কারীমে العين (চোখ) শব্দটি আল্লাহর প্রতি একবচন ও বহুবচন এই উভয়ভাবেই مضاف (সম্বোধিত) হয়েছে। হাদীছেও এটিকে আল্লাহর প্রতি দ্বি-বচন হিসাবে সম্বোধিত হয়েছে। দাজ্জালের হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ﴿أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ﴾ "নিশ্চয়ই তোমাদের রব অন্ধ নন"।[৬৪]

এ কথা বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। এখানে সুস্পষ্ট যে, এই হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহর জন্য একচোখ সাব্যস্ত করা উদ্দেশ্য নয়। যার চোখ মাত্র একটি সে তো প্রকাশ্য কানা। আল্লাহ তা'আলা এই দোষের অনেক উর্ধ্বে। আরবদের ভাষায় مضاف إليه এর অবস্থা অনুপাতে مضاف কখনো একবচন, কখনো দ্বি-বচন আবার কখনো বহুবচন হয়। একবচনের اسم বা বিশেষ্যকে যদি একবচনের ضمير এর (সর্বনামের) দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করা হয়, তাহলে সেই ইসমকেও একবচন ব্যবহার করতে হয়। যেমন: هذا قلمك এটি তোমার কলম। আর যদি বহুবচনের শব্দের দিকে ইযাফত করা হয়, চাই সে বহুবচন ইসমে যাহের হোক কিংবা সর্বনাম হোক, তাহলে শাব্দিক মিল রাখার জন্য সেই مضاف বা সম্বোধিত পদকে বহুবচন ব্যবহার করাই উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا আমাদের চোখসমূহের সামনেই নৌকাটি চলছিল। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا﴾

"এরা কি দেখে না, আমাদের নিজের হাতসমূহের তৈরী জিনিসের মধ্য থেকে এদের জন্য সৃষ্টি করেছি গবাদি পশু?" *(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৭১)।*

আর যখন আরবরা তাদের ভাষায় দ্বি-বচনের শব্দকে অপর কোন দ্বি-বচনের শব্দের দিকে ইযাফত করে, তখন তারা বাক্যকে অধিকতর ফাসীহ (সুস্পষ্ট) করার জন্য দ্বি-বচনকেও (মুযাফকেও) বহুবচন ব্যবহার করে থাকে। যেমন: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾

৬৪ . ছ্বহীহ: ছ্বহীহ বুখারী ৪৪০২, আবূ দাউদ ৪৩২০, তিরমিযী ২২৪১।

তোমাদের দু'জনের মন সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে *(সূরা তাহরীম ৬৬:৪)*।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'জন স্ত্রীর অন্তর মাত্র দু'টি। দ্বি-বচনের শব্দকে দ্বি-বচনের দিকে ইযাফত (সম্বন্ধ) করার কারণে দ্বি-বচন মুযাফকে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তোমাকে চোখ দিয়ে দেখছি এবং হাত দিয়ে ধরে রাখছি, এ কথা কোন শ্রোতারই বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ থেকে পৃথিবীর কোন মানুষই এ কথা থেকে বুঝে না যে, একটি চেহারায় অনেকগুলো (দুই এর অধিক) চোখ থাকে।

١٣ – إثبات السمع والبصر لله تعالى

১৩। আল্লাহ তা'আলার শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করণ

وقوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} وقوله: {لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء} {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} وقوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} وقوله: {أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} {الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

"যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতা" *(সূরা মুজাদালাহ ৫৮:০১)*। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের প্রতিবাদ করে বলেন,

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾

"নিসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾

"তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় এবং গোপন পরামর্শ শুনিনা? হ্যাঁ, শুনি। আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে" *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩:৮০)*। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তার ভাই হারূন (আলাইহিস সালাম) কে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

"আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি *(সূরা ত্বহা ২০:৪৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾

"সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন?" *(সূরা আল আলাক্ব ৯৬:১৪)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

"যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি উঠো এবং সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা ও নড়া-চড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" *(সূরা আশ শুআরা ২৬:২১৮-২২০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

"হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো। আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ তোমাদের আমল দেখবেন *(সূরা আত তাওবা ৯: ১০৫)*

.....

ব্যাখ্যা: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِـــي "আল্লাহ তার কথা শুনেছেন: খাওলা বিনতে ছা'লাবার কথা বলা হয়েছে।

تُجَادِلُـــكَ তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে: হে নাবী! সে তোমার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে বারবার কথা বলছিল। খাওলার স্বামীর নাম ছিল আওস ইবনে সামেত। আর এটি ছিল ঐ সময়ের ঘটনা, যখন সে তার স্ত্রীর সাথে যিহার[৬৫] করেছিল।

وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه সে আল্লাহর নিকট অভিযোগ পেশ করছে: এ বাক্যটিকে تجادلك এর সাথে আতফ (যুক্ত) করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আওসের স্ত্রী খাওলাকে বললেন, (قد حرمت عليه) তুমি তোমার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো, তখন খাওলা বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! তিনি তো তালাক শব্দ উচ্চারণ করেননি। অতঃপর খাওলা বলতে লাগল, আমি আল্লাহর কাছেই আমার অভাব-অনটনের অভিযোগ করছি এবং আমার

৬৫. নিজের স্ত্রীকে মাহরাম অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম, তাদের কারো সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা তাহরীমের প্রথম দিকের আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা পড়ার অনুরোধ করা হলো।

নিঃসঙ্গের কথা তাকেই জানাচ্ছি। জেনে রাখুন: আমার রয়েছে আওসের পক্ষ হতে কয়েকটি শিশু সন্তান। আমি যদি সন্তানগুলোকে তার নিকট সোপর্দ করি, তাহলে তারা ধ্বংস হবে এবং আমার কাছে নিয়ে আসলেও ক্ষুধায় মরবে। এই বলে সে আকাশের দিকে মাথা উঠাচ্ছিল এবং বলছিল: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভিযোগ করছি।

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا **আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথা শুনেন:** অর্থাৎ তিনি তোমাদের কথার পুনরাবৃত্তি শ্রবণ করেন।

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ **নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা:** তিনি সব আওয়াজ শ্রবণ করেন এবং সব মাখলুকের প্রতিই রয়েছে তার দৃষ্টি। এই মহিলাটি তোমার সাথে যেই বাদানুবাদ করছে এবং একই কথার পুনরাবৃত্তি করছে, তাও আল্লাহর শ্রুত আওয়াজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ **নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐসব লোকদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান:** এরা হচ্ছে ইয়াহূদীদের একটি দল। আল্লাহ তা'আলা যখন এ আয়াত নাযিল করেন,

﴿مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾

তোমাদের মধ্যে কে আল্লাহকে করযে হাসানা[৬৬] দিতে প্রস্তুত? *(সূরা আল বাকারা ২:২৪৫)।*

তখন ইয়াহূদীরা উপরোক্ত কথাটি বলেছিল। দুর্বল ও দরিদ্র লোকদের সাথে ছলনা করার জন্যই তারা উক্ত কথা বলেছিল। আসলে তারা বিশ্বাস করতো না যে, আল্লাহ ফকীর আর তারা ধনী। কেননা তারা আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিল। দীন ইসলামের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যই তারা এই ধরণের কথা বলেছিল।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ **তারা কি মনে করে যে আমি তাদের গোপন বিষয় শুনি না?** তারা তাদের মনের মধ্যে যেই বিষয় গোপন করে অথবা নির্জন স্থানে একত্রিত হয়ে পরস্পর যেই আলোচনা করে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন।

---

৬৬. আমাদের সমাজের অনেকেই সুদহীন ঋণকে করযে হাসানা বলে থাকে। এটি ঠিক নয়; মূলতঃ নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর রাস্তায় এবং গরীব-মিসকীনদের দান-খয়রাত করাকেই করযে হাসানা বলা হয়।

وَنَجْوَاهُمْ গোপন পরামর্শ: অর্থাৎ তিনি তাদের গোপন পরামর্শও জেনে ফেলেন। তারা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেই গোপন পরামর্শ করে আল্লাহ তা'আলা তাও জানেন। মানুষ তার ঘনিষ্ট বন্ধুর সাথে গোপনে যেই আলাপ করে এবং অন্যদের থেকে তা গোপন রাখে, তাকেই নাজওয়া বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হ্যাঁ, আমি সেই গোপন আলাপ সম্পর্কে জানতে পারি এবং তা শুনে ফেলি।

وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ আমার প্রেরিত দূতগণ তাদের নিকটে থাকে ও লিপিবদ্ধ করে: অর্থাৎ সম্মানিত লেখকগণ তাদের নিকট অবস্থান করে তাদের থেকে যেসব কথা ও কাজ প্রকাশিত হয়, তার সবই লিখে ফেলেন।

إِنَّنِي مَعَكُمَا আমি তোমাদের সাথে আছি: আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা (আলাইহিস সালাম)ও হারুন (আলাইহিস সালাম)কে ফেরআউনের নিকট পাঠিয়েছিলেন তখন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, إِنَّنِي مَعَكُمَا আমি তোমাদের সাথে আছি। এই কথার অর্থ হচ্ছে তোমাদেরকে হিফাযত করার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছি।

أَسْمَعُ وَأَرَى আমি শুনি এবং দেখি: অর্থাৎ আমি তোমাদের উভয়ের কথা শুনছি এবং তোমাদের শত্রুর কথাও শুনছি। সে সাথে তোমরা দু'জন যে স্থানে অবস্থান করছো তা আমি দেখছি এবং তোমাদের শত্রু যে স্থানে আছে, সে স্থানও দেখছি। তোমরা দুইজন যা করছো এবং সে যা করছে, তাও দেখছি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, **لَا تَخَافَا** তোমরা ভয় করো না।

أَلَمْ يَعْلَمْ সে কি জানে না? এখানে আবু জাহেলের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা বলা হয়েছে।[৬৭] সে যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাবার চত্বরে ছ্বলাত পড়তে নিষেধ করেছিল।

---

৬৭. আবু জাহেলকে কেন্দ্র করে সূরা আলাক্বের এ আয়াত এবং তার আগের ও পরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। সে যখন দেখল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের দারুন নাদওয়ার নিকটেই কাবা ঘরের আঙ্গিনায় প্রতিদিন ছ্বলাত আদায় করেন, তখন সে বলল,

لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لَوْ فَعَلَهُ لأَخَذَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ

"আমি যদি মুহাম্মাদকে কাবার নিকট ছ্বলাত পড়তে দেখি তবে তার ঘাড় পদদলিত করবো। তার এ কথা জানতে পেরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি তা করে তাহলে ফেরেশতাগণ তাকে পাকড়াও করবে"।

بِأَنَّ اللَّـهَ يَـرَىٰ **আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন এবং তার কথা শুনছেন? আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তাকে তার কাজের পূর্ণ সাজা দিবেন। এই প্রশ্নের মাধ্যমে তাকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে।

الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ **তিনি তোমাকে দেখতে থাকেন যখন তুমি উঠো:** অর্থাৎ যখন তুমি একাকী ছ্বলাতের জন্য উঠো ও ছ্বলাত পড়ো তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাকে দেখেন।

وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ **সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার ওঠা-বসা এবং নড়া-চড়ার প্রতিও তিনি দৃষ্টি রাখেন:** অর্থাৎ তুমি যখন জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করার সময় রুকুতে থাকো কিংবা সাজদায় থাকো অথবা দাঁড়ানো থাকো, তখনো আল্লাহ তোমাকে দেখেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ তুমি যা বলো, তিনি অবশ্যই তা শুনেন এবং তা জানতে পারেন।

وَقُـلِ اعْمَلُـوا **হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা আমল করতে থাকো:** আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি এসব মুনাফেকদেরকে বলে দাও যে, তোমরা যা ইচ্ছা আমল করতে থাকো এবং তোমরা তোমাদের বাতিল পথেই চলতে থাকো। কিন্তু তোমরা এই কথা মনে করো না যে, তোমাদের আমলসমূহ গোপন থাকবে।

فَسَيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالْمُؤْمِنُـونَ **আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনগণ! তোমাদের কাজ দেখবেন:** অর্থাৎ মানুষের সামনে তোমাদের আমলসমূহ প্রকাশিত হবে এবং দুনিয়াতেই তা দেখা যাবে। মৃত্যুর পর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এমন এক সত্তার দিকে,

إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

'যিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই জানেন এবং তোমরা কি করতে তা তিনি তোমাদের বলে দেবেন।' অতঃপর তিনি সেই আমলগুলোর বদলা দিবেন।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলাকে শ্রবণ করা ও দেখা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ শ্রবণ করেন ও দেখেন। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে শ্রবণ করা ও দেখা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই দেখেন ও শুনেন। তবে তিনি সৃষ্টির ছিফাতসমূহ থেকে এবং সৃষ্টির সাদৃশ্য

হওয়া থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। উপরের আয়াতগুলো আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা এবং দেখা সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একদম সুস্পষ্ট। তাতে فعل ماضي তথা অতীত কালের জন্য তৈরী শব্দ قد سمع (অবশ্যই শুনেছেন)এর মাধ্যমে, فعل مضارع তথা বর্তমান-ভবিষ্যতের জন্য গঠিত শব্দ يسمع (শুনছেন)এর মাধ্যমে এবং اسم فاعل তথা কতৃবাচক বিশেষ্যের জন্য গঠিত শব্দ سميع (শ্রবণকারী)এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য শ্রবণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। মোট কথা سمع, يسمع, سميع এই তিনটি শব্দ আল্লাহর জন্য শ্রবণ করা বিশেষণ অত্যন্ত জোরালোভাবেই সাব্যস্ত করেছে। যে বস্তু বা প্রাণী শুনতে পায় না আরবদের ভাষায় তাকে শ্রবণকারী ও দ্রষ্টা বলা সঠিক নয়। যে প্রাণী বা বস্তু শুনতে পায় এবং দেখতে পায়, শুধু তার ক্ষেত্রেই বলা হয় যে, يسمع ويبصر। এটিই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি। আরবীতে এ কথা বলা হয় না যে, الجبل سميع بصير পাহাড় শুনে ও দেখে। যে শুনে এবং দেখে তাকে ছাড়া অন্য কারো জন্য এই কথা বলা অসম্ভব।[৬৮]

৬৮. অন্যান্য ছিফাতের মতোই আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টির ক্ষেত্রে একই মূলনীতি। তা এ যে, আল্লাহ তা'আলার দেখা ও শুনা কোন সৃষ্টির দেখা ও শুনার মত নয়। আমরা তার দৃষ্টি ও শ্রবণকে মানুষের দেখা ও শুনার সাথে তুলনা করি না। মানুষ যখন বন্ধ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন সে বাহিরের কিছুই দেখতে পায় না এবং বাহিরের কথাও শুনতে পায় না। কিন্তু মহান আল্লাহ আরশের উপর থেকে মাখলুকের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবই দেখতে পান এবং তাদের সব কথাই শুনতে পান।

١٤ – إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به

১৪। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র বিশেষণ সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} وقوله: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَـاكِرِينَ} وقولـه: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} وقوله: {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾

"তিনি মহাশক্তিশালী *(সূরা আর রা'দ ১৩:১৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَاكِرِينَ﴾

"তারা (বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী কাফিররা ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্র করলো। জবাবে আল্লাহও তার গোপন কৌশল খাটালেন। আর আল্লাহ ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম" *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)*। আল্লাহ তা'আলা সালেহ আলাইহিস সালাম এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেন:

﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

"তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো এবং আমিও বিরাট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, যার কোন খবর তারা রাখতো না" *(সূরা আন নামল ২৭:৫০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾

"এরা একটি ষড়যন্ত্র করছে এবং তাদের মুকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি " *(সূরা আত ত্বরিক ৮৬:১৫-১৬)*।

.....

ব্যাখ্যা: وَهُوَ তিনি: অর্থাৎ আল্লাহ ওয়া তা'আলা।

شَدِيدُ الْمِحَالِ মহাশক্তিশালী *(সূরা আর রা'দ ১৩:১৩)*। المحال শব্দের আভিধানিক অর্থ কঠোরতা। অর্থাৎ কঠোর ষড়যন্ত্র।

ভাষাবিদ ইমাম যাজ্জায বলেন, আরবী ভাষায় বলা হয় ماحلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد অর্থাৎ তুমি তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ হলে। এই কথা ঠিক ঐ সময় বলা হয়, যখন তুমি তার সাথে শক্তি ও কঠোরতা প্রদর্শনে অবতীর্ণ হও। যাতে করে সুস্পষ্ট হয়, কে অধিক কঠোর।

ইবনুল আরাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, المحال অর্থ ষড়যন্ত্র করা। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত কঠোর ষড়যন্ত্রকারী এবং মহাকৌশল অবলম্বনকারী। আল্লাহর পক্ষ হতে ষড়যন্ত্র করার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তাকে এমনভাবে শাস্তি দেয়া, যাতে সে বুঝতে না পারে।

وَمَكَرُوا তারা গোপনে ষড়যন্ত্র করলো: অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের লোকেরা ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো। এখানে তাদের ঐসব লোক উদ্দেশ্য, যাদের নিকট থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম কুফুরী অনুভব করেছিলেন। তারা ছিল বনী ইসরাঈলের কাফির সম্প্রদায়। তারা ইসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইল। المكر (ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা) বলা হয় এমন কাজ করাকে, যার উদ্দেশ্য হয় সেই কাজের বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত।

وَمَكَرَ اللَّهُ আল্লাহ তা'আলাও ষড়যন্ত্র করলেন: এই কথার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে অবকাশ দিয়ে পরবর্তীতে পাকড়াও করলেন এবং তাদেরকে ষড়যন্ত্রের শাস্তি দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাদৃশ্য ও আকৃতি অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদান করলেন এবং ঈসাকে উপরে আল্লাহর দিকে উঠিয়ে নিলেন।[৬৯]

---

৬৯. ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, বনী ইসরাঈলের ইয়াহূদী কাফিররা ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে হত্যা করার জন্য আগমন করল। তাদের সাথে ছদ্মবেশী একজন নিকৃষ্ট লোক ছিল। এ লোকটি বাহ্যিকভাবে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর আনুগত্য প্রকাশ করলেও সে ছিল কুচক্রী ও খিয়ানতকারী কাফির। সে এসেছিল ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে দেখিয়ে দিতে। যাতে করে ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করতে পারে। ঈসা (আলাইহিস সালাম) তখন এমন একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন, যাতে একটি ছিদ্র ছিল। ছদ্মবেশী খিয়ানতকারী লোকটি সে ঘরে প্রবেশ করল। তার পিছ ধরে ইয়াহূদীরাও ক্রোধান্বিত ও হিংসার আগুনসহ অগ্রসর হল। ঐদিকে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল ফেরেশতাকে পাঠিয়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে ঘরের সে ছিদ্র দিয়ে নিজের দিকে উঠিয়ে নিলেন এবং এ কুচক্রী ও খিয়ানতকারীকেই ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর মত আকৃতি প্রদান করলেন। ছদ্মবেশী ঘরে প্রবেশ করে ঈসাকে পেল না। সে ঘর থেকে বের হয়ে এসে ইয়াহূদীদেরকে বলল, আমি তো ঈসাকে ঘরে দেখতে পাইনি। ইয়াহূদীরা ক্রোধান্বিত হয়ে বলল, তুমিই তো ঈসা। এ বলে তারা তাকেই ঈসা (আলাইহিস সালাম) মনে করে হত্যা করল এবং ক্রুশবিদ্ধ করল। এই ছিল আল্লাহর কৌশল ও ষড়যন্ত্র। তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকেন। কুচক্রী লোকটি

وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম ষড়যন্ত্রকারী: অর্থাৎ তিনি শাস্তি ও কষ্টের যোগ্য ব্যক্তিকে কষ্ট ও শাস্তি প্রদান করতে সর্বাধিক শক্তিশালী ও সক্ষম। তিনি এমনভাবে তা করতে সক্ষম যে, ষড়যন্ত্রকারীরা তা বুঝতেই পারে না।

وَمَكَرُوا مَكْرًا তারা বড় ধরণের একটি ষড়যন্ত্র করলো: এখানে সালেহ এর সম্প্রদায়ের কাফিরদের ষড়যন্ত্রের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৭০] তারা আল্লাহর

ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে ষড়যন্ত্র করলেন অর্থাৎ তার শরীরে ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর ছাপ লাগিয়ে দিলেন। সে তার উপযুক্ত শাস্তি পেল। আল্লাহ তার সাথে এমন ষড়যন্ত্র করলেন যে, সে বুঝতেই পারল না। ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করল এবং ক্রুশবিদ্ধ করল। এ হচ্ছে আল্লাহর রীতি। তিনি এক ষড়যন্ত্রকে আরেক ষড়যন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। এ লোকটি ষড়যন্ত্র করল। ইয়াহূদীরাও ষড়যন্ত্র করল। আল্লাহ তা'আলা তার ষড়যন্ত্রকে তার উপরই ফিরিয়ে দিলেন। যারা নাবী-রসূল এবং আল্লাহর অলীদেরকে কষ্ট দেয় ও তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালায়, তিনি সে যালেম ও কুচক্রীদেরকে এভাবেই শাস্তি দেন।

এরপর ইয়াহূদীরা সন্দেহে পড়ে গেল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা যদি ঈসাকেই হত্যা করে থাকি, তাহলে আমাদের সে লোকটি কোথায়? আর যদি আমাদের লোকটিকে হত্যা করে থাকি, তাহলে ঈসা (আলাইহিস সালাম) গেলেন কোথায়? এ সন্দেহে তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আসল কথা হচ্ছে, যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

"প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যাও করেনি এবং শূলেও চড়ায়নি বরং ব্যাপারটিকে তাদের জন্য সন্দিগ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এ ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে তারাও আসলে সন্দেহের মধ্যে অবস্থান করছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কিত কোন জ্ঞান নেই, আছে নিছক আন্দাজ-অনুমানের অন্ধ অনুসৃতি। নিঃসন্দেহে তারা ঈসা মসীহকে হত্যা করেনি; বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আন নিসা ৪: ১৫৭-১৫৮)

৭০. হিজর (বর্তমান নাম মাদায়েন সালেহ) অঞ্চলে সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর সম্প্রদায় ছামুদ জাতি বসবাস করতো। বর্তমান সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে এটি অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রচুর নিয়ামত দিয়েছিলেন। বাগ-বাগিচা, শষ্যক্ষেত্র, গবাদি পশু ইত্যাদি সকল প্রকার সম্পদই আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছিলেন। তারা সমতল ভূমিতে বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করতো এবং পাহাড়েও খোদাই করে সুন্দর সুন্দর ঘর নির্মাণ করতো। তাদের শরীরের গঠনও ছিল অত্যন্ত মজবুত এবং তারা ছিল খুবই শক্তিশালী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ আদ জাতির পর তোমাদেরকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যার ফলে আজ তোমরা তাদের সমতলভূমিতে বিপুলায়তন প্রাসাদ ও তার পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছো। কাজেই তার সর্বময়

ক্ষমতার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যেয়ো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না"। (সূরা আল 'আরাফ: ৭৪)

কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে অস্বীকার করেছিল। সে সাথে তারা মূর্তি পূজাও করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট সালেহ (আলাইহিস সালাম) কে পাঠালেন। তিনি তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহবান জানালেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ۖ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"আর আমি সামুদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য ইলাহ নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের রবের সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। কাজেই তাকে আল্লাহর যমীনে চরে খাবার জন্য ছেড়ে দাও। কোন অসদুদ্দেশ্যে এর গায়ে হাত দিয়োনা। অন্যথায় একটি যন্ত্রনাদায়ক আযাব তোমাদের উপর আপতিত হবে"। *(সূরা আল 'আরাফ: ৭৩)*

কিন্তু তারা সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং বিদ্রোহ করলো। আল্লাহর নির্দশন স্বরূপ আগত উটনীকেও তারা হত্যা করে ফেলল। শুধু তাই নয়; তারা সালেহ (আলাইহিস সালাম) এবং তার পরিবারের লোকদেরকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করারও গোপন ষড়যন্ত্র করল। তাদের ষড়যন্ত্র এ ছিল যে, তারা বলল, আমরা সালেহ (আলাইহিস সালাম) এবং তার পরিবারকে হত্যা করবো। অতঃপর সকালে যখন সে বিষয়ে কথা উঠবে, তখন শপথ করে আমরা বলবো, আমরা এ হত্যাকান্ড সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাদের এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার আগেই আল্লাহর কৌশল ও ষড়যন্ত্র সামনে চলে আসল। তারা আল্লাহর নাবী ও তার পরিবারের ব্যাপারে এক জঘন্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করেছিল। আল্লাহ তাদের এ মন্দ পরিকল্পনাকে শুধু ব্যর্থই করে দেননি; বরং সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার পূর্বেই তাদেরকে এমনভাবে পাকড়াও করলেন যে, তারা বুঝতেই পারল না। যে রাতে তারা তাকে এবং তার পরিবারকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তার আগেই এক বিকট আওয়াজের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সকল পাপিষ্ঠ কাফিরকে ধ্বংস করে দিলেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) এর মাত্র একটি বিকট চিৎকারের আওয়াজে তাদের দেহের ভিতরেই কলিজা ও অন্তর ফেটে গেল। তারা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রইল। এ ভয়াবহ আযাব থেকে আল্লাহ তা'আলা তার নাবী সালেহ (আলাইহিস সালাম) এবং মুমিনদেরকে রক্ষা করলেন। বিকট আওয়াজের এ শাস্তিকে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (٦٦) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٦٧) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ﴾

"শেষ পর্যন্ত যখন আমার ফায়ছালার সময় এসে গেলো তখন আমি নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে তাদেরকে বাঁচালাম। নিঃসন্দেহে তোমার রবই শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী। আর যারা যুলুম করেছিল একটি বিকট

নাবী সালেহ (আলাইহিস সালাম) এবং তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর ওয়ারিস এবং আত্মীয়দের ভয়ে তারা এ ষড়যন্ত্র গোপনে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিল। যাতে তারা হত্যাকারীদের পরিচয় জানতে পেরে প্রতিশোধ নিতে না পারে।

وَمَكَرْنَا مَكْرًا "আমিও বিরাট একটি কৌশল অবলম্বন করলাম"। অর্থাৎ তাদের এই কর্মের প্রতিফল দিলাম ও তাদেরকে ধ্বংস করলাম এবং আমার নাবী সালেহকে নাজাত দিলাম। অথচ তারা আমার এ কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতেই পারেনি।

إِنَّهُمْ **তারা:** এখানে মক্কার কুরাইশ কাফিরদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছে।

يَكِيدُونَ كَيْدًا **একটি ষড়যন্ত্র করছে:** মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে যেই সত্য দীন নিয়ে এসেছেন, তারা প্রতিহত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল।[৭১]

وَأَكِيدُ كَيْدًا **তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় আমিও একটি কৌশল করছি:** অর্থাৎ তাদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করি এবং তাদের ষড়যন্ত্রের সাজা দেই। অতঃপর তাদেরকে আকস্মিকভাবে ধরে ফেলি। আমার পাকড়াও সম্পর্কে তারা মোটেই টের পায় না। উপরের আয়াতগুলো হতে প্রমাণিত হলো, আল্লাহ তা'আলার المكر والكيد ষড়যন্ত্র ও কৌশল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রকৃতভাবেই ষড়যন্ত্র ও কৌশল

আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করলো এবং তারা নিজেদের বাড়িঘরে এমন অসার ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে রইলো, যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। শোনো! সামূদ জাতির লোকেরা তাদের রবের সাথে কুফরী করলো। শোনো! ছামুদ জাতিকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করা হয়েছে (তারা আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়েছে)"। (সূরা হুদ: ৬৬-৬৮)

তাদের ষড়যন্ত্রের শাস্তি ও প্রতিফল হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেই শাস্তি দিলেন, এটিকে আল্লাহর ষড়যন্ত্র ও কৌশল হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা আল্লাহর নাবী-রসূল ও অলীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। মূলতঃ আল্লাহর ষড়যন্ত্র অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন।

৭১. শুধু তাই নয়; তারা স্বয়ং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করার জন্য এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাথে কৌশল করেছেন এবং তাদের সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তিনি তার রসূলকে তাদের চোখের সামনে দিয়ে নিরাপদে বের করে নিয়েছেন। তারা তাকে দেখতেই পারেনি।

সাব্যস্ত করা হয়েছে। গোপনে কারো কাছে কোনো জিনিস পৌঁছিয়ে দেয়াকে المكر বলা হয়। الكيد এবং المخادعة শব্দদ্বয় ষড়যন্ত্র ও কৌশল অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

ষড়যন্ত্র ও কৌশল দু'প্রকার: একটি হচ্ছে অন্যায় ষড়যন্ত্র। আরেকটি হচ্ছে ভালো ও ন্যায় ষড়যন্ত্র। যার সাথে ষড়যন্ত্র করা অনুচিত এবং যে ব্যক্তি অসদাচরণের উপযুক্ত নয়, তার সাথে ষড়যন্ত্র করাকে অন্যায় ও অসৎ ষড়যন্ত্র বলা হয়।

আর ষড়যন্ত্রের শাস্তি স্বরূপ যে ব্যক্তি অসদাচরণ পাওয়ার হকদার তার সাথে ষড়যন্ত্র করা ন্যায়সঙ্গত। প্রথম প্রকার ষড়যন্ত্র হচ্ছে ঘৃণ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার ষড়যন্ত্র হলো প্রশংসাযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিশেষ হিকমাতের কারণে যেই প্রকার ষড়যন্ত্র প্রশংসনীয়, শুধু তাই করেন। তিনি যালেম ও পাপিষ্ঠদেরকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করেন, যা তারা কল্পনাও করতে পারে না।

যালেমরা আল্লাহর বান্দাদের সাথে যেরূপ আচরণ করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা যালেমদেরকে সেভাবে পাকড়াও করেন না; বরং আল্লাহর পাকড়াও হয় ভিন্ন ধরণের এবং অত্যন্ত কঠোর।

যারা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্র করে, তাদের শাস্তি স্বরূপই কেবল আল্লাহ তা'আলা তার নিজের পবিত্র সত্তার জন্য ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং ধোঁকা সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ যারা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করে তাদের অপকর্মের মোকাবেলায় আল্লাহও তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করেন ও ষড়যন্ত্রকারীদেরকে শাস্তি দেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ইহা জানা কথা যে, মন্দ, যুলুম এবং অন্যায়ের বিনিময়ে শাস্তি দেয়া সকল মানুষের নিকটেই প্রশংসনীয়। সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য অন্যায় ও ষড়যন্ত্রমূলক কাজের শাস্তি দেয়া কেন প্রশংসনীয় হবে না?[৭২]

---

৭২. শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যে গোপন কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাকে مكر, كيد , خداع তথা কৌশল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলা হয়। এই বিশেষণগুলো সাধারণত আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে কামালীয়া তথা পূর্ণতার গুণাবলী হিসাবে পরিগণিত নয়। কিন্তু শত্রুর মোকাবেলায় এগুলো প্রয়োগ করলে দূষণীয় হয় না, বরং প্রশংসনীয় হয়। সেই সাথে আল্লাহর পূর্ণ ইলম এবং অসীম ক্ষমতাও প্রকাশিত হয়।

একটি সতর্কতা

ষড়যন্ত্র করা, কৌশল অবলম্বন করা এবং ধোঁকা দেয়া এ বিষয়গুলোর নিসবত (সম্বন্ধ) যখন আল্লাহর দিকে করা হবে, তখন বুঝতে হবে এগুলো আল্লাহ তা'আলার কর্ম বা কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর নামগুলোর তুলনায় তার কর্মের পরিধি অনেক বিশাল। তাই আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তার জন্য এমনসব أفعال (কর্ম) সাব্যস্ত করেছেন, যেগুলো থেকে তার নিজের জন্য কোন নাম নির্ণয় করেননি।

উদাহরণ স্বরূপ أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) شاء الله (আল্লাহ চেয়েছেন), এ দু'টি ক্রিয়ার কথা বলা যেতে পারে। এ দু'টি ক্রিয়া থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম বের করে এভাবে বলা যাবে না যে, المريد (ইচ্ছাকারী) এবং الشائي (ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকারী)। مكر (ষড়যন্ত্র করা), كيد (কৌশল করা) الخداع (ধোঁকা দেয়া) الاستهزاء (ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা) ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই কথা।

এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যথাক্রমে ماكر (ষড়যন্ত্রকারী), كائد (চক্রান্তকারী), مخادع (প্রতারণাকারী) এবং مستهزئ (বিদ্রূপকারী) নাম নির্ধারণ করা এবং সেগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

কেননা এ নামগুলো যেই অর্থ বহন করে তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী প্রশংসনীয় এবং অন্য শ্রেণী নিন্দনীয়। এ দুই শ্রেণী হতে কেবল আল্লাহর জন্য প্রশংসনীয়টাই সাব্যস্ত হবে। যেমনটি ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে এবং বিনা পার্থক্যে এ কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হলে এবং এগুলো থেকে তার পবিত্র সত্তার জন্য নাম গ্রহণ করা হলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কামালিয়াত (পূর্ণতা) সাব্যস্ত হবে না।[৭৩]

---

৭৩. আল্লাহর নামসমূহ তিন প্রকার: (১) আল্লাহ্ তা'আলার এমন অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো এককভাবেই এবং সরাসরি আল্লাহর কামালীয়াত (পূর্ণতা) ও প্রশংসা বুঝায়। যেমন আর্ রহমান, আর রহীম, আল আলীম, আল হাকীম, আল আযীয আর রায্যাক, আস্ সামীউ, আল বাসীর ইত্যাদি। (২) আল্লাহর আরো এমন অনেক নাম রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন فعال لما يريد (যা ইচ্ছা সম্পাদনকারী)। শুধু فعال (কর্মসম্পাদনকারী) বললে আল্লাহর পরিপূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায়না। (৩) আরো রয়েছে আল্লাহর এমন কতিপয় নাম, যেগুলোর সাথে রয়েছে আরেকটি বিপরীত অর্থবোধক নাম। এ সমস্ত নাম তার বিপরীত অর্থবোধক নাম উল্লেখ ছাড়া আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা শোভা পায়না। সেগুলো যদি এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে পূর্ণতার স্থলে অপূর্ণতা ও ত্রুটি বুঝায়। যেমন النَّافِع الضَّار (ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), الخَافِض الرَّافِع

(নিচুকারী ও উত্তোলনকারী), الْمُعْطِي الْمَانِع (দানকারী ও বারণকারী), المُعِزُّ المُذِلُّ (সম্মানদাতা ও অপমানকারী), القابض الباسط (সংকীর্ণকারী ও সম্প্রসারণকারী), الأَوَّلُ والآخِرُ তিনিই প্রথম এবং তিনিই সর্বশেষ, الظاهر والباطن (তিনিই প্রকাশমান এবং তিনিই অপ্রকাশমান ইত্যাদি।

সুতরাং এককভাবে শুধু المُعِزُّ ,الباطن ,الظاهر ,الأول ,الآخر ,الْمَانِع ,الخَافِض ,الضَّار ইত্যাদি ব্যবহার করা জায়েয নেই। কুরআন বা হাদীছের কোথাও এগুলোর কোন একটিও এককভাবে ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপ আল্লাহ্ তা'আলার مُنْتَقِم তথা প্রতিশোধগ্রহণকারী নামটিও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত বর্ণিত হয়নি। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: إِنَّا مِنْ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ "নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি"। (সূরা সিজদা: ২২) অথবা তা থেকে নির্গত ছিফাতের দিকে ذو (যূ) শব্দ সম্বোধন ব্যতীত ব্যবহার করা হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী: وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ আর আল্লাহ্ পরাক্রান্ত ও প্রতিশোধগ্রহণকারী।

কিন্তু আল্লাহর أفعال (কর্মসমূহ) দুই প্রকার:

(১) এমন কর্ম, যা থেকে নাম নির্ণয় করা বৈধ। যেমন خلقَ يَخْلُقُ (সৃষ্টি করা)। এ থেকে আল্লাহর الخالق (সৃষ্টিকর্তা) নাম বের করা হয়েছে। علم يعلم (জানা), এখান থেকেই العليم (সর্বজ্ঞ) নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। سمع يسمع (শ্রবণ করা)। এ থেকেই السميع (সর্বশ্রোতা) নাম গ্রহণ করা হয়েছে। এমনি আল্লাহর আরো অনেক ফেল বা কাজ রয়েছে, যা থেকে নামও গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকার ফেল থেকে সরাসরি এককভাবে নাম নির্ধারণ করা হলে আল্লাহর পূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায়।

(২) আল্লাহ তা'আলার আরেক প্রকার কাজ রয়েছে, যা থেকে সরাসরি আল্লাহর জন্য নাম গ্রহণ করা জায়েয নয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ أراد الله (আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন) شاء الله (আল্লাহ চেয়েছেন), - এই দু'টি কাজের কথা বলা যেতে পারে। এই দু'টি ফেল থেকে আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম গ্রহণ করে এভাবে বলা যাবে না যে, المريد (ইচ্ছাকারী) এবং الشائي (ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকারী)। مكر (ষড়যন্ত্র করা), كيد (কৌশল করা) الخداع (ধোঁকা দেয়া) الاستهزاء (ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা) النسيان (ভুলে যাওয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও একই কথা। এগুলো থেকে আল্লাহর জন্য যথাক্রমে ماكر (ষড়যন্ত্রকারী), كائد (চক্রান্তকারী), مخادع (প্রতারক) এবং مستهزئ (বিদ্রুপকারী) নাম নির্ধারণ করা এবং সেগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এমনি আরো অনেক কাজ রয়েছে, যা থেকে নাম বের করা এবং তা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা জায়েয নয়।

١٥ – وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة

১৫। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা, রহমত, মর্যাদা ও ক্ষমতা

وقوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا} {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} وقوله: {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} وقوله عن إبليس: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾

"তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে সৎকাজ করে যাও অথবা যদি কারো মন্দ ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও ক্ষমতাবান"। *(সূরা আন নিসা ৪:১৪৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"তাদের উচিত ক্ষমা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াকারী"।[৭৪] *(সূরা আন নূর ২৪: ২২)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

---

৭৪. এ আয়াতটি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, মিসতাহ ইবনে উছাছাহ ছিল আবু বকরের খালাতো ভাই। সে ছিল মিসকীন। তার কোন সম্পদ ছিল না। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার জন্য খরচ করতেন। সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধেও শরীক ছিল।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধে যখন মুনাফিকরা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পবিত্রতার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দিল, তখন কতিপয় ভালো মুমিন লোকও ফিতনায় পড়ে গেলেন। তারাও দু'চার কথা বলেছিলো। তাদের মধ্যে আবু বকরের খালাতো ভাই মিসতাও ছিল। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মিছতার ব্যাপারটি জানতে পারলেন, তখন তিনি মিসতার উপর খুব রাগান্বিত হলেন এবং শপথ করে বললেন, আমি তোমার জন্য এখন থেকে এক পয়সাও খরচ করবো না। এই বলে তিনি মিসতার অনুদান বন্ধ করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন এবং মুমিনদেরকে ক্ষমার বিশেষণে বিশেষিত হওয়ার আদেশ করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন বললেন, তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন? তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই তা চাই।

﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

এরা (মুনাফেকরা) বলে, আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারলে মর্যাদাবান লোকেরা অপদস্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অথচ সম্মান ও মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না *(সূরা মুনাফিকুন ৬৩:৮)*। **আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন,**

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

"সে (ইবলীস) বললো, তোমার ইজ্জতের কসম, আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই *(সূরা ছ্বদ ৩৮:৮২-৮৩)*।

ব্যাখ্যা: إِن تُبْدُوا خَيْرًا তোমরা যদি প্রকাশ্যে সৎকাজ করে যাও অর্থাৎ তোমাদের সৎকর্মগুলোকে মানুষের জন্য প্রকাশ করো। أَوْ تُخْفُوهُ অথবা গোপনে সৎকাজ করে যাও অর্থাৎ যদি গোপনে সৎকাজ করতে থাকো।

أَوْ تَعْفُوا عَن سُوءٍ **অথবা যদি কারো মন্দ ব্যবহারকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলো কিংবা অন্য কোনভাবে কষ্ট দিল, তা যদি তোমরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো, তাহলে জেনে রাখো,

فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমা গুণের অধিকারী অথচ তিনি শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন: তিনি তার বান্দাদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদেরকে মাফ করে দেন। অথচ তারা নিজ হাতে যে অন্যায় কাজ করে, তার কারণে তিনি শাস্তি দিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরাও আল্লাহ তা'আলার গুণে গুণান্বিত হও। কেননা তিনি শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন। সুতরাং তোমাদেরও তাই করা উচিত।[৭৫]

অতঃপর তিনি শপথের কাফফারা আদায় করলেন, মিসতাহকে ক্ষমা করে দিলেন এবং পূর্বের ন্যায় তার জন্য নিয়মিত ভাতা চালু করলেন।

৭৫. মূলতঃ ক্ষমা করা তখনই প্রশংসনীয় কাজ হয়, যখন প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকে। এই প্রকার ক্ষমা করাকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। তাই তিনি বান্দাদেরকে প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমেই তাদের ফযীলত প্রকাশিত হবে। অপরপক্ষে ক্ষমা করার ক্ষমতা না থাকার কারণে যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয়, তার ক্ষমার মধ্যে প্রশংসার কিছু থাকে না। সম্পদের প্রতি প্রয়োজন না থাকার কারণে যে দান করে, তার দানেরও আল্লাহর নিকট কোন মূল্য হয় না।

وَلْيَعْفُوا **তাদের উচিত ক্ষমা করা:** অর্থাৎ আয়াতের প্রথম দিকে সম্মান ও ফযীলতের অধিকারী যেসব মুমিনের আলোচনা করা হয়েছে, তাদের উচিত মানুষের অপরাধ ঢেকে রাখা এবং ক্ষমা করে দেয়া।

وَلْيَصْفَحُوا **তাদের উচিত দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা:** সম্মান ও ফযীলতের অধিকারীদের উচিত দোষ-ত্রুটি ও অপরাধে লিপ্তদের এড়িয়ে চলা এবং তাদের থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা।[৭৬]

আল্লাহ তা'আলা বলেন: أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ **তোমরা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের মাফ করেন?** তোমরা কি চাওনা যে, তোমাদের ক্ষমার কারণে এবং যারা তোমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, তাদের থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে নেয়ার কারণে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন?

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং প্রচুর দয়াবান।

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ **সম্মান-মর্যাদা ও শক্তি তো কেবল আল্লাহ, তার রসূল ও মুমিনদের জন্য:**[৭৭] এখানে ঐসব মুনাফেকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা

---

৭৬. মূলতঃ এখানে এমন দোষ-ত্রুটি ও অপরাধ গোপন রাখা ও ক্ষমা করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা গোপন রাখলে ও ক্ষমা করে দিলে তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তবে অপরাধ যদি মারাত্মক হয় এবং যা গোপন রাখলে ও শাস্তি না দিলে সমাজে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাহলে সমাজ থেকে অন্যায় কাজের মূলোৎপাটন করার জন্য তাতে অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

৭৭. এই আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতিবাদে নাযিল হয়। ছুহীহ বুখারীতে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একবার যুদ্ধের জন্যে বের হলাম। মুহাজিরদের মধ্য হতে বহু লোক এ যুদ্ধে তার সাথে অংশ গ্রহণ করলেন। মুহাজিরদের মধ্যে এক লোক ছিল খুব রসিক। তিনি একজন আনসারী ছাহাবীর শরীরে খোঁচা মারলেন। এতে আনসারী খুব রাগান্বিত হয়ে গেলেন। পরিশেষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ গোত্রকে আহবান করতে লাগল। আনসারী বললেন, হে আনসারগণ! সাহায্য করো। মুহাজিরও বলতে লাগলেন, হে মুহাজিরগণ! সাহায্য কর। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন, কী হল? জাহেলী যুগের ন্যায় হাঁক-ডাক কেন? তারপর তিনি বললেন, তাদের ব্যাপারটা কী? তখন মুহাজির কর্তৃক আনসারীকে খোঁচা মারার কথাটি তাকে জানানো হল। জাবের বলেন, অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহেলী যুগের হাঁক-ডাক পরিত্যাগ কর। কেননা এটাতো অত্যন্ত ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কাজ। মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল তখন বলল, এরা আমাদের বিরুদ্ধে হাঁক দিচ্ছে? আমরা মদীনা ফিরে গেলে মদীনার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ইতর লোকদেরকে নিশ্চয়ই বের করে ছাড়বে। তখন উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি এই পঁচা লোকটির অর্থাৎ আব্দুল্লাহ

মনে করেছিল মুমিনদের উপর কেবল তাদেরই রয়েছে শক্তি ও সম্মান-মর্যাদা। العـزة শব্দের অর্থ শক্তি ও বিজয়।[৭৮] শক্তি ও বিজয় কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তার রসূল ও তার সৎ বান্দাদের মধ্য হতে যাদেরকে দান করেছেন, কেবল তাদের জন্যই। তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইবলীস সম্পর্কে বলেন যে, সে বলেছে: فَبِعِزَّتِكَ তোমার ইজ্জতের কসম: অর্থাৎ ইবলীস আল্লাহ তা'আলার ইয্যতের শপথ করে বলেছে।

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ আমি এদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করবোই: সে বনী আদমের সামনে প্রবৃত্তির কাম্য বস্তুগুলোকে সুসজ্জিত করে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদেরকে গোমরাহ না করে ছাড়বো না।[৭৯] এর ফলে তারা সকলেই গোমরাহ

ইবনে উবাইয়ের গর্দান উড়িয়ে দিব না? নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তাই করা হয়, তাহলে লোকেরা বলবে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছে। তখন এই আয়াতটি নাযিল হয়।

৭৮. العزيز (পরাক্রমশালী, বিজয়ী, পরাজিতকারী) আল্লাহর নাম। পরাজিত করা, শক্তিশালী হওয়া আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাত বা বিশেষণ। তিনি সকল মাখলুকের উপর বিজয়ী হন, কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। এই হিসাবে তিনি আযীয (বিজয়ী)। বলা হয় عز يعُزُّ অর্থাৎ তিনি অন্যের উপর বিজয়ী হয়েছেন, শক্তির মাধ্যমে অন্যকে দাবিয়ে দিয়েছেন ও পরাজিত করেছেন। দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর নিকট মুকদ্দমা পেশকারীদের একজনের উক্তি وعزني في الخطاب কথা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে সে আমার উপর বিজয়ী হয়েছে এবং আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে। সৃষ্টির উপর আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ বিজয়ী হয়। সে হিসাবে তিনি আযীয। তার শত্রুদের উপর তিনি বিজয় লাভ করেন। এ অর্থেও তিনি আযীয। আর যদি আইন বর্ণে যবর দিয়ে عز يعَزُّ পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে قوي অর্থাৎ তিনি নিজেই এমন শক্তিশালী হয়েছেন, যার উপর অন্য কেউ শক্তিশালী হতে পারে না। আর যদি আইন বর্ণে যের দিয়ে عزيعِزُّ পড়া হয়, তা হলে অর্থ হবে শক্ত হওয়া, কঠোর হওয়া। বলা হয়الأرض العزاز (শক্ত যমীন)। এটি হচ্ছে আযীযের সর্বনিম্ন অর্থ। সর্বোচ্চ হচ্ছে প্রথমটি, তারপর দ্বিতীয়টি। সুতরাং এই সবগুলো অর্থ ও ছিফাতই আল্লাহ তা'আলার নাম العزيز -এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ নিজেই শক্তিশালী, শক্তির মাধ্যমে অন্যকে পরাজিতকারী এবং তিনি অত্যন্ত কঠোর।

৭৯. আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে আদমের জন্য সিজদা করার আদেশ দিলেন, তখন ইবলীসও সেই আদেশের আওতায় ছিল। ফেরেশতাগণ সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস অহংকার করল এবং সিজদা করা হতে বিরত রইল। এতে আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের উপর ক্রোধান্বিত হলেন এবং তাকে লা'নত (অভিশাপ) করলেন। ইবলীস মনে করলো, আদমই যেহেতু তার অভিশপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ, তাই হিংসার বশবর্তী হয়ে শপথ করে বলল যে, সে আদম ও তার সন্তানদের থেকে প্রতিশোধ নিবে এবং তাদেরকে গোমরাহ করে ছাড়বে।

ঐদিকে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইবলীস কেবল তার বন্ধু ও চেলাদের উপরই দাপট ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হবে, তাদের উপর ইবলীসের কোন বাহাদুরি খাটবে না। ইবলীস যদিও আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে গোমরাহ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সে

হয়ে যাবে। অতঃপর ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, কাফির ও পাপিষ্ঠদের মধ্য হতে যারা তার অনুসারী তার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র শুধু তাদের মধ্যেই সফল হবে, তখন তার কথার মধ্যে স্বতন্ত্র বক্তব্য প্রয়োগ করলো। অর্থাৎ আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে গোমরাহীর আওতামুক্ত করে বললেন: إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ তবে একমাত্র তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে আল্লাহ তা'আলার জন্য মাফ করা, ক্ষমা করা, রহম করা, ক্ষমতা বিশেষণ রয়েছে। আল্লাহর মর্যাদা ও বড়ত্বের জন্য যেভাবে শোভনীয় ঠিক সেভাবেই এই বিশেষণগুলো সাব্যস্ত করতে হবে।

তাদেরকে গোমরাহ করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার চক্রান্ত হতে রক্ষা করেন। এটিই সঠিক কথা। ইবলীস কেবল তাদেরকেই গোমরাহ করে, যারা তাকে বন্ধু বানায়। যেসব কাফির, মুশরিক ও পাপিষ্ঠ তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, সে তাদের উপর শক্তিশালী হয়। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা ইবলীসকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। (আল্লাহই অধিক জানেন)

١٦ – إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه

১৬। আল্লাহ তা'আলার জন্য নাম সাব্যস্ত করা এবং কেউ তার সদৃশ হওয়া অস্বীকার করা।

وقوله: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ} وقوله: {فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} {وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

"তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন, যিনি বড়ত্ব ও সম্মানের অধিকারী"। *(সূরা আর রহমান ৫৫:৭৮)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

"কাজেই তুমি তার ইবাদত করো এবং তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো। তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি? *(সূরা মারইয়াম ১৯:৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"এবং তার সমতুল্য কেউ নেই" *(সূরা আল ইখলাস ১১২:৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"অতএব জেনে-বুঝে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করো না" *(সূরা আল বাকারা ২:২২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে। অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী আল্লাহকেই ভালোবাসে" *(সূরা আল বাকারা ২:১৬৫)।*

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন, تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ "তোমার রবের নাম বরকত সম্পন্ন। البركة শব্দের আভিধানিক অর্থ বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি। আর কারো জন্য বরকতের দু'আ করাকে تبريك বলা হয়। সে হিসাবে تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ অর্থ হলো, তোমার রবের মর্যাদা মহান ও সমুন্নত হয়েছে। تبارك শব্দটি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হয় না।[৮০]

---

৮০. البركة (বারাকাহ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, প্রচুর পরিমাণ কল্যাণ হওয়া এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া। تبارك -এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, বরকত দু'প্রকার।

(১) এমন বরকত, যা আল্লাহ তা'আলা হতে প্রকাশিত হয়। البركة থেকে بارك (তিনি বরকত দান করেছেন) فعل (ক্রিয়া) ব্যবহৃত হয়। এই ফেলটি কখনো নিজে নিজেই বাক্যে ব্যবহৃত হয়। কখনো على হারফে জার আবার কখনো في হরফে জারের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। البركة থেকে اسم مفعول এর সীগা হয় مباركٌ। অর্থাৎ যার মধ্যে বরকত রাখা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাকে বরকতময় করেছেন, কেবল সেই বরকতময় হয়েছে।

(২) আল্লাহ তা'আলার দিকে যেমন রহমত ও ইজ্জতের সম্বন্ধ করা হয়, তেমনি বরকতকেও তার দিকে সম্বন্ধিত করা হয়। বরকত শব্দটি যখন এই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এ থেকে فعل (ক্রিয়া) হয় تَبَارَكَ । তাই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য تبارك ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয় না এবং অন্যের জন্য এটি ব্যবহার করা বৈধ নয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা متبارك তথা বরকতের অধিকারী ও বরকত দানকারী। তার রসূল এবং তার অনুগত বান্দা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম مبارك তথা বরকতময়। সুতরাং تبارك এর ছিফাতটি তথা বরকত দান করা কেবল আল্লাহর সাথে খাস। আল্লাহ তা'আলা তার নিজের পবিত্র সত্তার জন্য এই ছিফাতটি সাব্যস্ত করেছেন। তিনি সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে বলেন, ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ "আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী। তিনি সমগ্র বিশ্ব জাহানের মালিক ও প্রতিপালক"। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুলকের ১ নং আয়াতে বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অতি মহান তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

হে পাঠক! আপনি কি লক্ষ্য করেন না! কুরআনে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে? তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য কুরআনে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। تبارك শব্দটি প্রশস্ততা এবং বৃদ্ধির অর্থ প্রদান করে। এটি تعالى (উঁচু হলেন), تعاظم (মহান হলেন) এবং অনুরূপ শব্দের মতোই। সুতরাং تبارك শব্দটি تعالى এর মতোই। 'তা'আলা' শব্দটি যেমন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সর্বোচ্চ উপরে হওয়ার অর্থ বহন করে, তেমনি تبارك শব্দটি আল্লাহ তা'আলার বরকতের পূর্ণতা, বড়ত্ব এবং তার বরকতের প্রশস্ততার অর্থ বহন করে। কোন কোন সালাফ (পূর্ববর্তী আলিমগণ) বরকতের এই অর্থ মুতাবেক تبارك শব্দের অর্থ করেছেন تعاظم শব্দ দ্বারা। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, تبارك অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সকল বরকত আনয়ন করেছেন।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য এখানে تَبَارَكَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পূর্ণ অর্থ এক শব্দে তো দূরের কথা এক বাক্যে বর্ণনা করাও কঠিন। এর শব্দমূল রয়েছে ب - ر - ك অক্ষর। এ থেকে بَرَكَة ও بُرُوك দু'টি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। بَرَكَة এর মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি, বিপুলতা, প্রাচুর্যের অর্থ। আর بُرُوك এর মধ্যে স্থায়িত্ব, দৃঢ়তা, অটলতা ও অনিবার্যতার অর্থ রয়েছে। অতঃপর এ ধাতু থেকে যখন تَبَارَكَ ক্রিয়াপদ তৈরী করা হয় তখন تفاعل এর বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া ও পূর্ণতা প্রকাশের অর্থও শামিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এর অর্থ দাঁড়ায় সর্বোচ্চ, বর্ধমান প্রাচুর্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের স্থায়িত্ব। এ শব্দটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে কোন জিনিসের প্রাচুর্য বা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন কখনো এর অর্থ হয় উচ্চতায় অনেক বেশী এগিয়ে যাওয়া। বলা হয়, تباركت النخلة অর্থাৎ অমুক খেজুর গাছটি অনেক উঁচু হয়ে গেছে। আসমায়ী বলেন, এক বন্ধু একটি উঁচু টিলায় উঠে নিজের সাথীদেরকে বলতে থাকে تَبَارَكْتُ عَلَيْكُمْ "আমি তোমাদের চেয়ে উঁচু হয়ে গেছি"। কখনো মর্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে বেশী অগ্রণী হওয়ার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কখনো একে ব্যবহার করা হয় দয়া ও সমৃদ্ধি পৌঁছানো এবং শুভ ও কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার অর্থে। কখনো এ থেকে পবিত্রতার পূর্ণতা ও চূড়ান্ত বিশুদ্ধতার অর্থ গ্রহণ করা হয়। পূর্বাপর বক্তব্যই বলে দেয় কোথায় একে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত تبارك শব্দের যেসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে,

এক) মহা অনুগ্রহকারী ও সর্বজ্ঞ। কারণ, তিনি নিজের বান্দাকে ফুরকানের (কুরআনের) মহান নিয়ামত দান করে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

দুই) বড়ই মর্যাদাশালী ও সম্মানীয়। কারণ, পৃথিবী ও আকাশে তারই রাজত্ব চলছে।

তিন) বড়ই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কারণ, তার সত্তা সকল প্রকার শির্কের গন্ধমুক্ত। তার সমজাতীয় কেউ নেই। ফলে আল্লাহর সত্তার সার্বভৌমত্বে তার কোন নজির ও সমকক্ষ নেই। তার কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন নেই। কাজেই তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য কোনো পুত্রের প্রয়োজন নেই।

চার) বড়ই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। কারণ, সমগ্র রাজত্ব তারই কর্তৃত্বাধীন। তার ক্ষমতায় অংশীদার হবার যোগ্যতা ও মর্যাদা কারো নেই।

যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য চেহারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাখ্যার সাথে ذُو الْجَلَالِ والإكرام এর ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।[৮১]

فَاعْبُدْهُ কাজেই তুমি তার ইবাদত করো: অর্থাৎ এককভাবে তার ইবাদত করো। তার ইবাদতের সাথে অন্য কারো ইবাদত করো না। العبـــادة শব্দের আভিধানিক অর্থ নত ও বিনয়ী হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضـــاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطـــة অর্থাৎ মানুষের এমন সব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের নাম ইবাদত, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন।[৮২]

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ তার ইবাদতের উপর অবিচল থাকো: অর্থাৎ তার ইবাদতের উপর সুদৃঢ় থাকো, সবসময় তা সম্পাদন করতে থাকো এবং ইবাদতের পথে যেসব কষ্ট আসে, তাতে ধৈর্য ধারণ করো।

هَلْ تَعْلَمُ لَـــهُ سَـــمِيًّا তোমার জানা মতে তার সমকক্ষ কোন সত্তা আছে কি? এটি হচ্ছে ইস্তেফহামে ইনকারী (অস্বীকার প্রশ্নবোধক প্রশ্নের) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পাঁচ) শক্তির পূর্ণতার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টিকারী ও তার ক্ষমতা নির্ধারণকারী। {(বাগাবী, আলুসী এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রচিত জালাউল আহকাম, (১/৩০৬)}

৮১. الإكرام হচ্ছে أكرم يكرم إكراما এর মাসদার। সে হিসাবে ذو الإكرام অর্থ হচ্ছে যিনি তার বান্দাকে সম্মানিত, অনুগ্রহ করেন এবং নিয়ামত দান করেন। সুতরাং বান্দাদের মধ্যে যত নিয়ামত রয়েছে, তার সবই আল্লাহর অনুগ্রহ থেকেই এবং তিনি তার বান্দাদের থেকে যেসব কষ্ট দূর করেন, তাও আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই। কেউ কেউ বলেছেন, যুল ইকরাম হচ্ছে ঐ সত্তা, যাকে তার বান্দাগণ সম্মান করে এবং তার বড়ত্ব বর্ণনা করে। সুতরাং যুল ইকরামের দুই অর্থ। তিনি তার বান্দাদেরকে নিয়ামত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেন এবং বান্দাগণও তাকে সম্মান করে এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করে। উভয় অর্থই আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। (আল্লাহই অধিক জানেন)

৮২. আলেমগণ বলেন, ইবাদতের মোট রুকন চারটি। (১) أقصى غاية الحب সর্বোচ্চ ভালোবাসা, (২) أقصى الخضوع والتذلل সর্বোচ্চ বিনয়, (৩) الخوف ভয় এবং (৪) الرجاء আশা। এ চারটি রুকন কোন আমলের মধ্যে এক সাথে পাওয়া গেলে, তা ইবাদতে পরিণত হবে। সুফীরা শুধু ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। এ জন্যই তারা গোমরাহ হয়েছে। আর যারা শুধু আশা নিয়ে ইবাদত করে, তারা মুরজীয়া। আর খারিজীরা শুধু অন্তরে ভয় নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত চারটি বিষয় অন্তরে নিয়েই আল্লাহর ইবাদত করেন। তারা একই সাথে অন্তরে আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভালোবাসা নিয়ে, তার সামনে পূর্ণরূপে নত হয়ে, তার শাস্তির ভয়সহ এবং তার রহমতের আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এমন কোন সদৃশ ও সমক্ষক নেই, যে তার ইবাদতে শরীক হতে পারে।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد এবং তার সমতুল্য কেউ নেই: আরবদের ভাষায় সমতুল্য বস্তুকে الكفء বলা হয়। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ তা'আলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ, সদৃশ এবং শরীক নেই।

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْـدَادًا অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করো না: النـد শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অনুরূপ, সদৃশ ও সমতুল্য। অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর জন্য এমনসব সমকক্ষ ও সমতুল্য নির্ধারণ করো না, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে শরীক করবে এবং ভালোবাসা ও সম্মানের ক্ষেত্রে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলার সমান করে ফেলবে।

وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ তোমরা জেনে-বুঝে: বিশেষ করে যখন তোমরা জানতে পারলে যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং অন্যান্য সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। এক কথায় বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার এমন কোন সমকক্ষ নেই, যে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীক হতে পারে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে আল্লাহর অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে: এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার একত্বের অনেকগুলো দলীল উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা ১৬৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

"আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির অনবরত আবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে চলমান জলযানসমূহে, বৃষ্টিধারার মধ্যে, আল্লাহ যা উপর থেকে বর্ষণ করেন, অতঃপর তার মাধ্যমে মৃত ভূমিকে জীবন দান করার মধ্যে, পৃথিবীতে সব রকমের প্রাণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়ার মধ্যে, আর বায়ুর প্রবাহে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালার মধ্যে বিবেকবানদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে"।

আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে একত্বের এ নিদর্শন ও দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করার পর সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর বিরাট শক্তি, মহান ক্ষমতা এবং একাই সকল মাখলুক সৃষ্টি করার এ উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান থাকার পরও মানুষের মধ্যে এমন লোকও দেখা যাচ্ছে, যারা অক্ষম-অপারগ মূর্তিগুলোকে তার সমকক্ষ নির্ধারণ করে এবং সেগুলোর ইবাদত করে।

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই তারা তাদেরকে ভালোবাসে: অর্থাৎ ই কাফিররা এ মূর্তিগুলোর ইবাদত করেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা এগুলোকে অত্যন্ত ভালোবাসে। মূর্তিগুলোর প্রতি ভালোবাসায় তারা এত বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা এগুলোকে আল্লাহর ভালোবাসার মতোই ভালোবাসতে শুরু করেছে। তারা ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদেরকে আল্লাহর সমান করে ফেলেছে। অথচ সৃষ্টি করা, রিযিক দান করা এবং সৃষ্টির কার্যাদি পরিচালনা করার মধ্যে তারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক নির্ধারণ করেনি। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম, তার বড়ত্ব ও সম্মান সাব্যস্ত করা হয়েছে। একই সাথে আল্লাহর সমতুল্য, সমকক্ষ এবং শরীক থাকার কথাও অস্বীকার করা হয়েছে। যেসব বিষয় আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা শোভনীয় নয়, সেগুলো গৌণ এবং সংক্ষিপ্ত আকারে অস্বীকার করার পদ্ধতিই কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত হয়েছে।

١٧ – نفي الشريك عن الله تعالى

১৭। আল্লাহ তা'আলার কোন অংশীদার বা শরীক নেই

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّه الَّذي لَمْ يَتَّخذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّه الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾

"আর বলো, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি।[৮৩] তার সার্বভৌমত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তার কোনো

---

৮৩. আল্লাহ তা'আলার যেহেতু কারো প্রতি কোন প্রয়োজন নেই এবং তিনি যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ-অমুখাপেক্ষী, তাই তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি। কেননা মানুষ স্বীয় প্রয়োজনেই সন্তান গ্রহণ করে। কেননা সে একাকী চলতে পারে না, অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহর যেহেতু অন্যের সাহায্যের দরকার পড়ে না, তাই তার সন্তানেরও প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সন্তান পিতার অনুরূপ হয়। আর আল্লাহর অনুরূপ ও সদৃশ অন্য কেউ নেই। আর অনেক সময় সন্তান পিতার চেয়ে বিভিন্ন বিবেচনায় বড় হয়। এই দিক থেকেও আল্লাহর জন্য সন্তান গ্রহণ দূষণীয়। আল্লাহ তা'আলার কোন সন্তান না থাকার আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, সন্তান পিতার অংশ হয়। আর আল্লাহর কোন অংশ নেই। মোট কথা মাখলুকের কোন অংশ আল্লাহর মধ্যে নেই এবং আল্লাহর সত্তার কোন অংশও সৃষ্টির মধ্যে নেই। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। তার যথাযথ বড়ত্ব বর্ণনা করো" *(সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। একচ্ছত্র সাম্রাজ্য তারই এবং তারই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান" *(সূরা আত তাগাবুন ৬৪:১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾

"যিনি (আল্লাহ) তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন, তিনি বড়ই বরকত সম্পন্ন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন। তিনিই আল্লাহ, যিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক, যিনি কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি, যার রাজত্বে তার কোন শরীক নেই এবং যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার একটি তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন" *(সূরা আল ফুরকান ২৫:১-২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই। আল্লাহর সাথে যদি আর কোন মাবুদ থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো। এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ পাক-পবিত্র। প্রকাশ্য ও গুপ্ত সবকিছুই তিনি জানেন। এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে" *(সূরা আল মুমিনুন ২৩:৯১-৯২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না" *(সূরা আন নাহাল ১৬:৭৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

(قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْـرِكُوا

بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾

"তুমি বলে দাও, আমার প্রতিপালক কেবল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায় বাড়াবাড়ি, আল্লাহ্‌র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, যার কোন দলীল-প্রমাণ তিনি অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো না" *(সূরা আল আরাফ ৭:৩৩)।*

ব্যাখ্যা: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّه বলো, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য: প্রশংসাকে হামদ বলা হয়। الحمد এর মধ্যে যেই أل রয়েছে তা ইস্তেগরাকের জন্য। অর্থাৎ এ কথা বুঝনোর জন্য যে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।[৮৪]

الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি: অর্থাৎ তার কোন সন্তান নেই। যেমন ধারণা করে থাকে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান এবং আরবের কতিপয় মুশরিক।

---

৮৪. সকল নিয়ামত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর পক্ষ হতে, তাই সকল প্রকার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া আবশ্যক। حمد (হামদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা। এটি ذم (নিন্দা)এর বিপরীত। হামদ এবং شكر পরস্পর সমার্থবোধক হলেও হামদ شكر -এর চেয়ে অধিকতর ব্যাপক অর্থ প্রদান করে। শোকর সাধারণত নিয়ামত ও অনুগ্রহের বিনিময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু হামদ এর জন্য তা শর্ত নয়। অর্থাৎ হামদ হচ্ছে নিয়ামত প্রদানকারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করা। তা নিয়ামতের বিনিময়ে হোক বা নিয়ামত ছাড়াই হোক। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর নিয়ামত এত ব্যাপক যে, তা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সুতরাং প্রত্যেকবার حمد (প্রশংসা) করার পূর্বে যে আল্লাহর নিয়ামত পেতে হবে, এমনটি নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির প্রতি যে নিয়ামত সর্বদা প্রসারিত করে রেখেছেন, তার জন্য সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করাকে পরিভাষায় হামদ বলা হয়। আর নির্দিষ্ট কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, তাকে পরিভাষায় شكر বলা হয়। কেউ কেউ حمدএর সংজ্ঞায় বলেন, هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري অর্থাৎ জবানের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় কৃত সৌন্দর্যের উপর কারো প্রশংসা বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে প্রশংসিত সত্তার (আল্লাহ তা'আলার) সৌন্দর্য বর্ণনা করাকে হামদ বলা হয়। হামদ ও শোকরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, (১) শোকর শুধু নিয়ামতের বিনিময়েই হয়ে থাকে, কিন্তু হামদের জন্য নিয়ামত শর্ত নয়। নিয়ামত ছাড়াও তা হতে পারে। (২) হামদ শুধু জবানের কথার মাধ্যমেই হয়, কিন্তু শোকর জবান, হাত, অন্তর এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমেও হয়। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ তার বাদশাহীতে কোন শরীক নেই: অর্থাৎ তার রাজত্বে ও প্রভুত্বে অংশীদার নেই। যেমন ধারণা করে থাকে অগ্নিপূজক এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়। তারা একাধিক মাবুদে বিশ্বাসী।

وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ তিনি তার বাদশাহী পরিচালনায় এমন অক্ষম নন যে, তার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়: অর্থাৎ তিনি এমন দুর্বল নন, যাতে তার কোন সাহায্যকারী কিংবা কোন মন্ত্রী অথবা কোন পরামর্শদাতার দরকার হয়। সুতরাং তিনি কারো সাথে বন্ধুত্ব রচনা করেননি এবং কারো সাহায্যও গ্রহণ করেননি।

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا আর তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করো, চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব: যালেমরা যা বলে, তা থেকে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ম ঘোষণা করো।

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে: আল্লাহর আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তারা সকলেই সব দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করছে।[৮৫]

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ রাজত্ব একমাত্র তারই, সকল প্রশংসাও তার জন্য: এ দু'টিতে অন্য কারো কোন অংশ নেই। তার বান্দারা পৃথিবীর রাজত্বের যেই অংশ লাভ করে থাকে, তা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দান করেন বলেই লাভ করে থাকে। তা মূলতঃ আল্লাহর রাজত্বেরই অংশবিশেষ।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ তিনি সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান: কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না।

تبارك শব্দটি فعل ماضي (অতীতকালের অর্থবোধক ক্রিয়া)। এটি البركة থেকে গৃহীত। কল্যাণের প্রাচুর্য, বৃদ্ধি, সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়াকে البركة (বরকত) বলা হয়। تبارك শব্দটি শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শুধু অতীত কালের শব্দ দ্বারাই ব্যবহৃত হয়।

---

৮৫. আল্লামা ড. ছ্বালিহ আল ফাওযান বলেন, সকল মাখলুকই স্বীয় জবান দ্বারাই তাসবীহ পাঠ করে। তিনি আরো বলেন, যারা বলে বাকশক্তিহীন মাখলুক স্বীয় অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, তাদের কথা বাতিল; বরং তারাও জবান দ্বারাই তাসবীহ পাঠ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তাসবীহ পাঠের ধরন সম্পর্কে জানেন। কিন্তু আমরা জানি না। মূলতঃ তারা প্রকৃতভাবেই তাসবীহ পাঠ করে। যেমন পাথরের তাসবীহ পাঠ, খাদ্যের তাসবীহ পাঠ ইত্যাদি। ছাহাবীগণ বলেন, আমরা খাদ্যের তাসবীহ শুনতাম। অথচ সেটাকে খাওয়া হচ্ছে।

الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ তিনি তার বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন:[৮৬] এখানে কুরআনকে ফুরকান হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে।[৮৭] কেননা তা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

عَلَى عَبْدِهِ বান্দার উপর: এখানে বান্দা বলতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য। আল্লাহর বান্দা হওয়া একটি প্রশংসনীয় বিশেষণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে নিজের দিকে ইযাফত (সম্বধিত) করেছেন। এটি হচ্ছে তার উপর কুরআন অবতীর্ণ করার সাথে সাথে সম্মান ও মর্যাদার সম্বন্ধ।

لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য: তিনি সমস্ত জিন ও মানুষের জন্য। এটি হচ্ছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

نذيرا শব্দটি الإنذار ক্রিয়ামূল থেকে منذر অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভয়ের কারণগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেয়াকে إنذار বলা হয়। ليكون (যাতে তিনি হতে পারেন), এ বাক্যটি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর ফুরকান অবতীর্ণ করার কারণ। অর্থাৎ যাতে করে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশ্বজনীন রিসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সত্তাকে চারটি গুণের মাধ্যমে গুণান্বিত করেছেন।

প্রথম গুণ: **الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তিনি পৃথিবী ও আকাশের রাজত্বের মালিক:** তিনি একাই আসমান-যমীনের সকল বিষয়ের মালিক এবং এতদুভোয়ের সবকিছু পরিচালনাকারী।

দ্বিতীয় গুণ: **وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি:** যেমন ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান এবং আরবের মুশরিকরা ধারণা করতো। আল্লাহ যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এবং সমস্ত মাখলুক তার প্রতি মুখাপেক্ষী। কারো প্রতি তার প্রয়োজন নেই বলেই তিনি কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেননি।

---

৮৬. এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে। কেননা নাযিল উপর থেকেই হয়ে থাকে। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর কালাম; মাখলুক নয়। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে।

৮৭. এখানে কুরআনকে ফুরকান বলা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের আরো অনেক নাম রয়েছে। যেমন কিতাব, যিকির, রূহ, নূর, হুদা ইত্যাদি। যে জিনিসের নাম হয় অধিক তার সম্মান ও মর্যাদাও হয় অধিক।

তৃতীয় গুণ: وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ **তার রাজত্বে কোন শরীক নেই:** এতে মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক এবং তাদের অনুরূপ আরো অনেক মুশরিক সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

চতুর্থ গুণ: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ **তিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন:** যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোই তিনি সৃষ্টি করেছেন। বান্দাদের কর্মগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বান্দাদের কর্মগুলো আল্লাহর সৃষ্টি। বান্দারা তা সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে।[৮৮] অতঃপর তার জন্য একটি তাক্বদীর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য বয়স নির্ধারণ করেছেন এবং তার রিযিক নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে সৌভাগ্যবান হবে? না হতভাগ্য হবে? তাও তিনি অবগত আছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবেই প্রস্তুত করেছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ তা'আলা এখানে তার নিজের সত্তাকে সন্তান গ্রহণ করা থেকে পবিত্র করেছেন এবং তার কোন শরীক নেই বলেও ঘোষণা করেছেন। অতঃপর তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তুর তাক্বদীর সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব বস্তুই তার সৃষ্টি এবং তার প্রতিপালনাধীন। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর প্রভু, সবকিছুর মালিক এবং সকলের মাবুদ। প্রত্যেক বস্তুই তার ক্ষমতাধীন, তারই পরিচালনাধীন, তারই বশীভূত এবং তারই তাক্বদীরের অধীনস্ত।

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ **আল্লাহ কাউকে নিজের সন্তানে পরিণত করেননি এবং তার সাথে অন্য কোন মাবুদও নেই:**

এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে সন্তান থেকে পবিত্র করেছেন। তার রাজত্বে, পরিচলানায় এবং তার ইবাদতে কোন শরীক হওয়াকেও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছেন। আল্লাহর সন্তান থাকার ধারণাকে এবং শরীক নির্ধারণ করার বিষয়কে জোরালোভাবে অস্বীকার করার জন্য উপরোক্ত আয়াতের দুই জায়গায় من হরফে জার ব্যবহার করা হয়েছে।

إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ **আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোন মাবুদ থাকতো তাহলে প্রত্যেক মাবুদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো:**

---

৮৮. সুতরাং তাদের কাজগুলো যেহেতু তারাই বাস্তবায়ন করে, তাই ভালো কাজ করলে তাদেরকে ভালো পুরস্কার দেয়া হবে আর খারাপ কাজ করলে শাস্তিও তারাই পাবে।

আয়াতের প্রথমাংশে বলা হয়েছে আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং তার ইবাদতে কোন শরীক নেই। এটি হচ্ছে তার পক্ষে একটি বিরাট দলীল। অর্থাৎ যদি ধরে নেওয়া হয় যে, একাধিক মাবুদ রয়েছে, তাহলে প্রত্যেক মাবুদই নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো এবং দলাদলি ও ভাগাভাগির কারণে সৃষ্টিজগতের শান্তি-শৃংখলা নষ্ট হয়ে যেতো। বাস্তবে আমরা দেখছি যে, সৃষ্টিজগত পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথেই রয়েছে এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই চলছে। তাতে একাধিক মাবুদ দেখা যায়নি এবং মাবুদদের দলাদলিও সৃষ্টি হয়নি।

وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এবং একজন অন্যজনের উপর চড়াও হতো: অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যদি আরেকজন মাবুদ থাকতো, তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অন্যের বিরোধীতা করতো। ফলে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতোই একজন অন্যজনের উপর জয়লাভ করতো। ফলে যে পরাজিত এবং দুর্বল প্রমাণিত হতো, সে ইলাহ (মাবুদ) হওয়ার যোগ্যতা হারাতো। সুতরাং যখন সমপর্যায়ের একাধিক মাবুদ থাকার বিষয়টি বাতিল সাব্যস্ত হলো, তখন সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, মাবুদ মাত্র এক। তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ এরা যেসব কথা তৈরী করে তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পাক-পবিত্র:** অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য যেই শরীক ও সন্তান নির্ধারণ করে থাকে, তা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই তিনি জানেন: অর্থাৎ যেসব বিষয় বান্দাদের অদৃশ্য এবং বান্দারা যা জানে না, কেবল তিনিই তা জানেন। বান্দারা যা দেখে ও জানে, তিনি তাও জানেন। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্যরা যদিও তাদের সামনে দৃশ্যমান বস্তুগুলো সম্পর্কে জানতে পারে, কিন্তু তারা গায়েবের খবর জানে না। সুতরাং এরা আল্লাহর জন্য যে শরীক নির্ধারণ করে, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ কাজেই আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করো না: আল্লাহ তা'আলা এখানে তার জন্য উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত পেশ করতে নিষেধ করেছেন। এক অবস্থাকে অন্য অবস্থার সাথে তুলনা করার নাম ضرب المثل তথা উপমা পেশ করা। আরবের মুশরিকরা বলতো, আমরা শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করবো, এর প্রতি আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং আল্লাহর এবং আমাদের মাঝে মাধ্যম স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই তারা বহু সংখ্যক মূর্তি এবং অন্যান্য বস্তুকে আল্লাহ এবং তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানাতো। আল্লাহ তা'আলাকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সাথে তুলনা করেই তারা এই কাজ করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আল্লাহর সদৃশ কেউ নেই। সুতরাং

আল্লাহর জন্য উপমা পেশ করা চলে না এবং তার সাথে কোন সৃষ্টির তুলনাও চলে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে ভালো করেই জানেন যে, তার অনুরূপ সত্তা আর কেউ নেই।

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ আল্লাহ তা'আলা তার পবিত্র সত্তা সম্পর্কে যা জানেন, তোমরা তা জানো না। সুতরাং তোমাদের এই কাজ তথা আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্ত এবং উপমা পেশ করা তোমাদের ভ্রান্ত ধারণা এবং বাতিল কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সেই সাথে মূর্তিগুলোকে আল্লাহর সাথে তুলনা করা এবং সেগুলোর ইবাদত করার ভয়াবহ ও মন্দ পরিণাম সম্পর্কেও তোমরা অবগত নও।

قُلْ তুমি বলে দাও: এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ হতে মুবাল্লিগ (দাঈ ও প্রচারক)। إِنَّمَا এটি সীমিত কারক অব্যয়।

حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ "আমার প্রতিপালক অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন: অর্থাৎ অশ্লীল বিষয়সমূহকে হারাম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

الفواحش শব্দটি فاحشة-এর বহুবচন। যেই পাপাচার অত্যন্ত নিকৃষ্ট, তাকে ফাহেশা বলা হয়।

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য: অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে প্রকাশ্যে যেই অপরাধ করা হয় এবং যা গোপনে করা হয় এই উভয় প্রকার গুনাহ্কেই আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন।

والإثم (পাপাচার) প্রত্যেক এমন অপরাধকে إثم বলা হয়, যাতে গুনাহ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: শুধু মদ পান করাকে إثم বলা হয়।

وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায় বাড়াবাড়ি: অর্থাৎ সীমাহীন যুলুম করা এবং মানুষের উপর অত্যাচার করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ আল্লাহ্র সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা: অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে তোমরা কোন শরীক সাব্যস্ত করো না।

مَا لَمْ يُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا যার কোন প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি:[৮৯] আয়াতের এ অংশ থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) দলীল গ্রহণ করেছেন।

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ আল্লাহ্‌র সম্পর্কে এমন কথা বলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, যা তোমরা জানো নাঃ

আল্লাহর ব্যাপারে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলা। যেমন আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করা কিংবা অনুরূপ এমন বিষয়ে কথা বলা, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। অনুরূপ আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ হতে অনেক বস্তুকে হালাল করে এবং বহু জিনিসকে হারাম করে আল্লাহর দিকে সম্বধিত করতো এবং বলতো আল্লাহ এগুলো হালাল করেছেন কিংবা এগুলোকে তিনি হারাম করেছেন।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা হতে প্রমাণ মিলে যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার শরীক হওয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং একমাত্র তার জন্যই পরিপূর্ণ গুণাবলী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার পবিত্র সত্তার জন্য সন্তান ও সদৃশ থাকার দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। সমস্ত মাখলুকই এ জাতীয় দোষ-ত্রুটি হতে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। অনুরূপ উপরোক্ত আয়াতগুলো শির্ক করাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিয়েছে। মূর্খতা ও কল্পনার উপর ভিত্তি করেই শির্কের সূচনা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার কোন সদৃশ ও সমকক্ষ নেই। (আল্লাহই অধিক জানেন)

---

৮৯. মুশরিকদের হাতে কোন দলীল নেই। তারা শুধু পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুসরণ করেই শির্ক করে থাকে। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) যখন তার পিতাকে এবং তার স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বললেন, مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ "তোমরা যে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছ, এগুলো কী? (সূরা আম্বীয়া ২১: ৫২) অর্থাৎ এগুলোর ইবাদতের পক্ষে কোন দলীল আছে কি? এগুলো কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে? তার জাতির লোকেরা জবাবে বলেছিল, وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ "আমাদের বাপ-দাদাদেরকে আমরা এদের ইবাদাতরত অবস্থায় পেয়েছি।

١٨ – إثبات استواء الله على عرشه

১৮। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত সাব্যস্ত করা:

وقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} في سبعة مواضع: في سورة الأعراف قوله: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة يونس ــ عليه السلام ــ: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة الرعد: {اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة طه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وقال في سورة الفرقان: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ} وقال في سورة الم السجدة: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} وقال في سورة الحديد: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}.

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত *(সূরা ত্বহা ২০:৫)*।[৯০]

---

৯০. আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব মর্যাদার জন্য যেভাবে আরশের উপর সমন্নত হওয়া বা আরশের উপরে উঠা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। এক মাখলুক যেভাবে অন্য মাখলুকের উপর উঠে আরশের উপর আল্লাহর উঠা বা সমুন্নত হওয়া সেরকম নয়। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) কে যখন এক লোক প্রশ্ন করল, الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তা কিভাবে? জবাবে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, الاستواء معلوم والكيف غير معلوم الإيمان به واجب والسوال عنه بدعة আরশের উপর আল্লাহর সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর ধরন আমাদের কাছে অজ্ঞাত। এর উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত। অতঃপর সে প্রশ্নকারীকে বিদ'আতী আখ্যা দিয়ে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর মজলিস থেকে বের করে দেয়া হলো। আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ক্ষেত্রেই নয়; বরং সকল ছিফাতের (বিশেষণের) ক্ষেত্রেই একই কথা। আল্লাহর ছিফাতের (বিশেষণের) ধরন আল্লাহই জানেন। আমরা জানি না। যেমন আল্লাহর সত্তা কেমন, তা আমরা জানি না। সুতরাং আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে কথা বলা আল্লাহর যাত (সত্তা) সম্পর্কে কথা বলার মতোই।

সে সঙ্গে আরো স্মরণ রাখা দরকার যে, আরশের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে বলেই তিনি আরশে আরোহন করেছেন- এমনটি নয়; বরং অন্যান্য মাখলুকের মত আরশও আল্লাহর প্রতি মুহতাজ (মুখাপেক্ষী)। কারণ আরশ আল্লাহর অন্যতম সৃষ্টি। কোন সৃষ্টির প্রতিই আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। আরো স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, আরশ আল্লাহকে বহন করে আছে- এমন ধারণা করা ভুল; বরং আল্লাহই আরশকে ধারণ করে আছেন। যেমন ধারণ করেছেন আসমান-যমীনসহ অন্যান্য সৃষ্টিকে। আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আরোহন করেছেন এই বিশ্বাস করাতে এটি আবশ্যক হয় না যে, আল্লাহ আরশের সাথে মিশে আছেন; বরং কুরআন-হাদীছে শুধু বলা হয়েছে- আল্লাহ আরশের উপরে। কত উপরে তার কোন সীমা নির্ধারিত হয়নি। সুতরাং আল্লাহর ছিফাতের ব্যাপারে নিজের পক্ষ হতে অনুমান করে কিছু বলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার পরিপন্থী।

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি ছুহীহ আক্বীদাহর অনেক আলেম ও সাধারণ লোক বুঝতে ভুল করেছেন। তারা الرحمن على العرش استوى এ আয়াতের অনুবাদ করে থাকেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন। এ অনুবাদ সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন এ আক্বীদাহ পোষণ করা ভুল। কারণ সমাসীন কথার সরল বাংলা অর্থ হচ্ছে উপবিষ্ট হয়েছেন বা আসন গ্রহণ করেছেন, যা ইস্তাওয়ার অর্থ নয়। যদি বলা হয়, আল্লাহ আরশে সমাসীন (উপবিষ্ট), তাহলে আল্লাহর জন্য অবস্থা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অথচ সালাফে সালেহীনের কেউ এমন কথা বলেননি, যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট বা সমাসীন।

লক্ষণীয় যে, আহলে হাদীছ সমাজের অনেক আলেম ও বক্তা জোরালোভাবেই বলে থাকেন যে, আল্লাহ আরশের উপরে সমাসীন। কুরআন মজীদের যেসব বাংলা অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তার অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থেই استوى এর অনুবাদ করা হয়েছে সমাসীনের মাধ্যমে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে এখান থেকেই আমাদের আলেম ও দাঈদের মধ্যে ভুলটি প্রবেশ করেছে। এই ভুলের কারণে এখন আহলে হাদীছ বিদ্বেষীগণ ফেসবুকসহ ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে বলে বেড়াচ্ছে যে, সালাফীদের আল্লাহ আরশে বসে আছেন। তাই ভুলটি সংশোধন করে নেওয়া আবশ্যক।

যেসব আহলে হাদীছ ভাই-বোন আমাদের এই লেখাটি পড়বেন, তাদের কাছে আমাদের জোরালো আবেদন হলো, তারা যেন ভুলটি সংশোধন করে নেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন (বসা বা উপবিষ্ট) এটি আমাদের (আহলে হাদীছদের) আক্বীদাহ নয়। শাইখুল ইসলাম, ইমাম ইবনুল কায়্যিম এবং কোন সালাফী আলেম থেকে এই ধরণের কথা পাওয়া যায়নি। ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা থেকেও আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন এ কথা বুঝা যায় না। তার কথার অর্থ আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত।

সুতরাং الرحمن على العرش استوى এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত। সমুন্নত না লিখে শুধু 'উপরে' কথাটি লিখে বা বলে ছেড়ে দিলেও ভুল হবে না। কিন্তু কোন ক্রমেই সমাসীন বলা চলবে না। কারণ আরশের উপর আল্লাহ তা'আলা কিভাবে সমুন্নত হয়েছেন, তার কোন ধরন কুরআন ও ছুহীহ হাদীছে বলা হয়নি। এমনি আল্লাহর অন্য কোন ছিফাতেরও ধরন বলা যাবে না। আল্লাহ যেমন, তার ছিফাতও তেমন। তার পবিত্র সত্তার প্রকৃত অবস্থা আমরা যেমন জানি না, তিনিই জানেন তেমনি তার অন্য কোন ছিফাতের প্রকৃত অবস্থাও আমরা জানি না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, তার অনেক ছিফাতে কামালিয়া রয়েছে, যা কোন মাখলুকের ছিফাতের মত নয়। যদি

এ কথা কুরআনের সাত জায়গায় বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনূসের ৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা রা'দের ২ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

"আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে। তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা তোহার ৫নং আয়াতে বলেন:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

"দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে বলেন:

﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ ﴾

"অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন তিনি পরম দয়াময়"। আল্লাহ তা'আলা সূরা সাজদার ৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ)

"আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন:

সমাসীন বলা হয়, তাহলে আল্লাহর বিশেষ একটি অবস্থা (বসা) সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যা কোন দলীল বা সালাফদের উক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

"আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।[৯১]

.....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর কিতাবের সাতটি স্থানে আল্লাহ তা'আলা সাব্যস্ত করেছেন যে তিনি আরশের উপরে সমুন্নত। প্রত্যেক স্থানেই মাত্র একটি শব্দ তথা استواء (সমুন্নত হওয়া) দ্বারা আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে استوى على العرش "তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। ইস্তিওয়া শব্দটি এখানে আসল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অন্য অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। ইস্তিওয়া (সমুন্নত হওয়া) আল্লাহ তা'আলার একটি কর্মগত ছিফাত। এটি তার পবিত্র সত্তার জন্য সুসাব্যস্ত। অন্যান্য ছিফাতের মতোই আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এ সুউচ্চ ছিফাতটি তার জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আরবদের ভাষায় চারটি শব্দের মাধ্যমে ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা:علا وارتفع وصعد واستقر এ চারটি শব্দের প্রথম তিনটির অর্থ উপরে উঠলেন এবং সমুন্নত হলেন। চতুর্থ শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্থির হলেন। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে বর্ণিত استواء শব্দের অর্থে সালাফদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তার ভিত্তি এ চারটি অর্থের উপরেই। আসলে ঘুরেফিরে অর্থ একটিই। তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তার নিয়ামতরাজি দ্বারা প্রতিপালনকারী। সুতরাং তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তোমরা এককভাবে তারই ইবাদত করবে।

---

৯১. তোমরা কোনো স্থানেই তার জ্ঞান, তার অসীম ক্ষমতা, তার শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ব্যবস্থাপনার আওতার বাইরে নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে, অথবা কোন নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ঐ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছেন। তোমাদের হৃদপিন্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমতো কাজ করছে। কোন সময় যদি তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন: তিনি সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা, আসমান-যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী এবং আসমান ও যমীনের মাঝখানে যা আছে, তার সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন।

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ তিনি ছয়দিনে এগুলো সৃষ্টি করেছেন: এ দিনগুলো হচ্ছে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার। শুক্রবার দিন সকল সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। এতেই আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন: অর্থাৎ যেভাবে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি আরশের উপর সেভাবেই সমুন্নত হয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে বাদশার সিংহাসনকে আরশ বলা হয়। তবে এখানে সবগুলো দলীল দ্বারা সেই সিংহাসন উদ্দেশ্য, যার রয়েছে একাধিক খুঁটি এবং যাকে আল্লাহর ফেরেশতাগণ বহন করে আছেন। সেটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের উপর তাঁবু বা গম্বুজ স্বরূপ। এক কথায় আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজগতের ছাদ।[৯২]

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে: অর্থাৎ যমীনের অনেক উপরে আসমানকে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যে, তাকে স্পর্শ করা এবং সে পর্যন্ত পৌছা সম্ভব নয়।

بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا তিনি আসমানকে বিনা খুঁটিতে উপরে স্থাপন করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ: খুঁটি ও স্তম্ভকে عمد বলা হয়। عَمَد শব্দটি عماد -এর বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এমন কোন খুঁটি ও স্তম্ভের উপর দাঁড় করান নি যে, তা সেই খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে আসমানসমূহকে খুঁটি ছাড়াই সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। আকাশের খুঁটি নেই, এই

---

৯২. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ». (بخارى: ٢٧٩٠)

"যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তখন তোমরা জান্নাতুল ফিরদাউস চাও। কেননা এটি হচ্ছে জান্নাতের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। তিনি বলেন, আমার মনে হচ্ছে, তার উপর আল্লাহর আরশ এবং তা থেকে জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয়েছে" (ছ্বহীহ বুখারী ২৭৯)।

কথাকে শক্তিশালী করার জন্য عمد এর পর ترونها (তোমরা দেখতে পাচ্ছ) বাক্যটি আনয়ন করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, আসমানের খুঁটি আছে। কিন্তু আমরা তা দেখি না। তবে প্রথম কথাটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন: তৃতীয় আয়াতের এ অংশ থেকেই আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার দলীল নেয়া হয়েছে। বাকী আয়াতগুলোর ক্ষেত্রেও কথা একই। আয়াতগুলোর যেখানে ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ রয়েছে, সেখান থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

সবগুলো আয়াত থেকে যা সাব্যস্ত হচ্ছে, তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব ও সম্মানের জন্য যেভাবে আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, আল্লাহর জন্য সেভাবেই আরশের উপরে সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করতে হবে। এ আয়াতগুলোতে ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা ইস্তিওয়াকে الاستيلاء (দখল করা, অধিকারী হওয়া) ও القهر (পরাজিত করা) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহর আরশকে ব্যাখ্যা করে আল্লাহ রাজত্বের মাধ্যমে। তারা বলে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে استولى على الملك وقهر غيره "তিনি তার রাজত্বের অধিকারী হলেন এবং অন্যদেরকে পরাজিত করলেন"। একাধিক কারণে এ ব্যাখ্যা বাতিল।

প্রথম: এটি একটি বিদ'আতী ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারী সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যার সুস্পষ্ট বিরোধী। জাহমীয়া ও মু'তাযিলারাই সর্বপ্রথম ইস্তিওয়ার এই ব্যাখ্যা করেছে। সুতরাাং এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত।

দ্বিতীয়: استوى على العرش এর ব্যাখ্যা যদি استولى على الملك হতো, তাহলে আরশ এবং নিম্নজগতের সাত যমীন, যমীনে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং সমস্ত মাখলুকের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকতো না। কেননা তিনি সমস্ত মাখলুকের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী এবং তিনি সবকিছুর মালিক। সুতরাং استوى এর দ্বারা ইস্তিওলা উদ্দেশ্য করা হলে আরশের উল্লেখ করা নিরর্থক হতো। আল্লাহর কালামে নিরর্থক কিছু নেই।

তৃতীয়: আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সাব্যস্ত করার জন্য কুরআন সুন্নাহয় শুধু استوى على العرش (আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন) এ বাক্যটিই উল্লেখিত হয়েছে। একবারও استولى على العرش (আরশের

অধিকার গ্রহণ করলেন) বাক্যটি আসেনি। একবারও যদি তা আসতো, তাহলে অন্য আয়াতগুলোতে উল্লেখিত استوى শব্দকে استولى এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেত।[৯৩]

চতুর্থ: উপরোক্ত আয়াতগুলোর যেখানেই আসমান-যমীন সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তার পর সবখানেই ثم আনয়ন করে বলা হয়েছে: ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন), যা বিলম্বের সাথে ধারাবাহিকতার অর্থ প্রদান করে। استواء على العرش দ্বারা যদি استيلاء على العرش والقدرة عليه (আরশের অধিকারী হওয়া এবং তার উপর ক্ষমতা লাভ করা) উদ্দেশ্য হতো, তাহলে خلق السموات والأرض বলার পর ثم استوى على العرش বলতেন না।

কেননা আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহর আরশ বিদ্যমান ছিল। যেমন ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে (হা/২৬৫৩) বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কিভাবে এটি বলা বৈধ হতে পারে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা আরশের অধিকারী ছিলেন না এবং এর উপর তিনি ক্ষমতাবানও ছিলেন না? এই ধরণের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

---

৯৩ .আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সকল বস্তুর মালিক একমাত্র তিনিই। অনন্তকাল থেকেই সকল বস্তুর উপর তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সকল বস্তু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও আল্লাহ এবং তার মালিকানা বহাল থাকবে। আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন বিশ্বাস পোষণ করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ পূর্বে অমুক বস্তুর মালিক ছিলেন না। পরে মালিক হয়েছেন। এ ধরণের অর্থ গ্রহণ করা হলে, আল্লাহ যে মহান ক্ষমতাবান তাতে বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না এবং মহান আল্লাহর সাথে মানুষের সাথে তুলনা হয়ে যাবে। (নাউযুবিল্লাহ)

١٩ – إثبات علو الله على مخلوقاته

১৯। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মাখলুকের উপর সমুন্নত

وقوله: {يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} {يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا} {أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ}

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

"হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু (নিদ্রা) দান করবো। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো" *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

"বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রবল শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান" *(সূরা আন নিসা ৪:১৫৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

"পবিত্র বাক্যসমূহ তারই দিকেই উঠে এবং সৎকর্মকে তিনি উন্নীত করেন"। *(সূরা ফাত্বির ৩৫:১০)* আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের উক্তি উল্লেখ করে বলেন,

﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۚ ﴾

"হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমারাত নির্মাণ করো যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি। অর্থাৎ আসমানের রাস্তা এবং মূসার ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। মূসাকে মিথ্যাবাদী বলেই আমার মনে হয়। এভাবে ফেরাউনের জন্য তার কুকর্মসমূহ সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সোজা পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে। ফেরাউনের সমস্ত চক্রান্ত ধ্বংসের পথেই ব্যয়িত হয়েছে"। *(সূরা গফির ৪০:৩৬-৩৭)* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? *(সূরা মুলক ৬৭:১৬-১৭)।*[৯৪]

ব্যাখ্যা: يَـا عِيسَـى হে ঈসা! আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বলেছেন।

إِنِّـي مُتَوَفِّيـكَ "আমি তোমাকে ওফাত দিবো"। অধিকাংশ আলেমের মতে এখানে ওফাত বলতে নিদ্রা উদ্দেশ্য। কেননা নিদ্রা মৃত্যুর অন্যতম প্রকার। আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ৬০ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু ঘটান"। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতে বলেন:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾

"মৃত্যুর সময় আল্লাহই রূহসমূহ কবয করেন। আর যে এখনো মরেনি নিদ্রাবস্থায় তার

---

৯৪. আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে সমুন্নত- এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ "তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন"। (সূরা নাহ্ল: ৫০) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ "ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়"। (সূরা মাআরিজ: ৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন"। (সূরা সাজদাহ: ৫) কুরআন ও সুন্নাহয় এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। কোন কোন আলেম এ বিষয়ে একহাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। জানা থাকা আবশ্যক যে, সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত/গুণ বা বিশেষণ। কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না।

রূহ কবয করেন"।[৯৫]

وَرَافِعُكَ إِلَيَّ তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে আসমানে নিজের দিকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়েছেন। আয়াতের এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহর জন্য **علو** তথা উপরে হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা উঠিয়ে নেওয়া সাধারণতঃ উপরের দিকেই হয়।

بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ বরং আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এখানে ঐসব ইয়াহূদীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা দাবী করে যে, তারা ঈসা আলাইহিস সালাম মাসীহ ইবনে মারইয়ামকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

"মূলতঃ তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি এবং ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি; বরং তাদেরকে সন্দেহে ফেলা হয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল তারাই সে বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে। কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ তাকে নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন *(সূরা আন নিসা ৪:১৫৭-১৫৮)*।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে জীবিত আবস্থায় নিজের দিকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি নিহত হননি। আয়াতের এ অংশই দলীল গ্রহণের স্থান। কেননা এ অংশে আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর হওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর উঠিয়ে নেওয়া বা উঠানো (নীচ থেকে) উপরের দিকেই হয়।

---

৯৫. সুতরাং ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে যে মৃত্যু দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা সে মৃত্যু উদ্দেশ্য নয়, যাতে দেহ থেকে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরং এখানে ঘুম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিদ্রার মাধ্যমে উপরে উঠিয়ে নিয়েছেন। কথায় বলে, ঘুমন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ সমান। সুতরাং ঈসা (আলাইহিস সালাম) মৃত্যুবরণ করেননি। ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করার যে ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইয়াহূদীদের সে ষড়যন্ত্র থেকে হেফাযত করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের বিশ্বাস এই যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ তা'আলা জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইয়াহূদীরা তাকে হত্যা করতে পারেনি। ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে তিনি আমাদের নাবীর উম্মাত হয়ে আবার দুনিয়াতে আগমন করবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন, বিকৃত খ্রিষ্টান ধর্মের পতন ঘটাবেন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, আমাদের নাবীর শরী'আত দ্বারা বিচার-ফায়ছালা করবেন এবং ইসলামের বিলুপ্ত হওয়া আদর্শগুলো পুনর্জীবিত করবেন। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করার পর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তার জানাযা ছ্বলাত পড়ে দাফন করবেন। তার আগমনের পক্ষে কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছে অনেক দলীল বিদ্যমান।

إِلَيْهِ يَصْعَدُ তার দিকেই উঠে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার দিকেই পবিত্র বাক্যসমূহ উন্নীত হয়; অন্য কারো দিকে নয়।

الْكَلِمُ الطَّيِّبُ পবিত্র বাক্যসমূহ: অর্থাৎ আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত এবং দু'আ উদ্দেশ্য।

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ সৎ আমল তাকে উপরে উঠায়: অর্থাৎ উত্তম আমল বাক্যসমূহকে উপরে উঠায়। কেননা সৎ আমল ছাড়া পবিত্র বাক্য কবুল হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকির করে, কিন্তু ফরয ইবাদতগুলো সম্পাদন করে না, তার পবিত্র বাক্যসমূহ ফেরত দেয়া হয়। ইয়াস ইবনে মুআবিয়া (রহিমাহুল্লাহ আনহু) বলেন, আমলে সালেহ না থাকলে শুধু উত্তম বাক্য আকাশে উঠে না। হাসান বসরী ও কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমল ছাড়া শুধু মুখের কথা কবুল হয় না। মোটকথা উপরের আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির উপরে। কেননা উঠা বা উঠানো নীচ থেকে উপরের দিকেই হয়।

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ইমরাত নির্মাণ করো: ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে এ কথা বলেছিল। ফেরাউন তাকে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করার আদেশ করেছিল। সে বলেছিল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ ও মজবুত প্রাসাদ নির্মাণ করো।

لَّعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ যাতে আমি রাস্তাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি অর্থাৎ আসমানের দরজাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি।

فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ মূসা আলাইহিস সালামএর ইলাহকে উঁকি দিয়ে দেখতে পারি। فَأَطَّلِعَ ফেলে মুযারেটি فاء السببية এর পরে আসার কারণে উহ্য أن দ্বারা মানসুব (যাবর) হবে। এ কথার মাধ্যমে সে মূসা আলাইহিস সালামকে মিথ্যুক বলেছিল। অর্থাৎ ফেরাউনের কথার অর্থ হলো, মূসা যখন দাবী করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন অথবা তিনি যখন এই দাবী করলেন যে, আকাশে তার মাবুদ রয়েছেন, তখন ফেরাউন তার কথাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِبًا এবং বলেছিল আমি মূসা আলাইহিস সালামকে মিথাবাদী বলেই মনে করি অর্থাৎ সে যেই রিসালাতের দাবী করছে অথবা আকাশে তার ইলাহ (মাবুদ) থাকার যেই দাবী করছে, আমি তার দাবীতে তাকে মিথ্যুক মনে করছি।

এ আয়াত থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সৃষ্টির উপর। মূসা আলাইহিস সালাম

ফেরাউনকে এই সংবাদই দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আসমানের উপর। ফেরাউন তাকে এই কথায় মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিল। এখান থেকে আরো প্রমাণিত হলো যে, পূর্বের নাবীগণও তাদের উম্মাতদেরকে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে।

أَأَمِنتُمْ **তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো?** আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে ধমক দিয়ে বলছেন, তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছো? নিরাপত্তা হচ্ছে ভয়ের বিপরীত।

من في السماء যিনি আসমানে আছেন। অর্থাৎ যিনি আসমানে আছেন, তোমরা কি তার শাস্তি হতে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছো? আসমানে যিনি আছেন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। এখানে في السماء আসমানে আছেন অর্থ على السماء আসমানের উপরে আছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন:

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

"আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো"।

এখানেও في হারফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর ক্রুশবিদ্ধ করবো। উপরোক্ত আয়াতে في হারফে জারটি তখনই على (উপরে) অর্থে ব্যবহৃত হবে, যখন আসমান দ্বারা আল্লাহর নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হবে। আর যদি السماء দ্বারা শুধু উপর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে في হারফে জারটি ظرفية তথা স্থান বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হবে। তখন বাক্যটি এ রকম হবে, أأمنتم من في العلو অর্থাৎ যিনি উপরে আছেন, তোমরা কি তার শাস্তির ব্যাপারে নিরাপদ হয়ে গেছো?

أن يخسف بكم الأرض তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন। যেমন ধসিয়ে দিয়েছিলেন কারুনকে।

فإذا هي تمور তখন যমীন অকস্মাৎ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে এবং প্রকম্পিত হতে থাকবে।

أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا **কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন এ ব্যাপরেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো?** যেমন আল্লাহ তা'আলা লুত আলাইহিস সালাম এর জাতি এবং হস্তী বাহিনীর উপর

আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, তোমাদের উপর মেঘমালা পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর। আবার কেউ কেউ বলেছেন, বাতাস পাঠাবেন। যাতে থাকবে পাথর।

فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? অর্থাৎ যখন তোমরা আযাব দেখতে পাবে, তখন জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? কিন্তু তখন এই জানা তোমাদের কোন উপকারে আসবে না।

উপরের দুই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টির علـــو (উপরে হওয়া) সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ আসমানের উপরে। সুতরাং শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য উলু (উপর) সাব্যস্ত করার জন্য উল্লেখ করেছেন। এই আয়াতগুলো আল্লাহর পবিত্র সত্তা উপরে হওয়ার কথা প্রমাণ করে, যেমন ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত অধ্যায়ের আয়াতগুলো সাব্যস্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর।

استواء (আরশের উপর সমুন্নত হওয়া) এবং علـــو (উপরে হওয়া) এর মধ্যে পার্থক্য:

(১) علـــو তথা সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত বিশেষণ। অর্থাৎ এটি কখনো আল্লাহর সত্তা থেকে আলাদা হয় না এবং এটি তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। অপর দিকে استواء (উপরে উঠা, সমুন্নত হওয়া) আল্লাহর কর্মগত ছিফাত, যা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর স্থায়ী বিশেষণ। আর আরশের উপর আল্লাহ সমুন্নত হওয়া হচ্ছে তার কর্মগত বিশেষণ। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন তখন স্বীয় ইচ্ছা ও ক্ষমতার মাধ্যমে উপরে উঠেন বা বা আরশের উপর সমুন্নত হন। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বলেছেন ثم استوى "অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন"। আর এই সমুন্নত হওয়া ছিল আসমান-যমীন সৃষ্টির পর।

(২) সৃষ্টির উপর হওয়া এমন একটি বিশেষণ, যা মানুষের বোধশক্তি, স্বভাব-প্রকৃতি ও কুরআন-সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি শুধু কুরআন ও হাদীছের দলীল দ্বারা প্রমাণিত; যা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও বোধশক্তি দ্বারা প্রমাণিত নয়।

٢٠ – إثبات معية الله لخلقه

২০। আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সাথে আছেন।

وقوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} وقوله: {لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ} {وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

"তিনিই আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। অতঃপর তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে এবং যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যেখানেই থাক না কেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন" *(সূরা আল হাদীদ ৫৭:৪)*। আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"তিন ব্যক্তির এমন কোনো পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন। তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথেই, তারা যা করে তিনি ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত" *(সূরা মুজাদালাহ ৫৮:৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ "তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে

আছেন *(সূরা আত তাওবা ৯:৪০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ "আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি" *(সূরা ত্বহা ২০:৪৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা মুত্তাকী হয়েছে এবং যারা সৎকর্ম করে" *(সূরা আন নাহল ১৬:১২৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"তোমরা সবরের পথ অবলম্বন করো, অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন" *(সূরা আল আনফাল ৮:৪৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

"আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন" *(সূরা আল বাকারা ২:২৪৯)*।

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতের هوالذي থেকে শুরু করে وما يعرج فيها পর্যন্ত ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। ﴿ وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ﴾ **তিনি তোমাদের সাথেই, তোমরা যেখানেই থাক না কেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাদের সাথে আছেন, তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তোমরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের কাজ-কর্ম দেখছেন। তোমরা স্থলভাগে থাকাবস্থায় যা করো, জলভাগে থাকাকালে যা করো, রাতের অন্ধকারে যা করে থাকো, দিবাভাগে যা করো, গৃহাভ্যন্তরে যা করো এবং নির্জন মরুভূমিতে যা করো, তার সবই তিনি অবগত আছেন। তার জ্ঞানে সবকিছুই সমান। অর্থাৎ তিনি সকল সৃষ্টির অবস্থা সম্পর্কে সমানভাবে অবগত আছেন। সবকিছুই তার শ্রবণ ও দৃষ্টির অধীনে। তিনি তোমাদের কথা শ্রবণ করছেন এবং তোমাদের অবস্থান দেখছেন। আয়াতের এ স্থান থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ **তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন:** তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে দৃষ্টি রাখেন। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তার নিকট গোপন নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না: পরামর্শ বলতে গোপন পরামর্শ উদ্দেশ্য। মোটকথা তিনজনের কোন পরামর্শ হয় না।

إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ যাতে তিনি চতুর্থ হিসাবে না থাকেন এবং পাঁচ জনের হয় না, যাতে ষষ্ঠ না থাকেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাকে এভাবে চারে পরিণত করে দেন এবং পাঁচজনের গোপন পরামর্শকে এভাবে ছয়জনের পরামর্শে পরিণত করেন যে, তিনি তাদের সেই গোপন পরামর্শে অংশ গ্রহণ করেন এবং তা জেনে ফেলেন। তিন এবং পাঁচ সংখ্যাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার কারণ হলো অধিকাংশ গোপন পরামর্শকারীর সংখ্যা তিন অথবা পাঁচজন হয়ে থাকে। অথবা আয়াতটি তিনজনের কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং পাঁচজনের অন্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা কমবেশী প্রত্যেক সংখ্যার সাথে আছেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: ﴿وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾ "তাদের সংখ্যা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, তিনি তাদের সাথেই আছেন"। অর্থাৎ উল্লেখিত সংখ্যার কম হোক, যেমন একজন বা দুইজন এবং উল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে বেশী হোক, যেমন ছয়জন বা সাতজন। ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই আছেন। তারা গোপনে যেই পরামর্শ করে, আল্লাহ তা'আলা তা অবগত হন। ফলে সেই গোপন পরামর্শের কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। তাফসীরকারগণ বলেন, ইয়াহূদী এবং মুনাফেকরা গোপনে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতো। তারা এর মাধ্যমে মুমিনদের মধ্যে এই ধারণা ঢুকিয়ে দিত যে, তারা এমন বিষয়ে পরামর্শ করছে, মুমিনদের জন্য কষ্টদায়ক। এতে করে মুমিনরা চিন্তায় পড়ে যেত। এ বিষয়টি দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে অভিযোগ করলো। তখন তিনি ইয়াহূদী ও মুনাফেকদেরকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেন মুসলিমদের বাদ দিয়ে গোপন বৈঠকে মিলিত না হয়। কিন্তু এতে তারা বিরত থাকল না বরং তারা বারবার গোপন পরামর্শ করতেই থাকল। তখন আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলো নাযিল করলেন।

أَيْنَ مَا كَانُوا তারা যেখানেই থাকে না কেন: এর অর্থ হচ্ছে যে স্থানেই তাদের গোপন পরামর্শ হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে তা পরিবেষ্টন করে নেন। **ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ** অতঃপর তিনি সংবাদ দিবেন। ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমল সম্পর্কে: তাদেরকে সে অনুযায়ী বদলা দিবেন। এর মাধ্যমে তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে এবং ধমক দেয়া হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে পরিজ্ঞাত। তার কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। এ আয়াত থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে আছেন। এটি হচ্ছে সাধারণ বা সার্বজনীন সাথে থাকা। এ অর্থে তিনি সকল সৃষ্টির সাথেই রয়েছেন। এ প্রকার সাথে থাকার অত্যাবশ্যকীয় দাবী হচ্ছে, তিনি ক্ষমতার মাধ্যমে এবং ইলমের মাধ্যমে সবকিছুকে ঘিরে আছেন। তিনি সকলের সব অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত আছেন। এ জন্যই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এ আয়াতটি আল্লাহর ইলমের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবং ইলমের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا বিষণ্ন হয়ো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন: হিজরতের পথে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন গুহায় আত্মগোপন করেন, তখন তিনি তার সাথী আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এ কথা বলেন। মক্কার মুশরিকরা তাদের নিকটে চলে আসে। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কাফিরদের কষ্টের ভয় করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন, তুমি **বিষণ্ন** হয়ো না। অর্থাৎ তুমি দুঃশ্চিন্তা পরিহার করো।

إن الله معنا আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রয়েছেন: অর্থাৎ তার সাহায্য, সমর্থন ও শক্তি আমাদের সাথে রয়েছে। সুতরাং যার সাথে আল্লাহ রয়েছেন, সে কখনো পরাজিত হবে না। আর যাকে পরাজিত করা সম্ভব হবে না, তার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। উপরের আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এহেন সাথে থাকার দাবী হচ্ছে মুমিনদেরকে সাহায্য, হেফাজত ও শক্তিশালী করা।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)ও হারুন (আলাইহিস সালাম) কে বলেছেন, إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ **আমি তোমাদের সাথে আছি, সবকিছু শুনছি ও দেখছি:** সুতরাং ফেরাউনকে ভয় করো না। ভয় করতে নিষেধ করার কারণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী: إنني معكما "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি"। অর্থাৎ তোমাদের উভয়কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে সাহায্য করার মাধ্যমে আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের উভয়ের এবং ফেরাউনের কথা শুনছি। তোমাদের উভয়ের অবস্থান এবং ফেরাউনের অবস্থান দেখছি। তোমাদের কারো কোন অবস্থা আমার কাছে গোপন নয়। এ আয়াত থেকেও দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর অলীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ সান্নিধ্য রয়েছে। এটি হচ্ছে সাহায্য, সমর্থন ও শক্তিশালী করার সান্নিধ্য। সেই সাথে আল্লাহ ওয়া তা'আলার জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টি সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا **নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন:** অর্থাৎ যারা হারাম ও সকল প্রকার গুনাহর কাজ ছেড়ে দেয় এবং ইখলাসের সাথে সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে রয়েছেন।

وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ **যারা সৎকর্ম করে** *(সূরা আন নাহল ১৬:১২৮)***:** অর্থাৎ যারা আনুগত্যের কাজগুলো সঠিকভাবে আদায় করে এবং আল্লাহর আদেশ পালন করে, সহযোগিতা ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের সান্নিধ্যেই আছেন। এটি হচ্ছে বিশেষ এক প্রকার সান্নিধ্য। আয়াতেকারীমা থেকে গ্রন্থকার এটিই সাব্যস্ত করেছেন।

وَاصْبِرُوا **তোমরা সবরের পথ অবলম্বন করো:** আল্লাহ তা'আলা এখানে সবরের আদেশ দিয়েছেন। সবরের আসল অর্থ হচ্ছে নফসকে আটকিয়ে রাখা। তবে এখানে সবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির ও মুসলিমদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধকালে সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ **অবশ্যই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন:** অতঃপর সবরের এ আদেশ করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সবরকারীদের সাথে আছেন। সুতরাং যেসব কাজে সবর করা দরকার, আল্লাহ তা'আলা ঐসব কাজে সবরকারীদের সাথে আছেন। এ আয়াতে কারীমা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এখানে ঐ সকল সবরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সান্নিধ্য রয়েছে, যারা আনুগত্যের কাজে সবর করে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কতই না সুন্দর এ সান্নিধ্য! যাকে এটি দান করা হয়েছে, কোন শক্তি বা ব্যক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। কোন দিক থেকেই তার উপর চড়াও হওয়া যাবে না। যদিও শত্রু বাহিনী হয় অগণিত।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ **আল্লাহর হুকুমে কতক ক্ষুদ্র দল অনেক বিরাট দলকে পরাজিত করেছে:**[৯৬] অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালা অনুযায়ী অনেক ছোট দল অনেক বড় দলকে পরাজিত করেছে।

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ **আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন:** এ অংশ থেকেই দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার সময় সবর করে, তাদের জন্য

---

৯৬. এ আয়াতে আল্লাহর মুমিন বান্দা তালুত ও যালেম শাসক জালুতের মধ্যকার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তালুতের সৈন্য সংখ্যা জালুতের তুলনায় অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও সুদৃঢ় ঈমান ও পর্বত সদৃশ সবরের কারণে জালুতের বাহিনীর উপর বিজয় দান করেছেন। সূরা বাকারার ২৪৬ নং আয়াত থেকে শুরু করে ২৫২ নং আয়াত পর্যন্ত এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি হচ্ছে বিশেষ সান্নিধ্য। যার দাবী হচ্ছে সাহায্য ও শক্তিশালী করা। উপরের সবগুলো আয়াতের অভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তাতে আল্লাহর সান্নিধ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ সান্নিধ্য দু'প্রকার।

প্রথম: সাধারণ ও ব্যাপক সান্নিধ্য। যেমন বলা হয়েছে প্রথম দুই আয়াতে। এই প্রকার সান্নিধ্যের তাৎপর্য হলো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছেন। সমস্ত মানুষের ভালোমন্দ সব আমল সম্পর্কেই তিনি অবগত আছেন এবং তাদেরকে আমল অনুযায়ী বিনিময়ও দিবেন।

দ্বিতীয়: আল্লাহর মুমিন বান্দাদের জন্য রয়েছে এক বিশেষ সান্নিধ্য। এই প্রকার সান্নিধ্যের দাবী হচ্ছে মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করা, শত্রুর মোকাবেলায় তাদেরকে শক্তিশালী করা এবং তাদেরকে হিফাযত করা। সম্মানিত লেখক এই অধ্যায়ে যেসব আয়াত উল্লেখ করেছেন, তার মধ্য হতে শেষের পাঁচটি আয়াতে এই প্রকার সান্নিধ্যের কথাই প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সান্নিধ্যে থাকা সৃষ্টির উপরে থাকা এবং আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সান্নিধ্যে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে থাকার মতো নয়। কেননা,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ "তার সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা"। কেননা সান্নিধ্য সাধারণত কাছে থাকার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। পরস্পর স্পর্শ করা কিংবা পরস্পর সমান হওয়া জরুরী নয়। আরবরা বলে থাকে, (مازلنا نمشي والقمر معنا) আমরা চলছিলাম। চলন্ত অবস্থায় চন্দ্র আমাদের সাথেই ছিল। অথচ চন্দ্র তাদের মাথার অনেক উপরে এবং তাদের মাঝে এবং চন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব অনেক। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে হওয়া এবং তাদের সান্নিধ্যে হওয়ার পরিপন্থী নয়।[৯৭] সামনে আরো বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

---

৯৭. উল্লেখিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ সৃষ্টির সাথে আছেন। তবে অর্থ এ নয় যে, তিনি মাখলুকের সাথে মিশে সর্বত্র বিরাজমান; বরং এর অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থেকে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত মাখলুককে ঘিরে আছেন। কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকার অর্থ এই যে, সাহায্য ও হিফাযতের মাধ্যমে তিনি তাদের সাথে আছেন। আল্লাহ স্বীয় মাখলুকের নিকটে থাকা আরশের উপরে থাকার পরিপন্থী নয়। কেননা আল্লাহ মাখলুকের নিকটে বা সাথে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের নিকটে বা সাথে থাকার মত নয়। আরশের উপরে সমুন্নত থেকে সমস্ত মাখলুকের যাবতীয় বিষয়ের খবর রাখার ভিতরেই আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ তার সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি শুনেন এবং দেখেন। (সূরা আশ শূরা: ১১) মোটকথা আমরা জানি, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী নয়। তাই আমরা

٢١ – إثبات الكلام لله تعالى

২১। আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলার বিশেষণ) সাব্যস্ত করণ

وقوله: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ} {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} {مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ} {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا} {وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} {وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} {وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ

বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে। কারণ এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। উভয় প্রকার দলীলের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে আমরা বলিঃ যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষের সাথে আছেন তার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে এবং সমর্থনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আর বাস্তবে তিনি স্বীয় সত্ত্বায় আরশের উপরে সমুন্নত। তবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়ার উক্তি থেকে বুঝা যায়, তিনি এভাবে সকল ক্ষেত্রেই উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় করার পক্ষপাতী নন। তার কথার অর্থ হচ্ছে দলীলের মাধ্যমে যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে এবং তিনি মহান আরশের উপর সমুন্নত, তাই আমরা তাতে বিশ্বাস করি। তিনি কিভাবে, কি অবস্থায় উপরে এবং কিভাবে আরশের উপর সমুন্নত তা আল্লাহই জানেন। আমরা জানিনা। এই রকমই অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ মাখলুকের অতি নিকটে ও সাথে, তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ মাখলুকের নিকটে এবং সাথেই। তবে তিনি কিভাবে মাখলুকের নিকটে ও সাথে, তার অবস্থা ও ধরন আমরা জানিনা। এ ব্যাপারে তিনিই অবগত।

সকল মাখলুকের উপর তার ক্ষমতা। সে হিসাবে তিনি তাদের নিকটেই, কেউ তার ক্ষমতার বাইরে নয়। তিনি যেহেতু মাখলুকের সকল অবস্থা ও আমল সম্পর্কে জানেন, সে হিসাবেও তিনি তাদের অতি নিকটে। কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। আর তিনি তার অলীদের সাথে রয়েছেন। এটি হচ্ছে বিশেষ ও সাধারণ সৃষ্টির চেয়ে অতিরিক্ত এক নৈকট্য ও সান্নিধ্য। তিনি তার অলীদেরকে শত্রুদের উপর শক্তিশালী করেন এবং সাহায্য করেন। তাছাড়া আমাদের কারো কথা, "আমি তোমার সাথে আছি" এর অর্থ এ নয় যে, আমি তার সাথে মিশে আছি। আমরা অন্যকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে। অথচ যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়, সে থাকে এক শহরে। আর যাকে লক্ষ্য করে বলা হলো সে থাকে অন্য এক শহরে। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّـهُ مِـن قَبْلُ} {وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَـى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

"আর আল্লাহর কথার চেয়ে বেশী সত্য আর কার কথা হতে পারে? *(সূরা আন নিসা ৪: ৮৭)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

"আর আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾

"স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা!"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ ﴾

"সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ, তার কালেমাসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই"। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১৬৪ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

"আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়"। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ﴾

" তাদের কারোর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ১৪৩ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴾

"অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা মারইয়ামের ৫২ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾

"আমি তাকে তার ডান দিকের তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাকলাম এবং গোপন আলাপের মাধ্যমে তাকে নৈকট্য দান করলাম"। আল্লাহ তা'আলা সূরা শুআরার ১০ নং আয়াতে বলেন,

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

"যখন তোমার রব মূসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেছিলেনঃ যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও"। আল্লাহ তা'আলা সূরা আরাফের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾

"তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, "আমি কি তোমাদের এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি " আল্লাহ তা'আলা সূরা কাসাসের ৬৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾

স্মরণ করো সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কোন ব্যক্তি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও"। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ৭৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"অথচ তাদের একটি দল এমন ছিল, যারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। অতঃপর তা খুব ভালো করে জেনেবুঝে সজ্ঞানে তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহ এর ১৫ নং আয়াতে বলেন,

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ﴾

"এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও, তোমরা কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন"। আল্লাহ তা'আলা সূরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾

"হে নাবী! তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে যাকিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও। তার কালেমা পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই"। আল্লাহ তা'আলা সূরা নামালের ৭৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾

"যথার্থই এই কুরআন বনী ইসরাইলের জন্য বেশির ভাগ এমনসব কথার স্বরূপ বর্ণনা করে, যেগুলোতে তারা মতভেদ করে"।

ব্যাখ্যা: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ আর আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই। আয়াতে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তা হচ্ছে ইস্তেফহামে ইনকারী তথা অস্বীকারের প্রশ্ন। আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কেউ থাকাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে।

حديثا কথায়: অর্থাৎ কথায়, সংবাদ প্রদানে, আদেশ করায়, ওয়াদা-অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا আল্লাহর চেয়ে বেশী সত্যবাদী আর কে হতে পারে? القيل হচ্ছে قال يقول এর মাসদার। এটি القول এর অনুরূপ। এই আয়াতাংশের অর্থও পূর্বের আয়াতের মতোই। আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কারো কথা নেই এবং আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদীও আর কেউ নেই।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার জন্য حديث ও قيل অর্থাৎ কথা বলা বিশেষণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এতে আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা: অর্থাৎ স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম কে এই কথা বলবেন। যেসব নাসারা ঈসা এবং তার মাতা মারইয়ামের ইবাদত করছে, এই কথার মাধ্যমে তাদেরকে ধমক দেয়া হয়েছে। এটি পূর্বের আয়াতদ্বয়ের মতোই। এখানেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কথা বলা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا "সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে তোমার রবের কথা পূর্ণাঙ্গ: এখানে কালেমা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কালাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তার সংবাদের ক্ষেত্রে সত্যবাদী এবং হুকুম-আহকামে ইনসাফকারী। صدقا এবং عدلا এই শব্দ দু'টি তামীয হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়: এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মূসার সাথে কথা বলেছেন এবং সেই কথা মূসাকে শুনিয়েছেন। এ জন্যই মূসা আলাইহিস সালামকে কালীমুল্লাহ বলা হয়। মূসার সাথে আল্লাহর কালাম (কথা বলা) থেকে রূপকার্থের সম্ভাবনা দূর করার জন্য تكليما মাসদারকে তাগিদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি মূসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথা বলেছেন।

مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ তাদের কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন: অর্থাৎ রসূলদের কারো কারো সাথে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। বিনা মধ্যস্থতায় সরাসরি কথা বলেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মূসা এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কথা বলেছেন। এমনি আদম আলাইহিস সালাম এর সাথেও কথা বলেছেন। ছ্বহীহ ইবনে হিব্বানে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কতক রসূলের সাথে অতীতে কথা বলেছেন।[৯৮]

---

৯৮. ক্বিয়ামতের দিনও আল্লাহ তা'আলা আদমের সাথে কথা বলবেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, আমি হাজির আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ তোমার হাতেই। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম বলবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا **অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মূসার আগমণের জন্য যেই সময় নির্ধারণ করলেন, মূসা আলাইহিস সালাম ঠিক সেই নির্ধারিত সময়েই উপস্থিত হলো।

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ **এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিনা মধ্যস্থতায় মূসা আলাইহিস সালামকে তার কথা বললেন। সুতরাং এ আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি বিনা মধ্যস্থতায় মূসার সাথে কথা বলেছেন।

وَنَادَيْنَاهُ **আমি তাকে ডাকলাম:** আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালামকে ডাক দিয়েছেন। উঁচু আওয়াজে ডাক দেয়াকে النداء বলা হয়।

مِن جَانِبِ الطُّورِ আল্লাহ তা'আলা তাকে তূর পাহাড়ের দিক থেকে ডাক দিয়েছেন। মাদায়েন শহর এবং মিশরের মাঝখানের একটি পাহাড়ের নাম তুর।

الْأَيْمَنِ ডান দিক: মূসা আলাইহিস সালাম যখন আগুন দেখে তা থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে গেলেন তখন মূসার ডান দিক থেকে ডাক দেয়া হল। এখানে পাহাড়ের ডান দিক উদ্দেশ্য নয়। কেননা পাহাড়ের কোন ডান-বাম হয় না।

وَقَرَّبْنَاهُ **তাকে নৈকট্য দান করলাম:** আর আমি মূসা এর সাথে চুপিসারে কথা বলার জন্য তাকে নৈকট্য দান করলাম।

نَجِيًّا শব্দটি مناجيا অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ চুপিসারে কথার বলার জন্য মূসা আলাইহিস সালামকে আমার নৈকট্য দান করলাম। মুনাজাত মুনাদার (উঁচু আওয়াজে

সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি আশা করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক। এবারও আমরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের ন্যায়।

আহবানের) বিপরীত। এ আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উঁচু আওয়াজে ডাক দেন, আহবান করেন এবং চুপিসারেও কথা বলেন। ডাক দেয়া এবং মুনাজাত করা (নীচু আওয়াজে কথা বলা) কালামের (কথা বলার) দু'টি প্রকার। ডাক দেয়া সাধারণত উঁচু আওয়াজে হয় আর মুনাজাত নীচু আওয়াজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, যালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও: অর্থাৎ তাদেরকে পাঠ করে শুনাও সেই ঘটনা অথবা স্মরণ করো সেই সময়ের ঘটনা, যখন তোমার রব মূসা আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেছিলেন। আহবান করাকে النداء বলা হয়। أَنِ ائْتِ এখানে أن অব্যয়টি أن مفسرة এবং أن مصدرية উভয়ই হতে পারে।

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اذهب إلى তুমি **যালেম সম্প্রদায়ের** কাছে যাও: ফেরাউন সম্প্রদায়কে যালেম বলার কারণ এই যে, তারা কুফুরীর যুলুম এবং পাপাচারের যুলুমকে নিজেদের মধ্যে একত্র করেছিল। কুফুরীর মাধ্যমে তারা নিজেদের নফসের উপর যুলুম করেছিল এবং পাপাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে তারা অন্যদের উপর যুলুম করেছিল। যেমন তারা বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছিল এবং তাদের ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করেছিল। এই আয়াতে কারীমাতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম (কথা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যার সাথে ইচ্ছা কথা বলেন এবং তাকে স্বীয় কথা শুনিয়ে দেন।

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি: আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়াকে এই বলে ডাক দিলেন যে, আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? অর্থাৎ ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করিনি? এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের দুইজনকে ধমক দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে যেই বস্তু হতে সাবধান করা হয়েছিল, তা থেকে তারা বিরত থাকেনি। এ আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে আদম ও তার স্ত্রী হাওয়ার জন্য ডাক এসেছিল।

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ আর তারা যেন ভুলে না যায় সেদিনের কথা, যেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন: তোমরা রসূলদের কী জবাব দিয়েছিলে? অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন এই মুশরিকদেরকে ডাক দিবেন এবং বলবেন, তোমরা রসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে? যেসব নাবীকে

তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল, তারা যখন তোমাদের কাছে আমার রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলো তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে?[৯৯]

এ আয়াতেও আল্লাহর জন্য কালাম (কথা বলা) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে ডাক দিবেন।[১০০]

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যেসব মুশরেকের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের কেউ যদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার জন্য তোমার কাছে আসতে চায়, তোমার নিরাপত্তা কামনা করে এবং আশ্রয় চায়, তুমি তাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করো।

حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। অর্থাৎ তোমার জবানীতে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং তুমি যে বিষয়ের প্রতি আহবান করছো, তার প্রকৃত অবস্থাও বোধগম্য হয়।

এই আয়াত থেকেও আল্লাহ তা'আলার কালাম (কথা বলা বিশেষণ) রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ আমরা যা তিলাওয়াত করি, তা আল্লাহর কালাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যে একটি দল ছিল: এটি হচ্ছে ইয়াহূদীদের দল। **فريق** শব্দটি **اسم جمع**। এই শব্দের কোন একবচন নেই।

يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّه তারা আল্লাহর কালাম শ্রবণ করতো। এখানে কালাম দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য। ইয়াহূদীরা তাওরাতের আয়াত শ্রবণ করতো।

ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ অতঃপর তারা তার মধ্যে বিকৃতি সাধন করতো। অর্থাৎ তারা আসল ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে অন্য ব্যাখ্যা করতো।

---

৯৯. আলেমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন প্রতিটি মানুষকে দু'টি প্রশ্ন করবেন। (১) ما كنتم تعبدون؟ "তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করতে?" (২) ماذا أجبتم المرسلين তোমরা রসূলদের জবাবে কী বলেছিলে?

১০০. আল্লাহর কালাম ও ডাক যেমন হয় দুনিয়াতে, তেমনি হয় আখিরাতে। তিনি দুনিয়াতে কোন কোন নাবী-রসূলের সাথে কথা বলেছেন। আখিরাতেও মাখলুকের সাথে কথা বলবেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কথা বলা ও ডাক দেয়ার বিষয়টি তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। তিনি যখন যার সাথে কথা বলার ইচ্ছা করেন তখন তার সাথে কথা বলেন এবং যা বলার ইচ্ছা করেন তাই বলেন।

مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ তারা তার মধ্যে তাহরীফ বা বিকৃতি সাধন করতো: অর্থাৎ ভালো করে জেনে-বুঝে তারা তাওরাতের বিপরীত আমল করতো।

وَهُمْ يَعْلَمُونَ তারা ভালো করেই জানতো যে, তারা যেই তাহরীফ বা পরিবর্তন করছে এবং যেই অপব্যাখ্যা করছে, তাতে তারা অপরাধী।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও আল্লাহর কালাম আছে বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তাওরাতও আল্লাহর কালামের অন্তর্ভুক্ত। আর ইয়াহূদীরা তাওরাতের মধ্যে তাহরীফ করেছে, তার মধ্যে পরিবর্তন ও রদবদল করেছে।

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ এরা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে দিতে চায়। এদের বলে দাও: তোমরা কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, আল্লাহ তো আগেই এ কথা বলে দিয়েছেন।

يُرِيدُونَ এরা: এখানে পিছনে থেকে যাওয়া ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোক উদ্দেশ্য, যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদে বের না হয়ে পরিবার-পরিজন ও নিজেদের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। হুদায়বিয়ার বছরও তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বের না হয়ে নিজেদের গৃহেই বসেছিল।

أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সেই কথাকে পরিবর্তন করতে চায়, যার মাধ্যমে তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, খায়বারের গণীমত কেবল তারাই পাবে।

قُل لَّن تَتَّبِعُونَا বলো, তোমরা কখনোই আমাদের সাথে যেতে পারবে না, এই বাক্যটি না বাচক হলেও তা নিষেধাজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। لاتتبعونا অর্থাৎ আমাদের সাথে তোমরা বের হয়ো না।

كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ আল্লাহ তো আগেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আগেই ওয়াদা করেছিলেন যে, পরের বছর খায়বারের যুদ্ধে যেই গণীমত হাসিল হবে, তা কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যই। উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর জন্য কালাম ও কাওল তথা কথা বলা বিশেষণ সুসাব্যস্ত।[১০১] আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা

১০১ . কুরআন আল্লাহর কালাম; ইহা আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়। কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে। উপরে উল্লেখিত দলীলগুলো সে কথারই প্রমাণ

করে। ছাহাবী, তাবেঈ, সালাফে সালেহীন এবং সম্মানিত ইমামগণের মতও তাই। সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কুরআন আল্লাহর কালাম। তবে মু'তাযিলা এবং আহলে সুন্নাতের মধ্যে এই মাসআলাটি নিয়ে বিরাট মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদের কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকদের বিরাট ক্ষতি হয়েছে। আহলে সুন্নাতের ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এ মাসআ'লার কারণেই কঠোর নির্যাতন সহ্য করেছেন।

কতিপয় আলেম বলেন, রিদ্দার যুদ্ধের দিন আল্লাহ তা'আলা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মাধ্যমে যেমন ইসলামের হিফাযত ও সাহায্য করেছেন তেমনি যেদিন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল সেদিন তার মাধ্যমে ইসলামের হিফাযত করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) যে ফিতনায় পড়েছিলেন, তার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্বাসী খলীফা মামুনুর রশিদের যুগে মু'তাযিলা আলেমদের খুব প্রভাব ছিল। তাদের প্রভাবে স্বয়ং খলীফা মামুনও প্রভাবিত হয়েছিলেন। মু'তাযিলাদের মতে কুরআন আল্লাহর মাখলুক। তারা খলীফাকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই খলীফা মামুন মানুষকে এ মতবাদ মানতে বাধ্য করলেন। তার কথার সাথে যেসব আলেম অমত পোষণ করতেন, তিনি তাদের উপর নির্যাতন চালাতেন এবং হত্যা করতেন। অধিকাংশ আলিম তখন মনে করলেন যে, বল প্রয়োগ করে যেহেতু কুরআনকে মাখলুক বলতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং তা না বললে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়, তাই বাধ্য হয়ে তারা খলীফার কথা মেনে নিলেন। বিশেষ করে যখন ইসলামে এই সুযোগ রয়েছে যে, বাধ্য হয়ে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে কোন মুসলিম কাফির হয়ে যায় না। ঈমানের দ্বারা অন্তর পরিপূর্ণ রেখে জান চলে যাওয়ার কিংবা নির্যাতনের ভয়ে মুখে কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করলে তা জায়েয রাখা হয়েছে এবং এই অবস্থায় কুফুরী বাক্য উচ্চারণকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

তাই এক পর্যায়ে অধিকাংশ আলিম মাসআলাটিকে এই পর্যায়ে রেখে স্বীকার করে নিলেন যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। তবে সেখানে এমন কিছু আলেম থাকার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না, যারা কেবল খলীফার নৈকট্য ও পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যই কুরআনকে মাখলুক বলেছিল।

কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে নূহ (রহিমাহুল্লাহ) কুরআনকে মাখলুক বলতে অস্বীকার করলেন। তারা উভয়েই বললেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর নিকট থেকে ইহা নাযিল হয়েছে। ইহা অন্যান্য সৃষ্টির মতো সৃষ্ট জিনিস নয়; বরং তা আল্লাহর কালাম ও ছিফাত। তারা মনে করলেন, বাধ্য হয়ে যেসব মাসআলায় সত্যের বিপরীত বলা যায়, এটি সেরকম কোন সাধারণ ও ব্যক্তিগত মাসআলা নয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাদের জন্য সেই সুযোগ গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ এই মাসআলাটি ব্যক্তিগত মাসআলা নয়, যাতে বাধ্য হয়ে সত্যের খেলাফ বললে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেসব মাসআলার সম্পর্ক ইসলামী শরী'আতের সংরক্ষণের সাথে, সেখানে নিজের গর্দান বিসর্জন দিয়ে হলেও মুসলিমরা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের হেফাজত করবে।

সুতরাং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) যদি তখন নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য এবং বাধ্য হয়ে এই কথা বলতেন যে, কুরআন আল্লাহর মাখলুক, তখন সকল মানুষই বলতঃ কুরআন আল্লাহর মাখলুক। নির্যাতনের ভয়ে এই কথা বলা হলে ইসলামী সমাজ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং একটি চিরসত্য ইসলামী আক্বীদাহ হয়তো মুসলিমগণ হারিয়ে ফেলতেন। তাই তিনি খলীফার কথায় সম্মতি না দিয়ে সত্য প্রকাশ করার সুদৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলেন এবং এই জন্য অমানবিক নির্যাতন ভোগ করলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের ফিতনার বিষয়টি ভালো করে বুঝার জন্য আরেকটু খোলাসা করে লেখার প্রয়োজন অনুভব করছি। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সূত্রে বলা হয়েছে যে, মুতাযেলী

আলেম আহমাদ ইবনে আবু দাউদ এবং বিশর আলমুরাইসী খলীফা মামুনকে পরামর্শ দিল, তিনি যেন রাজ্যের আলেমদেরকে এই কথা বলতে বাধ্য করেন যে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি। মামুন এতে রাজী হয়ে বাগদাদের পুলিশ প্রধান ইসহাক ইবনে ইবরাহীমকে দেশের সমস্ত বিজ্ঞ আলেমকে একত্র করার আদেশ দিলেন। ইসহাক সকল আলেমকে একত্র করে মামুনের চিঠি পড়ে শুনালেন এবং কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, এ কথা বলার আহবান জানালেন। সেই সাথে এই কথাও জানিয়ে দেয়া হলো যে, খলীফার আদেশ অমান্য করে যেই আলেম কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলবে, তাকে সরকারী পদ থেকে বহিস্কার করা হবে এবং মামুনের অনুদান থেকেও বঞ্চিত করা হবে। উল্লেখ্য যে, খলীফার আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতির কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো।

এখান থেকেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ইমামকে অন্যান্য আলেমের সাথে ইসহাকের কার্যালয়ে হাজির করা হলো। আলিমগণ এক এক করে সকলেই নির্যাতনের ভয়ে কুরআনকে মাখলুক বলা শুরু করলেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এই অবস্থা দেখে ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং ক্রোধে তার চেহারা ও চোখ লাল হয়ে গেল। অথচ এর আগে তিনি ছিলেন একজন নরম ও কোমল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু তার সেই নরম স্বভাব চলে গেল এবং তিনি আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হলেন। এটি ছিল সেই দিনের ঘটনা। অতঃপর তিনি তার মসজিদে ফিরে এলেন এবং পাঠ দানে নিয়োজিত হলেন। লোকেরা এরপর থেকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে এই মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। প্রথম দিকে তিনি এই মাসআলার জবাব দিতে অস্বীকার করতেন। কিন্তু ফিতনাটি যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন মানুষ জেনে ফেলল যে, কোন্ কোন্ আলেম এই মাসআলায় খলীফার মর্জি মুতাবেক ফতোয়া দিয়েছেন এবং কোন্ কোন্ আলিম খলীফার বিরোধীতা করেছেন।

খলীফা মামুনের কাছেও খবর পৌঁছে গেল। তিনি তখন বাইজানটাইনের সীমান্তবর্তী অঞ্চল তারতুসে অবস্থান করছিলেন। তিনি পুলিশ প্রধান ইসহাককে দ্বিতীয়বার আলিমদের সাথে বসার আদেশ দিলেন এবং যারা কুরআনকে আল্লাহর সৃষ্টি না বলে আল্লাহর কালাম বলবে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়ার আদেশ করলেন। ইসহাক তাই করলেন। এতে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও মুহাম্মাদ ইবনে নুহ ব্যতীত সকলেই খলীফার কথা মেনে নিল। এক পর্যায়ে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল এবং মুহাম্মাদ ইবনে নুহকে জেলে বন্দী করা হলো। ইসহাক শপথ করে বলল, তারা যদি কুরআনকে মাখলুক বলতে নারাজ হয়, তা হলে সে উভয়কে নিজ হাতে হত্যা করবে। এ জন্য সে তলোয়ার উঁচিয়ে ভয় দেখালো। কিন্তু তারা উভয়েই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এইবার ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে বাগদাদ থেকে তারতুসে তথা যেখানে খলীফা মামুন অবস্থান করছিলেন, সেখানে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হলো। তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাওয়ার পথে অনেক ঘটনাই ঘটে যায়। এসব ঘটনা ইমামকে সত্যের উপর দৃঢ়পদ থাকতে সহায়তা করেছিল। এ সময় সমস্ত মানুষের দৃষ্টি ছিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের দিকে। তিনি কী বলেন, তারা তার অপেক্ষায় ছিল। লোকেরা তাকে এই মাসআলায় সত্যের উপর অটল থাকতে সাহস দিতেন।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তারতুসে যাওয়ার পথে ইরাকের একজন গ্রাম্য লোক তার সাথে দেখা করে এই বলে সাহস দিল যে, হে ইমাম আহমাদ! আপনি সত্যের পথেই আছেন। সুতরাং আপনি অটল থাকুন। আপনাকে যদি হত্যাও করা হয়, তাহলেও আপনি খলীফার কথায় সম্মতি দিবেন না। শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ করুন। আর বেঁচে থাকলে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়ে বেঁচে থাকুন। এই দুনিয়াতে নিহত হয়ে পরকালে জান্নাতে যাওয়াই আপনার জন্য ভালো। এসব কথা শুনে ইমামের মনোবল বৃদ্ধি পেত এবং তার ঈমান মজবুত হতো।

এমনিভাবে তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদের অন্যতম সাথী আবু জা'ফর আলআম্বারী ফুরাত নদী পার হয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। ইমাম তাকে দেখে বললেন, হে আবু জা'ফর! এত কষ্ট করে আমার সাথে দেখা করতে আসার কী প্রয়োজন ছিল? জবাবে আবু জা'ফর বললেন, ওহে আহমাদ! শুন! তুমি আজ মানুষের নয়ন মনি, তুমি সকলের মাথা! মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তারা তোমার অনুসরণ করবে। আল্লাহর কসম! তুমি যদি কুরআনকে মাখলুক বলো, তাহলে আল্লাহর বান্দারা তাই বলবে। আর তুমি যদি তা বলতে অস্বীকার করো, তাহলে অগণিত মানুষ কুরআনকে মাখলুক বলা হতে বিরত থাকবে। হে বন্ধু! ভালো করে শুন। খলীফা যদি তোমাকে এইবার হত্যা নাও করে, তাহলে তুমি একদিন মৃত্যু বরণ করবে। মরণ একদিন আসবেই। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করো। খলীফার কথায় তুমি কুরআনকে সৃষ্টি বলতে যেয়োনা।

কথাগুলো শুনে ইমাম আহমাদ কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ما شاء الله আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে। অতঃপর তিনি বললেন, হে আবু জা'ফর! কথাগুলো তুমি আরেকবার বলো। আবু জা'ফর কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। এবারও ইমাম কাঁদলেন এবং বললেন, ما شاء الله।

তারতুস যাওয়ার পথে ইমাম আহমাদ গভীর রাতে তাহাজ্জুদের ছ্বলাত পড়তেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে দু'আ করতেন, আল্লাহ যেন তাকে মামুনের সামনে হাজির না করেন এবং মামুনকে যেন না দেখান। দু'আয় তিনি এই কথা বারবার বলতেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা যে, তারতুস পৌঁছার আগেই বিনা অসুখে মামুন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি ছিল ২১৮ হিজরী সালের রজব মাসের ঘটনা।

মামুনের মৃত্যু সংবাদ আসার পর রক্ষীরা ইমামকে মুহাম্মাদ নুহ এর সাথে বাগদাদের জেলে ফেরত নিয়ে আসল। মামুনের পরে মুতাসেম খলীফা নিযুক্ত হলেন। মুতাসেম যদিও মু'তাযিলা মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু মামুনের গৃহীত নীতি থেকে ফিরে আসাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ খলীফা মামুন মুতাসেমকে মু'তাযিলা মতাদর্শের উপর অটল থাকার অসীয়তও করেছিলেন। তাই মামুনের প্রতি মুতাসেমের অগাধ ভালোবাসার কারণেই মুতাসেম খলীফা হয়ে সর্বপ্রথম যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন তা হলো তিনি ইমাম আহমাদকে হাত-পা বেঁধে বাগদাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জেলে ফেলে রাখলেন। তাতে তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে বাগদাদের বড় জেলে সাধারণ কয়েদীদের সাথে স্থানান্তর করা হলো। এখানে তিনি ত্রিশ মাস অবস্থান করেন। এরই মধ্যে দীর্ঘ কারাভোগ এবং নির্যাতনের কারণে জেলের মধ্যেই মুহাম্মাদ ইবনে নূহ মারা গেলেন। তার মৃত্যুর পর ইমাম আহমাদ একাই ময়দানে বাতিলের মোকাবেলা করতে থাকলেন।

জেলের মধ্যে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের বড় বড় আলেমরা প্রবেশ করে ইমামের সাথে খালকে কুরআনের মাসআলায় তর্কে লিপ্ত হতো এবং যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ পেশ করতো। কিন্তু ইমাম আহমাদের যুক্তি-প্রমাণ সবসময়ই মু'তাযিলাদের যুক্তি-প্রমাণের উপর জয়লাভ করতো। যতবারই ইমাম আহমাদ যুক্তি-তর্কে মু'তাযিলা আলেমদের উপর জয়লাভ করতেন, ততবারই তার উপর যুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া হতো। এভাবে কিছুদিন পার হওয়ার পর খলীফা মুতাসেমের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হলো।

প্রিয় পাঠক! আপনি পরিস্থিতির ভয়াবহতার প্রতি একটু খেয়াল করুন। একদিকে ইমাম আহমাদ একা। অন্যদিকে খলীফা। খলীফার সাথে রয়েছে বিদ'আতী আলেমগণ, মন্ত্রীপরিষদ, রাষ্ট্রের উপরস্থ সেনা কর্মকর্তাগণ, পুলিশবাহিনী এবং জল্লাদের দল। বিতর্কের শুরুতে খলীফা নিজেই ইমামকে নরম করার চেষ্টা করতেন এবং কুরআনকে মাখলুক বলে ফতোয়া জারী করার জন্য উৎসাহ দিতেন। অতঃপর মুতাযেলী আলেমদেরকে তার সাথে তর্ক করার আদেশ দিতেন। কিন্তু ইমাম

আহমাদ কুরআন, হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করে সকলকে পরাজিত করে দিতেন। বিদআতীরা দার্শনিকদের যুক্তি পেশ করতো। ইমাম আহমাদের দলীল তাদের কথার উপর জয়লাভ করতো। তিনি বলতেন, আমাকে কুরআন ও সুন্নাহর একটি দলীল দিয়ে বুঝিয়ে দাও যে কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি।

ঐদিকে পুলিশ প্রধান আব্দুর রাহমান ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলতেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালকে ত্রিশ বছর যাবৎ চিনি। তিনি আপনার আনুগত্য করাকে ওয়াজিব মনে করেন, আপনার শাসনকে সমর্থন করেন এবং আপনার সাথে জিহাদ করাকে ফরয মনে করেন। সেই সাথে তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম এবং ফকীহ।

অপর দিকে আহমাদ ইবনে দাউদ এবং অন্যান্য বিদআতীরা খলীফাকে ইমামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলত এবং বুঝাতো যে, ইমাম আহমাদ একজন গোমরাহ, কাফির এবং বিদ'আতী।

এভাবে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ার কারণে খলীফা মুতাসেম বিরক্তিবোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিদ'আতী আলিম আহমাদ ইবনে দাউদ খলীফাকে পুনরায় ইমাম আহমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। তাই আহমাদ ইবনে দাউদের প্ররোচনায় এবং উৎসাহে ইমামকে চাবুক মারা শুরু হলো। ইমামের দৃঢ়তা দেখে স্বয়ং খলীফা আশ্চর্যবোধ করলেন এবং ইমামের উপর তার দয়ার উদ্রেক হলো। তৎক্ষণাৎ আহমাদ ইবনে দাউদ বলতে লাগলঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি তাকে ছেড়ে দেন, তাহলে লোকেরা বলাবলি করবে যে, ইমাম আহমাদের সামনে দুইজন আব্বাসী খলীফা পরাজয় বরণ করেছে। এই নিকৃষ্ট কথাটির কারণে খলীফা পূর্বের অবস্থানে ফিরে যায় এবং জল্লাদরা তার আদেশে ইমামকে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করে দেয়।

এভাবে জল্লাদরা পালাক্রমে তার শরীরকে বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল। সতেরবার বেত্রাঘাত করার পর সেই দিন খলীফা মুতাসেম ইমাম আহমাদকে বললেন, হে আহমাদ! কী কারণে আপনি এভাবে নিজের জান শেষ করছেন? আল্লাহর কসম! আমি আপনার উপর দয়া করতে চাই, কিন্তু.....।

ঐ সময় আব্বাসীয় খিলাফতের একজন তুর্কী সেনাপতি স্বীয় তরবারি দ্বারা ইমামের শরীরে গুঁতা মেরে বলল, তুমি কি এই সব মানুষকে পরাজিত করতে চাও? আরেকজন বলল, মরণ হোক তোমার! তোমার খলীফা আমীরুল মুমিনীন তোমার মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তুমি তার কথা অমান্য করছো? আরেকজন বলে উঠল, হে আমীরুল মুমিনীন! একে হত্যা করে ফেলুন। অন্য একজন বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি রোজাদার অবস্থায় রোদ্রে দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেন? তাকে হত্যা করে ফেলুন এবং নিজেকে শান্ত করুন। এমনি আরো অনেক কথাই হয়তো সেদিন হয়েছিল সেখানে।

পরিশেষে খলীফা মুতাসেম ইমামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আহমাদ! আফসোস আপনার জন্য! আমাদের কথার জবাব দিন। ইমাম অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, আমার কাছে কুরআন থেকে অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত থেকে একটি দলীল নিয়ে আসুন। আমি আপনাদের কথার সাথে একমত হবো। এতে তার শরীরে পুনরায় বেত্রাঘাত শুরু করা হলো। অতঃপর ইমামকে লক্ষ্য করে খলীফা মুতাসেম বললেন, আমার কথাকে সরাসরি সমর্থন না করলেও আপনি এমন একটি কথা বলুন, যাতে আমি সামান্যতম সন্তুষ্ট হতে পারি এবং আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু ইমাম তার অবস্থান থেকে সামান্যতম পিছপা হলেন না।

জল্লাদরা তার উপর বেত্রাঘাত অব্যাহত রাখলো এবং কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি, এ কথা জোর করে তার থেকে আদায় করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই লাভ হলো না। পরিশেষে খলীফা

কথা বলেন। আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করা জায়েয নেই। আল্লাহর কালামের উপর আমল করা আবশ্যক এবং তার অনুসরণ করা জরুরী।

ইমামের পর্বত সদৃশ দৃঢ়তা দেখে তার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে এনে সকলের সামনে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত করার আগে ইমামের আত্মীয় স্বজন থেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি নিলেন যে, ইমামকে তারা সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বুঝে নিচ্ছে। এই স্বীকারোক্তি নেয়ার কারণ হলো খলীফার ভয় ছিল, সাধারণ লোকেরা যদি জানতে পারে যে তাদের প্রাণপ্রিয় ইমামকে নির্যাতন করা হয়েছে, তাহলে তারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল মুক্তি পেলেন, কিন্তু মু'তাযিলা ও বিদ'আতী আলেমদের দাপটের কারণে নির্বিঘ্নে সত্যের দাওয়াত প্রচারের মত পরিবেশ ছিল না। তাই তিনি প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলা জুমু'আ ও জামা'আতে হাজির হতেন, মানুষকে হাদীছ ও সুন্নাতের দারস প্রদান করতেন এবং ফতোয়া দিতেন।

এরই মধ্যে মুতাসেম মৃত্যু বরণ করে এবং তার পুত্র ওয়াছেক খলীফা হয়। সেও তার পূর্ব পুরুষের ন্যায় মু'তাযিলা মতবাদ ও বিদ'আতের পৃষ্ঠপোষক ছিল। ২৩১ হিজরী সালে ওয়াছেকের মৃত্যু হলে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নিযুক্ত হন। মুতাওয়াক্কিল খলীফা হওয়ার সাথে সাথেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের দাওয়াতের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ মুতাওয়াক্কিল আহলে সুন্নাতের মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাই তিনি বিদ'আতীদের পথ সংকীর্ণ করে ইমাম আহমাদসহ সকল সুন্নী আলেমদের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) যে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি যেই যুলুম নির্যাতন সহ্য করে সত্যের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন, তাতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তিনি এমন একটি বিদ'আতের মোকাবেলায় সত্য বলেছেন, যেই বিদ'আতকে পরপর তিনজন খলীফা পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন, তাদের সাথে ছিলেন সমস্ত বিদ'আতী আলেম, রাজ্যের সকল মন্ত্রী, বিচারক এবং সশস্ত্র বাহিনী। অপর দিকে ইমাম আহমাদ ছিলেন একা। একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং জেল-যুলুম সহ্য করে সত্যকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি যখন যুলুম-নির্যাতন সহ্য করছিলেন, তখন লোকেরা তার কাছে এসে আবেদন করছিল যে, আমাদের যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমরা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আপনাকে মুক্ত করবো। কিন্তু ইমাম তাতে সম্মতি দেননি। বরং নিজে একাই যুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে লাগলেন এবং মুসলিমদেরকে সবর করার আদেশ দিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, বিদ্রোহ করে তাকে মুক্ত করতে গেলে অসংখ্য মানুষের রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশী। তাই তিনি সবর করলেন, দলীল-প্রমাণ পেশ করার পথকেই বেছে নিলেন এবং এ পথেই ভালো ফল হবে মনে করলেন। বাস্তবেও তাই হয়েছিল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের এই পরীক্ষা থেকে দীনের দাঈ ও আলেমদেরকেও শিক্ষা নিতে হবে। তারা যেন পরিস্থিতির প্রতিকূলতা, জেল-যুলুম এবং নির্যাতনের ভয়ে বিদআত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সামনে মুখ বন্ধ করে বসে না থাকেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বালের মত সৎসাহস ও পর্বত সদৃশ মনোবল এবং সাহস নিয়ে সুন্নাত ও সত্যের দাওয়াতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমুন্নত রাখতে হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই তাওফীক দাও। আমীন। **তথ্যসূত্রঃ** সিয়ারু আলামিন নুবলা এবং অন্যান্য গ্রন্থ।

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ হে নাবী! যা কিছু তোমার উপর অহী করা হয়েছে তা তুমি পাঠ করে শুনিয়ে দাও: আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর উপর অহী স্বরূপ যেই কিতাব নাযিল করেছেন, তা সর্বদা তিলাওয়াত করার আদেশ করেছেন। দ্রুত এবং অতি সংগোপনে জানিয়ে দেয়াকে অহী বলা হয়।[১০২] উসূলে তাফসীরের কিতাবগুলোতে অহীর বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

مِن كِتَابِ رَبِّكَ তোমার রবের কিতাবের মধ্য থেকে: এই বাক্যটি ঐ বিষয়ের বর্ণনা স্বরূপ, যা তার নিকট অহী করা হয়েছে।

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ তার কালেমা (কথা) পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই: অর্থাৎ তার কথার কোন পরিবর্তনকারী, বিকৃতকারী এবং অপসারণকারী নেই। মোট কথা এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলার জন্য কালেমা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ এই কুরআন বনী ইসরাইলের বেশির ভাগ স্বরূপ বর্ণনা করে: তাওরাত ও ইঞ্জিলের অধিকারীদেরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। তারা হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা।

أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ বেশির ভাগ যেগুলোতে তারা মতভেদ করে: তারা ঈসার ব্যাপারে মতভেদ করেছে। ইয়াহূদীরা ঈসা আলাইহিস সালাম কে অবৈধ সন্তান বলে অপবাদ দিয়েছে। আর খ্রিষ্টানরা তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। কুরআন তার বিষয়ে মধ্যম পন্থা নিয়ে এসেছে। সত্য কথা হলো তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল এবং আল্লাহর কালেমা, যা তিনি মারইয়াম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি আল্লাহর একটি রূহ। অর্থাৎ আল্লাহর ঐ সমস্ত রূহের অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

এই আয়াতে কারীমা থেকেও প্রমাণ মিলে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। কুরআনের মধ্যে পূর্বের সমস্ত কিতাবের খবর রয়েছে এবং আহলুস কিতাবদের ফির্কাসমূহের মধ্যে যেসব বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কুরআন ইনসাফের সাথে সেসব বিষয়ের ফায়ছালাকারী। আর এ সব বিষয় আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট হতে আসা অসম্ভব।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) যে আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আল্লাহর জন্য কালাম সাব্যস্ত করেছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল

---

১০২ . আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলদের মাধ্যমে সৃষ্টির জন্য যে দীন ও শরী'আত পাঠিয়েছেন, তাকে শরী'আতের পরিভাষায় অহী বলা হয়।

জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ যেহেতু প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলা বিশেষণে বিশেষিত, তাই তারা আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করে। কালাম (কথা বলা) আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি এর দ্বারা বিশেষিত এবং তার সাথে তা কায়েম রয়েছে। আরেক দিক থেকে কালাম ছিফাতে ফেলিয়া বা কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তা আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরত অনুযায়ী সংঘটিত হয়। তিনি যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা এবং যে বিষয়ে ইচ্ছা কথা বলেন। তার কালাম আগেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কারণ তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী এবং অবিনশ্বর। তিনি কামেল তথা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ। আল্লাহর কালাম তার ছিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজের সত্তাকে কালাম (কথা বলা) বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতে তা দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশেষিত করেছেন। এই বিষয়ে বিরোধীদের মাযহাব এবং তার জবাব অচিরেই আসবে ইনশা-আল্লাহ।

٢٢ – إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى

২২। কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে

وقوله: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} {لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ}

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ৯২ ও ১৫৫ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾

"আর এটি একটি বরকতপূর্ণ কিতাব, যা আমি নাযিল করেছি"। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের ২১ নং আয়াতে বলেন:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

"আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ﴾

"যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি, আর আল্লাহ ভালো করেই জানেন তিনি কি নাযিল করবেন- তখন এরা বলে, তুমি নিজেই এ কুরআনের রচনাকারী। আসলে এদের অধিকাংশই জানে না। এদেরকে বলো, একে তো রূহুল কুদুস সত্য সহকারে তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করেছে, যাতে

মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়। আর এটি মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ। আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়। অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইংগিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়। আর এটি হচ্ছে পরিষ্কার আরবী ভাষা"। *(সূরা আন নাহাল ১৬:১০১-১০৩)*

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) যখন আল্লাহ তা'আলার জন্য কালাম সাব্যস্ত করার দলীলগুলো উল্লেখ করলেন এবং এই কথা সাব্যস্ত করলেন যে, কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার কালাম, তখন ঐসব দলীল বর্ণনা শুরু করেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

وَهَٰذَا এটি: এখানে কুরআনুল কারীমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এখানে ইসমে ইশারা মুবতাদা। তার খবর হচ্ছে كتاب।

أنزلناه আমি অবতীর্ণ করেছি এবং مبارك (বরকত সম্পন্ন) এই দু'টি كتاب এর ছিফাত। এখানে অবতীর্ণ করা ছিফাতকে مبارك এর আগে উল্লেখ করার কারণ হলো কাফিররা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করতো। প্রচুর বরকত ওয়ালা বস্তুকে مبارك বলা হয়। কুরআনকে বরকত ওয়ালা বলার কারণ হলো তাতে রয়েছে দীন ও দুনিয়ার প্রচুর বরকত ও কল্যাণ।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ "আমি যদি এই কুরআনকে কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ছে এবং ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে:

এখানে কুরআনের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআন শুনে এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় অন্তর ভীত হওয়া আবশ্যক। কেননা কুরআন যদি পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো, তাহলে পাহাড় এত কঠিন ও মজবুত হওয়া সত্ত্বেও কুরআন বুঝার পর আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হতো এবং আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ফেটে যেত। সুতরাং হে মানব! এটি কিভাবে সম্ভব যে, কুরআন শুনে তোমাদের অন্তর নরম হয় না এবং তা ভীতও হয় না? অথচ তোমরা আল্লাহর আদেশ বুঝতে সক্ষম হয়েছ এবং তার কিতাব অনুধাবন করেছ।

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ যখন আমি একটি আয়াতকে অন্য একটি আয়াত দ্বারা বদল করি: এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে একটি কুফুরী শুবহার

(সন্দেহের) বর্ণনা শুরু করেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। বদল করার অর্থ হলো কোন জিনিসকে নিজ স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য জিনিস স্থাপন করা। আয়াতকে বদল করার তাৎপর্য হচ্ছে তা উঠিয়ে নিয়ে তার স্থলে অন্য একটি আয়াত রাখা। এর নাম হচ্ছে এক আয়াতের মাধ্যমে অন্য আয়াত মানসুখ বা রহিত করা।

قالوا এরা বলে: অর্থাৎ কুরাইশ গোত্রের কাফিররা মানসুখ করার হিকমাত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে বলে, হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই তুমি মিথ্যা রচনাকারী। আল্লাহর উপর জবান লম্বা করছো। তোমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তোমাকে একটি বিষয়ে আদেশ করেছেন। পুনরায় ধারণা করো যে, আল্লাহ তোমাকে প্রথম আদেশের বিপরীত অন্য এক আদেশ দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার এমন জবাব দিয়েছেন, যাতে তাদের অজ্ঞতার প্রমাণ মিলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ আসলে এদের অধিকাংশই জানে না: অর্থাৎ মূলতঃ তারা কোন জ্ঞানই রাখে না এবং নসখ বা রহিত হওয়ার হিকমাত সম্পর্কেও তারা অবগত নয়। কুরআনের এক আয়াতকে অন্য আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করার মধ্যে কী পরিমাণ উপকারিতা রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। কখনো একটি বিষয় শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করার মধ্যে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশেষ একটি স্বার্থ থাকে। অতঃপর সেই সময় পার হওয়ার পর তার বদলে অন্য একটি বিষয় শরী'আতভুক্ত করার মধ্যেই উপকার লক্ষ্য করা যায়। এই কাফিরদের বিবেক-বুদ্ধির উপর থেকে যদি পর্দা উঠে যেত, তাহলে তারা বুঝতে সক্ষম হতো যে, মানসুখ করাই সঠিক, ইনসাফপূর্ণ এবং সহজ-সরল।

অতঃপর তারা যে ধারণা করেছিল, এই পরিবর্তন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজের পক্ষ হতে এবং এর মাধ্যমে সে মিথ্যা রচনা করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ধারণার প্রতিবাদ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! তুমি বলো যে, এই কুরআন নাযিল করেছেন রূহুল কুদুস তথা জিবরীল এর মাধ্যমে। কুদুস অর্থ পবিত্র। আসল অর্থ হচ্ছে الروح المطهر (পবিত্র আত্মা) এটি নাযিল করেছে। روح القدس এখানে মাওসুফকে (রূহকে) ছিফাতের (কুদুসের) দিকে ইযাফত সম্বোধন করা হয়েছে।

مِن رَّبِّكَ তোমার রবের পক্ষ হতে অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে। **بِالْحَقِّ সত্য সহকারে:** এটি হাল হিসাবে নসবের স্থানে পতিত হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে متصفا بكونه حقا সত্য অবস্থায় এই কুরআন নাযিল হয়েছে।

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا যাতে মুমিনদের সুদৃঢ় করা যায়: অর্থাৎ যাতে মুমিনদেরকে ঈমানের উপর মজবুত রাখা যায় সে জন্য তোমার উপর জিবরীলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। নাসিখ (রহিতকারী), মানসুখ (রহিতকৃত)ও আল্লাহর পক্ষ হতেই এসেছে। যাতে মুমিনগণ বলতে পারে যে, নাসিখ এবং মানসুখের প্রত্যেকটিই আমাদের রব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে। বিশেষ করে যখন তারা জানতে পারবে যে, রহিত করার মধ্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে, তখন তারা ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকবে।

وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ আর এটি মুসলিমদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ স্বরূপ: এখানে هدى এবং بشرى শব্দ দু'টি ليثبت এর অবস্থানের উপর আতফ (স্থাপন) করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম হতে পারে: تثبيتا لهم وهداية وبشرى। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সন্দেহগুলো থেকে আরেকটি সন্দেহ বর্ণনা করেছেন এবং জবাব দিয়েছেন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ আমি জানি এরা তোমার সম্পর্কে বলে, এ ব্যক্তিকে একজন লোক শিক্ষা দেয়: অর্থাৎ আমি অবশ্যই জানি যে, এই কাফিররা বলে, একজন মানুষ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন শিক্ষা দেয়। আসমানের কোন ফেরেশতা তার নিকট কুরআন নিয়ে আসে না। যেই মানুষটি তাকে কুরআন শিক্ষা দেয়, সে এর আগে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অনারবদের কিতাবাদি পাঠ করেছে। কারণ মুহাম্মাদ একজন অশিক্ষিত মানুষ। কুরআনে অতীতের যেসব খবর উল্লেখ করা হচ্ছে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা তা রচনা করা সম্ভব নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার জবাব এইভাবে দিয়েছেন যে,

لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ অথচ এরা যে ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে তার ভাষা তো আরবী নয়: অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যেই ব্যক্তি তোমাকে কুরআন শিক্ষা দেয় বলে তারা ধারণা করছে, তার ভাষা আরবী নয়। সে আরবী বলতে পারে না। আর এই কুরআন তো পরিষ্কার আরবী ভাষায়। অর্থাৎ এই কুরআন অলঙ্কারপূর্ণ আরবী ভাষায় এবং এর বর্ণনা সুস্পষ্ট। সুতরাং তোমরা কিভাবে ধারণা করছ যে, একজন অনারব লোক মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছে? অথচ তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছ, অক্ষম হয়েছ কুরআনের মতো কয়েকটি বা একটি সূরা আনয়ন করতে। তোমরা আরবী ভাষার লোক, সুস্পষ্ট আরবী বলায় পারদর্শী এবং অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্য

প্রদানকারীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হওয়ার পরও তোমরা কুরআনের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয়েছ।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর শিক্ষা: উপরোক্ত আয়াতে কারীমাগুলো থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন আল্লাহরই কালাম। ফেরেশতা বা কোন মানুষের কালাম নয়। যারা বলে কুরআন আল্লাহর কালাম নয়; সৃষ্টির কালাম, এখানে তাদের কথারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই আয়াতে আল্লাহর জন্য মাখলুকের উপর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা নাযিল কেবল উপর থেকেই হয়।

٢٣ – إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

২৩। ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের রবকে স্বচক্ষে দেখবে

وقوله: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} {عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ} {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} {لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} وهذا الباب في كتاب الله كثير. ومن تدبر القرآن طلبًا للهدى تبين له طريق الحق.

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۞إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

"সে দিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে" *(সূরা আল ক্বিয়ামাহ ৭৫: ২২-২৩)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুতাফফিফীনের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ﴾

"উঁচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

"যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী"। আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বাফ এর ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَاوَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

সেখানে তারা যা চাইবে তাই তাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে, তার জন্য সত্যের পথ পরিষ্কার হবে।

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের চেহারা উজ্জ্বল হবে। النضارة শব্দটি ناضرة থেকে যোয়াদ বর্ণ দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হচ্ছে উজ্জ্বল ও সুন্দর হওয়া অর্থাৎ আলোকোজ্জল, তরতাজা, সুন্দর এবং জ্যোতির্ময় হওয়া। সেদিন তারা তাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা তাদের চোখ দ্বারাই তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে ছাহাবী, তাবেঈ এবং উম্মতের সালাফগণের ইজমা হয়েছে এবং ইসলামের ইমামগণ তাতে একমত হয়েছেন।

আয়াতে কারীমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হলো যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবেন।

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ উঁচু আসনে বসে তারা দেখতে থাকবেন: الأرائك শব্দটি أريكة এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে সিংহাসন বা খাঁট। মুমিনগণ সিংহাসনে বসে তাদের রব আল্লাহ তা'আলার দিকে তাকিয়ে দেখবে। আর কাফিরদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে যেমন এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, তারা عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হবে। এ আয়াত থেকেও ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য তাদের মহান রবকে দেখার বিষয়টি প্রমাণিত হলো।

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ "যারা উত্তম আমল করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো বেশী: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব আমল ওয়াজিব করেছেন, তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং যেসব পাপাচার থেকে তাদেরকে নিষেধ করেছেন, যারা তা বর্জন করার মাধ্যমে কল্যাণের পথ অবলম্বন করবে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ তথা উত্তম বিনিময়। এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, তা হচ্ছে জান্নাত। وزيادة (আরো বেশী) এর তাফসীরে ছ্বহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য কিতাবে ছ্বহীহ সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে যিয়াদাহ বা বেশী বলতে আল্লাহর মহান চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। এ উম্মতের সালাফে সালেহীনগণও এই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই উপরের আলোচনা হতে প্রমাণ মিলছে যে, মুমিনদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখার সুযোগ রয়েছে।

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا সেখানে তারা যা চাইবে তাদের জন্য তাই থাকবে: জান্নাতে মুমিনদের মন যা চাইবে, তাদের জন্য তাই রয়েছে সেখানে। তাদের চোখ বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত এবং অপরিমীত কল্যাণ পেয়ে শীতল হবে।

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবেঃ অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার নিয়ামত ও কল্যাণের অতিরিক্ত যা থাকবে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা।

আয়াতে কারীমার এই অংশ থেকেই প্রমাণ নেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার সম্মানিত চেহারার দিকে মুমিনদের তাকানো প্রমাণিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে যা শিক্ষণীয়ঃ

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে ক্বিয়ামতের দিন মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার প্রমাণিত হলো। আর এটিই হবে মুমিনদের জন্য জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে এটিই হচ্ছে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুসলিমদের সম্মানিত ইমামগণের কথা। শিয়াদের রাফেযী সম্প্রদায়, জাহমীয়া এবং মু'তাযিলারা এই মাসআলায় খেলাফ করেছে। তারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের বিরোধীতা করেছে। উপরোক্ত বাতিল ফির্কার লোকেরা আল্লাহর দিদার অস্বীকার করার পক্ষে কতিপয় দুর্বল সন্দেহ এবং ভ্রান্ত দলীল পেশ করেছে। তার মধ্যে

(১) আল্লাহকে দেখা যাবে এই কথা সাব্যস্ত করলে আবশ্যক হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কোন একটি দিকে রয়েছেন। আর তিনি যদি কোন দিকে থাকেন, তাহলে তার জন্য জিসিম (দেহ, আকার-আকৃতি, শরীর ইত্যাদি) সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা দেহ ও শরীর থেকে পবিত্র।

এ সন্দেহের জবাব এই যে, দিক শব্দটির মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্যে ঢুকে আছেন, তাহলে এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অসংখ্য দলীল এ কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। আল্লাহকে দেখা যাবে বা তাকে দেখা সম্ভব এটা সাব্যস্ত করলে, আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত হয়ে যায় না। আর যদি দিক দ্বারা উপরের দিক উদ্দেশ্য হয় তথা এটি উদ্দেশ্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে, তাহলে আল্লাহ তা'আলার জন্য উপরের দিক সুসাব্যস্ত। এটি অস্বীকার করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অর্জিত হওয়ার সাথে তিনি উপরের দিকে হওয়া সাংঘর্ষিক নয়।

(২) মু'তাযিলা এবং আল্লাহর দিদারে অবিশ্বাসী অন্যান্য সম্প্রদায় দলীল হিসাবে আল্লাহর বাণীঃ لَن تَرَانِي "তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না"- এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। তাদের দলীল গ্রহণের জবাবে বলা হয়েছে যে, আয়াতে দুনিয়াতে আল্লাহর দিদার নাকোচ করা হয়েছে। আখিরাতের দিদার নাকোচ করা হয়নি। যেমন অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে আখিরাতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে।

আখিরাতে মানুষের অবস্থা দুনিয়ার অবস্থার চেয়ে ভিন্ন হবে।[১০৩]

(৩) তারা আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

"দৃষ্টিশক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা আল আন'আম ৬:১০৩)*

এর জবাবে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে ইদরাক তথা আল্লাহকে আয়ত্ত করার নাফী এসেছে। আল্লাহর দিদার নফী করা হয়নি। إدراك অর্থ হচ্ছে আয়ত্ত ও বেষ্টন করা।

মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে; কিন্তু তাকে আয়ত্ত করতে পারবে না।[১০৪] বরং মানুষের দৃষ্টিসমূহ আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারবে না, এই কথা থেকেও আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এই আয়াতটি আল্লাহর দর্শন সাব্যস্ত করার অন্যতম দলীল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জানেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কিতাবে এ বিষয়ে আরো অনেক আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনে আল্লাহর জন্য নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার বিষয়ে অনেক আলোচনা এসেছে। গ্রন্থকার এখানে তা থেকে সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন। কুরআনের অনেক আয়াতে আল্লাহর নাম এবং তার ছিফাতের বর্ণনা এসেছে। এগুলো আল্লাহর জন্য ঠিক সেভাবেই সাব্যস্ত করতে হবে, যেভাবে সাব্যস্ত করলে আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় হয়।

যে ব্যক্তি কুরআন নিয়ে গবেষণা করবে অর্থাৎ তাতে চিন্তা-গবেষণা করবে এবং কুরআন যেই হিদায়াতের প্রমাণ বহন করে, তার উপর দৃষ্টি দিবে, তার জন্য সত্যের পথ উন্মুক্ত হবে। সত্যের রাস্তা তার জন্য পরিষ্কার হবে। কুরআন নিয়ে গবেষণা করাই হচ্ছে তা পাঠ করার মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১০৩. দুনিয়াতে মানুষের চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহকে দেখার ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে দুনিয়ায় তৈরী করা হয়নি। পাহাড়ের গঠন মানুষ গঠনের চেয়ে অধিক মজবুত ও শক্ত হওয়ার পরও যেহেতু পাহাড় আল্লাহর নূরের সামনে টিকে থাকতে পারেনি এবং আল্লাহ তা'আলা যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, তাই বুঝা গেল যে মানুষ চর্ম চক্ষু দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখতে সক্ষম নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

১০৪. আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টিকে দেখেন এবং সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই বেষ্টন করে আছেন। কিন্তু মানুষের পক্ষে তো আল্লাহকে পুরাপুরি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহর শান এর অনেক উর্ধ্বে। সুতরাং বেষ্টন করাকে অস্বীকার করার দ্বারা দেখার নফী হয় না। বেষ্টন ছাড়াও আল্লাহকে দেখা সম্ভব। দেখার জন্য বেষ্টন অপরিহার্য নয়।

﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

"এটি একটি অত্যন্ত বরকতপূর্ণ[১০৫] কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে এরা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলরা তা থেকে শিক্ষা নেয়"। *(সূরা ছ্বদ ৩৮:২৯)* আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদের ২৪ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের হৃদয়ের উপর তালা লাগানো আছে?" আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমিনুনের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ﴾

"তারা কি কখনো এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা করেনি? নাকি সে এমন কথা নিয়ে এসেছে যা কখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছে আসেনি?

১০৫. বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি। কুরআন মাজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের কেবল লাভই হয়; কোন প্রকার ক্ষতির আশংকা নেই।

فصل: مكانة السنة

অধ্যায়: সুন্নাতের মর্যাদা

الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة

আল্লাহ তা'আলার জন্য সুন্দর নামসমূহ এবং সুউচ্চ গুণাবলীর উপর সুন্নাতের দলীল গ্রহণের পদ্ধতি

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ثُمَّ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ وَتُبَيِّنُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ

অতঃপর এই ছিফাতগুলোর মধ্যে তাও অন্তর্ভুক্ত, যার বিবরণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাতে রয়েছে। কেননা সুন্নাত কুরআনকে ব্যাখ্যা করে, কুরআনে যা সংক্ষিপ্তাকারে এসেছে সুন্নাত তাকে বর্ণনা করে, কুরআন যেদিকে আহবান করে সুন্নাতও সেদিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে।

ব্যাখ্যা: শাইখের এই উক্তিটিকে পূর্বের বাক্যের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। পূর্বের বাক্যটি হচ্ছে,

وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ..... الخ

অর্থাৎ নাকোচ করা ও সাব্যস্তকরণ/ইছবাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার মধ্যে সূরা ইখলাসে বর্ণিত তার সুউচ্চ গুণাবলী অন্যতম।

তেমনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুকে যে সব গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং যেসব ছিফাত ছ্বহীহ সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে, হাঁ ও না বোধক বক্তব্যের মাধ্যমে ঐসব গুণাবলীও আল্লাহ তা'আলার জন্য সুসাব্যস্ত।

কেননা সুন্নাত হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি এবং আল্লাহর কিতাবের পর যেই মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করা দরকার, তা হচ্ছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

"তোমরা যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাক, তাহলে বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহ এবং রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*।

আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব কুরআনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়াফাতের পর তার দিকে ফিরিয়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তার সুন্নাতের দিকে ফিরিয়ে দেয়া।

السنة সুন্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ الطريقة রাস্তা, পথ।[১০৬] আর ইসলামের পরিভাষায়: هي ما ورد عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من قول أو فعل أو تقرير রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে কথা, কাজ এবং সমর্থন বর্ণিত হয়েছে তাকে সুন্নাত বলা হয়।

সুন্নাতের মর্যাদা [مكانة السنة]

فالسنة تفسر القرآن সুন্নাত কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে: কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর প্রতি যা নাযিল করেছেন, তিনি তা মানুষের জন্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

"আমি এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে লোকদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করতে পারো এবং যাতে করে তারা চিন্তা-ভাবনা করে" *(সূরা আন নাহাল ১৬:৪৪)*।

---

১০৬. চাই সে রাস্তা সঠিক হোক কিংবা বাতিল হোক। চাই সেই রাস্তা حسي (বাহ্যিক) হোক যেমন মানুষের চলার রাস্তা ও পথ অথবা معنوى (নৈতিক) হোক। যেমন- হিদায়াত, আলো ও সত্যের পথ কিংবা গোমরাহীর পথ হোক।

এমনি সুন্নাত تبين القرآن অর্থাৎ কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করে। যেমন ছ্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এবং অধিকাংশ হুকুম-আহকাম কুরআনে সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। আর সুন্নাতে নববী তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে। সেই সাথে আরো জানার বিষয় যে, تدل على القرآن وتعبر عنـــه অর্থাৎ কুরআন যেই দিকে আহবান করে, সুন্নাতও সেই দিকেই আহবান করে এবং কুরআন যা বর্ণনা করে, সুন্নাতও তাই বর্ণনা করে। তাই সুন্নাত সকল ক্ষেত্রেই কুরআনের সমর্থক।[১০৭]

---

১০৭. সুতরাং অনুসরণের দিক থেকে হাদীছের মান কুরআনের মতোই। হাদীছ ব্যতীত কোন মুসলিমের পক্ষে ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই মহান আল্লাহ্ কুরআনের অনেক স্থানেই রসূলের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তার রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।" *(সূরা আন নিসা: ৫৯)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"বলঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ্ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।" (সূরা আলে-ইমরান: ৩১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"অতএব, যারা তার নাবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিত্না (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রমণ করবে।" (সূরা নূর: ৬৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"। (সূরা হাশর: ৭) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করে, পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনীতে সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে"। (সূরা আহযাব: ২১) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করে নেবে"। (সূরা আন নিসা: ৬৫) আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতে বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"যখন আল্লাহ্ ও তার রসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের অধিকার নেই। যে আল্লাহ্ ও তার রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়"। এমনিভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অসংখ্য হাদীছে উম্মতকে তার সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

«فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী"। (আবু দাউদ, তিরমিজী, হাদীছটি ছ্বহীহ) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ "যে ব্যক্তি আমাদের দীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারী ও মুসলিম) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ "আমাকে কুরআন ও তার অনুরূপ বস্তু দান করা হয়েছে। (আবু দাউদ, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه "আমি তোমাদের মাঝে এমন বিষয় রেখে যাচ্ছি যত দিন তোমরা তা দৃঢ়তার সাথে আকঁড়ে ধরবে ততদিন তোমরা গোমরাহ হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আর অপরটি হচ্ছে তার নাবীর সুন্নাত। অত্র হাদীছের ভাষা থেকে বুঝা যাচ্ছে হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরআন মানলে কিংবা কুরআন ছেড়ে দিয়ে শুধু হাদীছ মানা হলে সীরাতে মুস্তাকিম থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট হতে হবে। সুতরাং হাদীছ যেহেতু দীনের দু'টি মূলনীতির মধ্যে একটি মূলনীতি, তাই ছাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগসমূহে আলেমগণ হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলনে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

হাদীছ ছাড়া ইসলামের প্রথম মূলনীতি কুরআন বুঝার কোন সুযোগ নেই। যুগে যুগে যারাই হাদীছ ছাড়া কুরআন বুঝতে চেষ্টা করেছে তারাই গোমরাহ হয়েছে। কুরআন থেকে হাদীছকে আলাদা করার কারণেই সকল বাতিল ফির্কার উৎপত্তি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই ইসলামের শত্রুরা আজ পর্যন্ত কুরআনের মধ্যে কোন প্রকার

সুতরাং আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত দ্বারা যা সাব্যস্ত তার হুকুম একই। আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম। কুরআন দ্বারা যেমন আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত হয়েছে, তেমনি সুন্নাত দ্বারাও তা সাব্যস্ত হয়েছে।

বিকৃতি সাধন করতে পারেনি। আর সুন্নাতের হিফাযতের দায়িত্ব সরাসরি না নেয়ার কারণে এবং তা সংরক্ষণের দায়িত্ব এই উম্মতের উপর ছেড়ে দেয়ার কারণে ইসলাম বিদ্বেষীরা সুন্নাতের মধ্যে ভেজাল ঢুকিয়ে দিয়ে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে হাজার হাজার জাল হাদীছ রচনা করে তাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে উম্মতের বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের এই ষড়যন্ত্রকে বুঝতে পেরে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর হাদীছগুলো বিলুপ্ত হওয়া এবং জাল ও যঈফের সাথে মিশে যাওয়া থেকে উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলে মুসলিম জাতি আজ হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ আকারে হাতে পেয়েছে।

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে যেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা গ্রহণ করা এবং তার উপর আমল করা আবশ্যক। চাই তা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হোক বা খবরে ওয়াহিদ হোক তথা একক সূত্রে বর্ণিত হোক। চাই তা আক্বীদাহর ক্ষেত্রে হোক কিংবা আহকামে আমালীয়ার ক্ষেত্রে হোক।

وجوب الإيمان بما وصف الرسول ربه من الأحاديث الصحاح

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে যে সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব-আবশ্যক

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيمَانُ بِهَا كَذَلِك

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছসমূহে তার প্রভুকে যেই সুউচ্চ গুণাবলীতে বিশেষিত করেছেন এবং হাদীছ সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ যেসব হাদীছ কবুল করে নিয়েছেন, সেই হাদীছগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার যেসব অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে তা বিশ্বাস করা আবশ্যক।

ব্যাখ্যাঃ وما وصف به থেকে শুরু করে بالقبول পর্যন্ত সবগুলো শব্দ মিলে মুবতাদা হয়েছে। আর وجب الإيمان بها كذالك হচ্ছে তার খবর। অর্থাৎ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা যেমন জরুরী, তেমনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾

"এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কোন কথা বলেন না। তা অহী ছাড়া অন্য কিছু নয়, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় *(সূরা আন নাজম ৫৩:৩-৪)*

সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতও আল্লাহর পক্ষ হতে অহী স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

"আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও হিকমাত নাযিল করেছেন, এমনসব বিষয় তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ অনেক বেশী" *(সূরা আন নিসা ৪:১১৩)।*

এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনুল কারীম। আর হিকমাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নাত। সুতরাং সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করা আবশ্যক। বিশেষ করে আক্বীদাহ সম্পর্কিত বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো"। *(সূরা আল হাশর ৫৯:৭)*

সুতরাং হাদীছ গ্রহণ করার শর্ত হচ্ছে, তা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া। এ জন্যই ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: **الصحاح من الأحاديث هادীছ ছ্বহীহ হতে হবে।** الصحاح শব্দটি صحيح এর বহুবচন।

পরিভাষায় **الحديث الصحيح** ছ্বহীহ ঐ হাদীছকে বলা হয়: **هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة** যা বর্ণনা করেছেন পূর্ণ স্মরণ শক্তি সম্পন্ন ন্যায়পরায়ণ বর্ণনাকারী তার অনুরূপ আরেকজন বর্ণনাকারী থেকে। আর যা **شاذ** (বিরল) ও **معلول** (ত্রুটিযুক্ত) নয়।

কাজেই হাদীছ ছ্বহীহ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে: (১) বর্ণনাকারীদের আদালত তথা ন্যায় পরায়ণতা (عدالة الرواه), (২) তাদেরে স্মরণ শক্তি (ضبطهم), (৩) হাদীছের সনদ মুত্তাসিল হওয়া (اتصال السند), (৪) হাদীছের সনদ সকল ইল্লত

তথা দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া (سلامته من العلة) এবং (৫) হাদীছটি শায (অন্যান্য ছ্বহীহ হাদীছের বিপরীত) না হওয়া (سلامته من الشذوذ)।[১০৮]

تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ হাদীছ সম্পর্কে পারদর্শী আলিমগণ যেসব হাদীছ কবুল করে নিয়েছেন অর্থাৎ যে হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ গ্রহণ করেছেন এবং যার উপর আমল করেছেন, তাকে ছ্বহীহ হাদীছ বলে। **মুহাদ্দিছগণ ব্যতীত অন্যদের কথা হাদীছের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।**

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ সুন্নাতে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার অনেক ছিফাতের (বিশেষণের) উদাহরণ পেশ করেছেন।

১০৮. কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর এমন বর্ণনাকে শায বলা হয়, যা তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য অথবা অধিক সংখ্যক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার বিপরীত। এ ক্ষেত্রে অধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার উপর আমল করা হবে।

١ –ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله

১। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতে দুনিয়ার আসমানে তার নেমে আসা সুসাব্যস্ত করণ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

من ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم يَنزِل رَبُّنا تَبارَكَ وَتَعالَى كُلَّ لَيْلَة إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه متفق عليه

"হাদীছে আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রসূল এর বাণী: আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, কোন দু'আকারী আছে কি? আমি তার দু'আ কবুল করবো। কোন সাহায্য প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে দান করবো। কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করবো"।[১০৯]

ব্যাখ্যা: ينزل ربنا আমাদের রব নেমে আসেন: যেভাবে নেমে আসা আল্লাহর বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভা পায়, তিনি সেভাবেই নেমে আসেন। আমরা তাতে বিশ্বাস করি। আল্লাহর নেমে আসাকে সৃষ্টির নেমে আসার সাথে তুলনা করি না। সূরা আশ শূরার ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "তার সদৃশ কোন কিছুই নেই।"।

إلى سماء الدنيا দুনিয়ার আসমানে: এখানে মাউসুফকে ছিফাতের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূল বাক্যটি এ রকম ছিল, السماء الدنيا অর্থাৎ দুনিয়ার নিকটতম আসমান।

حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার

---

১০৯. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ বুখারী হা/১১৪৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৫৮, ইবনে মাজাহ হা/১৩৬৬, আবূ দাউদ হা/১৩১৫, তিরমিযী হা/৩৪৯৮।

আকাশে নেমে আসেন: ثلث শব্দের বিশেষণ হিসাবে الآخرُ শব্দের শেষ বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, নুযুলে ইলাহী তথা দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার সময় নির্ধারিত রয়েছে।

فَأَسْتَجِيبَ لَـهُ আমি তার দু'আ কবুল করবো: প্রশ্নবোধক বাক্যের জবাব হিসাবে **فأستجيب** ফেলে মুজারেটি মানসুব (যাবর) হয়েছে। এমনি **فأعطيه** এবং **فأغفرله** ফেল দু'টিও একই কারণে মানসুব হয়েছে। **فاستجيب له** অর্থ হচ্ছে, আমি তার দু'আ কবুল করবো বা তার ডাকে সাড়া দেবো।

হাদীছ থেকে আল্লাহ তা'আলার নেমে আসার দলীল পাওয়া যায়। নামা বা অবতরণ করা আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের অন্যতম। একই সাথে হাদীছ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকা সাব্যস্ত হলো। কেননা নেমে আসা উপর থেকেই হয়। হাদীছে ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহর নেমে আসাকে তার রহমত বা আদেশ আগমন করার দ্বারা ব্যাখ্যা করে। এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ আসল হচ্ছে শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা এবং প্রকৃত অর্থ বাদ না দেয়া।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: **من يدعوني فأستجيب لـه** কে আমার কাছে দু'আ করবে, আমি তার দু'আ কবুল করি। এখান থেকে কি এই কথা বুঝা যায়, আল্লাহর রহমত বা তার আদেশ এইভাবে শেষ রাতে ডাকাডাকি করে এবং কথা বলে? এই হাদীছ থেকে আল্লাহর কালামও সাব্যস্ত হয়। কেননা এতে রয়েছে فيقـول الخ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেন। এখানে দান করা, দু'আ কবুল করা এবং ক্ষমা করা ছিফাতও আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে ফেলীয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেই হাদীছ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন, তাকে মুত্তাফাকুন আলাইহি বলে।

٢ –إثبات أن الله يفرح ويضحك

২। এ কথা সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা খুশি হন ও হাসেন।

وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (لله أشد فرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته) الحديث. متفق عليه. وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة) متفق عليه.

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ بِرَاحِلَتِهِ

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল।[১১০] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

"আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন, যাদের একজন অন্যজনকে হত্যা করে। অতঃপর তারা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে।[১১১]

ব্যাখ্যা: لله শব্দের মধ্যে প্রথমে যে লাম অক্ষরটি প্রবেশ করেছে, তাকে লামে ইবতেদা বলা হয়। আর أشد فرحا এর মধ্যে فرحا শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব (যাবর) হয়েছে।

الفرح শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আনন্দিত ও খুশি হওয়া এবং অন্তরের মধ্যে ফুর্তি অনুভব হওয়া। পাপাচার ছেড়ে দিয়ে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসাকে তাওবা বলা হয়।

بتوبة عبده বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে।

---

১১০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

১১১. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮২৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৯০, ইবনে মাজাহ হা/১৯১, সুনানে নাসাঈ হা/৩১৬৬।

التوبة তাওবা: পাপ বর্জন করে আনুগত্যের দিকে ফিরে আসা।

براحلته তার বাহনে: الراحلة বলা হয় ঐ উটনীকে, যা বোঝা বহন করার বয়সে উপনীত হয়েছে।

الحديث : ফেলে মুকাদ্দারের কারণে الحديث শব্দটি মানসুব (যাবর) হয়েছে। উহ্য বাক্যটি হচ্ছে أكمل الحديث হাদীছটি পূর্ণরূপে পড়ুন। পূর্ণ হাদিস:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَوْبَةِ عَبْده حينَ يَتُوبُ إِلَيْه، منْ أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحلَته بأَرْضٍ فَلَاة، فَانْفَلَتَتْ منْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيسَ منْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ في ظلِّهَا، قَدْ أَيسَ منْ رَاحلَته، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلكَ إِذَا هُوَ بهَا، قَائمَةً عنْدَهُ، فَأَخَذَ بخطَامهَا، ثُمَّ قَالَ منْ شدَّة الْفَرَح: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدي وَأَنَا ربُّكَ، أَخْطَأَ منْ شدَّة الْفَرَح

“বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে থামলো। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে ফেলেছে।[১১২]

এ হাদীছ থেকে আল্লাহর আনন্দিত হওয়া ও খুশি হওয়া প্রমাণিত হলো। তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে খুশি হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই খুশি হন। এটিও আল্লাহর ছিফাতে কামালিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর খুশি হওয়া কোন মাখলুকের খুশি হওয়ার মতো নয়। এটি তার অন্যান্য ছিফাতের মতোই। আল্লাহর খুশি হওয়া তার অনুগ্রহ ও দয়ার খুশি।

আল্লাহ তা'আলা বান্দার তাওবার কারণে এমন খুশি হন না যে, তাওবার প্রতি তার প্রয়োজন ছিল এবং বান্দার তাওবার মাধ্যমে তিনি উপকৃত হবেন। কেননা আনুগত্যকারীর আনুগত্য আল্লাহর কোন উপকার করে না এবং পাপাচারীর পাপাচারও আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না।

---

১১২. ছহীহ মুসলিম হা/২৭৪৭, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: يضحك الله إلى رجلين... إلخ **"আল্লাহ তা'আলা এমন দু'জন লোকের প্রতি হাসেন।** হাদীছের শেষাংশে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ উল্লেখ করেছেন।

يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل فَيُستشهد ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فَيُسْتَشْهَدُ

"মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে অন্য কাফিরের হাতে শহীদ হয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। ফলে সে তাওবা করে এবং ইসলাম কবুল করে নেয়। পরবর্তীতে সেও আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হয়।[১১৩]

এতে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ এবং সীমাহীন রহমতের প্রমাণ মিলে। কেননা মুসলিমগণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। কখনো এমন হয় যে, কাফিরদের কেউ তাদের কাউকে হত্যা করে ফেলে। এতে আল্লাহ তা'আলা নিহত মুসলিমকে শাহাদাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সেই হত্যাকারী কাফিরের উপরও অনুগ্রহ করেন এবং তাকে ইসলামের পথ দেখান। ফলে সেও জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়। পরিণামে সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করে। এটি আসলেই আশ্চর্যের বিষয়। হাসি সাধারণত ঐসব বিস্ময়কর বিষয় থেকেই হয়ে থাকে, যা সাধারণত খুব কমই সংঘটিত হয়।

উপরের হাদীছের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য হাসা বিশেষণ সাব্যস্ত। হাসি তার ছিফাতে ফেলিয়ার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে হাসা শোভনীয়, আমরা তার জন্য সেভাবেই হাসি সাব্যস্ত করি। তার হাসি মানুষের হাসার মতো নয়।[১১৪]

---

১১৩ . ছ্বহীহ বুখারী ২৮২৬, ছ্বহীহ মুসলিম ১৮৯০, ইবনে মাজাহ ১৯১, নাসাঈ ৩১৬৬।

১১৪ . আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তা'আলা তাওবাকারীর প্রতি খুশি হন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে নিহত ব্যক্তি এবং হত্যাকারীর ক্রিয়া-কর্ম দেখে হাসেন। তবে আমাদেরকে এ কথা স্বরণ রাখতে হবে যে, খুশি হওয়া এবং হাসা আল্লাহর গুণাবলীর অন্যতম একটি গুণ। আমরা এতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন ব্যতীতই বিশ্বাস করি। আল্লাহর শানে যেমন হাসা শোভনীয়, তিনি সেভাবেই হাসেন। তার হাসা কোন মাখলুকের হাসার মতো নয়।

٣ –إثبات أن الله يعجب ويضحك

৩। আল্লাহ তা'আলা আশ্চর্যান্বিত হন এবং হাসেন।

وقوله: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ آزِلِينَ قَنِطِينَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ» حديث حسن

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমাদের রব তার বান্দাদের নিরাশ হওয়াতে এবং তিনি যে তাদের অবস্থা অচিরেই পরিবর্তন করে দিবেন তাতে আশ্চর্যবোধ করেন। তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন। এ অবস্থায় তিনি হাসতে থাকেন। তিনি জানেন যে, তোমাদের বিপদ মুক্তি, আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির সময় অতি নিকটে। এ হাদীছটি হাসান।[১১৫]

ব্যাখ্যা: عَجِبَ رَبُّنَا আমাদের রব আশ্চর্যবোধ করেন: অভিধানগ্রন্থ 'আলমিসবাহ' নামক কিতাবে রয়েছে, তাজ্জব দু'প্রকার বিষয় ও বস্তু থেকে হতে পারে।

(১) এমন বিষয় ও বস্তু থেকে আশ্চর্যবোধ হয়, যাতে আশ্চর্যবোধকারী ঐ বস্তু বা বিষয়ের প্রশংসা করে। এই প্রকার আশ্চর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্যবোধকারী বিষয়টিকে সুন্দর ও ভালো মনে করে এবং তার প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা জানায়।

(২) এমন বিষয় হতে আশ্চর্যবোধ করা হয়, যাকে আশ্চর্যবোধকারী অপছন্দ করে। এই প্রকার আশ্চর্যবোধের মধ্যে আশ্চর্যবোধকারী কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করে এবং তার নিন্দা করে।

مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ তার বান্দাদের নিরাশ হওয়া থেকে: কোন জিনিস হতে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়াকে قنوط বলা হয়। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া এবং অনাবৃষ্টির অপকারিতা বিদূরিত হওয়া থেকে নিরাশ হওয়া।

---

১১৫. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৪/১১-১২, ইবনে মাজাহ ১/৬৪, ইবনে আছিম (সুন্নাহ) ৫৪৪

وَقُرْبِ غِيَرِهِ অচিরেই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া: غيره শব্দের গাইন বর্ণে যের দিয়ে এবং ইয়া বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ কঠিন অবস্থাকে ভালো অবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তন করা।

يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ آزِلِينَ তোমরা অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, সংকীর্ণতা এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেখেন। آزلين শব্দটি গঠন করা হয়েছে। الأزل এর যা বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়তে হবে। এর অর্থ হচ্ছে সংকীর্ণতা ও নিরাশায় নিপতিত হওয়া। বলা হয়ে থাকে أزل يأزل أزلا অর্থাৎ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটনে নিপতিত হয়েছে।

فَيَظَلُّ يَضْحَكُ তিনি হাসতে থাকেন: এটি আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত ছিফাতে ফেলিয়াসমূহের (কর্মগত বিশেষণসমূহের) মধ্যে গণ্য, যা মাখলুকের কোন ছিফাতের মতো নয়। সুতরাং এই হাদীছে আল্লাহ তা'আলার কর্ম সম্পর্কিত ছিফাতসমূহ থেকে দু'টি ছিফাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। ছিফাত দু'টি হচ্ছে আশ্চর্যান্বিত হওয়া এবং হাসা। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই এই দু'টি ছিফাত তার জন্য সাব্যস্ত করতে হবে। আল্লাহর আশ্চর্যান্বিত হওয়া এবং হাসা মাখলুকের আশ্চর্যবোধ করা ও হাসার মতো নয়। হাদীছে আল্লাহ তা'আলার জন্য নযর তথা দৃষ্টিও সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটিও আল্লাহর কর্মগত ছিফাতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি দেন। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন নয়।

٤ –إثبات الرجل والقدم لله سبحانه

৪। আল্লাহ তা'আলার 'পা' সাব্যস্ত করণ

وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يلقى فيها وهي تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيد، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رجله ــ وفي رواية: عليها قَدَمَه ــ فيزوي بعضها إلى بعض فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ) متفق عليه

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি? তখন মহান রাব্বুল আলামীন জাহান্নামে নিজের 'পা' রাখবেন।[১১৬] অন্য বর্ণনায় رجله -এর স্থলে قدمه এসেছে। এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে এবং বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে' 'যথেষ্ট হয়েছে'।[১১৭]

ব্যাখ্যা: পরকালে আল্লাহ তা'আলা কাফির ও গুনাহগারদেরকে যে আগুনের শাস্তি দিবেন, সেই শাস্তির অন্যতম নাম হচ্ছে জাহান্নাম। কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের গভীরতার কারণেই এই নামে নামকরণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নাম যেহেতু খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই একে জাহান্নাম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ জাহান্নাম শব্দটি الجهومة থেকে গৃহীত হয়েছে। জুহুমাহ শব্দের অর্থ অন্ধকার।

يلقى فيها জাহান্নামে অপরাধীদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে: অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। ঐদিকে **জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?** অর্থাৎ জাহান্নাম আরো বেশী চাইতে থাকবে। কেননা জাহান্নাম অনেক প্রশস্ত। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে ভর্তি করার ওয়াদা করেছেন।

حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رجله তখন মহান রাব্বুল আলামীন তাতে নিজের 'পা' রাখবেন: জাহান্নাম যেহেতু অত্যন্ত বড় এবং তা যেহেতু খুব প্রশস্ত আর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে পূর্ণ করার ওয়াদা করেছেন, ঐ দিকে আল্লাহ তা'আলার

---

১১৬ . ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৪৬।

১১৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৬৬১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৪৮, তিরমিযী হা/৩২৭২, মুসনাদে আহমাদ হা/১৩৪৫৭।

রহমতের দাবী হচ্ছে, তিনি কাউকে বিনা অপরাধে শাস্তি দিবেন না, তাই তিনি ওয়াদা পূর্ণ করতে গিয়ে জাহান্নামে স্বীয় 'পা' রাখবেন।

فيزوي بعضها إلى بعض এতে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে: অর্থাৎ জাহান্নামের এক অংশ অন্য অংশের সাথে মিলে যাবে এবং এর উভয় পার্শ্ব পরস্পর মিশে যাবে। ফলে এর মধ্যে তখন যত বাসিন্দা থাকবে, তাদের ছাড়া আর কোন লোক প্রবেশ করার জায়গা খালি থাকবে না।

فَتَقُولُ قَطْ قَطْ জাহান্নাম বলবে, 'যথেষ্ট হয়েছে' 'যথেষ্ট হয়েছে'। অর্থাৎ জাহান্নাম বলবে আমার জন্য এই পরিমাণই যথেষ্ট। অত্র হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহর 'পা' সাব্যস্ত হলো। আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেমন 'পা' শোভনীয়, তার 'পা' ঠিক সেরকমই। আল্লাহ তা'আলার হাত এবং চেহারার মতোই পা তার ছিফাতে যাতীয়া তথা সত্তাগত বিশেষণ। এ হাদীছের ব্যাখ্যায় মুআত্তিলা (আল্লাহর ছিফাত অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় মারাত্মক ভুল করেছে। তারা বলেছে, قدمه (আল্লাহর 'পা') বলতে বিশেষ এক প্রকার সৃষ্টি উদ্দেশ্য। তারা আরো বলেছে, হাদীছের অপর বর্ণনায় যেখানে قدمه এর স্থলে رجله এসেছে। তাই 'পা' বলতে একদল মানুষ (কাফির) উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়ে থাকে رجل جراد (পঙ্গপালের একটি দল)।

এ ব্যাখ্যার প্রতিবাদে বলা হয়েছে যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, حتى يضع الخ আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামে 'পা' রাখবেন। তিনি এ কথা বলেননি যে, حتى يلقي فيها তিনি তাতে নিক্ষেপ করবেন। যেমন হাদীছের প্রথম অংশে বলেছেন, জাহান্নামে তার বাসিন্দাদেরকে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে। সেই সাথে আরো বলা হয়েছে যে, رجل শব্দকে জামা'আত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করা গেলেও قدم শব্দকে প্রকৃত কিংবা রূপকার্থে জামা'আত বা দল দ্বারা ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই।[১১৮]

---

১১৮. এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে, আল্লাহ তা'আলা যখন জাহান্নামে 'পা' রাখবেন, তখন কি জাহান্নামের আগুনে আল্লাহর 'পা' পুড়ে যাবে না? এর জবাবে বলা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলার শান, বড়ত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের মনেই কেবল এই ধরণের প্রশ্ন জাগতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকল বস্তুর ক্রিয়া ও গতি-প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক। সকল সৃষ্টিই আল্লাহর অনুগত। আগুনও তার অনুগত। আগুন তার নিজস্ব ইচ্ছা ও ক্ষমতায় জ্বলে না এবং অন্যকেও জ্বালায় না। মানুষ যখন আগুন জ্বালায় তখন আগুন জ্বলবে কি জ্বলবে না, তা আল্লাহর কাছে অনুমতি সাপেক্ষ ব্যাপার। আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিতেই আগুন জ্বলে। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) কে যখন নমরুদের বাহিনী আগুনে নিক্ষেপ করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শান্তিময় ঠান্ডা হয়ে যাও। তাই সমস্ত কাঠ পুড়ে ছাই হলো এবং ইবরাহীমকে যে

٥ –إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى

৫। আল্লাহ তা'আলার আহবান, আওয়াজ এবং কালাম রয়েছে

وقوله: (يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَادِي بِصَوْتٍ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وقوله: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবে, আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা তখন আওয়াজ উঁচু করে এই বলে ডাক দিবেন, আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন তোমার বংশধর থেকে একদল লোককে বের করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বুখারী ও মুসলিম।[১১৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার প্রভু কথা বলবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমাদের সকলের সাথেই

রশি দিয়ে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সে রশি পুড়ল, কিন্তু ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর একটি পশমও পুড়ল না। সুতরাং আগুন আল্লাহর 'পা' জ্বালিয়ে ফেলবে, এ ধারণা অবাস্তব।

১১৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৮৩, ৪৭৪১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২২। ছ্বহীহ বুখারীতে হাদীছটির পূর্ণ বিবরণ এভাবে এসেছে যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, আমি হাজির আছি, প্রস্তুত আছি। সব কল্যাণ আপনার হাতেই। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, জাহান্নামী দলকে বের কর। আদম বলবেন, জাহান্নামী দলের সংখ্যা কত? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন। সে সময় (চরম ভয়াবহ অবস্থার কারণে) শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে মাতালের মত দেখতে পাবে। অথচ তারা মাতাল নয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে একজন আমাদের মধ্যে কে হবেন? তিনি বললেন, তোমরা আনন্দিত হও। তোমাদের মধ্য থেকে হবে একজন এবং ইয়াজুজ-মা'জুজ থেকে হবে বাকী নয়শত নিরানব্বই জন। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! আমি আশা করি জান্নাতবাসীর চারভাগের একভাগ হবে তোমরা। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর তিনভাগের একভাগ। একথা শুনে আমরা তাকবীর পাঠ করলাম। তারপর তিনি বললেন, আমার আশা, তোমরাই হবে জান্নাতবাসীর অর্ধেক। এবারও আমরা উঁচু আওয়াজে তাকবীর ধ্বনি দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য লোকদের তুলনায় একটি সাদা বলদের চামড়ায় একটি কালো লোমের ন্যায় অথবা একটি কালো বলদের চামড়ায় একটি সাদা লোমের ন্যায়।

কথা বলবেন। কথা বলার সময় বান্দার মাঝে এবং তার রবের মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না।[১২০]

ব্যাখ্যা: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ আমি তোমার আহবানে সাড়া দিচ্ছি ও তোমার আনুগত্যের উপর সর্বদা সুদৃঢ় আছি এবং তোমার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছি: لبيك শব্দটি ألب بالمكان সে অমুক স্থানে অবস্থান করেছে, এ বাক্য থেকে নেওয়া হয়েছে। যখন কেউ কোন স্থানে অবস্থান করে, তখন বলা হয় ألبَّ بالمكان। মাফউলে মুতলাক হিসাবে لبيك শব্দটি মানুসব হয়েছে। তাগিদ স্বরূপ এটিকে দ্বি-বচন ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমার আনুগত্য করার জন্য বারবার প্রস্তুত ও সুদৃঢ় রয়েছি।[১২১] سعديك শব্দটি المساعدة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আমি তোমার অনুগত আছি এবং আনুগত্য করার জন্য বারবার তোমার কাছে সাহায্য চাচ্ছি।

فَيُنَادِي **অতঃপর ডাক দিবেন।** এখানে দাল বর্ণে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ডাক দিবেন।

بصوت **আওয়াজ সহকারে** এই শব্দটি ينادي এর তাগিদ স্বরূপ এসেছে। কেননা ডাক দেয়া বা আহবান করা সাধারণত: আওয়াজের সাথেই হয়ে থাকে। এটি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا "আল্লাহ মূসার সাথে কথা বলেছেন ঠিক যেমনভাবে কথা বলা হয়" (সূরা নিসা ৪:১৪৬)।

بعثا إلى النار **জাহান্নামের বাহিনী:** এখানে بعث শব্দটি مبعوث অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আগুনের দিকে প্রেরিত বাহিনীকে বের করো। তার অর্থ হলো জাহান্নামের অধিবাসীদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করো। উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এমন আওয়াজসহ কথা এবং আহবান হয়, যা শোনা যায়। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর পক্ষ হতে আহবান আসবে। হাদীছে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন এবং ডাক দেন।

---

১২০. ছহীহ বুখারী হা/৭৪৪৩, ৭৫১২, ছহীহ মুসলিম হা/১০১৬, ইবনে মাজাহ হা/১৮৫।

১২১. এ শব্দের অর্থ বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে, হে আল্লাহ! আমি তোমার আহবানে বারবার সাড়া দিচ্ছি। হাজীগণ যখন ইহরামের কাপড় পরিধান করে لبيك اللهم لبيك পাঠ করেন, তখন এই তালবীয়ার মর্মার্থ দাড়ায়, হে আল্লাহ! তুমি তোমার নাবী খলীল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর জবানে যে আহবান জানিয়েছো, তাতে আমি সাড়া দিচ্ছি এবং তোমার অনুগত হয়ে এখানে হাযির হয়েছি।

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا سيكلمه ربه **তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে অচিরেই তার প্রভু কথা বলবেন না:** এখানে ছাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হলেও সর্বকালের সকল মুমিন উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বিনা মধ্যস্থতায় কথা বলবেন। ليس بينه وبينه ترجمان আল্লাহর মাঝে এবং বান্দার মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না: যে ব্যক্তি এক ভাষার কথা অন্য ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করে, তাকে দোভাষী বলা হয়। অর্থাৎ এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় অনুবাদকারীর নাম তারজুমান। এ হাদীছ থেকেও দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সাথে কথা বলবেন। তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহর কালাম তার ছিফাতে ফেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, তিনি ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক মুমিনের সাথেই কথা বলবেন।

٦ –إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه

৬। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন এবং তিনি তার আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন।

وقوله في رقية المريض: (رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ ، اجعل رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فيبرأ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله: (أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ) حديث صحيح. وقوله: (والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه) حديث حسن رواه أبو داود وغيره.وقوله للجارية: (أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) رواه مسلم.

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময় বলেছেন,

(رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ ، اجعل رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ ، اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فيبرأ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره

"তিনিই আমাদের প্রভু, যিনি আকাশে রয়েছেন। হে আমাদের প্রভু! তোমার নাম পবিত্র। তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে। আসমানে যেমন তোমার রহমত রয়েছে তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো। আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করো। তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক। তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল করো এবং তোমার 'শিফা' হতে 'শিফা' নাযিল কর। আল্লাহর ইচ্ছায় সে সুস্থ হবে।[১২২] এ হাদীছটি হাসান। ইমাম আবু দাউদ এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।[১২৩] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ

১২২. আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুত তিব্ব। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীছটিকে মুনকার (অশুদ্ধ) বলেছেন। দেখুন, মিশকাতুল মাসাবীহ, হা/১৫৫৫।

১২৩. আবু দাউদ ৩৮৯২, ইমাম আলবানী হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন।

"আমার উপর কি তোমাদের আস্থা নেই? অথচ আমি ঐ আল্লাহর একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন।[১২৪] নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

[والعرش فوق ذلك وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ] حديث حسن رواه أبو داود وغيره

"তার উপর আল্লাহর আরশ। আর আল্লাহ্ আরশের উপর। তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন"।[১২৫] হাদীছটি হাসান। আবু দাউদ এবং অন্যান্য ইমামগণ এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। একটি দাসীকে রসূল জিজ্ঞেস করেছিলেন:

(أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ) رواه مسلم.

"আল্লাহ কোথায়? সে জবাবে বলেছিল আসমানের উপর। রসূল আলাইহি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি তখন দাসীর মনিবকে বললেন, তুমি একে আযাদ করে দাও। কারণ সে মুমিন।[১২৬]

.....

১২৪. ছ্বহীহ মুসলিম ১০৬৪, ছ্বহীহ বুখারী ৪৩৫১।

১২৫. আওআলের হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখন্ড অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, তোমরা কি জান এটি কী? আমরা বললাম, এটি মেঘ। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কত? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তার রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। এভাবে সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের গভীরতা হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি পাহাড়ী পাঠা (পাঠার আকৃতিতে ফেরেশতা)। তাদের হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। তারা আল্লাহর আরশ পিঠে বহন করে আছে। আরশ এত বিশাল যে, তার উপরের অংশ থেকে নীচের অংশের দূরত্ব হচ্ছে আসমান ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন আরশের উপরে। তবে এই হাদীছটি ছ্বহীহ ও যঈফ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে যে প্রধান দু'টি বিষয়কে কেন্দ্র করে হাদীছটি এসেছে যথা আল্লাহর বড়ত্ব এবং তার আরশে সমুন্নত হওয়া সে বিষয়টি সুসাব্যস্ত ও সর্বজন স্বীকৃত বিধায় হাদীছের মর্মার্থ সঠিক।

১২৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, আবূ দাউদ হা/৯৩০, সুনানে নাসাঈ হা/১২১৮।

ব্যাখ্যা: في رقية المريض রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করার সময়, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন। অর্থাৎ রোগীর জন্য সুস্থতা প্রার্থনা করে এই দু'আ পাঠ করতেন। কুরআন ও হাদীছের দু'আর মাধ্যমে রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করা বৈধ। আর শিরকী কথা ও কর্ম দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা নিষিদ্ধ।

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِى فِى السَّمَاءِ আমাদের প্রভু রয়েছেন আসমানে: في السماء বলতে **على** السماء। অর্থাৎ আকাশের উপরে উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে في হরফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, **فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ** "কাজেই তোমরা দেশের মধ্যে আরো চার মাস চলাফেরা করো"। *(সূরা আত তাওবা ৯:২)*। এখানেও في হরফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত। في অক্ষরটি আসল অর্থে তথা যারফিয়া হিসাবেও ব্যবহৃত হওয়া বিশুদ্ধ। তখন السماء দ্বারা সাধারণভাবে উপর বুঝাবে।

تَقَدَّسَ اسْمُكَ তোমার নাম পবিত্র: অর্থাৎ তোমার অতি সুন্দর নামগুলো প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্র। اسم শব্দটি এখানে একবচন হলেও মুযাফ হওয়ার কারণে এর দ্বারা আল্লাহর সকল পবিত্র নামই উদ্দেশ্য হবে।

أَمْرُكَ فِى السَّمَاءِ وَالأَرْضِ তোমার হুকুম আসমানে ও যমীনে: অর্থাৎ আসমান ও যমীনে তোমার ঐসব সৃষ্টি ও নির্ধারণগত আদেশ কার্যকর হয়, যার মাধ্যমে সবকিছুই সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়। এই অর্থেই আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

"আল্লাহ তা'আলা যখন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তিনি শুধু তাকে বলেন যে, হয়ে যাও। সাথে সাথেই তা হয়ে যায়"। *(সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)*[১২৭]

এমনি আল্লাহর আরেক প্রকার আদেশ রয়েছে, যা শরী'আতের ঐসব আদেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

---

১২৭. আল্লাহ তা'আলার আদেশ দু'প্রকার: (১) আমরে কাওনী। আল্লাহ যে আদেশ দ্বারা আসমান-যমীনের সকল বিষয় সৃষ্টি, তাদবীর ও পরিচালনা করেন, তা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টিগত আদেশ। (২) আল্লাহ তা'আলার আরেক প্রকার আদেশ রয়েছে, যা দ্বারা শরী'আতের আদেশ উদ্দেশ্য। যেমন ছ্বলাতের আদেশ, যাকাতের আদেশ, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণের আদেশ ইত্যাদি আরো অনেক আদেশ রয়েছে। তদ্রুপ অন্যান্য পাপাচার থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো শারঈ ও দীনী আদেশ-নিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الأَرْضِ আসমানে যেমন তোমার রহমত রয়েছে, তেমনি যমীনেও তোমার রহমত নাযিল করো: এখানে আল্লাহ তা'আলার যেই রহমত আসমানের সকল বাসিন্দাকে নিজের মধ্যে শামিল করে নিয়েছে ঐ রহমতের উসীলায় আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন যমীনবাসীর জন্যও তার রহমতের একটি অংশ নির্ধারণ করেন।

اغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا আমাদের গুনাহ ও ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করো: এখানে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করা হয়েছে।

المغفرة অর্থ হচ্ছে ঢেকে রাখা এবং পাপাচার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। মাথাকে ঢেকে রাখার জন্য এবং শত্রুর আঘাত থেকে মাথাকে হিফাযত করার জন্য মাথায় যেই শিরস্ত্রাণ المِغْفَر পরিধান করা হয়, তা এই **المغفرة** শব্দ থেকেই নেয়া হয়েছে। এখানে الحوب হচ্ছে الإثم (অপরাধ)। আর الخطايا এবং الذنوب একই অর্থে ব্যবহৃত। তা হচ্ছে গুনাহ ও পাপসমূহ।

أنت رب الطيبين তুমি পবিত্রদের প্রতিপালক: এই বাক্যের মাধ্যমেও উসীলা দেয়া হয়েছে। **طيب** শব্দের বহুবচন **الطيبون**। তারা হচ্ছেন নাবী এবং তাদের অনুসারীগণ। আল্লাহর রুবুবীয়াতকে উক্ত শ্রেণীর লোকদের প্রতি সম্বন্ধিত করার দ্বারা তাদের সম্মান, মর্যাদা ও তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা সবকিছুরই প্রভু ও মালিক।

أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ তোমার নিকট হতে রহমত নাযিল করো: অর্থাৎ যেই রহমতটি তুমি সৃষ্টি করেছো, তা তুমি আমাদের উপর নাযিল করো। আল্লাহর রহমত দুই প্রকার।

(১) আল্লাহর যেই রহমত তার অন্যতম ছিফাত অর্থে ব্যবহৃত,[১২৮] সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ "আর আমার রহমত প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে"। *(সূরা আল 'আরাফ: ১৫৬)*

(২) আবার রহমতকে কখনো আল্লাহ তা'আলার দিকে তার ক্রিয়া হিসাবে সম্বন্ধিত করা হয়। তখন তা ঐ সব মাখলুকের অন্তর্ভুক্ত হয়, যা সৃষ্টিকর্তার দিকে

১২৮. আর এ কথাটি সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, আল্লাহর কোনো ছিফাতই (বিশেষণ/গুণ) সৃষ্টি নয়।

সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যেমন এই হাদীছে রহমত শব্দটি তার দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের এ হাদীছে বলেছেন,

«خَلَقَ اللَّهُ مِائَةَ رَحْمَةٍ فَوَضَعَ وَاحِدَةً بَيْنَ خَلْقِهِ وَخَبَأَ عِنْدَهُ مِائَةً إِلاَّ وَاحِدَةً»

"আল্লাহ তা'আলা একশটি রহমত সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টির মধ্যে তা থেকে মাত্র একটি রহমত ছেড়েছেন। আর ৯৯টি রহমত তার নিকট রেখে দিয়েছেন।[১২৯]

রোগী যেহেতু আল্লাহর রহমতের প্রতি মুখাপেক্ষী, তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের কাছে রোগীর উপর রহমত নাযিল করার আবেদন করেছেন, যাতে তিনি এর মাধ্যমে রোগীকে শিফা দান করেন। এ হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য 'উলু' তথা উপরে হওয়া সাব্যস্ত। আরো সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর। পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, উলু তথা উপরে হওয়া আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ছিফাত। সেই সাথে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াত, তার ইলাহীয়াত, তার পবিত্রতা, সকল সৃষ্টির উপরে হওয়া, তার সকল আদেশ, তার রহমত ইত্যাদি ছিফাত তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব।

أَلا تَأْمَنُونِي তোমাদের কি আমার উপর আস্থা নেই? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ হতে ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করে এ কথা বলা হয়েছে, যে তার কতক মাল বণ্টনে আপত্তি উত্থাপন করেছিল।[১৩০] এখানে যেই أَلا অব্যয়টি এসেছে, তা

---

১২৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৬৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৫২, তিরমিযী হা/৩৫৪১, ইবনে মাজাহ হা/৪২৯৩।

১৩০. ছ্বহীহ বুখারীতে (৪৩৫১) এ হাদীসটি বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। ছ্বহীহ বুখারীতে এ হাদীছটি বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ، وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاءِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَلا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً». قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجَنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الأَزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: «وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ»؟ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي». فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلا أَشُقَّ

বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং তা দ্বারা সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয়। আর تـــأمنون শব্দটি الأمانة থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে পক্ষপাতিত্ব ও খেয়ানত না করা। অর্থাৎ তোমরা কি মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে আমার উপর আস্থাশীল নও?

وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّـــمَاء অথচ আমি ঐ সত্তার একজন আস্থা ভাজন ব্যক্তি, যিনি আসমানের উপর রয়েছেন: আসমানে যিনি রয়েছেন, তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা। তিনি আমাকে তার অহী, রিসালাত এবং শরী'আতের আহ্বান করার উপর আমানতদার বানিয়েছেন। সুতরাং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমানতদারী এবং সত্যবাদীতার সাক্ষ্যদাতা হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। উপরোক্ত হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহর জন্য উলু (উপরে হওয়া বিশেষণ) সাব্যস্ত।

بُطُونَهُمْ». قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفٍّ، فَقَالَ: «إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ رَطْبًا لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». وَأَظُنُّهُ قَالَ: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ» (بخارى: ٤٣٥١)

"আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়ামান থেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য পরিচ্ছন্ন চামড়ার থলের মধ্যে সামান্য স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন, যা ধুলাবালি থেকে তখনো আলাদা করা হয়নি। তিনি চারজনের মধ্যে সোনাটি বন্টন করে দিলেন। এরা হচ্ছেন, উয়াইনা ইবনে বদর, আকরা ইবনে হাবেস, যায়েদুল খাইল আর চতুর্থ জন হচ্ছেন আলকামাহ বা আমের ইবনে তুফাইল। তার সাথীদের একজন বলল, এ লোকগুলোর চেয়ে আমরা এর বেশী হকদার। বর্ণনাকারী বলেন, কথাটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কানে পৌছল। তিনি বললেন, তোমাদের কি আমার উপর আস্থা নেই? অথচ আমি ঐ আল্লাহর একজন আস্থা ভাজন ব্যক্তি, যিনি আকাশে আছেন। আমার কাছে দিন-রাত আকাশের খবর আসছে। এ সময় এমন এক ব্যক্তি দাঁড়াল, যার চোখ দু'টি ছিল ভ্রুর মধ্যে লুকায়িত, গাল ছিল ফোলা, কপাল ছিল উঁচু, দাড়ি ছিল ঘন, মাথা ছিল ন্যাড়া এবং লুঙ্গি ছিল অনেক উপরে। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহকে ভয় করুন। তিনি বললেন, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও, সারা দুনিয়ার মাঝে আমি কি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করার হকদার নই? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি চলে গেল। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তাকে হত্যা করব না? তিনি জবাবে বললেন, না, হয়তোবা সে ছ্বলাত পড়ে। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ বললেন, এমন অনেক ছ্বলাত আদায়কারী আছে যারা মুখে এমন কথা বলে যা তাদের মনের মধ্যে নেই। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে লোকদের দিল চিরে ফেলার ও তাদের পেট ফেঁড়ে ফেলার আদেশ দেয়া হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি ঐ লোকটির দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তখনো সে পিঠ ফিরে চলে যাচ্ছিল। তিনি তার দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, ঐ ব্যক্তির বংশে এমন এক প্রজন্মের উদ্ভব হবে, যারা সুমিষ্ট স্বরে কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের গলার নীচে যাবে না। দীন তাদের কাছ থেকে এমনভাবে ছিটকে পড়বে, যেমনভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে পড়ছে যে, তিনি একথাও বলেছেন, আমি যদি সেই জাতিকে পাই, তাহলে সামুদ জাতির মত তাদেরকে হত্যা করবো"।

কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, من في السماء যিনি রয়েছেন আসমানের উপর। একটু পূর্বে এই বাক্যের ব্যাখ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে।

والعرش فوق ذلك তার উপর আল্লাহর আরশ: এ বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ ঐসব সৃষ্টির উপর, যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীর জন্য হাদীছে বর্ণনা করেছেন। তাতে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে এক আসমান থেকে অন্য আসমান পর্যন্ত দূরত্ব, প্রত্যেক আসমানের পুরুত্ব, সপ্তম আসমানের উপরস্থ সাগর, সেই সাগরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দূরত্ব এবং ঐ সাগরের উপর সাতটি বিশাল আকারের ওয়াল (বিশেষ আকৃতির আট ফেরেশতা) থাকার কথা বর্ণনা করা রয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলার আরশ।

والله فوق العرش আর আল্লাহ্ আরশের উপরে। অর্থাৎ তার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য যেভাবে আরশের উপর সমুন্নত হওয়া শোভনীয়, তিনি সেভাবেই আরশের উপর সমুন্নত রয়েছেন।

وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন: অর্থাৎ তিনি তার ইলমের মাধ্যমে তোমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, যা থেকে কোন বস্তুই গোপনীয় নয়। উপরের হাদীছ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য আরশের উপর সমুন্নত হওয়া সুসাব্যস্ত। আর আল্লাহ তা'আলার আরশ সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে বান্দাদের সমস্ত আমলকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তার নিকট কোন কিছুই গোপনীয় নয়।

وقوله للجارية দাসীর কথা: সে ছিল মুআবীয়া ইবনুল হাকামের দাসী। মনিব মুআবীয়া দাসীর উপর ক্রোধান্বিত হয়ে দাসীকে চপেটাঘাত করলেন। অতঃপর তিনি অনুতপ্ত হলেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিষয়টি জানালেন। তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো জানালেন যে, আমি কি তাকে মুক্ত করে দিবো না? তিনি বললেন, আমার কাছে ওকে নিয়ে এসো। তিনি দাসীকে নাবী আলাইহি ওয়া কাছে নিয়ে আসলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, أين الله আল্লাহ কোথায়? এতে দলীল পাওয়া যায় যে, আল্লাহ কোথায়? এই প্রশ্ন করা জায়েয আছে।

দাসী তখন বলল في السماء আসমানের উপর। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপর। এই বাক্যের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসীকে আরো প্রশ্ন করলেন যে, আমি কে? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দাসীর বিশ্বাস কী ছিল, তা জানার জন্য তাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছে। দাসী তখন বলল, أنت رسول الله "আপনি আল্লাহর রসূল"। এই বাক্যের মাধ্যমে দাসী রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্য রিসালাতের সাক্ষ্য দিল। তিনি তখন দাসীর মনিব মুআবীয়াকে বললেন,

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ **তুমি একে আযাদ করে দাও, কারণ সে মুমিন।** এতে প্রমাণ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তা'আলা উপরে এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে। আরো জানা গেল যে, দাসমুক্তির জন্য ঈমান পূর্বশর্ত। এ হাদীছে সমস্ত সৃষ্টির উপরে অবস্থিত সাত আসমানের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার দলীল পাওয়া গেল। এতে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল যে, আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করার সময় আঙ্গুল বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে উপরের দিকে ইঙ্গিত করা বৈধ।

٧ –إثبات معية الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه

৭। এটি সাব্যস্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাখলুকের সাথেই আছেন। এটি সাব্যস্ত করা আরশের উপর তার সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَفْضَلُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ" حَدِيثٌ حَسَنٌ. أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت

"সর্বোত্তম ঈমান হলো তুমি জানবে যে, যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমার সাথেই"।[১৩১] হাদীছটি হাসান। ইমাম তাবারানী উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

"তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়াবে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। এমনকি ডান দিকেও না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সামনে রয়েছেন।[১৩২] একান্ত যদি থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে।[১৩৩] বুখারী ও মুসলিম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ

---

১৩১. এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাসহ আরশের উপর সমুন্নত হয়েও মাখলুকের সাথে ও নিকটে। মাখলুকের নিকটে থাকা আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার পরিপন্থী নয়। তিনি ইলম ও ক্ষমতার মাধ্যমে মাখলুকের অতি নিকটে। আলেমদের থেকে এই ব্যাখ্যাও বর্ণিত হয়েছে। সুফীদের যেসব লোক আরশের উপরে আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তাসহ মাখলুকের সাথে, তাদের কথা সম্পূর্ণ বাতিল।

১৩২. আল্লাহ তা'আলা তার সকল বান্দার নিকবর্তী হলেও তিনি বিশেষভাবে ছ্বলাত আদায়কারীর নিকটবর্তী হন। আরশের উপর সমুন্নত হওয়া এবং একই সময় ছ্বলাত আদায়কারীর সামনে হওয়া আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

১৩৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪১৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৪৮, আবূ দাউদ হা/৪৮৫, নাসাঈ হা/৭২৪, দারিমী হা/১৩৯৮, ইবনে মাজাহ হা/৮৬১।

آخذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛ اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ رواه مُسْلِمٌ،

"হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভু! হে আরশে আযীমের রব! হে আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক! হে দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী! হে তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন অবতীর্ণকারী! আমি তোমার নিকট আমার নফসের অনিষ্ট হতে এবং ভূপৃষ্ঠে প্রত্যেক বিচরণকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার ললাট তুমি ধারণ করে আছ। হে আল্লাহ! তুমিই الأَوَّل (প্রথম)। তোমার পূর্বে কেউ ছিল না। তুমিই الآخـــر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তুমিই الظَـــاهر (সবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই البَـــاطن (মাখলুকের অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছু নেই"। তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো। ইমাম মুসলিম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৩৪]

ছাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন তখন তিনি বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের জন্য সহজ পন্থা অবলম্বন করো। কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না। যাকে তোমরা আহবান করছো তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং অতি নিকটে। তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে"।[১৩৫] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

---

১৩৪. ছহীহ মুসলিম হা/২৭১৩, তিরমিযী হা/৩৪৮১, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩১।

১৩৫ . ছহীহ বুখারী হা/৬৩৮৪, ছহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবূ দাউদ হা/১৫২৬।

ব্যাখ্যা: أَفْضَلُ الإِيمَـانِ **সর্বোত্তম ঈমান**। অর্থাৎ ঈমানের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, এ কথা বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই। পূর্বোক্ত কথার মধ্যে দলীল পাওয়া যায় যে, ঈমানের তারতম্য হয়। অর্থাৎ সকল মুমিনের ঈমান এক সমান নয়।

أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَـكَ **তুমি জানবে যে, আল্লাহ তোমার সাথেই আছেন**। অর্থাৎ ইলমের মাধ্যমে এবং তোমার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার মাধ্যমে তিনি তোমার সাথেই, তুমি যেখানেই থাকো না কেন। যে ব্যক্তি ইহা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, তার ভিতর ও বাহির একই রকম হবে এবং সকল স্থানেই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলবে। ইমাম তাবারানী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানী হচ্ছেন, আবুল কাসেম সুলায়মান আল-লাখমী। হাদীছের যেসব হাফেয বিপুল সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মু'জামুল কাবীরে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছে দলীল পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের মাধ্যমে মাখলুকের সাথেই এবং তিনি তাদের আমলসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক হলো সবসময় এই কথা মনে রাখা। এতে তার আমল সুন্দর হবে।

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ **তোমাদের কেউ যখন ছ্বলাতে দাঁড়ায়:** অর্থাৎ ছ্বলাত শুরু করে, তখন সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। হাদীছে উল্লেখিত قِبـــل শব্দের 'কাফ' বর্ণে যের দিয়ে এবং 'বা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে।

فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِـــهِ **কেননা আল্লাহ তা'আলা তার সামনের দিকে রয়েছেন**। এটি হচ্ছে ছ্বলাত আদায়কারীকে কিবলার দিকে থুথু নিক্ষেপ করতে নিষেধ করার কারণ। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছ্বলাত আদায়কারীর চেহারার দিকে রয়েছেন। অর্থাৎ সামনের দিকে রয়েছেন। যেভাবে সামনে থাকা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয়, তিনি সেভাবেই ছ্বলাত আদায়কারীর সামনে থাকেন।[১৩৬] এতে করে

---

১৩৬. আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত। কেউ যদি প্রশ্ন করে আরশের উপর থেকে ছ্বলাত আদায়কারীর সামনে তার দৃষ্টি রাখেন কিভাবে? এর জবাব হচ্ছে, আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি কিভাবে ছ্বলাত আদায়কারীর সামনে তার দৃষ্টি রাখেন। ঠিক এই প্রশ্ন করাও ভুল যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থাকা সত্ত্বেও শেষ রাতে কীভাবে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। কেননা আল্লাহর সুমহান গুণাবলীর কোনোটির ব্যাপারেই এই প্রশ্ন করা যাবে না যে, তার ধরন কী? আল্লাহর ছিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছগুলো ছাহাবীগণ শুনেছেন। তাদের কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। সুতরাং তিনি কিভাবে ছ্বলাত আদায়কারীর নিকটবর্তী হন বা সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখেন? এই প্রশ্ন করা বিদ'আত। এ বিষয়ে ইমাম মালেক (রহিমাহুল্লাহ) এর উক্তি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বান্দার জন্য একই সময় একাধিক স্থানে থাকা অসম্ভব, আল্লাহর জন্য আরশের উপর থেকেও দুনিয়ার

এটি আবশ্যক হয় না যে, তিনি মাখলুকের সাথে একদম মিলিত অবস্থায় রয়েছেন। বরং আসমানসূহের উপর আরশে তিনি সমুন্নত। আরশে সমুন্নত হয়েও তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তাদের সকলকে পরিবেষ্টনকারী। ছ্বলাত আদায়কারী যেন তার ডান দিকেও থুথু না ফেলে। কেননা ডান দিকের আলাদা মর্যাদা রয়েছে এবং ছ্বলাত আদায়কারীর ডান দিকে রয়েছে দু'জন ফেরেশতা। যেমন বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় এসেছে।

وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ **একান্ত যদি ছ্বলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে থুথু ফেলতেই হয় তাহলে বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নীচে ফেলবে:** অর্থাৎ ছ্বলাত আদায় কারী ব্যক্তি যদি থুথু ফেলতে বাধ্য হয়, তাহলে সে যেন তার বাম দিকে কিংবা বাম পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করে। এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হলো, আসমানসমূহের উপরে আরশে সমুন্নত হয়েও আল্লাহ তা'আলা ছ্বলাত আদায়কারী বান্দার নিকটবর্তী হন এবং ছ্বলাত আদায়কারীর দিকে বিশেষভাবে অগ্রসর হন (মনোনিবেশ করেন)।

اللهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِ **হে আল্লাহ! হে সাত আসমান ও যমীনের প্রভু:** اللهم এর মূল হচ্ছে يا أَللهُ । আল্লাহ শব্দের পূর্ব হতে হরফে নেদা يـا কে ফেলে দিয়ে তার বদলে শেষে ميم বাড়ানো হয়েছে। হে সাত আসমানের প্রভু! অর্থাৎ তার স্রষ্টা ও মালিক।

وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ **আরশে আযীমের রব:** অর্থাৎ এমন বিশাল আরশের মালিক, যার বিশালতা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়। আরশ হচ্ছে আল্লাহর সর্ববৃহৎ সৃষ্টি। আরশের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ **হে আমাদের প্রতিপালক এবং সকল বস্তুর প্রতিপালক!** অর্থাৎ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, সকল জিনিসের সৃষ্টিকর্তা এবং সবকিছুর মালিক। এতে সাব্যস্ত হলো, সবকিছুর প্রতিপালনকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

আসমানে অবতরণ করা ছ্বলাত আদায়কারীর নিকটবর্তী হওয়া বা মুসল্লীর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা মোটেই অসম্ভব নয়। পূর্বাকাশে সকাল বেলা যখন সূর্য উদিত হয়, তখন যদি আমরা পূর্ব দিকে ফিরে দাঁড়াই এবং বিকাল বেলা যখন পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যায়, তখন আমরা যদি পশ্চিম দিকে ফিরি তখন সূর্য আমাদের সমানে থাকে। অথচ তা থাকে আকাশে এবং আমাদের বহু উপরে। সূর্য আমাদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার জন্য আকাশ থেকে নেমে আসে না। আল্লাহর সৃষ্টি যদি একই সাথে উপরে এবং আমাদের সামনে থাকতে পারে, তাহলে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলার জন্য আরশের উপরে এবং মুসল্লীর সামনে থাকা কি করে অসম্ভব হতে পারে!!!

فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى দানা ও বীচি বিদীর্ণকারী: খাদ্য দ্রব্যের দানা ও খেজুরের বীচিকে উদ্‌গত করণের জন্য বিদীর্ণকারী।

মূসা (আলাইহিস সালাম)এর উপর তাওরাত (التوراة), ঈসা (আলাইহিস সালাম) এর উপর ইঞ্জিল (الإنجيل) এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর কুরআন (القرآن) অবতীর্ণকারী। এই হাদীছে তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন এ তিনটি কিতাবের ফযীলত প্রমাণিত হলো। আরো জানা গেল যে, এ কিতাবগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে।

أعوذ بك আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি: অর্থাৎ হে আল্লাহ আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং তোমার পথকেই আকঁড়ে ধরছি।

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ তোমার নিকট ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি: ভূপৃষ্ঠে যেসব প্রাণী বিচরণ করে, সেগুলোর প্রত্যেকটিকেই دابة বলা হয়।

أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا যার ললাট তুমি ধারণ করে আছ: মাথার সামনের অংশকে ললাট বা কপাল বলা হয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! ঐসব অনিষ্টকারী প্রাণী যেহেতু তোমার ক্ষমতা ও আয়ত্তাধীন এবং তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে সেভাবেই পরিচালনা করো, তাই তুমি আমার উপর থেকে ঐগুলোর অনিষ্ট দূর করে দাও। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'আয় বলতেন,

أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ؛

"হে আল্লাহ! তুমিই الأَوَّل (প্রথম)। তোমার পূর্বে কিছুই ছিল না। তুমিই الآخر (সর্বশেষ), তোমার পর কিছুই থাকবে না। তুমিই الظَّاهِر (সবকিছুর উপরে), তোমার উপরে আর কিছুই নেই। তুমিই البَاطِن (অতি নিকটে), তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই"।[১৩৭]

---

১৩৭. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭১৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩১, আবূ দাউদ হা/৫০৫১, তিরমিযী ৩৪৮১। বিজ্ঞ আলেম ও কালাম শাস্ত্রবিদগণ আল্লাহ তা'আলার এ নামগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত উপরোক্ত ছ্বহীহ হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম থেকে যেহেতু এগুলোর ব্যাখ্যা এসে গেছে, তাই এসব ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আল্লাহ তা'আলার এ চারটি নাম তথা الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) এবং الظَاهِر (সবকিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকেই সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। الأَوَّل (সর্বপ্রথম) ও الآخر (সর্বশেষ) -এই দু'টি নাম প্রমাণ করে যে, তিনি সমস্ত কাল ও যামানাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। অর্থাৎ স্থান, কাল এবং তাতে যত মাখলুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সৃষ্টি করার পূর্বেও তিনি ছিলেন। স্থান, কাল ও সমস্ত মাখলুক ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও তিনি অবশিষ্ট থাকবেন। অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখনো তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখনো তিনি থাকবেন। আর আল্লাহ তা'আলার الظَاهِر (সবকিছুর উপরে) ও البَاطِن (অতি নিকটে) এ নাম দু'টি প্রমাণ করে যে, তিনি উর্ধ্বজগৎ এবং নিম্নজগতের সকল স্থান এবং সেসব স্থানের সবকিছুকেই (তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা) ঘেরাও করে আছেন।

আল্লাহর যাহের নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সকল মাখলুকের উপরে। আরবী ভাষায় প্রত্যেক বস্তুর উপরের অংশকে যাহের বলা হয়। সকল মাখলুক তার নীচে। তার উপরে কোনো মাখলুক নেই।

কেউ কেউ যাহের অর্থ করেছেন যে, তিনি প্রকাশ্য। তাদের মতে الظهور থেকে الظاهر নামটি এসেছে। ظهور অর্থ প্রকাশিত হওয়া। সুতরাং তিনি তার নিদর্শন, দলীল-প্রমাণ এবং কার্যাবলীর মাধ্যমে মানুষের বিবেকের নিকট প্রকাশিত। তিনি الباطن অপ্রকাশ্য এ হিসাবে যে, দুনিয়ার অন্যান্য দৃশ্যমান জিনিসের মত তাকে দেখা যায় না।

সুতরাং এ চারটি নামের মূল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টিকে সকল দিক থেকেই ঘেরাও করে আছেন। সৃষ্টির সূচনার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বিদ্যমান থাকা এবং সব সৃষ্টির শেষেও অনন্তকাল তিনি অবশিষ্ট থাকা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সবশেষে যে সকল বস্তু সৃষ্টি করবেন, তার সবই তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি যাহের তথা সবকিছুর উপরে হওয়া এবং বাতেন তথা সবকিছুর নিকটে হওয়ার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বস্তুকেই (তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দ্বারা) ঘেরাও করে আছেন।

সে হিসাবে আল্লাহ তা'আলার الأول নামটি তার সর্বপ্রথম হওয়ার প্রমাণ করে। তার الآخر নামটি তার চিরস্থায়িত্বের প্রমাণ করে। তার الظاهر নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সবকিছুরে উপরে এবং তিনি সর্বাধিক মহান। আর আল্লাহ তা'আলার الباطن নামটি প্রমাণ করে যে, তিনি সৃষ্টির অতি নিকটে এবং তাদের সাথে।

আল্লাহ তা'আলার الباطن নামটির ব্যাখ্যায় আলেমদের থেকে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। ছুহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ অর্থাৎ তুমি অতি নিকটে, তোমার চেয়ে অধিক নিকটে আর কিছুই নেই। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, الباطن অর্থ নিকটে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটবর্তী এবং তিনি স্বীয় ইলমের মাধ্যমে তাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের সকল গোপন এবং অস্পষ্ট বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ আমি তোমাদের চেয়ে সেই মুমূর্ষ ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। (সূরা ওয়াকিয়া: ৮৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

"আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের শাহ রগের চেয়েও অধিক নিকটে আছি"। (সূরা কাফ: ১৬)

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয় । তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনো আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে পাকড়াও করবো।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির দৃষ্টিসীমা ও ধারণার অন্তরালে এবং অপ্রকাশ্য। যারা এ কথা বলেছেন, তাদের কেউ কেউ একটু বাড়িয়ে ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেহেতু অপ্রকাশ্য, তাই পৃথিবীর কোথাও তাকে খুঁজে বের করা বা তার দেখা পাওয়া যাবে না। তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রীয়সমূহ দ্বারা তার সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তার গভীর রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না।

যারা আল্লাহ তা'আলার الباطن নামের উপরোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন, তারা তার الظاهر নামের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, যাহের অর্থ প্রকাশ্য। তারা উভয় নামের অর্থ এভাবে করেছেন যে, তিনিই প্রকাশ্য, তিনিই অপ্রকাশ্য। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যেসব জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তারই গুণাবলী, তারই কার্যাবলী এবং তারই নূরের প্রকাশ।

কেউ কেউ বলেছেন, الباطن অর্থ হচ্ছে هو العالم بما بطن يقال بطنت الأمر اذا عرفت باطنه তিনি সকল গুপ্ত বস্তু সম্পর্কে অবগত। যেমন বলা হয়, بطنت الأمر আমি বিষয়টির গোপন অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এই কথা আপনি ঠিক তখনই বলেন, যখন ঐ বিষয়ের গুপ্ত ব্যাপার সম্পর্কে জানতে পারেন। দেখুন, শাইখ সিন্দী (রহিমাহুল্লাহ) এর টিকাসহ ইবনে মাজাহ, (৮/২১৭)

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, হাদীছে যেহেতু বলা হয়েছে الظاهر অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর উপরে, তার উপরে আর কিছু নেই, তাই যাহেরের মোকাবেলায় الباطن এর অর্থ এ রকম বলা যাবে না যে, তিনি সবকিছুর নীচে, তার নীচে আর কিছুই নেই, নাউযুবিল্লাহ। সুতরাং আল্লাহ আমাদের নীচে, -এটি বলা অবৈধ। কেননা কোন কিছুর নীচে হওয়া ত্রুটিপূর্ণ ছিফাত বা বিশেষণ। আল্লাহ তা'আলার সত্তা উপরে হওয়ার বিশেষণে বিশেষিত, নীচে হওয়ার বিশেষণে নয়। উপরে হওয়া আল্লাহর ছিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত গুণ।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত চারটি নামের ব্যাখ্যায় উপরে বর্ণিত অর্থগুলোর সবগুলোই বা অধিকাংশই সঠিক। তবে ঐ নামগুলোর ব্যাখ্যায় নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তাই আমাদের বিশ্বাস করা ও মেনে নেওয়া আবশ্যক। যে অর্থ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তার বিপরীত

আল্লাহ তা'আলার এই চারটি নামের মধ্যে দু'টি নাম তার চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বরতার প্রমাণ করে। এই দু'টি নাম হচ্ছে الأَوَّل (প্রথম) এবং الآخر (সর্বশেষ)। আর বাকী দু'টি নাম আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপরে সমুন্নত হওয়া এবং সৃষ্টির একদম নিকটে হওয়ার প্রমাণ করে। এই নাম দু'টি হচ্ছে الظَّـاهِر (প্রকাশ্যমান) এবং الْبَـاطِن (অতি নিকটে)। হাদীছের মধ্যে এই শেষ দু'টি নামই হচ্ছে মহল্লে শাহেদ। অর্থাৎ এখান থেকেই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকের উপরে এবং তিনি নিকটেও। কেননা আল্লাহ তা'আলার এই নাম দু'টিতে আল্লাহর জন্য علـو (মাখলুকের উপরে সমুন্নত হওয়া) এবং قـرب (সৃষ্টির নিকটে হওয়া) সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর এ দু'টি ছিফাত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তা'আলা উপরে সমুন্নত হয়েও মাখলুকের নিকটে এবং মাখলুকের নিকটবর্তী হয়েও সকল মাখলুকের উপরে সমুন্নত।

اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ। তুমি আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করো: অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর থেকে তোমার হকসমূহ এবং মাখলুকের হকসমূহ আদায়ের ব্যবস্থা করো। বান্দা নিজের শক্তিতে অসৎকাজ করতে অক্ষম এবং নিজের শক্তিতে কোন সৎকাজই করতে পারে না, -এখানে তাই বলা হয়েছে।

وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ এবং আমাকে দারিদ্রের কবল থেকে মুক্ত করো: الفقر অর্থ হচ্ছে প্রয়োজন, অভাব। ফকীর বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যার কিছুই নেই অথবা যার কাছে প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য বস্তু রয়েছে। এই হাদীছ থেকে আরো জানা গেল যে, প্রয়োজন পূরণ করার জন্য এবং দু'আ কবুলের জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম ও ছিফাতের উসীলা দেয়া বৈধ।

ছাহাবীগণ যখন আল্লাহর যিকির করার সময় তাদের আওয়াজ উঁচু করলেন: এটি ছিল খায়বারের যুদ্ধের ঘটনা। যেমন এই হাদীছের কোন কোন সনদে সুস্পষ্ট করেই তা বলা হয়েছে। ছাহাবীগণ যেই যিকিরের মধ্যে আওয়াজ উঁচু করেছিল, তা ছিল তাকবীর। অর্থাৎ তারা উঁচু আওয়াজে **الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله** বলছিল। **أربعوا** অর্থ হচ্ছে **أرفقوا** অর্থাৎ নিজেদের জন্য সহজ করো।

ব্যাখ্যা ছাহাবী, তাবেঈ এবং সালাফে সালেহীন থেকে কিছুই পাওয়া যায়নি। সুতরাং হাদীছে বর্ণিত ব্যাখ্যা গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ।

فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا **কেননা তোমরা তো বধির বা দূরে অবস্থানকারী কাউকে আহবান করছো না:** এটি হচ্ছে আওয়াজ অতিরিক্ত উঁচু না করার এবং নিজেদের উপর সহজ করার আদেশ দেয়ার কারণ। অর্থাৎ তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছো না, যিনি তোমাদের ডাক শুনেন না এবং তোমাদেরকে দেখেন না। সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা থেকে এমন আপদ ও ত্রুটি নাকোচ করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার জন্য শ্রবণ করার প্রতিবন্ধক। সেই সাথে হাদীছে উক্ত দোষ দু'টির বিপরীত গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا যাকে তোমরা আহবান করছো তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং তোমাদের অতি নিকটে। সুতরাং আওয়াজ উঁচু করার কোন দরকার নেই।

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ **তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও আহবানকারীর অধিক নিকটে:** সুতরাং যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে এবং যারা তার যিকির করে তিনি তাদের অতি নিকটে। তাই আওয়াজ উঁচু করে দু'আ করার প্রয়োজন নেই। তিনি এত নিকটে যে, আওয়াজ নীচু করে দু'আ করলে যেভাবে শুনেন, উঁচু আওয়াজে দু'আ করলেও ঠিক সেভাবেই শুনেন।

হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকটবর্তী হন। হাদীছে ইহা সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনি উঁচু আওয়াজগুলো যেমন শুনেন, নীচু ও অস্পষ্ট আওয়াজগুলো সেভাবেই শুনেন। উপরের সবগুলো হাদীছ প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে, তাদের নিকটে, তিনি মাখলুকের সব আওয়াজ শুনেন এবং তিনি তাদের সমস্ত নড়াচড়া (আমলসমূহ) দেখেন। আর তিনি যে সৃষ্টির উপরে এবং আরশের উপর সমুন্নত এটি তার বিরোধী নয়। আল্লাহর মাঈয়াত তথা সৃষ্টির সাথে থাকার ব্যাখ্যা এবং তার প্রকারভেদ কুরআনুল কারীমের দলীল-প্রমাণসহ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

٨ –إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة

৮। মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন তাদের রবকে দেখতে পাবে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيلة البدر لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِه، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» (بخارى:٥٥٤)

"কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে চন্দ্রকে দেখতে পাও, সেভাবেই তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের যদি এই পরিমাণ সামর্থ থাকে, সূর্য উদয় এবং অস্তের পূর্বের ছ্বলাত হতে কোন বস্তুই তোমাদেরকে পরাভুত করতে পারবে না, তাহলে উক্ত ছ্বলাতদ্বয়কে তোমরা যথাসময়ে আদায় করো।[১৩৮]

ব্যাখ্যা: এখানে **إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ কোন অসুবিধা ছাড়াই তোমরা দেখতে পাও:** দ্বারা মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ستـرون এর মধ্যে যে سـين অক্ষরটি প্রবেশ করেছে, তা ভবিষ্যৎকালের জন্য হলেও এখানে তা দ্বারা তাগিদ তথা বাক্যের বিষয়কে শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য।

تـرون ربكـم অর্থাৎ তোমরা তোমাদের চোখ দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখবে। মুমিনগণ তাদের রবকে দেখার বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির তথা ব্যাপক সংখ্যক বর্ণনাকারীর সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।[১৩৯]

---

১৩৮ . ছ্বহীহ বুখারী ৫৫৪, ছ্বহীহ মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৪৭২৯, ইবনে মাজাহ ১৭৭।

১৩৯. যারীর, সুহাইব, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু মূসা, আবু সাঈদ ও অন্যান্য ছাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে ছ্বহীহ এবং সুনানের কিতাবগুলোতে এসমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«أَنَّ النَّاسَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ»

"একদল লোক বলল: হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি ক্বিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব?

كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيلة البدر তোমরা যেমন পূর্ণিমার রাতে এই চন্দ্রকে দেখতে পাও: অর্থাৎ চন্দ্র তার পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করার রাতে। এটি হচ্ছে মাসের ১৪তম রাত। ঐ রাতে চন্দ্র আলোতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এখানে এই তাশবীহ তথা আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জোর দিয়ে আল্লাহর দিদারকে সত্য হিসাবে সাব্যস্ত করা এবং তার দ্বারা রূপকার্থ উদ্দেশ্য হওয়ার সন্দেহকে দূর করা। বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে আল্লাহর দিদারকে পূর্ণিমার রাতের মেঘহীন আকাশে চাঁদ দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলার **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** সদৃশ আর কিছুই নেই।

لا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ তাকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় না। تـــا বর্ণে পেশ দিয়ে এবং مـــيم বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের উপর এমন কোনো যুলুম হয় না যে, ভীড়ের কারণে কেউ দেখতে পাবে আবার কেউ দেখতে পাবে না।

لاتضامون এর তা تا বর্ণে যবর দিয়ে এবং ميم বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হয়েছে। এভাবে পড়া হলে এর মাসদার হবে التضـــامّ। অর্থাৎ পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখার জন্য তোমাদের একজনকে অন্যজনের কাছে গিয়ে মিশতে হয় না। এই বর্ণনা অনুসারে

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। তিনি আবার বললেন, আকাশে মেঘ না থাকলে সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বলল, না কোন অসুবিধা হয় না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা ক্বিয়ামতের দিন এরকম পরিষ্কারভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে"। ছ্বহীহ বুখারী ৭৪৩৭। কাইস ইবনে আবু হাযেম বলেন,

«سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ»

"আমি জারির ইবনে আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একদা পুর্ণিমার রাত্রিতে আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম। তিনি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেভাবে এ চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছ অচিরেই সেভাবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে"। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৬৩৩ সুতরাং প্রকাশ্যভাবেই মু'মিনগণ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এটিই হবে বেহেশতের ভিতরে মু'মিনদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যারা এর বিরোধীতা করবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। "যেমন কর্ম তেমন ফল" এই মূলনীতির ভিত্তিতে তারা আল্লাহর দর্শন থেকে বঞ্চিত হবেন বলে আলেমদের যে বক্তব্য রয়েছে সেটাই প্রণিধানযোগ্য।

অর্থ হবে, চাঁদ দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে এক স্থানে জড়ো হওয়ার প্রয়োজন হয় না। যাতে খুব ভীড় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উভয় বর্ণনার অর্থ একসাথে এ হবে যে, নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। এই দেখা সত্য। তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকেই দেখতে পাবে।

فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا সুতরাং তোমাদের যদি সামর্থ থাকে যে, কোনো বস্তুই তোমাদেরকে পরাভুত করতে পারবে না: অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের ছ্বলাত পড়া হতে তোমরা পরাজিত হবে না। এটি হচ্ছে ফজরের ছ্বলাত। আর সূর্য ডুবার পূর্বেও একটি ছ্বলাত থেকে পরাভূত হবে না। তা হচ্ছে আসরের ছ্বলাত। তোমরা যদি উক্ত ছ্বলাত দু'টি যথা সময়ে আদায়ের সামর্থ রাখো, তাহলে ছ্বলাতদ্বয় আদায় করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি ও গাফেলতী করো না। বরং জামা'আতের সাথে এবং সঠিক সময়ে এ ছ্বলাত দু'টি আদায়ে যত্নবান হও। এ দু'টি ছ্বলাতকে খাস করে উল্লেখ করার কারণ হলো, এতে ফেরেশতাগণ একসাথে মিলিত হয়।[১৪০] সুতরাং আসর ও ফজরের ছ্বলাত পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাতের মধ্যে সর্বোত্তম। তাই যে ব্যক্তি এ ছ্বলাত দু'টি যত্নসহকারে আদায় করবে, সে সর্বোত্তম পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা। হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, ক্বিয়ামতের দিন খোলাখুলিভাবে এবং কপালের চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবেই মুমিনগণ তাদের রবকে দেখতে পাবে।[১৪১] যে আয়াতগুলোতে আল্লাহর দিদার সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করার সময় ঐসব লোকের আলোচনা ও প্রতিবাদ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, যারা এই মাসআলায় বিরোধীতা করেছে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করেছে।

---

১৪০. আসর ও ফজরের ছ্বলাতে ফেরেশতাদের মিলিত হওয়ার হাদীছটি হচ্ছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ»

"তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমন করে থাকেন। তারা ফজর ও আসরের ছ্বলাতের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? তারা বলেন, আমরা তাদেরকে ছ্বলাত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা ছ্বলাতেই ছিল"। (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৫৩০)

১৪১. এখান থেকে সুস্পষ্ট রূপেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর আকার রয়েছে। তবে তা কেমন, তা আমরা জানি না। কিন্তু যিনি তার সৃষ্টিকে এত সৌন্দর্য দান করেছেন, তিনি অতি সুন্দর হবেন, - এটি যুক্তি ও বিবেক দ্বারা সমর্থিত। হাদীছে রয়েছে, إن الله جميل يحب الجمال অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দর। তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন। সুতরাং আল্লাহ নিরাকার এ কথা বলা মারাত্মক ভুল।

موقف أهل السنة من هذه الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية

যেসব হাদীছে আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সুসাব্যস্ত করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ

"হে পাঠক! উপরোক্ত হাদীছগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন! অনুরূপ অনেক হাদীছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবের ঐসব ছিফাতের সংবাদ দিয়েছেন যা তার রব তাকে জানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব সুউচ্চ ছিফাতের সংবাদ দিয়েছেন মুক্তিপ্রাপ্ত দল তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সেসব সুমহান ছিফাতের প্রতি বিশ্বাস করে। ঠিক তেমনি তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছগুলোতে বর্ণিত ছিফাতগুলোর প্রতিও বিশ্বাস করে। তারা ঐসব ছিফাতের কোন পরিবর্তন করে না, কোনটিকেই বাতিল করে না এবং এগুলো থেকে কোনটির ধরন, আকৃতি, কিংবা উপমাও পেশ করে না।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের হাদীছগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অবস্থান বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান ঠিক কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের আয়াতসমূহের প্রতি তাদের অবস্থানের অনুরূপ। তা হলো হাদীছগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং ঐগুলোর প্রকৃত ও আসল অর্থে বিশ্বাস করা। হাদীছের শব্দমালা যেই বাহ্যিক অর্থ প্রদান করে, তারা সেই বাহ্যিক অর্থকে বিভিন্ন প্রকার বাতিল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অন্য অর্থে পরিবর্তন করে না, হাদীছের শব্দসমূহ যা প্রমাণ করে, তারা তা অস্বীকার করে না এবং বাতিলও করে না। সেই সাথে তারা হাদীছসমূহে উল্লেখিত আল্লাহর ছিফাতসমূহকে সৃষ্টিসমূহের ছিফাতের সাথে তুলনাও করে না। কেননা আল্লাহর সদৃশ কোন কিছুই নেই। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের তরীকা ঐসব বিদ'আতী, জাহমীয়া, মু'তাযিলা এবং আশায়েরাদের তরীকার বিপরীত, যারা আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কিত দলীলগুলোকে অস্বীকার করে অথবা সেগুলো যা প্রমাণ করে, তার অপব্যাখ্যা করে। তারা ঐসব মুশাব্বেহা (আল্লাহর ছিফাতকে বান্দার ছিফাতের সাথে তুলনাকারী) সম্প্রদায়েরও বিপরীত, যারা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে ফেলেছে। অর্থাৎ তারা বলেছে আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মতোই। বস্তুতঃ তারা যা বলে, আল্লাহ তা'আলা তার অনেক উর্ধ্বে।

مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة

উম্মতের বিভিন্ন ফির্কার মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মর্যাদা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمَّةِ كَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمَمِ فَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَةِ وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وغيرهم وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرَّافِضَةِ وَالْخَوَارِجِ

বরং এ উম্মাত যেমন পূর্বের উম্মাতসমূহের তুলনায় মধ্যপন্থী উম্মাত হিসাবে পরিগণিত, ঠিক তেমনি এ উম্মাতের মধ্যকার বিভিন্ন ফির্কার (দল, জামা'আত) তুলনায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যপন্থী জামা'আত হিসাবে গণ্য।

আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে ছিফাতকে অস্বীকারকারী জাহমীয়া সম্প্রদায় এবং আল্লাহ তা'আলার সুমহান ছিফাতকে বান্দার ছিফাতের সাথে তুলনাকারী মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে।

আল্লাহ তা'আলার কর্মসমূহের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হচ্ছে জাবরীয়া এবং কাদারীয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে।

আল্লাহ তা'আলার ওয়াঈদ তথা গুনাহর কারণে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র সুন্নাতে শাস্তির যেসব ধমক এসেছে, তাতেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান মুরজীয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদিয়ী সম্প্রদায়ের মাঝে।

ঈমান এবং দীনের নামগুলোর বিষয়েও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান একদিকে হারুরী (খারিজী) ও মু'তাযিলাদের মাঝে এবং অন্যদিকে মুরজীয়া ও জাহমীয়াদের মাঝে। এমনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের ব্যাপারেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান খারিজী এবং রাফেযীদের মাঝখানে।

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীল দ্বারা সুসাব্যস্ত আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতগুলোর ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান বর্ণনা করার পর উপরোক্ত বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাদের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। যাতে করে অন্যদের তুলনায় তাদের মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কেননা কোন বিষয়ের সৌন্দর্য কেবল তার বিপরীত বিষয়ের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। সকল জিনিসের ক্ষেত্রেই একই কথা। সমস্ত বস্তুই তার বিপরীত বস্তুর মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়।[১৪২]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মাতের সমস্ত ফির্কার তুলনায় মধ্যমপন্থী ফির্কা হিসাবে স্বীকৃত: আল-মিসবাহুল মুনীর নামক কিতাবে রয়েছে যে, الوسط শব্দের واو এবং سين বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। ওয়াসাত অর্থ হলো সরল-সোজা। তবে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ন্যায়পরায়ন এবং উৎকৃষ্ট। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ১৪৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী উম্মতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের উপর সাক্ষী হতে পারো"।

সুতরাং আহলুস সুন্নাতের লোকেরা 'ওয়াসাত'। الوسط অর্থ হচ্ছে তারা ন্যায়পরায়ন, উৎকৃষ্ট এবং উত্তম। দীনের ক্ষেত্রে কঠোরতায় এবং শৈথিল্য প্রদর্শনে যে দু'টি দল বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান তাদের উভয়ের মাঝখানে। সেই সাথে যেসব ফির্কা নিজেদেরকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধিত করে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের তুলনায় মধ্যমপন্থী। মুসলিম উম্মত পূর্বের উম্মতদের তুলনায় মধ্যমপন্থী। অতীতের যেসব

---

১৪২. অন্ধকারের মাধ্যমেই আলো, মূর্খতার মাধ্যমেই জ্ঞান, অন্যায়ের মাধ্যমেই ন্যায় ইত্যাদিকে ভালোভাবে বুঝা যায়। এমনি তাওহীদের বিপরীত শির্ক না বুঝলে তাওহীদের পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করা যায় না এবং বিদ'আত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্নাত সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন হয় না। এভাবে পৃথিবীতে যেসব বস্তু ও বিষয় রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা কেবল তখনই অর্জিত হবে, যখন তার বিপরীত বস্তু সম্পর্কেও জানা যাবে।

উম্মত বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং যারা দীনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এই উম্মত তাদের তুলনায় মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।[১৪৩]

---

১৪৩. পূর্বের উম্মাতসমূহের বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি, সীমালঙ্ঘন এবং শৈথিল্যের কিছু উদাহরণ হচ্ছে, যেমন (১) ইয়াহূদীরা আল্লাহ তা'আলার হকের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে দোষ-ত্রুটি যুক্ত করেছে এবং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের কাতারে শামিল করে ফেলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বদ অভ্যাসের প্রতিবাদ করে বলেন,

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নাবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, 'আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (সূরা আলে-ইমরান: ১৮১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

"আর ইয়াহূদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা হয়েছে। তাদের হাতই বাঁধা হয়েছে। এ কথা বলার কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তার উভয় হস্ত সদা উন্মুক্ত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন"। (সূরা আল মায়িদা: ৬৪)

ঐদিকে আবার খ্রিষ্টানরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে ত্রুটিযুক্ত মাখলুককে পরিপূর্ণ গুণের অধিকারী প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। তাদের প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

"মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ আল্লাহর একজন রসূল ও একটি ফরমান ছাড়া আর কিছুই ছিল না, যা আল্লাহ মারইয়ামের দিকে পাঠিয়েছিলেন। আর সে ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি রূহ (যে মারইয়ামের গর্ভে শিশুর রূপ ধারণ করেছিল)। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলদের প্রতি ঈমান আনো এবং 'তিন' বলো না। এরূপ বলা হতে বিরত হও, এটাই তোমাদের জন্য ভালো। আল্লাহই তো একমাত্র ইলাহ। কেউ তার পুত্র হবে, তিনি এর অনেক উর্ধ্বে। পৃথিবী ও আকাশের সবকিছুই তার মালিকানাধীন এবং সে সবের প্রতিপালক ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট। কিন্তু এই উম্মত তাদের মত আল্লাহ তা'আলার সাথে দোষ-ত্রুটি যুক্ত করেনি এবং কোন সৃষ্টিকেও স্রষ্টার আসনে বসায়নি।

নাবীদের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছে। ইয়াহূদীরা আল্লাহর নাবী ও রসূল ঈসা ইবনে মারইয়ামের প্রতি মিথ্যারোপ ও কুফরী করেছে এবং তার নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করেছে। অপর পক্ষে খ্রিষ্টানরা তার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাকেই মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদী তার ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন

করেছে। এ উম্মাত তার ব্যাপারে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতীতই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং বলেছে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

ইবাদতের বিষয়গুলোতে খ্রিষ্টানরা চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। পবিত্রতা ছাড়াই তারা আল্লাহর ইবাদত করে। তারা নাপাকী থেকে পবিত্রতা হাসিলের জন্য গোসল করে না। তাদের কেউ পেশাব করে, সেই পেশাব কাপড়ে লাগে এবং তা নিয়েই গীর্জায় গিয়ে ইবাদত করে (মন্ত্র পাঠ করে)।

ইয়াহূদীরা এর বিপরীত। তাদের কাপড়ে নাপাকী লাগলে পানি দ্বারা ধৌত করে তা পবিত্র করে না; বরং তারা কাপড়ের সেই অংশ কেটে ফেলে দেয়। এমনকি তারা ঋতুবতী মহিলাদের ধারেকাছেও যায় না, তাদের সাথে পানাহারও করে না।

কিন্তু এই উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী। তারা ইয়াহূদীদের মত করে না এবং খ্রিষ্টানদের মতও করে না। তাদের কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে তা সহ ছ্বলাত পড়ে না এবং কাপড়ের সেই অংশ কেটেও ফেলে দেয় না; বরং তারা কাপড় ধৌত করে নেয় এবং অপবিত্র বস্তু কাপড় থেকে দূর করে দেয়। অতঃপর তা পরিধান করে ছ্বলাত পড়ে। এমনি এই উম্মাতের কোন পুরুষের স্ত্রীর যখন মাসিক রক্তস্রাব শুরু হয়, তখন তাকে দূরে সরিয়ে দেয় না এবং তার সাথে পানাহার করা থেকে বিরত থাকে না। বরং একসাথেই পানাহার করে, ঘরসংসার করে এবং সহবাস ব্যতীত সবকিছুই করে। খাদ্য ও পানীয় বস্তুসমূহ থেকে হালাল ও হারামের ব্যাপারেও পূর্বের জাতিসমূহ কড়াকড়ি, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করেছে। খ্রিষ্টানদের মধ্যে হারাম বলতে কিছু নেই। তারা শুকরসহ সকল শ্রেণীর নাপাক ও হারাম বস্তুকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে। ঐদিকে ইয়াহূদীরা নিজেদের উপর কড়াকড়ি করে বেশ কিছু হালাল জিনিসকে হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

"আর আমি ইয়াহূদীদের জন্য নখ ওয়ালা প্রাণী হারাম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও, তবে যা তাদের পিঠে, কিংবা নাড়ীভূঁড়ি বা হাড়ের সাথে যা লেগে থাকে তা ছাড়া। তাদের সীমালংঘনের দরুন তাদেরকে এ শাস্তিটি দিয়েছিলাম। আর এই যা কিছু আমি বলছি সবই সত্য"। (সূরা আনআম: ১৪৬) আল্লাহর নির্ধারিত হালাল-হারামের সীমা না মানার কারণেই শাস্তি স্বরূপ এমনটি করা হয়েছিল।

কিন্তু এই উম্মাত হচ্ছে এ বিষয়েও মধ্যপন্থী। তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো হালাল করা হয়েছে এবং অপবিত্র জিনিসগুলো হারাম করা হয়েছে। কিসাস বা হত্যার বদলে হত্যার বিষয়ে এই উম্মাতের জন্য মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইয়াহূদীদের উপর কিসাস গ্রহণ করা ফরয ছিল। খুনীকে মাফ করে দেয়া খ্রিষ্টান/নাসারাদের উপর আবশ্যক ছিল। কিন্তু এ উম্মাতের জন্য রয়েছে মধ্যম পন্থা। তাদেরকে কিসাস নেয়া, কিংবা কিসাসের বদলে দিয়াত গ্রহণ করা কিংবা কোনটিই না নিয়ে মাফ করে দেয়ার মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

সুতরাং অন্যান্য উম্মতের তুলনায় উম্মতে ইসলামীয়ার জন্য মধ্যম পন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, কড়াকড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করার সুযোগ রাখা হয়নি। বরং সকল ক্ষেত্রেই মধ্যপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যকার সকল ফির্কার তুলনায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যপন্থী। যেমন উম্মাতে ইসলামীয়া অন্যসব উম্মাতের তুলনায় মধ্যপন্থী।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যপন্থী মাযহাবের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তারা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা

প্রথমত: আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর ছিফাতকে বাতিলকারী জাহমীয়া এবং আল্লাহর ছিফাতের উপমা পেশকারী মুশাব্বেহা সম্প্রদায়ের অবস্থানের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। জাহমীয়াদের ইমাম জাহাম ইবনে সাফওয়ান আত্ তিরমিযীর দিকে নিসবত করে জাহমীয়া সম্প্রদায়ের নাম রাখা হয়েছে। এরা আল্লাহ তা'আলার সত্তাকে পবিত্র সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি তারা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ বিশেষণগুলোকেও অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ধারণাপ্রসূত দলীল হচ্ছে আল্লাহর জন্য নাম ও ছিফাত সাব্যস্ত করা হলে মাখলুকের সাথে আল্লাহর তুলনা হয়ে যায়। তাই তারা সমস্ত নাম ও ছিফাতকে বাতিল করে দিয়েছে। এ কারণেই তাদেরকে মুআত্তেলা তথা আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতসমূহকে বাতিলকারী সম্প্রদায় বলা হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তাকে অতি সুন্দর নাম ও সুমহান ছিফাত থেকে মুক্ত করে ফেলেছে। আর আল্লাহর ছিফাতকে মানুষের ছিফাতের সাথে তুলনাকারী সম্প্রদায়ের লোকদেরকে মুশাব্বেহা সম্প্রদায় বলার কারণ হলো তারা আল্লাহ তা'আলার ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুব বাড়াবাড়ি এবং শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করেছে এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলোকে মাখলুকের সাধারণ ছিফাত সমূহের সাথে তুলনা করেছে।[১৪৪] আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সমস্ত কথার অনেক উর্ধ্বে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে। তারা আল্লাহর ছিফাতগুলোকে আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও মর্যাদার জন্য শোভনীয় পদ্ধতিতেই সাব্যস্ত করেন। তারা আল্লাহর ছিফাতকে মাখলুকের ছিফাতের সাথে তুলনা করে না এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলোর কোন উপমা ও দৃষ্টান্তও পেশ করেন না। সুতরাং তারা আল্লাহকে মাখলুকের ছিফাত থেকে পবিত্র করতে গিয়েও

---

১৪৪. এরা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করতে গিয়ে এতই বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাদের কথা হচ্ছে আল্লাহ যেহেতু নিজের সত্তার জন্য ছিফাত সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে তা সাব্যস্ত করা। তারা আল্লাহর শানে এত বেয়াদবী প্রদর্শন করে বলেছে যে, আল্লাহর ছিফাত বলতে আমরা মাখলুকের ছিফাতকেই বুঝে থাকি। অর্থাৎ আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মতোই। আল্লাহর হাত মাখলুকের হাতের মতোই। এমনি চোখ, শ্রবণ, দৃষ্টি, চেহারা ইত্যাদি। (নাউযুবিল্লাহ) এই গোমরাহ লোকেরা আরো বলেছে আল্লাহ যেহেতু নিজের জন্য মুখমন্ডল সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমরা তা সাব্যস্ত করবো এবং বলবো যে, আল্লাহর চেহারা বনী আদমের একজন সুদর্শন যুবকের চেহারার মতোই। (নাউযুবিল্লাহ)

বাড়াবাড়ি করেন না[১৪৫] এবং তার সুউচ্চ ছিফাতগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করেন না। বরং তারা আল্লাহর ছিফাতগুলো বাতিল করা ছাড়াই আল্লাহকে সকল ত্রুটিপূর্ণ ও দোষযুক্ত বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র করেন এবং মাখলুকের সাথে তুলনা করা ব্যতীতই তারা আল্লাহর জন্য অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী সাব্যস্ত করেন।

দ্বিতীয়তঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কর্মসমূহের ক্ষেত্রেও জাবরীয়া এবং কাদারীয়া সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝে। الجبر শব্দের দিকে সম্বন্ধ করে তাদের জাবরীয়া সম্প্রদায় হিসাবে নাম রাখা হয়েছে। কেননা তারা বলে: إن العبد مجبور على فعله অর্থাৎ বান্দা তার কর্মের উপর একান্ত বাধ্য। তার কোন স্বাধীনতা নেই। সুতরাং তারা আল্লাহর কর্মগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার কোন কাজই নেই বলে ধারণা করেছে। তারা আরো মনে করেছে যে, বান্দারা কোন কাজই করে না। তাদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র কর্তা এবং বান্দার কর্মও আল্লাহ তা'আলাই করেন। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে বান্দার সমস্ত নড়াচড়া এবং কর্ম একান্তই বাধ্যতামূলক। বান্দা যেই নড়াচড়া ও কর্ম সম্পাদন করে, তা জ্বরে আক্রান্ত রোগীর কম্পনের মতোই। বান্দার কাজগুলো বান্দার দিকে কেবল রূপকার্থেই সম্বন্ধ করা হয়।[১৪৬]

---

১৪৫. বরং তারা কেবল আল্লাহর পবিত্র সত্তা থেকে তাই অগ্রাহ্য করে, যা কেবল আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে নিজের সত্তা থেকে অগ্রাহ্য করেছেন এবং আল্লাহর রসূল তার সুন্নাতে তার প্রভু থেকে অগ্রাহ্য করেছেন।

১৪৬. এ শ্রেণীর গোমরাহ লোকেরা আল্লাহর সাথে বেআদবী প্রদর্শন করে আরো বলেছে যে, বান্দা গোসল দাতার হাতে মৃত ব্যক্তির মতোই এবং শিশুর হাতে কাঠের পুতুলের মতোই। বান্দা ভালোমন্দ যা করে, তা মূলতঃ আল্লাহ করেন। বান্দার কাজে ও কর্মে বান্দা মোটেও স্বাধীন নয়। তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছে। সৃষ্টির উপর আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করতে গিয়েই তারা এতটা বাড়াবাড়ি করেছে।

আল্লাহ তা'আলার কর্মের ব্যাপারে জাবরীয়াদের উপরোক্ত মাযহাব সঠিক নয়। কারণ বান্দার কাজে যদি তার স্বাধীনতা নাই থাকতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো কাজ করা বা না করার আদেশ দিতেন না। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তাকে বলেছেন, এটা করো, ওটা করো না, তাতে বুঝা গেল, কাজ করার বা না করার ক্ষেত্রে বান্দা স্বাধীন এবং কাজ করার ক্ষমতাও তার রয়েছে। সুতরাং বান্দার কাজ বান্দাই করে, আল্লাহ নয়, বান্দার ছ্বলাত বান্দাই পড়ে, আল্লাহ নয়, এমনি বান্দার পাপকর্ম.....। মূলতঃ জাবরীয়াদের এই বাতিল মাযহাব থেকেই মুসলিমদের আক্বীদায় সর্বেশ্বরবাদ তথা সবকিছুতেই স্রষ্টার অস্তিত্বের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বান্দার কর্মে বান্দা যে স্বাধীন, তা আমাদের প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে অনুভব করে থাকে। বিবেক ও যুক্তি এটিকে সমর্থন করে। এটি অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই হয় বলে আল্লাহ তা'আলা তার কাজের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন। অন্যথায়

এবার কাদারীয়া সম্প্রদায়ের কথায় আসি। القدر শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে কাদারীয়া বলা হয়। তারা বান্দাদের জন্য তাদের কর্মসমূহ সাব্যস্ত করতে গিয়ে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে। তারা বলেছে, বান্দাই তার নিজের কর্মের স্রষ্টা। এতে আল্লাহর কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং তাদের ধারণায় বান্দাদের কর্মসমূহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন নয়, আল্লাহ তা নির্ধারণ করেননি এবং তার ইচ্ছাও করেননি। বরং বান্দারা নিজেদের স্বাধীন ও মুক্ত ইচ্ছাতেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে।[১৪৭]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছে, বান্দার জন্য এখতিয়ার ও ইচ্ছা রয়েছে। বান্দার কাজ বান্দার দ্বারাই সংঘটিত হয়। তবে সে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করতে পারে না। সে কেবল তাই করে, যা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ "আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা করো তাও তিনি সৃষ্টি করেছেন"। *(সূরা আছ ছ্বফ্ফাত ৩৭:৯৬)* এখানে বান্দাদের জন্য কর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেই কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকবীরের ২৯ নং আয়াতে বলেন:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ "তোমরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না"। এই আয়াতে বান্দাদের জন্য এমন ইচ্ছা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার পরে হয়। কাদার তথা তাক্বদীরের মাসআলা আলোচনা করার সময় এ বিষয়ে অতিরিক্ত বর্ণনা অচিরেই সামনে আসছে ইনশা-আল্লাহ।

তৃতীয়ত: আল্লাহর অঈদ বা শাস্তির ভয় দেখানোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থী। الوعيد অর্থ হচ্ছে আযাবের ভয় দেখানো। তবে এখানে উদ্দেশ্য

শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান নিরর্থক হয়ে যায়। পৃথিবীর কোন আদালতে যখন কোন অপরাধীকে হাযির করা হয়, তখন বিচারকের সামনে গিয়ে অপরাধী যদি বলে আমি এই অপরাধ করিনি; আল্লাহ করেছেন, কোন আদালত তার এ কথাকে সমর্থন করবে না এবং তাকে শাস্তি থেকেও রেহাই দিবে না। মানুষের কাজ মানুষ করে বলেই শাস্তি তাকেই দেয়া হয়। ভালো কাজ করলে পুরস্কারও সে পায়; আল্লাহ নয়। তবে সকল কাজের স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ, বান্দা কোন কিছুরই স্রষ্টা নয়। এ বিষয়টি আমরা শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়াতে আরো বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। তাই পাঠকদেরকে গুরুত্বসহ সে কিতাবটিও পড়ার অনুরোধ করছি।

১৪৭. কাদারীয়াদের এই মত সঠিক নয়। কারণ তারা আল্লাহর সৃষ্টি ও কর্মে অন্যকে শরীক করে ফেলেছে। এই জন্যই তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক হিসাবে নাম করণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়; তারা আরো দাপট দেখিয়ে বলেছে যে, বান্দার কাজ শেষ হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে জানেনও না। নাউযুবিল্লাহ।

হচ্ছে ঐসব আয়াত ও হাদীছ, যাতে পাপীদের জন্য আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। শাইখুল ইসলামের উক্তি: بين المرجئة والوعيدية من القدريـــة وغـــيرهم এর তাৎপর্য হলো আল্লাহর অঈদের (শাস্তি সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীছের) ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অবস্থান হচ্ছে মুরর্জিয়া এবং কাদারীয়াদের ওয়াঈদীয়া ফির্কার লোকদের অবস্থানের মাঝামাঝি। الإرجاء শব্দের দিকে নিসবত করে তাদেরকে المرجئة বলা হয়। الإرجـــاء অর্থ পিছিয়ে দেয়া বা বের করে দেয়া। তারা যেহেতু আমলকে ঈমান থেকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না, তাই তাদেরকে মুরজিয়া বলা হয়। তারা মনে করে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ফাসিক নয়। তারা আরো বলে যে, ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচারে লিপ্ত হওয়া ক্ষতিকর নয়। যেমন কাফির অবস্থায় সৎকাজ করলে সৎকাজ কোন উপকারে আসবে না।[১৪৮]

সুতরাং তাদের নিকট কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার।[১৪৯] সে শাস্তির সম্মুখীন হবে না। তারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম লাগাতে গিয়ে চরম শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। এমনকি তাদের ধারণায় পাপাচারের কারণে ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না এবং কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর ফাসিক হওয়ার হুকুমও লাগানো যাবে না।

আর ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মতে গুনাহগারের জন্য শাস্তির যেই ধমক এসেছে, তা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব। কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ব্যাপারে তারা আরো কড়াকড়ি করে বলেছে যে, সে যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।[১৫০] দুনিয়ার হুকুমে সে ঈমান

---

১৪৮. তবে কাফির যদি ঈমান গ্রহণ করে, তাহলে কুফরীর হালতে যেসব ভালো কাজ করেছে, তা দ্বারাও সে উপকৃত হবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৪৯. মানুষকে মুমিন বানানোর ক্ষেত্রে তাদের এ কথা চরম বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের প্রমাণ করেছে। তাদের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, চুরি, ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যাসহ যত অপরাধই করুক না কেন, ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের কথা থেকে আরো আবশ্যক হয় যে, যারা ঈমান আনয়ন করার পর ফরয বা সুন্নাত কোন আমলই করে না, আর যারা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, তাহাজ্জুদ ছ্বলাত আদায়সহ যাবতীয় সৎকাজে প্রতিযোগিতার সাথে অগ্রসর হয়, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

১৫০. তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন তার উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি। (সূরা আন নিসা: ৯৩) খারিজী, মু'তাযিলা এবং তাদের অনুরূপ সম্প্রদায়ের

থেকে বের হয়ে যাবে।

কিন্তু কবীরা গুনাহ্কারী মুমিনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় ফির্কার লোকদের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলেন যে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অপরাধী এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। তার ঈমানেও কমতি আসবে এবং তাকে ফাসিক বলা হবে। মুরজিয়াদের ন্যায় তারা কবীরা গুনাহ্কারীকে পূর্ণ ঈমানদার বলে না। সে শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ কথাও বলে না। কিন্তু সে ঈমানের গন্ডি থেকে বের হবে না এবং ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সেখানে চিরকাল থাকবেনা। তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে অপরাধের পরিমাণ মুতাবেক তাকে শাস্তি দিবেন।[১৫১] অতঃপর সে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ওয়াঈদীয়া সম্প্রদায়ের মতো এ কথা বলে না যে, ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে এবং পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।

সুতরাং মুরজিয়ারা শুধু ঐসব আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে ঈমান আনলেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই) জান্নাতে যাওয়া যাবে বলে ওয়াদা করা হয়েছে। আর ওয়াঈদীয়ারা (খারিজী ও মু'তাযিলারা) কেবল ঐসব আয়াত ও হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, পাপাচারে লিপ্ত হলে জাহান্নামে যেতে হবে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উভয় প্রকার দলীলকে একত্র করেছেন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন।[১৫২]

লোকেরা এ আয়াত এবং যেসব আয়াতে পাপীদেরকে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে, তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করে বলেছে যে, এ ধমক বাস্তবায়ন করা আল্লাহর উপর আবশ্যক। তাদের মতে কবীরা গুনাহকারীরা ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করে তথায় চিরকাল থাকবে।

১৫১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন"। (সূরা আন নিসা: ৪৮) এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে শির্ক ব্যতীত অন্যসব গুনাহ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে স্বীয় অনুগ্রহে ক্ষমা করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে ইনসাফ স্বরূপ তাকে গুনাহর পরিমাণ শাস্তি দিবেন। আর সে ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না।

১৫২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শরী'আতের কোন একটি দলীলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অন্যান্য দলীলকে বর্জন করে না। তারা সমস্ত দলীলের উপরই আমল করে। তাই তারা উক্ত মাসআলাতেও উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় করে মধ্যপন্থা এভাবে অবলম্বন করেছে যে, কুরআন এবং হাদীছের পরিভাষায় অনেক আমলকে কুফরী বলা হয়েছে এবং তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে

চতুর্থতঃ ঈমান ও দীনের বিভিন্ন পরিভাষাতেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে কাফির বলা, মুসলিম বলা এবং ফাসিক বলার ক্ষেত্রেও তারা মধ্যমপন্থী। দুনিয়া ও আখিরাতে গুনাহগারদেরকে কি রকম শাস্তি দেয়া হবে, তাতেও তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন

জাহান্নামের আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়ার কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে সাথে আবার এমন অনেক দলীলও রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, যেকোন কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম দীন থেকে বের হয়ে যায় না। যতক্ষণ না গুনাহকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত হয়। গুনাহ করলেই যেহেতু কোন মুসলিম কাফির হয়ে যায় না, তাই তাওবা না করে মারা গেলে তাতে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামও আবশ্যক হয় না। একাধিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কবীরা গুনাহ করলেই কোন মুসলিম কাফির হয়ে যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজকরণ এবং অনুগ্রহ বিশেষ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব"। (সূরা আল বাকারা ২:১৭৮) সুতরাং এখানে আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে মুমিন বলেই সম্বোধন করেছেন এবং তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের ভাই হিসাবে উল্লেখ করেছেন। নিঃসন্দেহে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনি ভাই। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মুমিনদের দু'দল যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ইনসাফ কারীদেরকে পছন্দ করেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও"। (সূরা আল হুজরাতঃ ৯-১০) এমনি আরো অনেক দলীল রয়েছে, যার কিছু আমরা শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়াতে উল্লেখ করেছি। সুতরাং আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা প্রমাণ করে যে, (অবিবাহিত) ব্যভিচারী, চোর এবং ব্যভিচারের অপবাদ দানকারীকে হত্যা করা হবে না। বরং তাদের প্রত্যেকের উপর নির্ধারিত শাস্তি কায়েম করা হবে। এটি প্রমাণ করে যে, অনুরূপ গুনাহে লিপ্ত কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যায় না।

করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হারুরী ও মু'তাযিলা এবং মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থানের মাঝখানে। হারুরীরাই খারিজী। হারুরা নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে হারুরী বলা হয়। হারুরা ইরাকের একটি গ্রামের নাম। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ ত্যাগ করে তারা হারুরা নামক গ্রামে একত্রিত হয়েছিল। এই জন্যই তাদেরকে হারুরী বলা হয়।

ওয়াসেল ইবনে আতার অনুসারীদেরকে মু'তাযিলা বলা হয়। মুসলিমদের কেউ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলে তার হুকুম কী হবে, এই মাসআলায় তার মাঝে এবং হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাঝে মতভেদ হওয়ার কারণে ওয়াসেল প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বসরীর মজলিস ত্যাগ করেছিল।[১৫৩] পরবর্তীতে ওয়াসেলের অনুসারীরাও হাসান বসরীর দারস ত্যাগ করে ওয়াসেলের সাথে যোগ দেয়। এতে হাসান বসরী বললেন: إنه قد اعتزلنا অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের মজলিস পরিত্যাগ করেছে। ইমাম হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এর এই কথা থেকেই তাদেরকে মু'তাযিলা বলা হয়। কবীরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিমের হুকুমের ব্যাপারে খারিজী ও মু'তাযিলাদের মাযহাব অত্যন্ত কঠোর। তারা তাকে ইসলামের বাইরে বলে হুকুম লাগিয়েছে। অতঃপর মু'তাযিলারা বলেছে, সে মুসলিমও নয়, কাফিরও নয়; বরং সে ঈমান এবং কুফুরী, -এই দুই স্তরের

---

১৫৩. এ ঘটনা সম্পর্কে আরো যা জানা যায়, তা হচ্ছে একদা হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) এর মজলিস চলছিল। সেখানে একজন শিষ্য প্রশ্ন করলো যে, কোন মুসলিম যদি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়, তার হুকুম কী হবে? জবাবে হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) বললেন, সে মুমিনে ফাসিক তথা ফাসিক মুমিন হিসাবে গণ্য হবে। সে মজলিসে হাসান বসরীর অন্যতম মেধাবী ছাত্র ওয়াসেল ইবনে আতাও ছিল। ওয়াসেল উস্তাদের সাথে উক্ত মাসআলায় খেলাফ (ভিন্ন মত পোষণ) করতে লাগলো। সে বলতে লাগলো, কবীরা গুনাহকারী মুসলিম ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে, কিন্তু কুফরীতে প্রবেশ করবে না; বরং সে ঈমান ও কুফরীর মাঝে ঝুলতে থাকবে। আর সে যদি বিনা তাওবায় মারা যায়, তাহলে পরকালে জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং চিরকালই সেথায় থাকবে। কখনো বের হবে না। এটি ছিল একটি বিদ'আতী কথা, যার পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ ইসলামে এই বিশেষণের কোন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐদিকে হাসান বসরীও বিভিন্ন দলীল প্রমাণের মাধ্যমে ওয়াসেলকে বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওয়াসেল কিছুতেই বুঝতে সক্ষম হলো না। পরিশেষে স্বীয় উস্তাদের সাথে একমত হতে না পেরে মজলিস ত্যাগ করলো এবং মসজিদের অন্য প্রান্তে গিয়ে আলাদা মজলিস তৈরী করলো। এতে করে তারও কিছু ভক্ত ও অনুসারী তৈরী হলো। হাসান বসরী (রাহিমাহুল্লাহ) ওয়াসেলের এই কান্ড দেখে বললেন যে, اعتزل عنا واصل অর্থাৎ ওয়াসেল আমাদের তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাব পরিত্যাগ করেছে। তার এই কথার কারণেই ওয়াসেল এবং তার অনুসারীদেরকে মু'তাযিলা বলা হয়। একটি মাসআলাকে কেন্দ্র করে মু'তাযিলা মাযহাবের যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীতে আরো কিছু মূলনীতি তাতে প্রবেশ করে। এই কিতাবের বিভিন্ন স্থানে এবং শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়ায় আমরা মু'তাযিলা এবং অন্যান্য বিদ'আতী ফির্কার বিভিন্ন মূলনীতি উল্লেখ করেছি। তাই পাঠকদের প্রতি শারহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া গুরুত্বের সাথে পাঠ করার অনুরোধ রইলো।

মাঝখানে অবস্থান করবে।

আর খারিজীরা বলেছে যে, সে কাফির হয়ে যাবে। তবে উভয় দল পরকালের হুকুমে একমত হয়ে বলেছে যে, কবীরা গুনাহকারী যদি সেই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

মুরজিয়া ও জাহমীয়াদের অবস্থান খারিজী ও মু'তাযিলাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির উপর হুকুম লাগাতে গিয়ে তারা চরম শৈথিল্য ও ঢিলামি করেছে এবং তার সাথে সহনশীলতা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করেছে। মুরজিয়াদের কথা হচ্ছে لايضر مع الإيمان معصية অর্থাৎ ঈমান ঠিক থাকলে পাপাচার কোন ক্ষতি করে না। কেননা তাদের মতে শুধু অন্তরের সত্যায়নকে ঈমান বলা হয়। তবে তাদের কারো মতে অন্তরের বিশ্বাসের সাথে জবানের উচ্চারণও জরুরী। কিন্তু তাদের কেউ এই কথা বলেনি যে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তাদের মতে আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে না এবং পাপাচারের মাধ্যমে তা কমে না। সুতরাং পাপাচার ঈমানকে কমিয়ে দেয় না এবং পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তিরও হকদার হয় না। বিশেষ করে যখন পাপাচারকে হালাল মনে করে তাতে লিপ্ত না হবে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত উভয় দলের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তারা বলেছে পাপাচারী পাপাচারে লিপ্ত হলেই ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। ফলে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর ইচ্ছা করলে জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দিবেন। কিন্তু শাস্তি দেয়া হলেও চিরকাল জাহান্নামে রাখা হবে না। যেমন বলে থাকে খারিজী এবং মু'তাযিলারা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বলে যে, পাপাচার ঈমানের মধ্যে কমতি আনয়ন করে এবং পাপাচারী ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশের যোগ্য হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলে সে কথা ভিন্ন। আর কবীরা গুনাহকারী ফাসিক হয়ে যাবে এবং তার ঈমানও ত্রুটিপূর্ণ হবে। তারা মুরজিয়াদের ন্যায় কবীরা গুনাহকারীকে কামেল (পূর্ণ) ঈমানদার বলে না।

পঞ্চমত: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযী ও খারিজীদের তুলনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। ছাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بـــه ومات على ذلك "যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ঈমানদার অবস্থায় সাক্ষাৎ করেছে এবং ঈমান অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে"। রাফেযী নামটি الـــرفض থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। রাফয্ অর্থ বর্জন করা, পরিত্যাগ করা। শিয়াদেরকে রাফেযী বলার কারণ হলো, তারা তাদের অন্যতম ইমাম যায়েদ ইবনে আলী ইবনে

হুসাইনকে বললেন, আপনি আবু বকর ও উমারের নাম উচ্চারণের পর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলা বর্জন করুন। অর্থাৎ তাদের ফযীলত, প্রশংসা ও সুনাম বলা বর্জন করুন। আলী ইবনে হুসাইন তখন বললেন, معاذ الله অর্থাৎ এরূপ করা থেকে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। এতে তারা যায়েদকেই পরিত্যাগ করলো। এ জন্যই তাদেরকে রাফেযী (পরিত্যাগকারী) হিসাবে নাম রাখা হয়েছে। ছাহাবীদের ব্যাপারে রাফেযীদের মাযহাব হচ্ছে, তারা আলী ইবনে আবু তালিব এবং আহলুস বাইতের ফযীলত বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করে থাকে এবং তাদেরকে অন্যসব ছাহাবীদের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, তারা বাকীসব ছাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। বিশেষ করে তিন খলীফা অর্থাৎ আবু বকর, উমার এবং উছমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম কে তারা শত্রু মনে করে, তাদেরকে গালি দেয় এবং তাদের উপর লা'নত বর্ষণ করে। কখনো কখনো তারা কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত বাকী সবাইকে অথবা কতিপয় ছাহাবীকে কাফির বলে।[১৫৪]

খারিজীরা শিয়া ও রাফেযীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে এবং তার সাথে অনেক ছাহাবীকেই কাফির বলেছে,[১৫৫] তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে ও

---

১৫৪. উপরে যা বলা হয়েছে, ছাহাবীদের ব্যাপারে তাদের কথাগুলো তার চেয়েও আরো অধিক জঘন্য। কুরআন ও হাদীছের যেখানেই লা'নতের কথা এসেছে, তা পড়া ও শ্রবণ করার সময় তারা মনে করে যে, এর দ্বারা আবু বকর, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উদ্দেশ্য। তারা আরো বলে যে, ছাহাবীগণ কুরআনের অনেক আয়াত গোপন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ) শুধু তাই নয়; উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর চারিত্রিক পবিত্রতার ব্যাপারে তারা মারাত্মক জঘন্য কথা বলেছে। তাদের এ রকম আরো অনেক খারাপ ও বাতিল আক্বীদাহ রয়েছে, যার কারণে আলেমগণ তারা উম্মাতে ইসলামীয়ার বাইরে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে মারাত্মক বাড়াবাড়ি করে। তারা বলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর আলীই ছিলেন খিলাফাতের বৈধ হকদার। কিন্তু আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জোর করে খিলাফত দখল করে তাকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের কিছু কিছু দল আলীকেই আল্লাহ মনে করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা ইয়া হুসাইন ইয়া হুসাইন বলে যেসব কথা বলে, তা সুস্পষ্ট শির্ক। শিয়া ও রাফেযীদের সম্পর্কে কারবালার ঘটনা সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা পড়ার অনুরোধ রইল। সেখানে তাদের বেশ কিছু অপকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি।

১৫৫. তারা আলী এবং মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়কেই কাফির বলেছে। এ ব্যাপারে খারিজীদের দলীল হচ্ছে আলী এবং মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আল্লাহর কিতাব বাদ দিয়ে মানুষকে বিচারক নির্ধারণ করেছেন, যা কুফরী। আহলে সুন্নাতের কথা হচ্ছে খারিজীদের এই ধারণা মূর্খতার পরিচয় বহন করে। আল্লাহর কুরআন যেহেতু মানুষের সাথে কথা বলে না, কোন না কোন মানুষের মুখ থেকেই তা বের হবে, তাই মানুষকে বিচারক বানানো কুফরী নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ন্যায়পরায়ণ মানুষকে ফায়ছালাকারী ও বিচারক বানাতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

তাদের জান-মাল হালাল করেছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রাফেযী এবং খারিজী এই উভয় দলের বিরোধী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সমস্ত ছাহাবীর সাথেই বন্ধুত্ব রাখে। কারো প্রতি ভালোবাসা পোষণে বাড়াবাড়ি করে না; বরং সকল ছাহাবীর ফযীলত ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে ছাহাবীদেরকেই এই উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মনে করে। এ বিষয়ে সামনে আরো বিবরণ সামনে আসছে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তোমরা শিকার করো না। আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে, যার ফায়ছালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি"। (সূরা আল মায়িদা: ৯৫) সুতরাং বিচারক মানুষই হবে। আল্লাহর কথা মানুষের জবান থেকেই বের হবে।

যেসব ছাহাবী খারিজীদের বুঝিয়ে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর প্রচেষ্টায় অনেকেই খারিজীদের দল ত্যাগ করে ফিরে আসে। অনেকেই আবার খারিজীদের সাথেই থেকে যায়। যারা ফিরে আসেনি, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাহরাওয়ান্দের যুদ্ধে তাদেরকে পরাজিত ও হত্যা করেছেন।

وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لاتنافي بينهما

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে সমুন্নত, আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, তিনি সমস্ত মাখলুকের উপরে এবং সকল মাখলুকের সাথে। মাখলুকের উপরে হওয়া এবং তাদের সাথে থাকা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فصل: وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانِ بِاللهِ الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ؟ وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَهُوَ مَعَكُمْ) أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ؛ فَإِنَّ هَذَا لاَ تُوجِبُهُ، اللُّغَةُ، بَلِ الْقَمَرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، وَهُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرُ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَانَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ، مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَّعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

অনুচ্ছেদ: ইতিপূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়টি উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে (প্রচুর সংখ্যক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে) যা বর্ণিত হয়েছে এবং এই উম্মতের সালাফগণ যেসব বিষয়ের উপর একমত হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করাও আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে শামিল। তার মধ্যে এও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহের উপরে অবস্থিত আরশের উপর এবং সকল মাখলুকের উপর। সেই সাথে তিনি মাখলুকের সাথেও। তারা যেখানেই থাকে না কেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথেই। তারা যা আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তা জানেন। আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে মাখলুকের উপরে থাকা এবং তাদের সাথে

থাকাকে একসাথে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ৪ নং আয়াতে বলেন:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে, তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সাথেই"।

وَهُوَ مَعَكُمْ 'তিনি তোমাদের সাথেই' এ কথার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে মিশে রয়েছেন। আরবী ভাষা এই অর্থকে আবশ্যক করে না। আল্লাহ মাখলুকের সাথে মিশে আছেন, এই ধারণা এই উম্মাতের সালাফদের ইজমার পরিপন্থী এবং আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যেই ফিতরাত (স্বভাব) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তারও খেলাফ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অথচ আল্লাহর জন্যই সর্বোত্তম উদাহরণ, চন্দ্র আল্লাহর অন্যতম একটি নিদর্শন, আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্য হতে ক্ষুদ্র সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। ইহাকে রাখা হয়েছে আসমানে। তারপরও চাঁদ ভ্রমণকারীর সাথেও থাকে এবং গৃহে অবস্থানকারীর সাথেও থাকে। ভ্রমণকারী যেখানে অবতরণ করে এবং যেখানেই চলে চাঁদ তার সাথেই থাকে।[১৫৬]

আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে। তাদের রক্ষক, তাদের সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তা'আলা তার রুবুবীয়াতের অন্যান্য ছিফাতের মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে।

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বিশেষভাবে দু'টি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। (১) আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়া এবং (২) তার মাখলুকের সাথে থাকা।

---

১৫৬. আল্লাহ তা'আলার জন্যই সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম উদাহরণ। এখানে বিষয়টিকে শুধু মানুষের বোধশক্তির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। অন্যথায় কোন উদাহরণ দিয়েই আল্লাহ তা'আলার সুমহান গুণাবলীর কোন একটিকেও বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার যাতের মত যেমন আর কোন যাত নেই, তেমনি তার সুউচ্চ ছিফাতেরও কোন সদৃশ নেই।

শাইখুল ইসলাম একটি সন্দেহ দূর করার জন্য বিশেষভাবে এ দু'টি মাসআলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে থাকা এবং সৃষ্টির সাথে থাকার বিষয়টিকে কেউ কেউ পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে করতে পারে। আবার কেউ এই ধারণাও করতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথেই, এর মানে হচ্ছে আল্লাহর ছিফাতগুলো মাখলুকদের ছিফাতের মতোই[১৫৭] এবং তিনি আমাদের সাথে একদম মিশে আছেন। যেমন এক মাখলুক অন্য মাখলুকের সাথে মিশে থাকে। সুতরাং প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সমস্ত সৃষ্টির উপরে আরশের উপর সমুন্নত হয়ে আবার সৃষ্টির সাথে না মিশে তাদের অতি নিকটবর্তী হন কিভাবে?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এই সন্দেহের একাধিক জবাব দিয়েছেন:

প্রথম জবাব: আরবদের যেই ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে তা এই অর্থকে আবশ্যক করে না। কেননা مع শব্দটি ভাষাগত দিক থেকে সাধারণ সান্নিধ্য ও নিকটত্ব অর্থ প্রদান করে; সহাবস্থান, সংমিশ্রণ, লাগালাগি এবং সংস্পর্শ ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে না। কেননা আপনি বলে থাকেন, زوجتي معي আমার স্ত্রী আমার সাথেই। অথচ এই কথা বলার সময় আপনি থাকেন একস্থানে, আপনার স্ত্রী থাকে অন্য স্থানে। আপনারা আরো বলে থাকেন, مازلنا نسير والقمر معنا আমরা পথ চলছিলাম, চাঁদ আমাদের সাথেই ছিল। অথচ চাঁদ থাকে আসমানে, থাকে মুসাফিরের সাথে এবং থাকে স্বদেশে অবস্থানকারীর সাথেও। সাধারণ একটি সৃষ্টি চাঁদের ব্যাপারে যদি এটি বলা সঠিক হয়, তাহলে যেই মহান স্রষ্টা সবচেয়ে বড় তার শানে এটি বলা কেন জায়েয হবে না যে, তিনি আসমানের উপরে আরশের উপর থেকেও আমাদের সাথে?[১৫৮]

---

১৫৭. অর্থাৎ এক মাখলুক যেমন অন্য মাখলুকের সাথে থাকে, আল্লাহ মাখলুকের সাথে থাকা ঠিক সেরকমই। (নাউযুবিল্লাহ), এটা বলা মারাত্মক ভুল।

১৫৮. শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এই চাঁদের অবস্থা যদি এ রকম হয়, অথচ তা সাধারণ একটি সৃষ্টি। আমরা বলি চাঁদ আমাদের সাথে। অথচ তা আকাশে। এই উভয় কথা পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। এখানে এটিও আবশ্যক হয় না যে, চাঁদ আমাদের সাথে সংমিশ্রিত ও মিলিত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং যেসব আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে রয়েছেন, সেসব আয়াতকে আমরা বাহ্যিক অর্থেই রেখে দেবো এবং আমরা বলবো, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের সাথে। একই সাথে তিনি আসমানে এবং সকল সৃষ্টির উপরে। সুতরাং আমাদের প্রভু প্রকৃতপক্ষেই আসমানে এবং প্রকৃতপক্ষেই আমাদের সাথে। এই উভয় কথার মধ্যে কোন পরস্পরিক বিরোধ নেই। আল্লাহ তা'আলা অনেক উপরে থেকেও মাখলুকের অতি নিকটে।

দ্বিতীয় জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে একদম মিশে আছেন, এই কথা উম্মতের সালাফে সালেহীন তথা ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারীদের ইজমার পরিপন্থী। অথচ তারা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং উত্তম আদর্শ। তারা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমুন্নত, সকল সৃষ্টির উপরে এবং তাদের থেকে আলাদা। তারা আরো একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইলমের মাধ্যমে তার সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। তারা আল্লাহ তা'আলার বাণী: وهو معكم এর ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন। অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথেই।

তৃতীয় জবাবঃ আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে নন বরং তাদের সাথে মিশে আছেন, -এই কথা মানুষের ঐ স্বভাব-প্রকৃতির দাবীর পরিপন্থি, যা দিয়ে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে যেই স্বভাব স্থাপন করেছেন, এই বিশ্বাস তার বিপরীত। কেননা আল্লাহ তা'আলা যে মাখলুকের উপরে, সৃষ্টিগত স্বভাব অনুযায়ী মাখলুক এই কথার স্বীকৃতি প্রদান করে। মানুষ বিপদাপদ ও সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়ার সময় উপরের দিকে অন্তরকে ধাবিত করে। ডান দিকে কিংবা বাম দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এ বিষয়ে কারো

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবসমূহে এ কথাই সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেন, যেসব আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সাথে, সেসবের তাবীল (ব্যাখ্যা) করার দরকার নেই। বরং আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে আরশের উপর সমুন্নত।

সুতরাং তিনি আমাদের সাথে। এই কথা সত্য। তিনি আরশের উপর এই কথাও সত্য। তিনি দুনিয়ার আসমানে নামেন। তাও সত্য। অথচ তিনি সবকিছুর উপরে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কেউ এই কথা কখনো অস্বীকার করে না। তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই দুনিয়ার আসমানে নামেন, তারা সকলেই একমত যে, তিনি উপরে। কেননা আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতগুলো মাখলুকের ছিফাতের মত নয়।

এখন প্রশ্ন হলো আল্লাহ তা'আলা কি স্বীয় সত্তাসহ আমাদের সাথে? উত্তরে বলবো যে, এই কথা বলা থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। কেননা এতে আল্লাহর শানে বাতিল ধারণার উদ্রেক হতে পারে। এর মাধ্যমে ঐসব লোকেরা দলীল গ্রহণ করতে পারে, যারা হুলুলে (সর্বেশ্বরবাদে) বিশ্বাসী। অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে সবকিছুর সাথেই আল্লাহ মিশে আছেন এবং সব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান। (নাউযুবিল্লাহ)

আরো প্রশ্ন হলো আমরা কি এই কথা বলতে পারি যে, আল্লাহ কি স্বীয় সত্তাসহ নেমে আসেন? এর জবাবে বলবো যে, এই কথা বলার প্রয়োজন নেই। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নেমে আসাকে আল্লাহর আদেশ বা রহমত আসার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চাইবে কেবল তার প্রতিবাদেই আমরা তা বলবো। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। এটি কেবল ঐ সৃষ্টিগত স্বভাবের দাবীতেই করে থাকে, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৫৯]

চতুর্থত জবাব: আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে যে সংবাদ দিয়েছেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতাওয়াতির সূত্রে যা বর্ণিত হয়েছে, এই ধারণা তার বিপরীত। কুরআন ও হাদীছে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির উপরে এবং আরশেরও উপরে। সেই সাথে তিনি সৃষ্টির সাথেও তারা যেখানেই থাকুক না কেন। মুতাওয়াতির হাদীছ,

هو ما رواه جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء

যার সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এমন একদল রাবী তাদের অনুরূপ আরেক দল রাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, মিথ্যার উপর যাদের একমত হওয়া সাধারণত অসম্ভব হয়।

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের উপরে এবং তাদের সাথে, এ বিষয়ে অনেক আয়াত এবং বহু হাদীছ রয়েছে। সূরা আল হাদীদের ৪ নং আয়াত তার মধ্যে অন্যতম, যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) উপরে উল্লেখ করেছেন।

---

১৫৯. পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহর নিকট দু'আ করার সময় উপরের দিকে হাত উঠানো এবং নিজের প্রয়োজন সৃষ্টিকর্তার কাছে পেশ করার সময় অন্তরকে উপরের দিকে ধাবিত করা শুধু মানুষের স্বভাব নয়; বরং অন্যান্য জীব-জন্তু এবং কীটপতঙ্গও প্রয়োজনের সময় উপরের দিকে হাত-পা ও অন্তর ধাবিত করে।

আল্লাহর নাবী সুলায়মান ইবনে দাউদ (আলাইহিস সালাম) একদা তার অনুসারীদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন একটি পিঁপড়া চিৎ হয়ে পিঠের উপর শয়ন করে আকাশের দিকে পা গুলো উঠিয়ে আল্লাহর কাছে এই বলে বৃষ্টি প্রার্থনা করছে, اَللّٰهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ, لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ হে আল্লাহ! আমরা তোমার এক সৃষ্টি। তোমার বৃষ্টির (রহমতের) পানি ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পিঁপড়ার এই কথা শুনে তিনি ফেরত আসছিলেন। অনুসারীরা তাকে ফেরত আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা ফেরত যাও। কারণ অন্যদের দু'আর বদৌলতেই তোমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হবে। তারা বলল, আমরা তো কাউকে দু'আ করতে দেখিনি। তখন তিনি তাদেরকে আকাশের দিকে পা উঠিয়ে একটি পিঁপড়ার আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চেয়ে দু'আ করার কথা জানালেন। (সুবুলুস সালাম, হা/ ৪৮৬)

এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ পিঁপড়াটি এবং তার দলের অন্যান্য পিঁপড়াগুলো আল্লাহর ছিফাতে অবিশ্বাসী জাহমীয়া সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়ে আল্লাহ সম্পর্কে অধিক অবগত। আল্লামা শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান বলেন, জাহমীয়াদের চেয়ে পিঁপড়াই অধিক উত্তম।

وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ، مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ শাইখুল ইসলাম বলেন: **مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে থেকেও মাখলুকের নিকটে। তাদের পর্যবেক্ষক এবং তাদের সম্পর্কে অবগত:** এখানে তিনি পূর্বের কথাকেই পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন। এর পূর্বে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে এবং মাখলুকের সাথে। এখানেও তিনি আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নাম সমূহের মধ্য হতে الرقيب (পর্যবেক্ষক) এবং المهيمن (সংরক্ষক) -এই নাম দু'টি উল্লেখ করে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটেই। আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১ নং আয়াতে বলেন: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া নজর রাখেন"।এখানে رقيب অর্থ হচ্ছে তিনি তার বান্দাদের সকল অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তার বান্দাদের নিকটে। আল্লাহ তা'আলা সূরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ﴾

"আল্লাহই সেই মহান সত্তা, যিনি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি বাদশাহ, অতীব পবিত্র, সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, হিফাযতকারী, পরাক্রমশালী, প্রবলশক্তিধর এবং অতীব মহিমান্বিত"।

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِن مَّعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ. আল্লাহ তা'আলা তার রুবুবীয়াতের অন্যান্য ছিফাতের মাধ্যমে তিনি মাখলুকের উপরে এবং তাদের অতি নিকটে: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার রুবুবীয়াতের দাবী হচ্ছে তিনি স্বীয় সত্তাসহ সব সৃষ্টির উপরে, তিনি বান্দাদের সকল কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবগত। সেই সাথে তিনি তার ইলমের মাধ্যমে তাদের অতি নিকটে এবং তিনি তাদেরকে সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন। তিনি তাদের সকল বিষয় পরিচালনা করেন, তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তার বিনিময় প্রদান করেন।

مايجب اعتقاده في علوه ومعيته سبحانه وتعالى ومعنى كونه سبحانه وتعالى في السماء وأدلة ذلك

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে এবং মাখলুকের সাথে থাকার ব্যাপারে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক, তিনি আসমানে থাকার অর্থ ও এর দলীলসমূহ।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ مِثْلِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : (فِي السَّمَاءِ) أَنَّ السَّمَاءَ تُظِلُّهُ أَوْ تُقِلُّهُ ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) وَهُوَ الذي (يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا (وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ) (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ)

আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন, তিনি আরশের উপরে। আরো বলেছেন যে, তিনি আমাদের সাথে। প্রকৃতপক্ষেই তিনি আরশের উপরে এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি আমাদের সাথে। এইসব কথার তাহরীফ (পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন) করার প্রয়োজন নেই। তবে আল্লাহ তা'আলার কালামকে বাতিল ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন في السماء অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে। আলেম ও মুমিনদের সর্ব সম্মতিক্রমে এই কথা বাতিল। কেননা আল্লাহ তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৫)* তিনি (আল্লাহ) সেই সত্তা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে অনড় রেখেছেন, যাতে ওরা স্থানচ্যুত না হয়। *(সূরা ফাত্বির ৩৫:৪১)* আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তার হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পতিত হয় না"। *(সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৫)* "তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তার হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত"। *(সূরা আর রূম ৩০:২৫)*

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা তার নিজের সম্পর্কে যেই সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, এ বিষয়ে যা বিশ্বাস করা আবশ্যক,

শাইখুল ইসলাম এখানে তা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেমন সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি আরশের উপরে এবং তিনি আমাদের সাথেও, তার উপর ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। এই কথার তাবীল (ব্যাখ্যা) করা জায়েয নয় এবং তার বাহ্যিক অর্থকে পরিবর্তন করাও বৈধ নয়। যেমন ব্যাখ্যা করে থাকে জাহমীয়াদের মুআত্তিলা সম্প্রদায় এবং মু'তাযিলা ও তাদের অনুরূপ ফির্কার লোকেরা। তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষে আরশের উপরে সমুন্নত নন; বরং আরশের উপর সমুন্নত হওয়া মাজায তথা রূপকার্থবোধক। তাই তারা الاستواء على العرش আরশের উপর আল্লাহ তা'আলার সমুন্নত হওয়ার ব্যাখ্যা এভাবে করে থাকে যে, الاستيلاء على الملك অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার রাজত্ব দখল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপরে রয়েছেন, এই কথার ব্যাখ্যায় তারা বলে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে علو القهر والقدرة অর্থাৎ আল্লাহর প্রতাপ, শক্তি ও তার ক্ষমতা সকলের উপরে। তারা অনুরূপ আরো এমন বাতিল ব্যাখ্যা করে থাকে, যা আল্লাহ তা'আলার কালামকে তার আসল অর্থ থেকে স্থানান্তরের শামিল। বিদ'আতীদের কেউ কেউ বলে থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে, এই কথার অর্থ হচ্ছে তিনি সর্বত্র বিরাজমান, উপস্থিত এবং তিনি প্রত্যেক স্থানেই রয়েছেন। যেমন বলে থাকে জাহমীয়াদের সর্বেশ্বরবাদী সম্প্রদায় এবং অন্যরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথার অনেক উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলার এ সম্পর্কিত কালামকে বাতিল ধারণা থেকে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন في السماء **অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমানে, এই কথা থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করে আছে অথবা আসমান আল্লাহকে ঢেকে রাখছে ও ছায়া দিচ্ছে:** এখানে تقله অর্থ হচ্ছে تحمله 'তাকে বহন করছে'। আর تظله মানে تستره 'তাকে ঢেকে রেখেছে'। الظلة 'ছায়া' বলা হয় ঐ জিনিসকে, যা তোমাকে উপরের দিক থেকে ঢেকে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আসমানে থাকার অর্থ এই নয় যে, আসমান তাকে বহন করছে, (নাউযুবিল্লাহ) এবং আসমান তাকে ঢেকে রেখেছে ও ছায়া দিচ্ছে। যে ব্যক্তি এই ধারণা পোষণ করবে, সে দুই কারণে মারাত্মক ভুলের মধ্যে পতিত হবে।

প্রথম কারণ: আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করছে অথবা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা আলেমদের ও ঈমানদারদের ইজমার পরিপন্থী।[১৬০]

---

১৬০. কেননা মাখলুকের মধ্যে এ স্বভাব দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে অনুভব করে, তার স্রষ্টা তার ভিতরে নয় এবং তার সাথে মিশ্রিত ও মিলিতও নয়; বরং তার বক্তিসত্তা থেকে আলাদা ও ভিন্ন। সে যখন আল্লাহকে ইয়া আল্লাহ! বলে ডাক দেয়, তখন বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তা'আলা তার সত্তা থেকে আলাদা। সে কখনোই ধারণা করে না যে, আল্লাহ তার ভিতরেই রয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ

আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে এবং তার সৃষ্টির বাইরে বা তার সৃষ্টি থেকে আলাদা। তার পবিত্র সত্তার মধ্যে মাখলুকের কোন স্বভাব নেই এবং সৃষ্টির মধ্যেও তার যাতের কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ﴾

"তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়েছ যে, আসমানে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? *(সূরা আল মুলক ৬৭:১৬-১৭)*[১৬১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, এখানে আসমান দ্বারা যদি আমাদের উপরে নির্মিত আসমান উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এখানে في হরফে জারটি **على** অর্থে ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ على السماء 'আল্লাহ তা'আলা আসমানের উপরে'। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ "এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের মধ্যে শুলিবিদ্ধ করবো"। এখানেও في হারফে জারটি على অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডের উপর শুলিবিদ্ধ করবো। আর যদি السماء দ্বারা العلو (উপর) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে في السماء অর্থ হবে في العلو অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা উপরে। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

দ্বিতীয় কারণ: আসমান আল্লাহ তা'আলাকে বহন করছে এবং আসমান তাকে ঢেকে রেখেছে, এই ধারণা কুরআনের ঐসব সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী, যা আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও সৃষ্টির প্রতি তার অমুখাপেক্ষীতার প্রমাণ করে। বরং সকল সৃষ্টিই আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ "আল্লাহ তা'আলার কুরসী সমস্ত আসমান ও যমীন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে" *(সূরা আল*

মাখলুকের মধ্যে আছেন, মিশে আছেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। এ ধারণা শরী'আতের দলীল, মানুষের বোধশক্তি এবং স্বভাব-প্রকৃতির দাবীর পরিপন্থী।

১৬১. আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত মাখলুকের উপরে, -এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ "তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন"। (সূরা আন নাহ্ল: ৫০) আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন, تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ "ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়"। (সূরা আল মা'আরিজ: ৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ "আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন"। (সূরা আস সাজদাহ:৫) কুরআন ও সুন্নাহয় এ রকম আরো অনেক দলীল রয়েছে। কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে এক হাজার দলীল উল্লেখ করেছেন। সৃষ্টির উপরে হওয়া আল্লাহর সত্তাগত ছিফাত। কোন অবস্থায়ই তা আল্লাহ থেকে আলাদা হয় না।

বাকারা ২:২৫৫)। আরশের মধ্যে কুরসী একটি বিশাল সৃষ্টি। ইহা আসমান ও যমীনের চেয়ে বড়। আরশ কুরসীর চেয়েও অনেক বড়। আসমান ও যমীনসমূহ যদি কুরসীর চেয়ে ছোট হয়, কুরসী যদি আরশের চেয়ে ছোট হয় এবং আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবকিছু থেকে বড়, তাহলে আসমান কিভাবে আল্লাহকে তার নিজের মধ্যে পুরে রাখবে বা তাকে বহন করবে অথবা ছায়া দিবে কিংবা ঢেকে রাখবে? আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ﴾

আসলে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে অটল ও অনড় রেখেছেন। আসমান ও যমীন যদি স্বীয় স্থান থেকে সরে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে আর কেউ তাদেরকে স্থির রাখার ক্ষমতা রাখে না। *(সূরা আল ফাত্বির ৩৫:৪১)* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর তিনিই আকাশকে এমনভাবে ধরে রেখেছেন, যার ফলে তার হুকুম ছাড়া তা পৃথিবীর উপর পড়ে যায় না"। *(সূরা আল হাজ্জ ২২:৬৫)* আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾

"আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও রয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবী তার হুকুমেই সুপ্রতিষ্ঠিত" *(সূরা আর রূম ৩০: ২৫)*। উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, আসমান ও যমীন আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহই আসমানকে ধরে রেখেছেন, যাতে তা স্বীয় স্থান থেকে সরে না যেতে পারে এবং তিনি আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তা যমীনের উপর পড়ে না যায়। একমাত্র আল্লাহর আদেশেই আসমান দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং ইহা জানার পর এই কথা বোধগম্য নয় যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং আসমান তাকে বহন করছে কিংবা ছায়া দিচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা এ বাতিল ধারণার অনেক উর্ধ্বে।[১৬২]

১৬২. এ ধারণা বাতিল যে, আরশের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন রয়েছে বলেই তিনি আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন এবং আসমানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী বলেই আসমান তাকে বহন করে রেখেছে। এ রকম ধারণা যারা করে, তারা আল্লাহর যথাযথ ক্ষমতাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। কোন মাখলুকের প্রতি আল্লাহর প্রয়োজন পড়বে তো দূরের কথা; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহেই সব মাখলুক টিকে আছে। আরশ, আসমান-যমীনসহ সকল মাখলুকই তার প্রতি মুখাপেক্ষী। তিনিই এগুলোর মালিক ও প্রভু।

وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لاينافي علوه وفوقيته

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির নিকটবর্তী। সেই সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তার মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া উপরে থাকার পরিপন্থী নয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ وَهُوَ عَلِيٌّ فِي دُنُوِّهِ قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের অতি নিকটবর্তী হন এবং তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন। আল্লাহ তা'আলার এ ছিফাত দু'টির প্রতি বিশ্বাস করা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তিনি নিজেকে যেসব সুউচ্চ গুণাবলী দ্বারা বিশেষিত করেছেন, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে শামিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা ঐ দু'টি ছিফাতকে অর্থাৎ মাখলুকের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাদের আহবানে সাড়া দেয়াকে একই আয়াতে একত্র করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

"আর হে নাবী! আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকের জবাব দেই " *(সূরা আল বাকারা ২:১৮৬)* নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে"।[১৬৩]

১৬৩. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৫৯৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭০৪, আবূ দাউদ হা/১৫২৬ ।

আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐসব আয়াত ও হাদীছের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা আল্লাহর সমস্ত সুউচ্চ ছিফাতের কোনো সদৃশ নেই। তিনি নিকটে থেকেও সৃষ্টির উপরে এবং উপরে থেকেও তাদের নিকটে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির উপরে এবং তিনি স্বীয় আরশের উপর সমুন্নত। পূর্বোক্ত অধ্যায়সমূহে শাইখুল ইসলাম দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ইহা প্রমাণ করার পর এই অধ্যায়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা উপরে, এই বিশ্বাসের সাথে আরো বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনি মাখলুকের অতি নিকটে। আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে, এই কথা বিশ্বাস করাও আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মাখলুকের অতি নিকটে এবং তিনি মাখলুকের দু'আ শ্রবণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি বিশেষণকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নিকটে থাকা ও দু'আ শ্রবণ করা, এ দু'টি বিশেষণ আল্লাহ তা'আলা সূরা আল বাকারার ১৮৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

"আর হে নাবী! আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের কাছেই। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দেই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহবানে সাড়া দেয়া এবং আমার উপর ঈমান আনয়ন করা। এতে আশা করা যায় যে, তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে"।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট আগমন করল। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ কি আমাদের নিকটে যে, আমরা তাকে নিরবে ডাকবো? নাকি তিনি আমাদের থেকে অনেক দূরে যে, উঁচু আওয়াজে ডাকবো?

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[১৬৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন: فإني قريب আমি আহবানকারীর অতি নিকটে। সে যখন আমাকে ডাকে, আমি তখন তার ডাকে সাড়া দেই। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দু'আ চুপিসারেই করা উচিত। দু'আতে

---

১৬৪. দেখুন তাফসীরে ইবনে জারীর আত্ তাবারী, ইবনে আবী হাতিম এবং অন্যান্য।

আওয়াজ উঁচু করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"তোমাদের কেউ বাহনে আরোহন করা অবস্থায় তার বাহনের ঘাড়ের যত নিকটবর্তী থাকে, তোমরা যাকে আহবান করছো, তিনি তার চেয়েও অধিক নিকটে"। এই হাদীছের ব্যাখ্যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছে দলীল পাওয়া যাচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে যে ব্যক্তি দু'আ করে, তিনি জবাব দেয়ার মাধ্যমে তার নিকটবর্তী হন। এই নিকটবর্তী হওয়া আল্লাহ তা'আলা উপরে থাকার পরিপন্থী নয়। এ জন্যই শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্য় যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা ঐসব আয়াত ও হাদীছের পরিপন্থী নয়, যাতে বলা হয়েছে যে, তিনি মাখলুকের উপরে রয়েছেন। কেননা সবগুলোই সত্য। সত্য বিষয় কখনো পরস্পর বিরোধী হয় না। আল্লাহ তা'আলার সুউচ্চ ছিফাতের কোন সৃদশ নেই। আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের ব্যাপারে এই কথা বলা যাবে না যে, তিনি যখন সৃষ্টির উপরে থাকবেন, তখন মাখলুকের সাথে থাকেন কিভাবে? কেননা আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণেই এই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। ভুল ধারণাটি হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে মাখলুকের সাথে কিয়াস করা। এই কিয়াস বাতিল। কেননা لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ আল্লাহ তা'আলার কোন সদৃশ নেই।

অতএব একই সাথে উপরে ও নিকটে থাকা আল্লাহ তা'আলার সুমহান ছিফাতের মধ্যে মিলিত হতে পারে। কেননা তিনি সর্বাধিক মহান, সবেচেয়ে বড়, মহামহিম এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে আছেন। একজন বান্দার হাতে একটি সরিষার দানা যেমন, বিশাল বিশাল সাতটি আসমান আল্লাহ তা'আলার হাতের মধ্যে ঠিক ঐ পরিমাণ স্থান দখল করে। সুতরাং যার বড়ত্বের কিছু দিক এ রকমই, তিনি কত বড়!! যিনি এত বড়, তার জন্য আরশের উপরে থাকা এবং যখন ইচ্ছা আরশের উপরে থেকেই মাখলুকের নিকবর্তী হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা علي في دنوه قريب في علوه "নিকটে থেকেও উপরে এবং উপরে থেকেও নিকটে"। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলগুলো এ কথারই প্রমাণ করে। এই কথার উপর মুসলিম মিল্লাতের আলেমগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।[১৬৫] আল্লাহ তা'আলার

১৬৫. তাদের এ কথার কোন বিরোধী না থাকাই ইজমা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ। কেউ যদি বিরোধীতা করতো, তাহলে অবশ্যই আমরা তা জানতাম। আমরা যেহেতু কোন বিরোধী পাইনি, তাই বুঝা গেল এ কথা সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এবং তাতে আলেমদের ইজমা হয়েছে।

অন্যতম সুমহান ছিফাত হচ্ছে عَلِيٌّ فِي دنوه "তিনি মাখলুকের নিকটে থাকা অবস্থায়ও উপরে থাকেন" এবং قريب فِي علوه "আরশের উপরে থাকা অবস্থায়ও মাখলুকের নিকটে থাকেন"।[১৬৬]

১৬৬. যদিও আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, তারপরও বলা যায় যে, বর্তমানে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন এমন অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার উপরে থাকা এবং মাখলুকের সাথে ও নিকটে থাকার বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে। আমরা প্রচার মাধ্যম কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে বহু দূরে অবস্থানকারী কারো কথা শুনতে পাই, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে তাকে একদম কাছে ও সামনে দেখতে পাই এবং তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতেও দেখি। মহান আল্লাহর কোন সৃষ্টি যদি বহু দূরে থেকেও অন্যের একদম কাছে ও সামনে ভাসতে পারে, তাহলে যেই মহান আল্লাহ সবকিছুর একমাত্র স্রষ্টা, তার ব্যাপারে কিভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে, মাখলুকের বহু উপরে থেকে তাদের নিকটবর্তী হওয়া অসম্ভব? সাধারণ একটি সৃষ্টি হয়েও মানুষের পক্ষে যদি এতকিছু করা সম্ভব, দূরের বস্তুকে কাছে দেখা সম্ভব, তাহলে যেই মহান স্রষ্টার জন্য কোন কিছুই অসম্ভব নয়, তার জন্য দূরে থেকেও কাছে থাকা এবং নিকটে থেকেও উপরে থাকা মোটেই অসম্ভব নয়।

وجوب الإيمان بأن القرأن كلام الله حقيقة

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, কুরআন প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তা'আলার কালাম।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإِلَيْهِ يَعُودُ وَأَنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ حَقِيقَةً لَا كَلَامُ غَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارَةٌ بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانِيهِ لَيْسَ كَلَامُ اللَّهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এবং তার কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। তা আল্লাহর কালাম ও ছিফাত, মাখলুক নয়। তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে এবং আখিরী যামানায়[১৬৭] তার দিকেই ফিরে যাবে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। এ কুরআন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করেছেন। তা প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয়।[১৬৮]

---

১৬৭. আখিরী যামানায় এক রাতেই কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন মানুষের অন্তর এবং মুসহাফ থেকে কুরআন উঠে যাবে। তাদের অন্তরে ও মুসহাফে কুরআনের কোন অংশই অবশিষ্ট থাকবে না। পৃথিবী তখন পাপাচারে ভরে যাবে। এমনকি আল্লাহ আল্লাহ বলার মত কোন লোক থাকবে না। তখন সেই নিকৃষ্ট লোকদের উপর ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

১৬৮. কুরআন ছাড়া আরো যেসব আসমানী কিতাব রয়েছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার কালাম। যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি। তাতে যেসব আদেশ-নিষেধ ও হুকুম-আহকাম রয়েছে তাও আল্লাহ তা'আলার কালাম। আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য ছিফাতের মতো কথা বলা ছিফাতটিও কাদীম (প্রাক্তন, আদি, চিরন্তন ও অবিনশ্বর)। তিনি প্রথম থেকেই এই বিশেষণে বিশেষিত। আর কথা বলা যেহেতু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, তিনি যখন ইচ্ছা কথা বলেন, সে হিসেবে আল্লাহর কথাগুলো নিত্য-নতুন হয়। তিনি তুর পাহাড়ে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন, মিরাজের রাত্রিতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলেছেন। ক্বিয়ামতের দিনও আদম (আলাইহিস সালাম) এর সাথে কথা বলবেন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে রসূলদের কাছে যেসব কালাম ও কিতাব এসেছে, তাও আল্লাহর কালাম। অতীতে তিনি কথা বলেছেন, এখনো তিনি কথা বলার

কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর কালামের বিবরণ অথবা আল্লাহ তা'আলার সত্তায় যে কালাম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা প্রকাশের মাধ্যম। মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কেননা কোন কালাম সর্বপ্রথম যার নিকট থেকে শুরু হয়, ঐ কালামকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয় না। কুরআনের অক্ষরগুলো এবং অর্থসমূহ আল্লাহ তা'আলারই কালাম। কুরআনের মর্মার্থগুলো ব্যতীত শুধু অক্ষরগুলোই যে আল্লাহর কালাম, তা নয় এবং তার অক্ষরগুলো ছাড়া শুধু মর্মার্থগুলোই যে তার কালাম, তাও নয়; বরং অক্ষরসমূহ এবং মর্মার্থসমূহ মিলেই আল্লাহর কালাম।

.....

ব্যাখ্যাঃ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের রূকনসমূহের অন্যতম। ঈমানের এ দু'টি মূলনীতির মধ্যে এ বিশ্বাসও শামিল যে, কুরআন আল্লাহর কালাম। কেননা আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আল্লাহর সুমহান ছিফাতগুলোর প্রতি ঈমানকেও শামিল করে। আল্লাহর কালাম তার সুমহান ছিফাতসমূহের মধ্যেই গণ্য। কালামকে আল্লাহ তা'আলা নিজের দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। ছিফাতকে তার মাউসুফের দিকে ইযাফাত করার যে নিয়ম রয়েছে, এটি হচ্ছে সেই নিয়মের ইযাফত। আল্লাহর ছিফাতসমূহ মাখলুক নয়। সুতরাং আল্লাহর কালামও মাখলুক নয়। অনেক ফির্কা এই মাসআলায় মতভেদ করেছে। তাদের মতে কুরআন মাখলুক। (নাউযুবিল্লাহ)। যারা কুরআনকে মাখলুক বলে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তাদের কতিপয়ের মত এ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

এক. জাহমীয়াদের মতামতঃ তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন না। তিনি অন্যের মধ্যে কালাম সৃষ্টি করেছেন। সেই কালামকেই তার দিকে সম্বন্ধ করে বর্ণনা করা হয়। তাই তাদের মতে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলার দিকে কালামের সম্বন্ধ করা হয়, প্রকৃত অর্থে নয়। কেননা তিনি কালাম সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি কথা বলেন মানে অন্যের মধ্যে কথা সৃষ্টি করেন। আল্লাহর কালাম সম্পর্কে এই কথা বাতিল। এই কথা কুরআন ও হাদীছের দলীল বিরোধী এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোধগম্য নয়। সালাফদের কথা এবং মুসলিমদের ইমামগণের মতেরও বিরোধী।

বিশেষণে বিশেষিত, যখন ইচ্ছা কথা বলেন এবং ভবিষ্যতেও কথা বলবেন। আল্লাহ তা'আলার যেমন শুরু ও শেষ নেই, তেমনি তার ছিফাতেরও শুরু এবং শেষ নেই। কালামের ব্যাপারটিও সেরকম। আল্লাহ তা'আলা সবসময় কথা বলার গুণে গুণান্বিত। (আল্লাহই সর্বাধিক অবগত রয়েছেন)

কেননা প্রকৃতপক্ষে যে কথা বলতে পারে না অথবা যার গুণাবলীর মধ্যে 'কথা বলা' বিশেষণ নেই, তাকে متكلم (বক্তা) বলা হয় না। সুতরাং কিভাবে এই কথা বলা যেতে পারে যে, قال الله "আল্লাহ বলেছেন", অথচ বাস্তবে এর প্রবক্তা আল্লাহ তা'আলা নন; বরং অন্য কেউ? কিভাবেই বা এটি বলা জায়েয হতে পারে যে, هذا كلام الله "এটি আল্লাহর কালাম", অথচ বাস্তবে তা অন্যের কালাম; আল্লাহর নয়?!

শাইখুল ইসলাম বলেন, কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শুরু হয়েছে এবং তার দিকেই ফিরে যাবে। কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতপক্ষেই কথা বলেছেন। তিনি এ কুরআন মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিল করেছেন, তা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর কালাম; অন্যের কালাম নয়: এই বক্তব্যের মাধ্যমে শাইখের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাহমীয়া ফির্কার প্রতিবাদ করা। তারা বলে, কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে শুরু হয়েছে এবং তিনি কুরআনের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে কথা বলেননি; বরং রূপক অর্থে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলা হয়েছে। অথচ তা অন্যের কালাম। আল্লাহর দিকে কুরআনকে সম্বন্ধ করার কারণ হলো, তা আল্লাহর সৃষ্টি। কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে শুরু হয়েছে, এ কথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা থেকেই তা বের হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে এবং তিনি এর মাধ্যমে কথা বলেছেন। এখানে مِنْ হরফে জারটি সীমানার শুরু বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তার দিকেই ফিরে যাবে: অর্থাৎ কুরআন পুনরায় আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। কেননা আখিরী যামানায় কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। মানুষের অন্তরে কুরআনের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং কাগজেও লিখা থাকবে না। এটি ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। অথবা কুরআন আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে, এ কথার অর্থ এটাও হতে পারে যে, কুরআনকে কেবল আল্লাহর দিকেই সম্বন্ধ করা হবে।

দুই. কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মত: অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে কুল্লাবের অনুসারী কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তারা বলে কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালামের বিবরণ। তাদের মতে, كلام الله هو المعنى القائم في نفسه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم "আল্লাহর কালাম বলতে এমন মর্মার্থ উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে যুক্ত। আল্লাহর হায়াত এবং ইলমের মতোই এটি তার সত্তার জন্য আবশ্যক। আল্লাহর কালাম তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে এই মর্মার্থটি মাখলুক তথা সৃষ্টি নয়। অক্ষর দ্বারা গঠিত শব্দমালা এবং সেগুলো উচ্চারণের আওয়াজসমূহ সৃষ্টি। এগুলো আল্লাহর কালামের হেকায়াত (বিবরণ); এগুলো হুবহু আল্লাহর কালাম নয়।

তিন. আশায়েরাদের মত: আবুল হাসান আল-আশআরী[১৬৯] এর অনুসারীগণ বলে থাকে, কুরআন আল্লাহর কালাম প্রকাশের ইবারাত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য। সুতরাং তাদের মতে আল্লাহর কালাম হচ্ছে এমন এবারত বা মর্মার্থ ও তাৎপর্য, যা আল্লাহর পবিত্র সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। আর এই মর্মার্থ ও তাৎপর্য মাখলুক নয়। আমরা যেই শব্দগুলো পাঠ করি, তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মর্মাথ ও তাৎপর্যেরই নাম। আমাদের দ্বারা পঠিত শব্দগুলো মাখলুক। এগুলো আল্লাহর কালামের বিবরণ, এই কথা বলা যাবে না। কোন কোন আলিম বলেছেন, কুরআনের ব্যাপারে আশায়েরা এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ শুধু শাব্দিক। এই মতভেদে কোন লাভ নেই। আশায়েরা এবং কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বলে থাকে, কুরআন দুই প্রকার। শব্দমালা এবং অর্থসমূহ। কুরআনের শব্দগুলো মাখলুক। কুরআনের মধ্যে যেই শব্দমালা রয়েছে, তা মাখলুক। আর কুরআনের অর্থগুলো কাদীম (অবিনশ্বর ও চিরন্তন) এবং তা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত কুরআনের সব অর্থ মিলে মূলতঃ একটি অর্থই প্রকাশ করে, তা বিভক্তিযোগ্য নয় এবং একাধিকও নয়। সে যাই হোক, উপরোক্ত মত দু'টি এক রকম না হলেও পরস্পর কাছাকাছি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ দু'টি মতকেই বাতিল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন: কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলা জায়েয হবে না যে, এটি কেবল আল্লাহর কালামের বিবরণ। যেমন বলে থাকে কুল্লাবিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা অথবা এ কথাও বলা বৈধ হবে না যে, তা আল্লাহর কালাম প্রকাশের মাধ্যম মাত্র। যেমন বলে থাকে আশায়েরা সম্প্রদায়ের লোকেরা। শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: মানুষ এটি পাঠ করলেই কিংবা কাগজে লিখলেই তা আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালাম হতে বের হয়ে যায় না। কুরআন আল্লাহর কালাম। যেখানেই কুরআন পাওয়া যাবে, তার অক্ষরসমূহ এবং মর্মার্থসমূহ আল্লাহর কালাম বলেই গণ্য হবে। চাই তা মানুষের অন্তরে সংরক্ষিত থাকুক বা জবানের মাধ্যমে

---

১৬৯. ছাহাবী আবু মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কবীলার দিকে সম্বন্ধ করে তাকে আশ'আরী বলা হয়। এটি ইয়ামানের একটি বিখ্যাত কবীলা। আবুল হাসান আশআরী প্রথমে মুতাযেলী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাওবা করে কুল্লাবীয়াদের মাযহাবে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি কুল্লাবীয়াদের মাযহাবও বর্জন করেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মাযহাবে ফিরে আসেন। তার কিতাব 'ইবানায়' সুস্পষ্টরূপে তা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আশআরী মাযহাবের লোকেরা তা স্বীকার করে না। আশায়েরা মাযহাবের লোকেরা কেবল সাতটি ছিফাতকে নামে মাত্র স্বীকার করে। তারা যেই সাতটি ছিফাতকে আল্লাহ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে, তা হচ্ছে الْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالْحَيَاةُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা, শ্রবণ করা, দেখা, কথা বলা এবং জীবন। বাকীগুলোকে তারা তাবীল বা অস্বীকার করে। এই সাতটি সাব্যস্ত করার কারণ হলো, তারা মনে করে আকল তথা মানুষের বোধশক্তি এগুলো সাব্যস্ত করে; বাকীগুলো নয়। (আল্লাহই সর্বাধিক জানেন)

তিলাওয়াত করা হোক অথবা কাগজে লিখিত অবস্থায় থাকুক। উপরোক্ত কোন অবস্থাতেই কুরআনকে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত কালামের বাইরে গণনা করা যাবে না। অতঃপর শাইখুল ইসলাম কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালামের মধ্যে গণ্য হওয়ার দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: কোন কালাম সর্বপ্রথম যার নিকট থেকে শুরু হয়, তাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে যে উক্ত কালামকে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, তার দিকে সেই কালামের সম্বন্ধ হয় না। কেননা যে ব্যক্তি মুবাল্লিগ বা প্রচারক হয়ে অন্যের কালাম পৌঁছিয়ে দেয়, তাকে কেবল মাধ্যম বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ﴾

"আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, তাহলে তাকে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা পর্যন্ত আশ্রয় দাও। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। কেননা এরা একটি অজ্ঞ সম্প্রদায়"।

এ আয়াতে যেই শ্রবণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল প্রচারকারীর মাধ্যমেই হতে পারে। অর্থাৎ প্রচারকের নিকট থেকেই, কেবল শ্রবণ করা সম্ভব। আর শ্রুত জিনিসকেই আল্লাহর কালাম হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হলো যে, কোন কথা সর্বপ্রথম যে বলে, সেই কথাকে তার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়।

চার. মু'তাযিলাদের মত: তারা বলে থাকে, কুরআনের অক্ষরগুলোই শুধু আল্লাহর কালাম। তার মর্মার্থ ও তাৎপর্য আল্লাহর কালাম নয়। তাই তারা বলে থাকে, সাধারণভাবে যখন এই কথা বলা হবে, ইহা আল্লাহর কালাম, তখন শুধু শব্দ উদ্দেশ্য হবে। যাকে আল্লাহর কালাম বলে নাম দেয়া হয়েছে, তার দ্বারা শুধু শব্দই উদ্দেশ্য হবে, তার মর্মার্থ কালামের অংশ হবে না;[১৭০] বরং আল্লাহ তা'আলার কালামের শব্দগুলো যা বুঝায়, তা আল্লাহর কালাম নয়।[১৭১]

---

১৭০. যারা কুরআনকে মাখলুক বলবে, তাদের জন্য কঠিন আযাবের হুশিয়ারী ও ধমক এসেছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মক্কার কাফির অলীদ ইবনে মুগীরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানে কুরআন শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। কুরআন শুনে সে বলতে লাগল, আমি কবিদের কবিতা শুনেছি, মানুষের কালাম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে, যাদু সম্পর্কেও আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সুতরাং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পাঠ করছেন, তা মানুষের কথা হতেই পারে না। কাফিররা তার এই কথা শুনে কড়া প্রতিবাদ করলো। তাই সে তার কাফির বন্ধুদের চাপের কারণে কথা পাল্টাতে বাধ্য হলো। কিন্তু সে জানতো যে, কুরআন আল্লাহরই কালাম। যেমন সে প্রথমে স্বীকার করেছিল। কুরআন সেই ঘটনা বর্ণনা করেছে। অলীদ ইবনে মুগীরা যখন কুরআনকে মানুষের

অতঃপর শাইখুল ইসলামের উক্তি: ولا الحروف دون المعاني তার অক্ষরগুলো ব্যতীত শুধু মর্মার্থগুলোই আল্লাহর কালাম নয়, -এর মাধ্যমে মু'তাযিলাদের মাযহাবের বিপরীত মত বর্ণনা করেছেন। যেমন কুল্লাবীয়া এবং আশায়েরাদের মাযহাব। যেমন একটু পূর্বে ব্যাখ্যাসহ তাদের মাযহাব বর্ণনা করা হয়েছে।

সঠিক মাযহাব হচ্ছে, অক্ষর এবং মর্মার্থগুলো সহকারেই কুরআন আল্লাহর কালাম। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত। আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের দলীল-প্রমাণ দ্বারা ইহাই সুসাব্যস্ত।

রচিত কথা বলল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কঠিন আযাবের ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾

"সে চিন্তা -ভাবনা করলো এবং একটা ফন্দি উদ্ভাবনের চেষ্টা করলো। সে অভিশপ্ত হোক! কিভাবে! সে এই কথা উদ্ভাবন করলো? সে আবার অভিশপ্ত হোক, কিভাবে এই কথা অনুমান করলো? অতপর সে মানুষের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর ভ্রু-কুঞ্চিত করলো এবং চেহারা বিকৃত করলো। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং অহংকার করলো এবং সত্য কবুল করা হতে বিরত থাকলো। অবশেষে বললো, এ তো এক চিরাচরিত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ তো মানুষের কথামাত্র। শীঘ্রই আমি তাকে সাকারে (দোযখে) নিক্ষেপ করবো। তুমি কি জানো, সে সাকার কী? যা জীবিতও রাখবে না আবার একেবারে মেরেও ফেলবে না। গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে। সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশজন কর্মচারী"। (সূরা আল মুদ্দাছছির: ১৮-৩০)

সুতরাং যারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম না বলে মাখলুকের কালাম বলবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অলীদ ইবনে মুগীরার সাথে সাকার নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

১৭১. এটিই হচ্ছে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে মু'তাযিলাদের কথা। তাদের মতে আল্লাহর এমন কোন কালাম নেই, যা তার যাতের সাথে قائم বা প্রতিষ্ঠিত। বরং আল্লাহর কালাম আল্লাহর অন্যান্য মাখলুকের মতোই এবং তাও অন্যতম সৃষ্টি। যেমন আল্লাহর আসমান, আল্লাহর যমীন, আল্লাহর উটনী, আল্লাহর ঘর ইত্যাদি। আল্লাহর নফসের মধ্যে কোন কালাম কায়েম নেই। আল্লাহ তা'আলার কালাম এমন কিছু হরফের নাম, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার নাম রেখেছে 'কালাম'। যেমন তিনি উটনী সৃষ্টি করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন আল্লাহর উটনী। তিনি কাবা ঘর সৃষ্টি করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন বাইতুল্লাহ। সুতরাং মু'তাযিলা ও জাহমীয়াদের নিকট আল্লাহর কালাম হচ্ছে শুধু হরফসমূহের নাম। তাদের মতে আল্লাহর কালাম বলতে এমন কিছু হরফ ও আওয়াজকে বুঝায়, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের দিকে সম্বন্ধ করে নাম দিয়েছেন কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম। (নাউযুবিল্লাহ)

وجوب الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية

এ বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন এবং জান্নাতে প্রবেশের পর তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَلَائِكَتِهِ وَبِرُسُلِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا بِأَبْصَارِهِمْ كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى

পূর্বে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং রসূলদের প্রতি ঈমানের যে বর্ণনা প্রদান করেছি, তার মধ্যে এ বিশ্বাস করাও শামিল যে, মুমিনগণ ক্বিয়ামতের দিন চোখ দিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। দিনের বেলায় পরিষ্কার আকাশে সূর্যকে মেঘখন্ড আড়াল করে না রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাঁদ দেখতে পায়, চাঁদ দেখতে যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলাকে তারা ক্বিয়ামতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে। অতঃপর তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা করবেন, সেভাবেই তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান এবং নাবী-রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে পরকালে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে, এ বিশ্বাসও শামিল হওয়ার কারণ হলো, তিনি তার কিতাবে এবং রসূল তার সুন্নাতে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাতে বিশ্বাস করবে না, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তার রসূলদের প্রতি কুফরী করল। কেননা যারা আল্লাহর প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি এবং আল্লাহর রসূলদের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তাদেরকে অন্যান্য যেসব বিষয়ের সংবাদ দেয়া হয়েছে, তারা তার সবগুলোতেই বিশ্বাস করে। عِيَانًا শব্দের আইন বর্ণে যের দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ তারা আসলেই আল্লাহকে খোলাখুলিভাবে দেখতে পাবে, তাতে কোন অস্পষ্টতা থাকবে না। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখার বিষয়টি রূপকার্থক

নয়। যেমন বলে থাকে আল্লাহর সুউচ্চ ছিফাতে অবিশ্বাসী মুআত্তেলা ফির্কার লোকেরা।

দিনের বেলায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে এবং কোন মেঘমালা সূর্যকে আড়াল না করে রাখলে তারা যেমন সূর্যকে দেখতে পায় এবং পূর্ণিমার রাতে তারা যেমন চাঁদ দেখতে পায়, চাঁদ দেখতে যেমন তাদের কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে: অর্থাৎ তারা প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহকে দেখতে পাবে, তাতে কোন অসুবিধা হবে না। আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে পূর্বে ব্যাখ্যাসহ যেসব আয়াত ও হাদীছ অতিক্রান্ত হয়েছে, এটা এ কথাই প্রমাণ করে।

তারা আল্লাহ তা'আলাকে ক্বিয়ামতের প্রশস্ত ময়দানে দেখতে পাবে। অতঃপর তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পরও দেখতে পাবে: এখানে ঐসব স্থানের কথা এসেছে, যাতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ অর্জিত হবে। মোট দু'টি স্থানে মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে।

প্রথম স্থান: في عرصات القيامة অর্থাৎ ক্বিয়ামতের ময়দানে। العرصات শব্দটি العرصة -এর বহুবচন। এমন প্রশস্ত স্থানকে العرصة বলা হয়, যাতে কোন বাড়িঘর থাকে না। ক্বিয়ামতের ময়দান বলতে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মানের স্থানকে বুঝায়। ক্বিয়ামতের ময়দানে কি শুধু মুমিনগণই আল্লাহকে দেখতে পাবে? না অন্যরাও দেখতে পাবে? এ মাসআলায় তিনটি মত রয়েছে। (১) মানুষ যখন হিসাবের জন্য ক্বিয়ামতের ময়দানে দাঁড়াবে, তখন মুমিন, কাফির এবং মুনাফেক সকলেই আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। (২) মুমিন ও মুনাফেকরা আল্লাহকে দেখতে পাবে, কাফিররা নয়। (৩) শুধু মুমিনরাই দেখতে পাবে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

দ্বিতীয় স্থান: মুমিনগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহকে দেখতে পাবে। কুরআন ও সুন্নাহর দলীল দ্বারা ইহা প্রমাণিত। ব্যাখ্যাসহ কিছু দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই সাথে যারা আল্লাহর দিদারকে অস্বীকার করে, তাদের প্রতিবাদও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। الجنة **(জান্নাত)** শব্দের আভিধানিক অর্থ বাগান। কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় জান্নাত বলা হয় সেই বাসস্থানকে, যা আল্লাহ তা'আলা তার বন্ধুদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। জান্নাতকে সকল প্রকার নিয়ামত দ্বারা পূর্ণ করে রাখা হয়েছে। শাইখুল ইসলাম বলেন: আল্লাহ তা'আলা যেভাবে চাইবেন, সেভাবেই তিনি মুমিনদেরকে দেখা দিবেন। অর্থাৎ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই এবং নির্দিষ্ট কোন ধরন ও আকৃতি ছাড়াই তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে।[১৭২]

---

১৭২. কোন জিনিস দেখতে হলে তাকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা এবং তার সকল দিকে পরিবেষ্টন করা আবশ্যক নয়। আমরা আকাশে চন্দ্র ও সূর্য দেখি। অথচ আমরা চন্দ্র-সূর্যের সকল দিক অবগত নই

ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়সমূহ।

১। কবরে সংঘটিতব্য বিষয় সমুহ (ما يكون في القبر)।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُمْتَحَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللَّهُ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّي وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصُعِقَ ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةُ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ

মৃত্যুর পর যা কিছু হবে বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের ফিতনা (পরীক্ষা), কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যেই নিয়ামত প্রদান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সকল মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবেঃ তোমার রব কে? তোমার দীন কী? তোমার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে? আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

ঈমানদারদেরকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে আর যালেমদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই

এবং তাকে পরিবেষ্টন করতে পারি না। পরিবেষ্টন ও ঘেরাও না করেই দূর থেকে আমরা পাহাড় দেখি। সুতরাং দেখার জন্য আয়ত্ত করা আবশ্যক নয়।

করেন *(সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)*। মুমিন ব্যক্তি তখন বলবে: আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নাবী।[১৭৩] আর আখিরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারী বলবে: হায় আফসোস! হায় আফসোস! এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলেছি। অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুরি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। এতে সে এমন উচ্চস্বরে চিৎকার করবে, যা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে। কোন মানুষ যদি তা শুনতো, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো। কবরের এ ফিতনার পর রয়েছে নিয়ামত কিংবা আযাব।[১৭৪]

---

১৭৩. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৭১, তিরমিযী হা/৩১২০, আবূ দাউদ হা/৪৭৫৩, সুনানে নাসাঈ হা/২০৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ ।

১৭৪. বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে মালাকুল মাওতের আগমন থেকে শুরু করে মুমিন, মুনাফিক এবং কাফির তথা সকল প্রকার মানুষেরই কবরের অধিকাংশ অবস্থার বিবরণ এসেছে। পাঠক ভাই-বোনদের কাছে হাদীছের ভাষ্যটি তুলে ধরছি। বারা ইবনে আযিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জনৈক আনসারী ছাহাবীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। তখনও কবরের খনন কাজ শেষ হয়নি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে বসে পড়লেন। আমরাও তার চারপাশে বসে গেলাম। তার হাতে ছিল একটি কাঠি। তা দিয়ে তিনি মাটিতে খুঁচাতে ছিলেন এবং একবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন আর একবার যমীনের দিকে মাথা অবনত করছিলেন। তিনবার তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং নীচু করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও"। কথাটি তিনি দু'বার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি এই দু'আ করলেন,

أَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।"

তারপর তিনি বললেন, মুমিন বান্দার নিকট যখন দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখিরাতের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের পোশাক এবং জান্নাতের সুঘ্রাণ। মুমিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা ততদূর পর্যন্ত সারি বেঁধে বসে থাকেন। এমন সময় মালাকুল মাউত উপস্থিত হন এবং তার মাথার পাশে বসে বলতে থাকেন, হে পবিত্র আত্মা! তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আস। একথা শুনার পর মুমিন ব্যক্তির রূহ্ অতি সহজেই বের হয়ে আসে। যেমনভাবে কলসীর মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে। রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতী পোশাক পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুঘ্রাণে তাকে সুরভিত করেন। তার দেহ থেকে এমন সুঘ্রাণ বের হতে থাকে যার চেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠে যান। যেখান দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেই খানের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে অতি উত্তম নাম উচ্চারণ করে বলা হয় অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তার সাথে প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত গমন করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার নামটি ইল্লিয়ীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে

নিয়ে যমিনে ফিরে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করব।

তখন কবরে তার আত্মা ফেরত দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? তিনি উত্তরে বলেন, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। আবার জিজ্ঞেস করেন, দুনিয়াতে তোমার দীন কি ছিল? তিনি উত্তর দেন, আমার দীন ছিল ইসলাম। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে তিনি বলেন, তিনি হলেন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তখন আকাশ থেকে মহান আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও, যেন সে জান্নাতের বাতাস ও সুঘ্রাণ পেতে পারে। তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়। একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং সুঘ্রাণে সুরভিত অবস্থায় তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন, তুমি খুশি হয়ে যাও। তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা আজ পূর্ণ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কে? তিনি বলেন, আমি তোমার সৎ আমল। তখন মু'মিন ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ! আপনি এখনই ক্বিয়ামত সংঘটিত করুন। আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত হবো। তখন তাকে বলা হয় তুমি এখানে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে থাক। তোমার কোন চিন্তা ও ভয় নেই।

অপরপক্ষে কাফির ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত সারি বেঁধে তারা বসে থাকেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে। কাফির বা পাপীর আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করেন যেমনভাবে লোহার পেরেককে ভিজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার উপর আকাশ ও যমিনের মধ্যকার সকল ফেরেশতা লা'নত করতে থাকেন। আকাশের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক দরজার ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যাতে ঐ ব্যক্তির রূহ তাদের দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। তার রূহকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখা হয়। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকেন। যেখান দিয়েই গমন করেন সেখানের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। (সূরা আল আরাফ: ৪০)

তারপর বলা হয় সাত যমিনের নীচে সিজ্জীনে তার নাম লিখে দাও এবং তার রূহ যমিনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে ফেরত দাও। কেননা আমি যমিন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, যমিনেই ফিরিয়ে দিব এবং ক্বিয়ামতের দিন যমিন থেকেই আবার বের করবো। তার রূহকে যমীনের দিকে

.....

ব্যাখ্যাঃ আখিরাত দিবস বলতে ক্বিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের অন্যতম রূকন। মানুষের পরিশুদ্ধ বিবেক ও বোধশক্তি এবং সৃষ্টিগত স্বভাব এ কথাই প্রমাণ করে।[১৭৫] সমস্ত আসমানী কিতাব

নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর কাফিরের দেহ যেখানে দাফন করা হয়েছে রূহটি সেখানে গিয়ে পতিত হয়। এরপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করলো সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো"। (সূরা আল হাজ্জঃ ৩১)

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে দাফন করে যখন লোকেরা চলে যায় তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং কঠিনভাবে ধমকাতে থাকেন। অতঃপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোর দীন কি? জবাবে সে বলে, হায়! আমি তো এটা অবগত নই। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোর ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! আমি তা জানি না। তার সম্পর্কে মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন, এই লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাসও তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়।

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোশাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফির বা মুনাফিক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কি? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোর সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুই ছিলি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে গাফেল এবং আল্লাহর নাফরমানীতে অগ্রগামী।

অতঃপর তার কবরে একজন বোবা ও বধির ফেরেশতা পাঠানো হয়। তার হাতে থাকে লোহার এমন একটি হাতুড়ি, সেটা দিয়ে যদি কোন কঠিন পাহাড়ে আঘাত করা হতো তাহলে উক্ত পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলায় পরিণত হয়ে যেত। তা দিয়ে তাকে এমন জোরে প্রহার করা হয় যাতে সে মাটির সাথে মিশে যায়। আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করেন। ফেরেশতা আবার তাকে আঘাত করেন। সে এমন প্রকটভাবে চিৎকার করতে থাকে যার আওয়াজ জিন-ইনসান ব্যতীত সকল সৃষ্টিজীবই শুনতে পায়। অতঃপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হয়। ক্বিয়ামতের দিন যেহেতু তার জন্য আরো কঠিন আযাব রয়েছে তাই সে বলবে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামত যেন না হয়। (দেখুন, আহকামুল জানায়েয, পৃষ্ঠা নং- ২০২)

১৭৫. কেননা বিবেক ও যুক্তির দাবী হচ্ছে মানুষকে এই দুনিয়াতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছেড়ে না দেয়া। তারা শুধু এখানে পানাহার করবে, খেলতামাশা করবে, যা ইচ্ছা তাই করবে এবং তাদের

এই কথাটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করেই বলেছে। সমস্ত নাবী-রসূল তা বিশ্বাস করার প্রতি মানুষকে আহবান করেছেন। ক্বিয়ামত দিবসকে আখিরাত দিবস বা শেষ দিবস হিসাবে নামকরণ করার কারণ এই যে, দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই দিন আগমন করবে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য সম্পর্কে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, মৃত্যুর পর যা হবে বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, তার সবগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই আখিরাতের প্রতি ঈমান বলা হয়। সুতরাং দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে শামিল। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থা, কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা, কবর থেকে পুনরুত্থান এবং পুনরুত্থানের পর মানুষের অন্যান্য অবস্থা। অতঃপর শাইখুল ইসলাম আখিরাতের অনেক বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আখিরাতের বিষয়গুলো হতে কবরে যা হবে সে সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কবরের ফিতনা, কবরের আযাব এবং কবরে মুমিনদেরকে যে নিয়ামত প্রদান করা হবে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এখানে শাইখ মূলতঃ দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন।

প্রথম বিষয়: কবরের ফিতনা। الفتنة শব্দের আভিধানিক অর্থ পরীক্ষা করা। এখানে ফিতনা দ্বারা কবরে মুনকার-নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতার প্রশ্ন উদ্দেশ্য। তারা মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করবেন।

কোন হিসাব নেওয়া হবে না, পরিশুদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি ও সৃষ্টিগত স্বভাব এটি সমর্থন করে না। সুতরাং এমন একটি দিন থাকা দরকার, যেখানে মানুষের সকল কাজের হিসাব নেয়া হবে। কেননা দুনিয়াতে যারা অন্যের উপর যুলুম করে, কুফরী করে, নানা অপরাধ ও পাপাচারে লিপ্ত হয়, স্রষ্টাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়, তাদের অনেকেই দুনিয়াতেই শাস্তি পায়। ঐদিকে আবার অনেকেই দুনিয়ায় শাস্তি পাওয়ার আগেই স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করে। আবার দেখা যায় অনেকেই ভালো কাজ করেও যথোপযুক্ত বিনিময় পায় না। অনেকেই সারা জীবন আল্লাহর আনুগত্য করেও দুনিয়াতে বিনিময় না পেয়েই মৃত্যু বরণ করে। তাই বিবেক বলে যে, এমন একটি দিন অবশ্যই থাকা দরকার, যেখানে সকল মানুষ তাদের ভালোমন্দ সব কাজের বিনিময় পাবে। অন্যথায় এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য নাবী-রসূলের মাধ্যমে শরী'আত পাঠানো অনর্থক। শুধু তাই নয়; মহান রাব্বুল আলামীনের আদল তথা ন্যায় বিচার ছুটে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলের হিসাব নেওয়ার জন্য এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আখিরাত দিবস নামে একটি দিবস নির্ধারণ করেছেন। তাতে আল্লাহ তা'আলা বনী আদমের প্রত্যেক আমলের হিসাব নিবেন, সবাইকে যথাযোগ্য প্রাপ্য প্রদান করবেন এবং তার ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

"তোমরা কি মনে করেছিলে আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের কখনো আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না? (সূরা আল মুমিনুন: ১১৫)

শাইখুল ইসলাম বলেন:فَأَمَّا الْفِتْنَةُ فَإِنَّ النَّاسَ يُمْتَحَنُونَ فِي قُبُورِهِم فيقال للرجل **সকল মানুষকেই কবরে পরীক্ষা করা হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর জিজ্ঞেস করা হবে: তোমার রব কে?** মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা নারী হোক। অধিকাংশ সময় যেহেতু পুরুষের কথাই উল্লেখ করা হয়, তাই এখানেও পুরুষকে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর শাইখ ঐসব প্রশ্ন উল্লেখ করেছেন, যা মৃত ব্যক্তির সামনে পেশ করা হবে। মুমিন ব্যক্তি প্রশ্নগুলোর কী উত্তর দিবে এবং কাফির বা মুনাফেক কী উত্তর দিবে এবং প্রশ্নের জবাবের পরে কাফির বা মুনাফেক যেই আযাবের সম্মুখীন হবে এবং মুমিন ব্যক্তি যেই নিয়ামতের মধ্যে থাকবে, শাইখ তাও উল্লেখ করেছেন।

মুনকার- নাকীর ফেরেশতাদ্বয় যেই প্রশ্ন করবেন, তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব। কেননা তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত সংখ্যক হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, হাদীছগুলো একসাথে মিলালে মুতাওয়াতিরের সীমায় পৌঁছে যায়। কুরআনুল কারীম দ্বারা কবরে ফিতনা বা প্রশ্নের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিকে পরীক্ষার বিষয়টি সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

মুমিনদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং আখিরাতেও। আর যালেমদেরকে আল্লাহ ভুলিয়ে দিবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। *(সূরা ইবরাহীম ১৪:২৭)*

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহিমাহুমাল্লাহ) উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বারা ইবনে আযিব হতে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: কবরের আযাবের ব্যাপারে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[১৭৬] ইমাম মুসলিম একটু বাড়িয়ে বলেছেন যে,

يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت "মৃত ব্যক্তিকে কবরে বলা হবে, তোমার রব কে? মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমার রব আল্লাহ এবং আমার নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর এই বাণীতে উক্ত কথার সত্যতা মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

---

১৭৬ . ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম ২৮৭১, তিরমিযী ৩১২০, আবূ দাউদ ৪৭৫৩, নাসাঈ ২০৫৭, ইবনে মাজাহ ৪২৬৯, মুসনাদে আহমাদ ।

"মুমিনদেরকে আল্লাহ সঠিক কথার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতে। সঠিক কথা বলতে এখানে তাওহীদের ঐ কালেমা উদ্দেশ্য, যা দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মুমিনের অন্তরে দৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। দুনিয়াতে মুমিনদেরকে তাওহীদের বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো, সত্যের পথে যত কষ্ট ও নির্যাতন আসুক, তা সহ্য করে তারা তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। আর আখিরাতে তার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার অর্থ হলো নাকীর-মুনকার নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের জবাব দেয়ার তাওফীক দান করা।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَأَمَّا الْمُرْتَابُ فَيَقُولُ هَــاهْ هَــاهْ আখিরাতের বিষয়সমূহে সন্দেহ পোষণকারীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে: হায় আফসোস! হায় আফসোস! هاه هــاه এটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ব্যথা, বেদনা ও কষ্টের আওয়াজ। মুনাফেক বা সন্দেহ পোষণকারী আরো বলবে: এ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। তবে লোকেরা যা বলতো আমিও তাই বলেছি। কেননা সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তাতে বিশ্বাস করেনি। কাজেই তার পক্ষে সঠিক জবাব দেয়া অসম্ভব হবে। যদিও সে হয়ে থাকে দুনিয়াতে সর্বাধিক জ্ঞানী এবং সুস্পষ্টভাষী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ "আর যালেমদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভুলিয়ে দিবেন"।

فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ অতঃপর লোহার ভারী একটি হাতুড়ি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে: লোহার বড় হাতুড়িকে مرزبــة মারযাবা বলা হয়। এই হাতুরি দিয়ে তাকে প্রহার করা হবে। আঘাতের কারণে সে এমন উঁচু আওয়াজে চিৎকার করতে থাকবে, যার আওয়াজ মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সব সৃষ্টিই শুনতে পাবে। মানুষ সেই চিৎকার শুনলে কী অসুবিধা হতো অর্থাৎ মানুষকে সেই আওয়াজ না শুনানোর মধ্যে কী হিকমত রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: মানুষ যদি তা শুনতে পেত, তাহলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতো। অর্থাৎ মরে যেতো অথবা অজ্ঞান হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের দাবী এই যে, কবরে মৃত ব্যক্তির যা হবে, জীবিতরা তা অনুভব করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কবরের আযাবকে গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যদি তা প্রকাশ করতেন, তাহলে যেই উদ্দেশ্যে তা গোপন রাখা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্য ও হিকমত ঠিক থাকতো না। সেটি হচ্ছে গায়েবের প্রতি ঈমান।[১৭৭]

---

১৭৭ . কবরের আযাব গোপন রাখার হিকমত ও উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তিনি যদি তা প্রকাশ করতেন আর আমরা যদি তা শুনতাম, তাহলে পৃথিবীর এই শান্তিময় ও সুশৃংখল পরিবেশ ঠিক

দ্বিতীয় বিষয়: কবরে মৃত ব্যক্তির আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম তার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন: অতঃপর কবরের ফিতনা (প্রশ্নোত্তর পর্ব) শেষ হবার পর থেকে বড় ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবরবাসী কবরে শান্তি পেতে থাকবে অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। শাইখুল ইসলাম এই উক্তির মাধ্যমে কবরের আযাব ও নিয়ামত সাব্যস্ত করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হচ্ছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তি তার কবরে নেয়ামাতের মধ্যে ডুবে থাকবে অথবা শাস্তিতে নিপতিত হবে। আর এটি হবে রূহ এবং দেহ উভয়ের জন্যই। যেমন এ ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং কবরের আযাব ও নেয়ামাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ফরয। এর ধরন এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কথা বলা যাবে না। মানুষের বোধশক্তি তা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। কেননা তা আখিরাতের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আখিরাতের বিষয়গুলো আল্লাহ ছাড়া এবং তিনি যাদেরকে তা থেকে যা কিছু জানিয়েছেন তারা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ তা'আলা রসূলদেরকে কবরের কিছু কিছু আযাব শুনিয়েছেন।[১৭৮]

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা কবরের আযাবকে অস্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে তাদের দলীল হচ্ছে তারা কবরের আযাব শুনে না এবং মৃত ব্যক্তি কবরে শাস্তি ভোগ করছে এবং তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এটি তারা দেখে না।[১৭৯]

থাকতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং কবরের আযাবকে আমাদের থেকে আড়াল করে রেখেছেন। আমাদের বাসগৃহের পাশেই কবরে শায়িত থাকে আমাদেরই পিতা-মাতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, প্রিয়জন এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। তাদের কেউ আযাবে নিপতিত হলে (আল্লাহ তাদেরকে কবরের আযাব থেকে হিফাযত করুন) এবং আমরা তা শুনলে আমাদের বেঁচে থাকা এবং সুখ-শান্তিতে জীবন ধারণ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠতো। কবরে আত্মীয়-স্বজনের এমনকি অন্য কারো আযাবের আওয়াজ শুনে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারতো না। তাই আল্লাহ তা'আলা দয়া করে কবরের আযাবকে ঈমান বিল গাইবের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেই সাথে পৃথিবীতে আমাদের বসবাসকেও শান্তিময় এবং আরামদায়ক করেছেন।

১৭৮. ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অথবা মদীনার দু'টি নতুন কবরের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন:

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ ثُمَّ قَالَ: بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيْمَةِ, وَأَمَّا الآخَرَ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

"কবর দু'টির অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে। আযাবের কারণ খুব বড় নয়। হ্যাঁ তা বড় পাপই তো। তাদের একজন ছিল চোগলখোর এবং অপরজন পেশাব থেকে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করতো না" (বুখারী ২১৮ ও মুসলিম ২৯২)

১৭৯ . আখিরাতের হুকুম-আহকাম দুনিয়ার হুকুম-আহকামের সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়ার হুকুম-আহকামের সম্পর্ক শরীরের সাথে। রূহ তার অনুগামী। আর আখিরাতের হুকুম-আহকামের সম্পর্ক

তাদের এই দলীলের জবাব হলো, আমরা যদি কোন জিনিস খুঁজে না পাই এবং না দেখি, তার অর্থ এই নয় যে, ঐ জিনিসটি আসলেই নাই অথবা কোন ঘটনা যদি আমরা ঘটতে না দেখি, তাহলে এমন কিছু বুঝার সুযোগ নেই যে, ঐ ঘটনা আসলেই সংঘটিত হয়নি। এমন অনেক জিনিস আছে, যা আমরা দেখি না, অথচ তা বিদ্যমান রয়েছে।[১৮০] কবরের আযাব অথবা নিয়ামাত ঐ বিষয়াবলিরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আখিরাত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে গায়িব তথা অদৃশ্যের বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং এ পৃথিবীর মানুষের বোধশক্তির আয়ত্তের বাইরে রেখেছেন। যাতে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসী মুমিনগণ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।[১৮১] সর্বোপরি আখিরাতের বিষয়গুলোকে দুনিয়ার বিষয়াদির উপর কিয়াস করা যাবে না। **কবরের আযাব দুই প্রকার।**

রূহের সাথে। শরীর তার অনুগামী। সুতরাং কবরে আযাব হবে রূহের উপর। শরীরও তা অনুভব করবে। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হোক, হিংস্র প্রাণী বা সাগরের মাছ খেয়ে ফেলুক, মাটিতে মিশে যাক কিংবা তাকে আগুনে পুড়ে ছাই বানিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হোক, আযাব হবেই হবে। মৃত ব্যক্তির রূহ সেই আযাবের কষ্ট অনুভব করবে। শরীরও তার অনুগামী হয়ে শাস্তি ভোগ করবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর আখিরাতে যখন মানুষ জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাবে তখন দেহের সাথে রূহ এমনভাবে যুক্ত হবে যে, আর কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। তখন দেহ এবং রূহ উভয়ই শান্তি অথবা শাস্তি পাবে।

১৮০. ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে যা দেখে, তার কাছের জাগ্রত ব্যক্তিরা তা দেখে না। জাগ্রত হয়ে সে যখন স্বপ্নের কথা বলে, অন্যরা তা বিশ্বাস করে। ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ যদি স্বপ্নে দেখে যে, তাকে পেটানো হচ্ছে এবং সে যদি চিৎকার করে, সেই চিৎকার তার পাশের লোকেরা শুনতে পায় না। অথচ ঘুমন্ত ব্যক্তি আসলেই কষ্ট পায় এবং জাগ্রত হয়েও সেই কষ্ট অনুভব করে। অনেকেই আবার ঘুমন্ত অবস্থায় সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করে শান্তি অনুভব করে। এটি কেউ অস্বীকার কওে না। কবরের আযাব ও নিয়ামতের বিষয়টি বিশ্বাস করার জন্য এই বাস্তব অভিজ্ঞতা সহায়ক হতে পারে। কবরের আযাব যেহেতু আখিরাতের বিষয় এবং আখিরাতের জন্য যেহেতু দুনিয়ার জীবনের চেয়ে ভিন্ন কানুন (নিয়ম ও বিধান) রয়েছে, তাই কবরের আযাব জীবিতরা দেখবে না, শুনবেও না। এমনকি দুইজন মানুষকে একই কবরে পাশাপাশি রাখা হলে সেখানে একজনের আযাব হলে এবং অন্যজন আরামে থাকলে তাদের একজন অন্যজনের অবস্থা জানতে পারে না। যেমন পাশাপাশি দুইজন ঘুমন্ত ব্যক্তিই স্বপ্ন দেখলে একজনের স্বপ্ন অন্যজন জানতে পারে না। কবরের আযাব বা নিয়ামত গায়েবী বিষয় হলেও আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা কবরের আযাব দেখিয়ে থাকেন। যেমন আমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কবরের আযাব দেখানো হয়েছে। ইবনে রজব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা কবরের আযাব দেখিয়ে থাকেন। ইতিহাস বলে যে, অনেকেই কবরের আযাব দেখেছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তার কিতাবুর্ রূহে এবং ইবনে আবীদ দুনয়া তার কিতাবুল কুবুরে এরকম অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে অধিক জানেন।

১৮১ . কবরের আযাব গোপন রাখার মধ্যে আরো যেসব বড় বড় হিকমতে ইলাহী লুকায়িত রয়েছে, তার মধ্যে এও রয়েছে যে, (১) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মৃতদেরকে দাফন করা থেকে বিরত থাকার আশঙ্কা না থাকলে আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতাম, তিনি যেন

(১) চিরস্থায়ী আযাব। চিরস্থায়ী আযাব হবে কাফিরের। যেমন, ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা গাফেরের ৪৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾

দোযখের আগুনের সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় পেশ করা হয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হলে নির্দেশ দেয়া হবে, ফেরাউনের অনুসারীদেরকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।

(২) এমন আযাব, যা নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তা স্থগিত রাখা হবে। আর এটি হবে কতিপয় গুনাহগার মুমিনের আযাব। তাদেরকে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। অতঃপর তার আযাব কমানো হবে। জীবিত কোন ব্যক্তির দু'আ অথবা সাদকা কিংবা ক্ষমা প্রার্থনার কারণে তার আযাব একেবারেই বন্ধ হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

তোমাদেরকে কবরের আযাব থেকে কিছু শুনান। (২) কবরের আযাব গোপন রাখার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মৃতের পরিবারের প্রতি রহম করেছেন। কেননা তারা যদি তাদের মাইয়্যেতের আযাব ও চিৎকার শুনতো, তাহলে তারা স্থির থাকতে পারতো না। (৩) আযাব গোপন রাখার মাধ্যমে মৃতের মান-মর্যাদার দিকটার প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার জীবিত আত্মীয় স্বজনকে তার বেহাল অবস্থা জানাতে চাননি। (৪) মৃতের পরিবারের মান-ইজ্জতের প্রতিও খেয়াল রাখা হয়েছে। কেননা মাইয়্যেতের আযাব শুনলে লোকেরা হয়তো তার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে দোষারোপ করে বলতো এই তো তোমার পিতাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, এই তো তোমার মা খুব আযাবে আছে! এই তো তোমার ছেলে.....ভাই... ইত্যাদি। (৫) আযাবের আওয়াজ ও চিৎকার শুনেই কারো মৃত্যু হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। কেননা এই আওয়াজ সাধারণ আওয়াজ নয়। এতে অন্তর ফেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে মৃত্যু অথবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়; এর ফলে পৃথিবীর এই সুন্দর নিয়ম-কানুন লন্ড-ভন্ড হয়ে যেত, যা হিকমতে ইলাহীর খেলাফ। (৬) মানুষ যদি আযাবে নিপতিত লোকদের এই চিৎকার শুনতো, তাহলে ঈমান বিল গায়েব (না দেখে বিশ্বাস করা) ঈমান বিল মুশাহদাহয় (দেখে বিশ্বাস করায়) পরিণত হতো। আর আযাব ও নিদর্শন দেখিয়ে কাউকে বিশ্বাসী বানিয়ে পরীক্ষা করার কোন অর্থই হয় না এবং সেই বিশ্বাসের কোন মূল্যও থাকে না। কেননা ক্বিয়ামতের পূর্বে যখন মানুষ পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠতে দেখবে, তখন সকলেই ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু সেই ঈমান কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾

"যে দিন তোমার পালনকর্তার নিদর্শনসমূহের কিছু এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবে না যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি"। (সূরা আনআম: ১৫৮)

القيامة الكبرى وما يجري فيها

২। বড় ক্বিয়ামত এবং তাতে যা ঘটবে

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি বা নিয়ামত বড় ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। তখন সমস্ত মানুষের রূহগুলোকে তাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা পোষণ করেছেন। 'লোকেরা ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় হাযির হবে।'[১৮২]

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ অধ্যায়ে এবং তার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ঐসব বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা আখিরাতে সংঘটিত হবে। আর এ সব বিষয় ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে। মোট ঘর বা বাসস্থান হলো তিনটি।

(১) দুনিয়ার ঘর (دار الدنيا)।

(২) বারযাখ তথা কবর জগতের ঘর (دار البرزخ)।

(৩) আখিরাতের ঘর (والدار الآخرة)।

---

১৮২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৬২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩, নাসাঈ হা/২০৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/২০৯৬, দারিমী হা/২৮৪৪। খাতনা করার সময় পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের যেই চামড়াটুকু কেটে ফেলা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাও ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং মানুষ যে অবস্থায় দুনিয়ায় এসেছিল, হুবহু সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (আল্লাহই অধিক অবগত)

এই তিনটি ঘরের প্রত্যেকটির জন্য বিশেষ বিশেষ হুকুম-আহকাম রয়েছে এবং এগুলোর জন্য এমন এমন ঘটনা রয়েছে, যা তাতে সংঘটিত হবে। বারযাখের গৃহে যা হবে, শাইখ তা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন।

এখানে তিনি ঐসব বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছেন, যা আখিরাতের ঘরে সংঘটিত হবে। তিনি বলেন:

কবরের ফিতনার পর কারো শাস্তি অথবা নিয়ামত বড় ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। ক্বিয়ামত দু'টি। ছোট ক্বিয়ামত (মৃত্যু) ও বড় ক্বিয়ামত। মৃত্যু হলো ছোট ক্বিয়ামত। এ ছোট ক্বিয়ামত প্রত্যেক মানুষের জন্য আলাদাভাবে কায়েম হবে। দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর এবং দেহ থেকে রূহ বের হওয়ার দিনই তার উপর এ ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৮৩]

আর বড় ক্বিয়ামত সমস্ত মানুষের উপর একসাথে কায়েম হবে এবং সব মানুষকে দুনিয়া থেকে একসাথেই উঠিয়ে নিবে। এ দিনকে ক্বিয়ামত (দণ্ডায়মান) দিবস

---

১৮৩. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ক্বিয়ামত এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনার সাথে ক্বিয়ামতের আলামতগুলো উল্লেখ করেননি। ক্বিয়ামতের আলামতগুলো যেহেতু ক্বিয়ামতের মতোই গায়েবী বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, তাই অন্যান্য আলেমগণ আক্বীদাহর বিষয়গুলোর সাথে ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামতগুলোও উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে ক্বিয়ামতের যেসমস্ত আলামতের কথা বর্ণিত হয়েছে তা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। ক্বিয়ামতের ছোট আলামতগুলোর অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে। যা এখনও প্রকাশিত হয়নি তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। ছহীহ মুসলিম (২৯০১) হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوف خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ

"একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তখন ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন: যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখতে পাবে ততদিন ক্বিয়ামত হবে না। (১) ধোঁয়া (২) দাজ্জালের আগমন (৩) ভূগর্ভ থেকে নির্গত দাব্বাতুল আরদ্ নামক অদ্ভুত এক জানোয়ারের আগমন ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (৫) ঈসা ইবনে মারইয়ামের আগমন (৬) ইয়াজুয-মা'জুযের আবির্ভাব (৭) পূর্বে ভূমিধ্বস (৮) পশ্চিমে ভূমিধ্বস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধ্বস (১০) সর্বশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে হাঁকিয়ে নিবে"।

আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশ্বাস হচ্ছে ক্বিয়ামতের এ সমস্ত আলামতের একটিও এখনো প্রকাশিত হয়নি। ক্বিয়ামতের পূর্বে এগুলো প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তা সংঘটিত হবে না।

হিসাবে নাম দেয়ার কারণ হলো তাতে শেষ ফুৎকারের সাথে সাথে সকল মানুষ তাদের কবর থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে দণ্ডায়মান হবে। তাই শাইখুল ইসলাম বলেছেন, তখন রূহগুলোকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। আর এটি তখনই হবে, যখন ইসরাফীল সিঙ্গায় ফুঁ দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا﴾

"তারপর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে এবং সহসা তারা নিজেদের রবের সামনে হাযির হবার জন্য নিজেদের কবর থেকে বের হবে। ভীত হয়ে বলবে, হায় আফসোস! কে আমাদেরকে আমাদের সমাধি থেকে উঠিয়ে দাঁড় করালো? (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৫১-৫২)। আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমারের ৬৮ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾

"অতঃপর আরেকবার শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে তখন হঠাৎ সবাই দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে"।

الروح শব্দের বহুবচন হচ্ছে الأرواح অর্থাৎ রূহসমূহ। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী যার বদৌলতে বেঁচে থাকে, তার নাম রূহ। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রূহের হাকীকত তথা আসল অবস্থা সম্পর্কে অবগত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

"এরা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। বলে দাও, রূহ আমার রবের আদেশ মাত্র"। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮৫)

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাদীছে সংবাদ দিয়েছেন। মুসলিমগণ এ বিষয়ে ইজমা পোষণ করেছেন: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে ক্বিয়ামতের দিন সৃষ্টির পুনরুত্থানের দলীলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং মুসলিমদের ইজমা, মানুষের বোধশক্তি এবং ফিতরাত পরিশুদ্ধ সৃষ্টিগত স্বভাব দ্বারা পুনরুত্থান প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবে পুনরুত্থান সম্পর্কে খবর দিয়েছেন, এর উপর দলীল কায়েম করেছেন এবং কুরআনের

অধিকাংশ সূরাতেই পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের প্রতিবাদ করেছেন।[১৮৪] আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বশেষ নাবী, তাই তিনি আখিরাতের

---

১৮৪. পুনরুত্থানকে সত্য হিসাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করেছে, তার মধ্যে নিম্নের দলীলগুলো অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর উক্তি নকল করে আরো বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"আর স্মরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম বলেছিল: হে আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনর্জীবিত করো। আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) জবাব দিল, বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চাই। আল্লাহ বললেন, ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি ধরে নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখো। এরপর তাদেরকে ডাকো। তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়"। (সূরা আল বাকারা ২:২৬০) গুহাবাসীদেরকে তিনশ নয় বছর পর্যন্ত ঘুমপাড়ানো এবং তাদেরকে জাগ্রত করার মধ্যে রয়েছে পুনরুত্থানের সুস্পষ্ট দলীল। মৃত যমীনকে বৃষ্টির মাধ্যমে সতেজ, সজীব এবং শস্য-শ্যামল করার দৃষ্টান্ত পেশ করে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান সাব্যস্ত করেছেন।

মানুষ সৃষ্টির উপাদান উল্লেখ করার মাধ্যমেও তাদের পুনরুত্থান সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

"মানুষ কি দেখে না, তাকে আমি সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে এবং তারপর সে দাঁড়িয়ে গেছে স্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে? এখন সে আমার উপর উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলে, এ হাড়গুলো যখন পচে গলে গেছে এতে আবার প্রাণ সঞ্চার করবে কে? তাকে বলো, এদেরকে তিনি জীবিত করবেন যিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সৃষ্টির প্রত্যেকটি কাজ ও অবস্থা জানেন। তিনিই তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তা থেকে নিজেদের চুলা জ্বালিয়ে থাকো। যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? অবশ্যই রাখেন। তিনি মহান স্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন তার কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়। পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি জিনিসের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তারই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে"। (সূরা ইয়াসীন ৭৭-৮৩)

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

বিষয়গুলোর এমন খোলাখুলি বিবরণ দিয়েছেন, যা অনেক নাবীর কিতাবসমূহেই পাওয়া যাবে না।

আমলের বিনিময় দেয়া মানুষের বিবেক ও বোধশক্তি দ্বারাই প্রমাণিত।[১৮৫] আর শরী'আত এটিকে সুসাব্যস্ত করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অনেক স্থানেই মানুষের বোধশক্তিকে পুনরুত্থানের প্রতি সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ কি মনে করে, তাকে বিনা হিসাবে ছেড়ে দেয়া হবে? অথবা তারা কি মনে করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন? তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করা হবে না? তাদেরকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি দেয়া হবে না? আল্লাহ তা'আলার হিকমাতের সাথে মোটেই শোভনীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অথবা (পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত স্বরূপ) সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করো, যে এমন একটি গ্রাম অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বলল, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জন বসতিকে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন? এ কথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন, এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কত বছর ঘুমিয়েছো? সে বলল, এই তো মাত্র একদিন বা তার চেয়েও কম সময় ঘুমিয়েছি। আল্লাহ বললেন, বরং তুমি একশ বছর ঘুমিয়েছো। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের উপর নজর বুলাও, দেখো তার মধ্যে সামান্য পরিবর্তনও আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো। আর এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই। তুমি গাধার অস্থিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। লক্ষ্য করো, আমি কিভাবে একে উঠিয়ে এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দিই। এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, তখন সে বলে উঠলো, আমি অবগত আছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিশালী"। (সূরা আল বাকারা ২:২৫৯)

১৮৫ . আমাদের এই বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখছি যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য আইন তৈরী করে রাখা হয়েছে। শান্তি প্রিয় মানুষের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক দেশেই মানুষ বেশ কিছু আইন-কানুন তৈরী করেছে। যারা মানুষের জান-মালের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করে তাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা। এই শাস্তি ক্ষেত্রে বিশেষে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অপরাধীকে শাস্তি দেয়া মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তি কেবল সমর্থনই করে না; বরং রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্তি দেয়া জরুরী মনে করে। অন্যথায় পৃথিবীর শান্তি-শৃংখলা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে। সুতরাং যেই মহান রাব্বুল আলামীন যুলুম করাকে মোটেই পছন্দ করেন না, যিনি ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করাকে ভালোবাসেন এবং সেই জন্য বিচার দিবস নামে একটি দিবসও নির্ধারণ করেছেন, তার জন্য অপরাধীকে পরকালে শাস্তি দেয়া অযৌক্তিক হয় কিভাবে?

নয় যে, তিনি মানুষকে অযথা সৃষ্টি করবেন, কোন দায়িত্ব না দিয়েই তাদেরকে ছেড়ে দিবেন, আদেশ-নিষেধ করবেন না এবং তাদের কর্ম অনুপাতে ছওয়াব বা শাস্তি দিবেন না। আল্লাহর হিকমাত এটি সমর্থন করে না।

এ রকম কোন সম্ভাবনা নাই যে, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলকে অসৎকর্মীর সমান করবেন কিংবা মুসলিমদেরকে অপরাধীদের কাতারে শামিল করবেন। কেননা কতক সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্মের বিনিময় পাওয়ার আগেই মৃত্যু বরণ করে এবং কতিপয় অপরাধী তার অপরাধের উপযুক্ত সাজা ভোগ করার আগেই মারা যায়। সুতরাং এমন একটি জগৎ অবশ্যই থাকা দরকার যেখানে উপরোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই ন্যায্য বিনিময় পেয়ে যাবে। পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী কাফির হিসাবে গণ্য হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا﴾

" কাফিররা ধারণা করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না"। (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:৭)

শাইখুল ইসলাম বলেন: فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর লোকেরা সমস্ত সৃষ্টির প্রভুর সামনে খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় দণ্ডায়মান হবে: حفاة শব্দটি حاف এর বহুবচন। যার পায়ে জুতা কিংবা মোজা থাকে না, তাকে حافٍ বলায় হয়। عراة (উলঙ্গ, বস্ত্রহীন) عارٍ এর বহুবচন। যার শরীরে কোন কাপড় থাকে না, সেই হচ্ছে عارٍ। আর **غرلًا** শব্দটি أغرل এর বহুবচন। খাতনাবিহীন লোককে আগরাল বলা হয়। যার পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কেটে খাতনা করা হয়নি, সেই আগরাল। লোকেরা যখন কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে দণ্ডায়মান হবে, তখন এই তিনটি বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমের হাদীছে এই কথা পাওয়া যাচ্ছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إنكم تُحْشَرُون إلى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا

"ক্বিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হবে"।[১৮৬]

১৮৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৬২৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫৯, তিরমিযী হা/২৪২৩, নাসাঈ হা/২০৮৩, মুসনাদে আহমাদ হা/২০৯৬, দারিমী হা/২৮৪৪।

مايجري في يوم القيامة

ক্বিয়ামতের দিন আরো যা ঘটবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ تُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ وَتَنْشُرُ الدَّوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۞ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ وَيُحَاسِبُ اللهُ الْخَلَائِقَ وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَمَّا الْكُفَّارُ فَلَا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتَ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ فَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّرُونَ بِهَا

ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের নিকটবর্তী হবে, মানুষের শরীর হতে নির্গত ঘাম তাদের নাক-মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[১৮৭] সেদিন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং তার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا

---

১৮৭. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

تَدْنُوْ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ

" ক্বিয়ামতের দিন সূর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। মানুষেরা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। মানুষের শরীরের পঁচা ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। একথা বলার পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন"। (ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৬৪, তিরমিযী হা/২৪২১)

أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾

"সে সময় যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে এমনসব লোক যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা জাহান্নামে থাকবে চিরকাল" (সূরা মুমিনূন ২৩:১০২-১০৩)।[১৮৮]

---

১৮৮ . আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা মানুষের আমলসমূহ মাপার জন্য বিশাল একটি দাড়িপাল্লা স্থাপন করবেন। তার দু'টি পাল্লা থাকবে। আমল অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করার জন্যেই আমলসমূহ ওজন করা হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে এর বিশদ বিবরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)

"আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি যুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করবো এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট"। (সূরা আম্বীয়া: ৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

"আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে"। (সূরা আরাফ: ৮) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ)

"আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে"। (সূরা আল আরাফ: ৯) অর্থাৎ তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾

"অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার ঠিকানা হবে হাভীয়া। আপনি জানেন তা কি? তা হচ্ছে প্রজ্জলিত অগ্নি"। (সূরা আল-কারিআহ: ৬-১১) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ

"ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষের সামনে আমার উম্মতের একজন লোককে উপস্থিত করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি খাতা বের করা হবে। প্রত্যেকটি খাতার বিশালতা হবে চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, এখানে যা লেখা আছে, তার কোন কিছু কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে? আমার ফেরেশতাগণ কি তোমার উপর যুলুম করেছে? তখন সে লোকটি

সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে। কেউ সেই আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾

"প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিবো এবং ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে পাবে। বলা হবে: পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই। আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট"। (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭: ১৩-১৪)

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির হিসাব নিবেন। তিনি তার মুমিন বান্দার সাথে নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং বান্দাকে পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

আর কাফিরদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের হিসাব ঐসব লোকদের হিসাবের মতো হবে না, যাদের ভালোমন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাদের কোন ভালো আমলই থাকবে না। কিন্তু তাদের দুনিয়ার অপকর্মসমূহ গণনা করে রাখা হবে এবং তা সংরক্ষণ করা হবে। ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে।

বলবে, হে আমার প্রভু! আপনার ফেরেশতাগণ অন্যায় কিছু লিখেনি। আল্লাহ বলবেন, তোমার কোন অযুহাত আছে কি? তখন সে লোকটি বলবে, হে আমার প্রভু! আমার কোন অযুহাত নেই। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজকে তোমার উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। তারপর একটি কার্ড বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে,

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ বলবেন, দেখ! তোমার আমল ওজন করা হবে। সে বলবে, হে আমার প্রভু! এতোগুলো বিশাল খাতাভর্তি গুনাহর তুলনায় এই কার্ডটির কোন ওজনই হবে না। আল্লাহ বলবেন, আজ তোমার উপর বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। অতঃপর মানদণ্ডের এক পাল্লায় রাখা হবে নিরানব্বইটি ফাইল এবং অপর পাল্লায় রাখা হবে শুধু মাত্র ঐ কার্ডটি। এবার ওজনের সময় তার গুনাহে ভর্তি নিরানব্বইটি ফাইলের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহর নামের সাথে অন্য বস্তুর কোন ওজনই হবে না"। ছ্বহীহ: ইবনে হিব্বান। উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীছ প্রমাণ করে যে, অবশ্যই হাশরের মাঠে মানদণ্ড স্থাপন করা হবে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআন ও হাদীছে ক্বিয়ামতের দিন যা হবে বলে উল্লেখিত হয়েছে, আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার কিয়দাংশ এখানে আলোচনা করেছেন। এই মহান দিনে যা হবে, তার বিস্তারিত বিষয়গুলো মানুষের বোধশক্তি দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হাদীছ দ্বারাই কেবল তা জানা যাবে। কেননা তিনি নিজের পক্ষ হতে কিছুই বলেন না।

যা বলেন, إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى তা কেবল অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েই বলেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই জানেন। তারপরও ক্বিয়ামতের দিন বান্দাদের আমলের হিসাব নেয়া, আমলসমূহ ওজন করা এবং পুস্তকে লিখিত অবস্থায় তা প্রকাশ করার মধ্যে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে, যাতে করে তিনি তার বান্দাদের দ্বারা পূর্ণ প্রশংসিত হতে পারেন, তার পূর্ণ আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়ন হয়, তার সুপ্রশস্ত রহমত এবং রাজত্বের সুবিশালতা প্রমাণিত হয়।

এই মহা বিপদের দিনে বান্দাদের যে অবস্থা হবে, ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে তার কিয়দাংশ আলোচনা করেছেন।

(১) সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবেঃ সূর্য তাদের মাথার নিকটবর্তী হবে। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে মিকদাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُونَ قِيدَ مِيلٍ أَوِ اثْنَيْنِ

"যখন ক্বিয়ামতের দিন হবে, তখন সূর্যকে বান্দাদের নিকটবর্তী করা হবে। এত নিকটবর্তী করা হবে যে, তাদের মাঝে এবং সূর্যের মাঝে মাত্র এক বা দুই মাইলের ব্যবধান থাকবে"।[১৮৯]

---

১৮৯. ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/২৪২১, মুসলিম হা/২৮৬৪। বিজ্ঞানের তথ্য অনুযায়ী সূর্য আমাদের থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থান করার পরও আমরা এখন দুনিয়াতে সূর্যের যেই তাপ অনুভব করি, তা কখনো এত প্রখর হয় যে, আমরা খোলা আকাশের নীচে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। ক্বিয়ামতের দিন তা মাত্র এক মাইলের দূরত্বে চলে আসলে অবস্থা কেমন হবে?!!! এই প্রশ্নের জবাবে আমরা বলবো যে, ক্বিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা এখনকার মতো দুর্বল অবস্থায় থাকবে না, তাদের শরীরে এখন যেই ধারণ ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। দুনিয়াতে কেউ পানাহার ব্যতীত একটানা পঞ্চাশ দিন সূর্যের তাপে থাকতে পারবে না, মারা যাবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন সূর্য এত নিকটবর্তী হওয়ার পরও তার নীচে পঞ্চাশ হাজার বছর পানাহার ছাড়াই দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে তারা ভয়াবহ বিপদাপদেরও সম্মুখীন হবে। সেগুলো বরদাশত করার মতো শক্তি দিয়েই তাদের দেহকে গঠন করা হবে। আরো প্রশ্ন হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন কেউ কি সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাবে? নাকি মুসলিম-অমুসলিম, সৎ-অসৎ সকল মানুষই উত্তাপে জ্বলবে?

وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ মানুষের শরীর থেকে নির্গত ঘাম তাদের জন্য লাগাম স্বরূপ হয়ে যাবেঃ অর্থাৎ ঘাম তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে লাগামের মতো হয়ে যাবে এবং তাদেরকে কথা বলা থেকে বারণ করবে। সূর্য তাদের নিকটে চলে আসার কারণেই এমন হবে। অধিকাংশ মানুষের জন্যই সূর্য নিকটবর্তী হবে। অর্থাৎ সূর্যের তাপ অনুভব করবে। তবে নাবীদেরকে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে এর বাইরে রাখতে চাইবেন, তাদের কথা ভিন্ন।

(২) বান্দাদের আমলসমূহ মাপার জন্য দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবেঃ এই দিন আরো যা হবে, তার অন্যতম হচ্ছে, দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে এবং তার মাধ্যমে বান্দাদের আমলসমূহ ওজন করা হবে। الموازين শব্দটি ميزان -এর বহুবচন। ক্বিয়ামতের দিন যেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, তার দ্বারা মানুষের ভালো ও মন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন আসলেই দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। এই নিক্তির দু'টি পাল্লা এবং একটি কাঁটা থাকবে। মীযান (দাড়িপাল্লা) আখিরাতের অন্যতম একটি জিনিস। এর বিবরণ যেমন এসেছে, সেরকমই বিশ্বাস করি। কুরআন ও হাদীছের দলীলের বাইরে আমরা তার আকৃতি ও ধরন অনুসন্ধান করতে যাবো না। বান্দাদের আমলসমূহ মাপার হিকমত হচ্ছে, এগুলোর পরিমাণ যাহির করা, যাতে সেই অনুপাতে বিনিময় দেয়া যায়।

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "আমলের তুলনায় যাদের নেকীর পাল্লা ভারী হবে": তারাই সফলকাম হবে"। অর্থাৎ তারা সাফল্য লাভ করবে, জাহান্নামের

উত্তরে বলবো, না। তা নয়। এমন অনেক লোক রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার ছায়া দিবেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা সে দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার ছায়া দান করবেন। তারা হলেন, (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তার প্রভুর ইবাদতের মাঝে প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (৪) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবাসে। আল্লাহর জন্য তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে একজন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা নিজের দিকে আহবান করে, আর সে পুরুষ বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (তাই তোমার ডাকে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়)। (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, ডান হাত দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হতে পারে না। অর্থাৎ তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে শুনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে বসে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি প্রবাহিত করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, যদিও উক্ত হাদীছে সাতজনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর ছায়া প্রাপ্তদের সংখ্যা সাতের মধ্যে সীমিত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো কয়েক প্রকার মানুষকে বিশেষ বিশেষ আমলের কারণে ক্বিয়ামতের দিন তার ছায়া দান করবেন।

আগুন হতে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশের হকদার হবে।

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ "এবং নেকীর তুলনায় যাদের অসৎ আমলের পাল্লা ভারী হবে": فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم তারাই হবে এমন লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অর্থাৎ ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ জাহান্নামে তারা চিরস্থায়ী হবে। অর্থাৎ তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে।

উপরোক্ত আয়াতে কারিমা দ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, ক্বিয়ামতের দিন দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। কুরআনের অনেক আয়াতে ওজন এবং মীযানের আলোচনা এসেছে। সবগুলো দলীল একসাথে মিলালে বুঝা যায়, আমলকারী, আমল এবং আমল যেই পুস্তকে লিখা আছে, সবই ওজন করা হবে। এই কথাগুলো পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। সবই ওজন করা হবে। তবে এ কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, পাল্লা ভারী বা হালকা হবে স্বয়ং আমলের কারণে; আমলকারীর ব্যক্তিসত্তা কিংবা যেই পুস্তিকায় আমল লিখা থাকবে, তার কোন বিবেচনা করা হবে না। আল্লাহই অধিক জানেন।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দলীলগুলো তাবীল করে বলেছে, এখানে আমল ওজন করা এবং দাড়িপাল্লা স্থাপন করার অর্থ হচ্ছে আদল তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বাতিল এবং কুরআন-সুন্নাহর দলীল, উম্মতের সালাফ ও তাদের ইমামদের ইজমা বিরোধী।

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এই বিষয়ে মু'তাযিলাদের সর্বোচ্চ দলীল হচ্ছে, তারা বলে কবরে মৃত ব্যক্তির আযাব হয়, এই কথা মানুষের বোধশক্তির পক্ষে কবুল করে নেয়া অসম্ভব। এ ছাড়া তাদের নিকট আর কোন দলীল নেই। তাদের এই কথার মধ্যে কারো বিরুদ্ধে কোন দলীল নেই। কবরের আযাবের বিষয়টি তাদের বোধশক্তি মেনে না নিলেও তা এমন অনেক লোকের আকল কবুল করে নিয়েছে, যাদের বোধশক্তি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাদের অনুসারীদের আকল কবরের আযাবকে সহজভাবেই গ্রহণ করে নিয়েছে। পরবর্তীতে অন্ধকার রাতের ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিদ'আতের আগমন ঘটল এবং যার যা ইচ্ছা বলতে লাগল ও শরী'আতের দলীলগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করল। এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, আখিরাতের বিষয়গুলো এমন কোন বিষয় নয়, যে বোধশক্তি দ্বারা তা বুঝা সম্ভব।

(৩) **সেদিন আমলনামা উন্মুক্ত করা হবে:** এ বড় ক্বিয়ামত দিবসের ঘটনাসমূহ থেকে শাইখুল ইসলাম আরো যা উল্লেখ করেছেন, সেদিন আমলনামাসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। এখানে দফতর বলতে সেই দফতর উদ্দেশ্য, যাতে বান্দাদের ঐসব

আমল লিখিত আছে, যা তারা দুনিয়াতে সম্পাদন করেছিল। সম্মানিত লেখকগণ তাদের আমলসমূহ সংরক্ষণ করে রেখেছেন। দফতর খোলা হবে, এই কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সময় বান্দার আমল লিখার দফতর বন্ধ করে দেয়া হয়। তাই ক্বিয়ামতের দিন হিসাব নেয়ার সময় সেই আমলনামা খোলা হবে। যাতে প্রত্যেক মানুষ তার আমলনামা দেখতে পারে এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে, সে সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

কেউ আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে, কেউ গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে: এই অংশের মধ্যে ক্বিয়ামতের দিন মানুষের আমলনামা গ্রহণ করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কুরআনুল কারীমে এর বিবরণ এসেছে। মানুষ সেদিন দুইভাবে নিজ নিজ আমলনামা গ্রহণ করবে।

(ক) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে ডান হাতে। মুমিন ব্যক্তিই ডান হাতে আমলনামা পাবে

(খ) কেউ তার আমলনামা গ্রহণ করবে বাম হাতে অথবা পিছন দিক থেকে। কাফির তার আমলনামা বাম হাতে পাবে। তার বাম হাতকে বাঁকিয়ে পিছনের দিকে নিয়ে তাতে আমলনামা প্রদান করা হবে। আয়াতে কাফিরের আমলনামা উভয়ভাবেই দেয়ার কথা এসেছে। উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কাফিরের ডান হাত সেদিন তার গলার সাথে বেঁধে রাখা হবে এবং তার বাম হাত পিছনে টেনে নেয়া হবে। অতঃপর সে বাম হাতে তার আমলনামা গ্রহণ করবে।

অতঃপর শাইখ আমলনামা প্রদানের উপর আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾

প্রত্যেক মানুষের ভালোমন্দ কাজের আমলনামা আমি তার গলায় ঝুলিয়ে দিব (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৩)।

طائره এর অর্থ হচ্ছে, তার থেকে ভালোমন্দ যেসব আমল প্রকাশিত হয়েছে। তা তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। আমল তাকে জড়িয়ে থাকবে এবং তাকে তার বিনিময় দেয়া হবে। আমলনামা হতে তার পালিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। হার বা মালা যেমন গলাকে পেচিয়ে থাকে তেমনি আমলনামা মানুষের গলায় ঝুলতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا এবং ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বের করবো একটি কিতাব, যাকে সে খোলা আকারে পাবে (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৩): অর্থাৎ তার সমস্ত আমলকে একটি কিতাবে একত্র করবো এবং

ক্বিয়ামতের দিন তাকে তা দিবো। সে যদি সৌভাগ্যবান হয়, তাহলে দিবো ডান হাতে। আর হতভাগ্য হলে দিবো বাম হাতে। আমলনামা সে খোলা অবস্থাতেই পাবে। সে তা পড়তে পারবে। অন্যরাও তার আমলনামা পড়তে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: يَلْقَاهُ مَنْشُورًا আমলনামাকে খোলা অবস্থায় পাবে। এর কারণ হলো যাতে নেকীর পরিমাণ বেশী থাকলে তাকে দ্রুত সুখবর দেয়া যেতে পারে এবং অসৎ আমল বেশী থাকলে তাকে তিরস্কার করা যেতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: اقْرَأْ كِتَابَكَ। পড়ো নিজের আমলনামা নিজেই: অর্থাৎ দুনিয়াতে যে পড়তে পারতো এবং যে পারতোনা উভয়কেই আমি তা পাঠ করার আগে বলবো: তোমার নিজের আমলনামা তুমি নিজেই পড়ো।

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا "আজ নিজের হিসাব করার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:১৪): حسيبا শব্দটি এখানে حاسبا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تمييز হিসাবে তা মানসুব (যাবর) হয়েছে। এটি হচ্ছে সর্বোত্তম ন্যায় বিচার। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকেই তার হিসাব গ্রহণকারী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। যাতে করে সে তার সমুদয় আমল দেখতে পায় এবং তা থেকে কোনটিই অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে জানা গেল যে, প্রত্যেক মানুষকেই ক্বিয়ামতের দিন আমলনামা প্রদানের বিষয়টি সুসাব্যস্ত। সে তার আমলনামা নিজেই পড়বে এবং তার মধ্যে যা থাকবে, তা অবগত হবে। অন্যের মাধ্যমে অবগত হওয়ার কোন প্রয়োজন পড়বে না।[১৯০]

---

১৯০. আল্লাহ তা'আলা ডান হাতে আমলনামা প্রাপ্ত মুমিনদের খুশির অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾

"অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, এসো! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখো। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে। তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান করো তৃপ্তি সহকারে।" (সূরা আল-হাক্কাহ: ১৯- ২৪) আর যারা বাম হাতে পিছন দিক থেকে তাদের আমলনামা গ্রহণ করবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থা উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾

(৪) সেদিন মানুষের হিসাব নেওয়া হবে: অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) হিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা সেদিন সৃষ্টিসমূহের হিসাব নিবেন। হিসাব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে লোকদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময়ের পরিমাণ সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া এবং তাদের আমলসমূহ থেকে তারা যা ভুলে গেছে তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। অন্যভাষায় বলা যায়, হাশরের ময়দান হতে চলে যাওয়ার আগেই আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দাদেরকে তাদের ভালোমন্দ আমলসমূহের হিসাব নেওয়ার জন্য আটকানোকে হিসাব বলা হয়।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন যে, হিসাব দুই প্রকার।

প্রথম: মুমিনের হিসাব: মুমিনের হিসাবের ব্যাপারে তিনি বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দার সাথে নিবৃত্তে মিলিত হবেন এবং পাপরাশির কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। যেমন এ বিষয়ে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞﴾

"অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার কাছ থেকে হালকা হিসাব নেয়া হবে এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে"। (সূরা ইনশিকাক ৮৪:৭-৯)

বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ من الناس ويقرره بذنوبه وَيَقُولُ له: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَن قد هَلَكَ، قَالَ: فإني سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ثم يعطى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ»

"যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় আমাকে যদি আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় আফসোস! আমার মৃত্যুই যদি শেষ পরিণতি হত! আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, একে ধর। অতঃপর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। অতঃপর তাকে এমন শিকল দিয়ে বাঁধ যার দৈর্ঘ হবে সত্তর গজ।" (সূরা আল-হাক্কাহ: ২৫-৩২)

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনকে নিকটবর্তী করে তার উপর স্বীয় (সম্মানের) পর্দা স্থাপন করে তাকে মানুষ থেকে আড়াল করবেন এবং তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। আল্লাহ তাকে বলবেন: তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? তুমি কি অমুক অমুক অপরাধ স্বীকার করো? এমনকি আল্লাহ যখন তার কাছ থেকে সকল গুনাহর স্বীকৃতি আদায় করবেন এবং বান্দা যখন দেখবে যে, সে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে তখন আল্লাহ বলবেন: আমি দুনিয়াতে তোমার এ সমস্ত গুনাহ গোপন রেখেছি। আজ তোমার এ সমস্ত গুনাহ আমি ক্ষমা করে দিবো। তখন তার ভালো কাজগুলোর আমলনামা (ডান হাতে) প্রদান করা হবে।[১৯১]

ويقرره بذنوبه তাকে দিয়েই তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন: অর্থাৎ তাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যাবেন, যাতে সে তার গুনাহসমূহ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যেমন হাদীছে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একাধিকবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো? তুমি কি এই গুনাহ স্বীকার করো?

মুমিনদের মধ্যে এমন বহু সংখ্যক থাকবে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেমন সত্তর হাজারের হাদীছে এসেছে যে, তারা বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৯২]

হিসাব হবে বিভিন্ন রকম। কারো হিসাব হবে একদম সহজ। আর এটি হলো কেবল আমলগুলো পেশ করা। আরেক প্রকার হিসাব হবে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে। ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يوم القيامة إِلاَّ هَلَكَ فقلت يا رسول الله أَلَيْسَ قد قال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۞فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَيس أحد يناقش الْحِسَابَ يوم القيامة إلا عذب»

"ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি বললাম: ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কি বলেননি "অতঃপর যার

---

১৯১. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৪১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৮।

১৯২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২১৬। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও বাইহাকীতে ছ্বহীহ সনদ দ্বারা অপর হাদীছে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার প্রতিপালকের নিকট চাওয়ার ভিত্তিতে তিনি আমাকে উক্ত প্রতি হাজারে আরো সত্তর হাজারের ওয়াদা দিয়েছেন। সেই সাথে থাকবে আমার প্রতিপালকের আরো তিন অঞ্জলি।

আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে অচিরেই তার সহজ হিসাব নেয়া হবে"? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: মূলতঃ এটি হিসাব নয়; বরং তা হলো শুধু আমলগুলো পেশ করা। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন যার কঠিন হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে"।[১৯৩]

দ্বিতীয়: কাফিরদের হিসাব: কাফিরদের হিসাব সম্পর্কে শাইখুল ইসলাম বলেন: আর কাফিরদের ব্যাপারে কথা হলো, তাদের হিসাব ঐসব লোকদের হিসাবের মতো হবে না, যাদের ভালোমন্দ আমলসমূহ ওজন করা হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তাদের কোন ভালো আমলই থাকবে না। অর্থাৎ তাদের এমন সৎ আমল থাকবে না, যা অসৎ আমলের সাথে তুলনা করে ওজন করা যায়। কেননা কুফরী করার কারণে তাদের আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। আখিরাতে তাদের অসৎ আমল ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সুতরাং তাদের হিসাব নেওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাদের দুনিয়ার অপকর্মসমূহ গণনা করা এবং সংরক্ষণ করা। ক্বিয়ামতের দিন তাদের আমলগুলোর কারণে তাদেরকে আটকানো হবে, তাদেরকে তা স্বীকার করানো হবে। অতঃপর তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন তাদের কুফরী আমলগুলো তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের কাছ থেকে সেগুলোর স্বীকারোক্তি আদায় করার পর বদলা দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾

"আমি অবশ্যই কাফিরদের জানিয়ে দেব তারা কি কাজ করে এসেছে। আর তাদেরকে আমি অত্যন্ত জঘন্য শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো"। (সূরা হামীম সাজদাহ ৪১:৫০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴾

"এবং তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, বাস্তবেই তারা ছিল কাফির"। (সূরা আরাফ ৭:৩৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

"তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামের অধিবাসীদের উপর আল্লাহর লানত"। (সূরা মুলক ৬৭:১১)

---

১৯৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৩৭।

حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয এবং তার স্থান ও বৈশিষ্ট্য

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ طُولُهُ شَهْرٌ وَعَرْضُهُ شَهْرٌ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا

ক্বিয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয। তার অনুসারীরা পানি পান করার জন্য সেখানে উপস্থিত হবে। এই হাউযের পানি হবে দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি, তার পানপাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। এর দৈর্ঘ্য হবে একমাসের দূরত্বের সমান এবং প্রস্থ হবে এক মাসের দূরত্বের সমান। যে তা থেকে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না।

ব্যাখ্যা: (৫) ক্বিয়ামতের দিন আরো যা থাকবে, তার মধ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয অন্যতম। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে হাওযে কাওছারের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।[১৯৪] তিনি বলেন: ক্বিয়ামতের ময়দানে থাকবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওযে কাউছার। তার অনুসারীরা সেখানে পানি পান করার জন্য আগমন করবে।

ছ্বহীহ সনদে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: চল্লিশজন ছাহাবী নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাওযে কাউছারের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এই হাদীছগুলোর অনেকগুলোই বা অধিকাংশই ছ্বহীহ বুখারীতে রয়েছে। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) এর কথা এখানেই শেষ। العرصات এর বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত

---

১৯৪ . হাওযে কাউছার কোথায় স্থাপন করা হবে, এ বিষয়ে আলেমদের থেকে দু'টি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, হাশরের ময়দানে। আবার কেউ বলেছেন, পুলছ্বিরাত পার হওয়ার পর। তবে প্রথম কথাটিই সঠিক। কারণ হাশরের ময়দানে মানুষ পিপাসায় কাতর হবে। তখন তাদের পানি পান করার প্রয়োজন হবে। তাই হাশরের মাঠে হাওযে কাউছার থাকাই যুক্তিযুক্ত।

হয়েছে।

الحوض শব্দের আভিধানিক অর্থ পানি জমা হওয়ার স্থান। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ঐক্যমতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয সাব্যস্ত। মু'তাযিলারা এতে ভিন্নমত করেছে। তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওয সাব্যস্ত করে না এবং এ বিষয়ে বর্ণিত ছ্বহীহ হাদীছগুলোও কবুল করে না। তারা হাওয সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে এবং এগুলোর প্রকাশ্য অর্থ পরিবর্তন করে থাকে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম হাওযের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সুসাব্যস্ত। যেমন বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلا يَظْمأُ أَبَدًا»

"আমার হাওযের প্রশস্ততা হচ্ছে এক মাসের দূরত্বের সমান। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, তার সুঘ্রাণ হবে কস্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র, তার পেয়ালার সংখ্যা হবে আকাশের তারকার সমান। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে সে কখনোই পিপাসিত হবে না।[১৯৫]

---

১৯৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫৭৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৯২। বিদ্আতীরা ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউযে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি বলেন,

«إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي»

"ক্বিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্য হাউজে কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকবো। যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে আমি তাকে তা থেকে পান করাবো। আমার হাউজ থেকে যে একবার পানি পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না। এমন সময় আমার কাছে একদল লোক আগমন করবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। আমি বলবো, এরা আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কত বিদআত তৈরী করেছিল। আমি বলব, আমার রেখে আসা দীনের মধ্যে যারা পরিবর্তন করেছো তারা এখান থেকে সরে যাও। অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করা হবে"। (বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুর রিকাক)

الصراط ومعناه ومكانه وصفة مرور الناس عليه

পুলছিরাত, তার অর্থ, স্থান এবং তার উপর দিয়ে মানুষের অতিক্রম

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَتْنِ جَهَنَّمَ وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرُكَّابِ الْإِبِلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفًا وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمَ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ

ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর ছিরাত স্থাপন করা হবে। তা হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে স্থাপিত একটি পুল। লোকেরা নিজি নিজ আমল অনুযায়ী এর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। তাদের কেউ চোখের পলকের গতিতে চলবে, কেউ বিজলির গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে, কেউ উটে আরোহীদের গতিতে, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে এবং কেউ হামাগুড়ি দিয়ে পার হবে। কাউকে সেখান থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পুলের উপর থাকবে লোহার অসংখ্য আঁকুড়া বা কাঁটা। এগুলো আমল অনুযায়ী মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: (৬) শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, ক্বিয়ামতের দিন যা হবে, তার মধ্যে পুলছিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার বিষয়টি অন্যতম।

الصراط **ছিরাত** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো প্রশস্ত রাস্তা। আর শরী'আতের পরিভাষায় পুলছিরাতের পরিচয় শাইখ নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, এটি মূলতঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যকার একটি সেতু। পুলছিরাত কোথায় স্থাপন করা হবে, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শাইখুল ইসলাম বলেন যে, তা হবে على متن جهنم অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের উপর। ইহার উপর দিয়ে লোকদের অতিক্রম করার অবস্থা সম্পর্কে বলেন, কেউ পার হবে চোখের পলকে, কেউ বা বিজলির গতিতে। অর্থাৎ

ঈমান এবং ঐ সমস্ত সৎ আমল অনুপাতে পুলছ্বিরাতের উপরে তাদের অতিক্রমের গতি দ্রুত কিংবা ধীর হবে, যা তারা দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সম্পাদন করেছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুনিয়াতে দীন ইসলামের উপর টিকে থাকা ও দৃঢ়তা অনুপাতেই পুলছ্বিরাতের উপর তাদের টিকে থাকা এবং অতিক্রম করার বিষয়টি নির্ভর করছে।[১৯৬]

সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে **صراط معنوى** ছ্বিরাতে মানাভী (আদর্শিক পথ) তথা দীন ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকবে, তারাই ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর স্থাপিত **صراط حسي** ছ্বিরাতে হিস্সী (বাহ্যিক পথ) পুলছ্বিরাতের উপর দৃঢ়পদ থাকবে। আর দুনিয়াতে যে ব্যক্তি এই ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত হবে, সে ক্বিয়ামতের দিন ছ্বিরাতে হিস্সীর উপর তথা পুলছ্বিরাতের উপর থেকে ছিটকে পড়বে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

يعدو عدوا অর্থ হচ্ছে দ্রুত গতিতে দৌড়িয়ে চলবে। আর يزحف زحفا মানে পায়ের বদলে নিতম্বের উপর ভর দিয়ে চলবে। وعليه كلاليب পুলছ্বিরাতের উপর থাকবে বাঁকা মাথা বিশিষ্ট লোহা। كلاليب শব্দটি كلوب এর বহুবচন। كلوب শব্দের 'কাফ' বর্ণে যবর এবং 'লাম' বর্ণে তাশদীদ ও পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। تخطف এর 'তোয়া' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। যের দিয়ে পড়াও জায়েয। الخطف মাসদার

---

১৯৬ . আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে,

«أَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا عِنْدَ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَوْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ (هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهُ أَفِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شِمَالِهِ أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ

"তিনি জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কাঁদতে শুরু করলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? তিনি বললেন, আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদছি। হাশরের মাঠে আপনি কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা মনে রাখবেন? নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। (১) মানুষের আমল যখন মাপা হবে। তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে। চিন্তা একটাই থাকবে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে? না হালকা হবে। (২) যখন প্রত্যেকের আমলনামা দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। আমলনামা ডান হাতে পাবে? না বাম হাতে পাবে- এনিয়ে চিন্তিত থাকবে। (৩) পুলছ্বিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। কেউ কাউকে স্মরণ করবে না"। (আবু দাউদ, অধ্যায়: কিতাবুস সুন্নাহ)।

থেকে এই শব্দটি গঠিত। কোন জিনিসকে খুব দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে যাওয়াকে খাতাফ বলা হয়। মন্দ আমলের কারণে মানুষকে পুলছ্বিরাতের উপর থেকে দ্রুত উঠিয়ে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শুবুহাত এবং শাহওয়াত (সন্দেহ এবং কুপ্রবৃত্তি) মানুষকে দুনিয়াতে ছ্বিরাতুল মুস্তাকীম থেকে দ্রুত সরিয়ে ফেলা অনুপাতেই পুলছ্বিরাতের উপরে লোহার বক্র কাঁটাগুলো মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে এবং লোকেরা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এ বিষয়ে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে ঈমান আনয়ন করে।

মুতাযেলী আলিম কাযী আব্দুল জাব্বার এবং তার অনেক অনুসারী জাহান্নামের উপর ছ্বিরাত স্থাপনের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছে। সে বলেছে, উপরোক্ত ছ্বিরাত বলতে জান্নাত ও জাহান্নামের দিকে যাওয়ার রাস্তাকে বুঝানো হয়েছে। তাদের মতে আল্লাহ তা'আলা সূরা মুহাম্মাদের ৫-৬ নং আয়াতে বলেছেন:

﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ﴾

"তিনি অচিরেই তাদের পথপ্রদর্শন করবেন, তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন" দ্বারা জান্নাতের পথের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা সূরা সাফ্ফাতের ২২-২৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾

ক্বিয়ামতের দিন আদেশ করা হবে, ধরে নিয়ে এসো যালেমদেরকে, তাদের সহযোগীদেরকে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মাবুদের ইবাদত করতো। অতঃপর তাদের সবাইকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দাও।

{فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} দ্বারা জাহান্নামের দিকে যাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল এবং বিনা দলীলে এর দ্বারা সুস্পষ্ট ছ্বহীহ হাদীছগুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে।[১৯৭] কুরআন ও হাদীছের উক্তি থেকে প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করা অপরিহার্য। কোন ক্রমেই বিনা কারণে প্রকাশ্য অর্থ বাদ দিয়ে অন্য

১৯৭. ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর পুল স্থাপন করা হবে এবং লোকেরা তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেহেতু এ বিষয়ে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে ঈমান আনয়ন করে।

অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

القنطرة بين الجنة والنار

জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝের সেতু

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ

যারা পুলছিরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে যখন তারা পুলছিরাত পার হবে, তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে একটি সেতুর উপর থামানো হবে। এখানে তাদের একজন থেকে অপরজনের কিসাস বা বদলা গ্রহণ করা হবে। অতঃপর যখন তাদেরকে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে।[১৯৮]

ব্যাখ্যা: (৭) ক্বিয়ামতের দিন আরো যা হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তা থেকে কানতারার (সেতুর) উপর দণ্ডায়মান হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি পুলছিরাত অতিক্রম করবে এবং জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

"একমাত্র সে ব্যক্তিই সফলকাম হবে, যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে (সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮৫)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা শুরার ৭ নং আয়াতে বলেন:

فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

"এক দল জান্নাতে যাবে এবং অপর দলকে যেতে হবে জাহান্নামে"।

---

১৯৮. কেননা জান্নাতের ঘরসমূহ এবং তার নিয়ামতগুলো অত্যন্ত পবিত্র ও সুন্দর। সুতরাং তার অধিবাসীগণও হবে পবিত্র। তাই যার মধ্যে সামান্যতম দোষ-ত্রুটি এবং অপবিত্রতা থাকবে, তাকে তা থেকে পবিত্র না করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে না।

তবে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মুমিনদের পারস্পরিক যুলুমের কিসাস নেওয়া হবে। পরিশেষে তারা যুলুম থেকে একদম পরিষ্কার-পরচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দরতম অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) فإذا عبروا বাক্য দ্বারা এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন অর্থাৎ তারা যখন পুলছীরাত পার হবে এবং জাহান্নামে পড়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে, তখন তারা একটি কানতারার উপর থামবে। সেতু, ওভার ব্রীজ এবং যমীনের উপর যেসব ঘরবাড়ি নির্মাণ করা হয়, তার চেয়ে উঁচু বস্তুকে কানতারা বলা হয়। এ কানতারা সম্পর্কে একাধিক কথা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, এটি হচ্ছে পুলসীরাতের ঐ কিনারা, যা জান্নাতের নিকটবর্তী। কেউ কেউ বলেছেন, এটি হচ্ছে শুধু মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট আরেকটি ছীরাত।

فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ অতঃপর তাদের একজনের জন্য অপরজন থেকে কিসাস বা বদলা গ্রহণ করা হবে: অর্থাৎ তাদের মধ্যকার পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেওয়া হবে। যালেম থেকে মাযলুমের হক আদায় করে নেওয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হবে অর্থাৎ মাযলুমের হক আদায় এবং অন্যান্য দায়ভার হতে মুক্ত হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হবে। তখন তাদের কতকের অন্তরে অন্যদের প্রতি যেই হিংসা-বিদ্বেষ ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾

"তাদের মনে যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকবে তা আমি বের করে দেবো, তারা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে"। (সূরা হিজর ১৫:৪৭)

أول من يستفتح باب الجنة وأول من يدخلها وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم

সর্ব প্রথম যিনি জান্নাতের দরজা খুলবেন, তিনি সর্বপ্রথম তাতে প্রবেশ করবেন এবং নাবী এর শাফা'আতের বর্ণনা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ أَمَّا الشَّفَاعَةُ الْأُولَى فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ آدَمُ ، وَنُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ: فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَهَاتَانِ الشَّفَاعَتَانِ خَاصَّتَانِ لَهُ وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِثَةُ: فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ ، فَيَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارَ أَلَّا يَدْخُلَهَا وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেহেশতের দরজা খুলবেন। সমস্ত উম্মতের মধ্য হতে তার উম্মতই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তিনি ক্বিয়ামতের দিন তিনটি শাফা'আত করবেন।

প্রথম শাফা'আতটি করবেন হাশরের মাঠে অবস্থানকারী সকল মানুষের জন্য। যাতে তাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করা হয়। আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা (আলাইহিমুস সালাম) এবং সমস্ত নাবীই সেদিন আল্লাহর নিকট শাফা'আত করতে অক্ষমতা প্রকাশ করার পর শাফা'আতের বিষয়টি পরিশেষে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে আসবে।

দ্বিতীয় শাফা'আতটি হবে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য। এ দু'টি শাফা'আত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য খাস।

আর তৃতীয় শাফা'আতটি হবে ঐসব লোকের ব্যাপারে, যাদের জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাবে। এই শাফা'আতটি হবে সমস্ত নাবী, সিদ্দীক এবং অন্যান্যদের জন্য। সুতরাং যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদের জন্য তিনি

সুপারিশ করবেন, তাদেরকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করানো না হয়। তিনি আরো সুপারিশ করবেন ঐ সব লোকের জন্য, যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাদেরকে সেখান থেকে বের করার সুপারিশ করবেন।

ব্যাখ্যা: (৮) ক্বিয়ামত দিবসের যেসব অবস্থা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা অতিক্রম করার পর সেদিন মুমিনদের সর্বশেষ অবস্থা কী হবে, শাইখুল ইসলাম এখানে তা বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত অধ্যায়ে তিনি বলেছেন: অতঃপর যখন তাদেরকে পারস্পরিক যুলুম থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার করা হবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অনুমতির পূর্বে এবং জান্নাতের দরজা খোলার আবেদন করার আগে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খুলবেন। যেমন ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ»

"ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় উপস্থিত হয়ে তার দরজা খোলার আবেদন করবো। তখন জান্নাতের প্রহরী বলবে: আপনি কে? আমি বলবো: মুহাম্মাদ। প্রহরী তখন বলবে: আপনার জন্য দরজা খুলতে আমাকে আদেশ করা হয়েছে। আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য আমি জান্নাতের দরজা খুলবো না"।[১৯৯]

الاستفتاح অর্থ হচ্ছে খোলার আবেদন করা। এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মান ও ফযীলত প্রকাশ করা হয়েছে।

সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা তাদের ফযীলত অন্যান্য সকল উম্মাতের উপরে। মুসিলম শরীফে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»

"আমরা সকলের পরে দুনিয়াতে আসলেও ক্বিয়ামতের দিন সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবো"।[২০০]

---

১৯৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯৭।

২০০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৫৫।

ক্বিয়ামতের দিন খাসভাবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি শাফা'আত করবেন। الشفاعات শব্দটি شفاعة এর বহুবচন। শাফা'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ মধ্যস্থতা করা, সুপারিশ করা। আর শরী'আতের পরিভাষায় শাফা'আত অর্থ হলো**سؤال الخير للغير** অন্যের জন্য কল্যাণের আবেদন করা। الشفاعة শব্দটি الشفع থেকে নেওয়া হয়েছে। ইহা الوتر শব্দের বিপরীত। شفع অর্থ জোড় আর وتر অর্থ বে-জোড়। শাফা'আতকারী তার আবেদনের সাথে সুপারিশকৃতের আবেদনকেও শামিল করে নেয় বলেই তাকে সুপারিশকারী বলা হয়। অথচ এর আগে সে ছিল একাকী।

শাইখুল ইসলাম বলেন: "ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তিনটি শাফা'আত হবে"। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব শাফা'আত করবেন, তিনি এখানে ঐসব শাফা'আতের আলোচনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে শাফা'আতের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। **তবে অনুসন্ধানের পর মোট আট প্রকার শাফাআতের কথা জানা যাচ্ছে**। এগুলোর মধ্য হতে কতিপয় শাফা'আত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে খাস এবং আরো কিছু শাফা'আতের কথা জানা যায়, যা তার জন্য এবং অন্যদের জন্যও সাব্যস্ত।

১) الشفاعة العظمى শাফাআতে উয্মা: وهي المقام المحمود এ শাফা'আত হবে মাকামে মাহমুদে। হাশরের মাঠে লোকদের দীর্ঘ অবস্থানের পর এবং আদম থেকে শুরু করে ঈসা (আলাইহিস সালাম) পর্যন্ত সবার কাছে সুপারিশের জন্য গমন করার পর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দাদের মাঝে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার আবেদন করবেন। সকল নাবীই যখন আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন, তখন নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রভুর অনুমতি নিয়ে শাফা'আত করবেন।

২) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في دخول أهل الجنة بعد الفراغ من الحساب জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত: হিসাবের পর জান্নাতীদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রবেশের অনুমতির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট শাফা'আত করবেন।

৩) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في عمه أبي طالب চাচা আবু তালেবের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন তার চাচা আবু তালেবের শাস্তি হালকা করার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। এ শাফা'আত তার সাথেই খাস। কেননা আল্লাহ তা'আলা সংবাদ

দিয়েছেন যে, কাফিরদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, তার শাফা'আত কেবল তাওহীদপন্থীদের জন্যই নির্দিষ্ট। সুতরাং তার কাফির চাচা আবু তালেবের জন্য যেই শাফা'আত তিনি করবেন, তা কেবল তার সাথেই এবং আবু তালেবের জন্যই খাস।[২০১] উপরের তিন প্রকার শাফা'আত কেবল আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্যই নির্দিষ্ট।

٤) شفاعته فيمن استحق النار من عصاة الموحـــدين أن لا يـــدخلها তাওহীদপন্থীদের মধ্য হতে যাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে তথায় না পাঠানোর শাফা'আত: যেসব গুনাহগারদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যাবে, তাদেরকে জাহান্নামে না পাঠানোর জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবেন।

٥) شفاعته ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার সুপারিশ: জাহান্নামে প্রবেশকারী তাওহীদপন্থী একদল পাপী লোককে তা থেকে বের করার জন্য তিনি শাফা'আত করবেন।[২০২]

---

২০১ . ছ্বহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, একদা আব্বাস (রাঃ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন,

«يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»

"হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আবু তালেবের কোন উপকার করতে পারলেন? সে তো আপনাকে শত্রুদের অনিষ্ট হতে হিফাজত করতো এবং আপনার জন্য মানুষের সাথে রাগান্বিত হতো। তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে এখন জাহান্নামের আগুনের উপরিভাগে অবস্থান করছে। আমি না থাকলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে অবস্থান করতো।

২০২ . আমরা বিশ্বাস করি যে, যে সমস্ত তাওহীদপন্থী মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং তাদের মধ্যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন"। (সূরা আন নিসা: ৪৮) কুরআন ও হাদীছে পাপী মুমিনদের এমন অনেক আমলের বর্ণনা এসেছে যাতে তাদের জন্য শাস্তির কথা এসেছে। তবে তা তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া আবশ্যক করে না। তাদের এক শ্রেণীর লোক ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

৬) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في رفع درجات بعض أهل الجنة জান্নাতের ভিতরে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ: জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন।[২০৩]

৭) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ فيمن استوت حسناتهم وسيئاتهم যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য সুপারিশ: ক্বিয়ামতের দিন যাদের গুনাহর পাল্লা এবং নেকীর পাল্লা সমান সমান হবে, তাদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাফা'আত করবেন যে, তাদেরকে যেন জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আলেমদের এক মত অনুযায়ী তারা হলেন আরাফবাসী।

৮) شفاعته ــ صلى الله عليه وسلم ــ في دخول بعض المؤمنين الجنة بلا حساب ولا عذاب বিনা হিসাবে এবং বিনা আযাবে এক শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর শাফা'আত: যেমন উক্কাশা ইবনে মিহসানের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত। উক্কাশা যখন শুনলেন, এই উম্মাতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে যাবে, তখন তিনি আবেদন করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে সেই সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উক্কাশার জন্য উক্ত সত্তর হাজারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার দু'আ করলেন।[২০৪]

এ শেষোক্ত পাঁচ প্রকারের শাফা'আত করার মধ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। তিনি বলেন,

«شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي»

"আমার উম্মতের কবীরা গুনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য আমার শাফা'আত"। (তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, সিলসিলায়ে ছ্বহীহা, হা/৫৫৯৮) তিনি আরো বলেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا»

"সকল নাবীর জন্য এমন একটি দু'আ রয়েছে, যা আল্লাহ কবুল করবেন। দুনিয়াতে সকল নাবী আল্লাহর কাছে দু'আ করে নিয়েছেন। আর আমি ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের সুপারিশের জন্য দু'আটি রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে ব্যক্তি ইনশা-আল্লাহ তা পাবে"। (মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান)

২০৩. এতে তারা তাদের আমলের তুলনায় অধিক বিনিময় লাভ করবেন। এমর্মে অনেক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ২০৫।

২০৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০, ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৭৫২।

সাল্লাম এর সাথে আরো অনেকেই শরীক থাকবে। যেমন অন্যান্য নাবীগণ, ফেরেশতাগণ, সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ।[২০৫]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত সকল প্রকার শাফা'আতেই বিশ্বাস করে। কেননা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত অনেক দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত। তবে দু'টি শর্ত ছাড়া শাফা'আত হবে না।

প্রথম শর্ত: শাফা'আতকারীকে শাফা'আত করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শাফা'আতের অনুমতি লাভ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

কে আছে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে?" *(সূরা আল বাকারা ২:২৫৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

"কোন শাফা'আতকারী এমন নেই, যে তার অনুমতি ছাড়া শাফা'আত করতে পারে *(সূরা ইউনুস ১০:৩)*।

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকা অপরিহার্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾

"তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন"। *(সূরা আম্বীয়া ২১:২৮)* এ দু'টি শর্ত সূরা নাজমের ২৬ নং আয়াতে একসাথে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾

"আসমানে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসবেনা। যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন"।

---

২০৫. মুসলিমদের যেসব শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগেই মারা যায় তারা তাদের পিতামাতার জন্য সুপারিশ করবে এবং মুমিনগণও পরস্পরের জন্য সুপারিশ করবে। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন।

কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেসব মুমিন মৃত্যুবরণ করবে তাদের কেউ জাহান্নামের হকদার হলে তাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করানোর জন্য শাফা'আতের ব্যাপারে মু'তাযিলা সম্প্রদায় লোকেরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরোধিতা করেছে। সেই সাথে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার ব্যাপারেও শাফা'আত হওয়াকে মু'তাযিলারা অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তারা শাফা'আতের উপরোক্ত প্রকারসমূহ থেকে পঞ্চম ও ষষ্ট প্রকার শাফা'আতকেও তারা অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾

"সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কাজে আসবে না *(সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৪৮)*।

তাদের কথার জবাব হলো, আয়াতটি কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাফিরদের কোন কাজে আসবে না। তবে মুমিনদের ব্যাপারে কথা হচ্ছে কতিপয় শর্তসাপেক্ষ সুপারিশ তাদের উপকার করবে। মোটকথা শাফা'আতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত:

(১) এক শ্রেণীর লোক শাফা'আতকে সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেছে। নাসারা, মুশরিক, সীমালঙ্ঘনকারী সুফী এবং কবর পূজারীরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা যাদেরকে তা'যীম করে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাদের শাফা'আতকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের নিকট পরিচিত শাফা'আতের মতোই মনে করে থাকে। সুতরাং তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের কাছে শাফা'আত প্রার্থনা করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকদের জন্য সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে না।

(২) মু'তাযিলা ও খারিজীরা শাফা'আতকে একদম অস্বীকার করেও সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা কবীরা গুনাহকারীদের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যদের শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে।

(৩) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কুরআনের আয়াত এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে। সুতরাং তারা শর্তসাপেক্ষ শাফা'আতকে সাব্যস্ত করে।[২০৬]

---

২০৬ . **নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শাফা'আত চাওয়ার বিধান:**

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম সুপারিশ করবেন এবং তার সুপারিশই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে। কিন্তু তার কাছে শাফা'আত চাওয়া বৈধ নয়। কারণ ক্বিয়ামতের

إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة واتساع الجنة عن أهلها

কতিপয় গুনাহগারকে শাফা'আত ব্যতীত শুধু আল্লাহর রহমতেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশের পর সেখানে জায়গা খালি থাকলে বা জান্নাতীদের তুলনায় জান্নাত অধিক প্রশস্ত হলে কী করা হবে?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَيُخْرِجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ أَقْوَامًا بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ

মাঠে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে এ কথা বলা যে, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে দ্রুত ফায়ছালা করার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন এবং দুনিয়াতে কেউ যদি বলে, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার কাছে শাফা'আত প্রার্থনা করছি- উভয় কথা এক নয়। এমনিভাবে তিনি জীবিত থাকাবস্থায় তার কাছে গিয়ে একথা বলা যে, হে আল্লাহর নাবী! আমার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করুন এবং তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর উক্ত কথা বলা এক নয়। কারণ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তিনি কারো জন্য দু'আ করতে সক্ষম নন। সুতরাং রসূলের কাছে শাফা'আত বা অন্য কিছু চাওয়া শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যদি কেউ বলে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শাফা'আতের অধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি তার কাছে এমন একটি জিনিস চাচ্ছি, যা তাকে দেয়া হয়েছে এবং তার মালিকানায় রয়েছে।

উত্তরে আমরা বলবো যে, আল্লাহ তার রসূলকে শাফা'আতের অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তার কাছে শাফা'আত চাইতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾

"মসজিদসমূহ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না"। (সূরা জিন: ১৮) শাফা'আত চাওয়া দু'আ চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ অর্থাৎ দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মূল। অন্য বর্ণনায় আছে দু'আ হচ্ছে সর্বোত্তম ইবাদত। সুতরাং দু'আ যেহেতু ইবাদত তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর কাছেই দু'আ করতে হবে। রসূল বা অন্য কোন মাখলুকের কাছে দু'আ করা সুস্পষ্ট শির্ক।

এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে আমরা রসূলের শাফা'আত লাভে ধন্য হতে পারি? রসূলের শাফা'আত পেতে হলে সকল প্রকার শির্ক থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তার সুন্নাতের অনুসরণ করতে হবে।

কেউ যদি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শাফা'আত চাওয়ার পরিবর্তে এভাবে বলে যে, হে আল্লাহ! ক্বিয়ামতের দিন আমাকে রসূলের শাফা'আত থেকে মাহরূম করো না কিংবা যদি বলে, হে আল্লাহ! রোজ হাশরে আমার জন্য রসূলের শাফা'আত নসীব করো, তাহলে কতই না সুন্দর হবে সেই দু'আ!

دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا أَقْوَامًا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَتَفَاصِيلُ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْآثَارِ مِنَ الْعِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي فَمَنِ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ

কোন শাফা'আত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে ও দয়ায় অনেক মানুষকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরেও জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের জন্য নতুন কিছু মানুষ সৃষ্টি করবেন এবং তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে যেমন হিসাব, ভালো আমলের ছওয়াব, মন্দ আমলের শাস্তি প্রদান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ আসমানি কিতাবসমূহে এবং নাবীদের থেকে বর্ণিত ইলমের মধ্যে রয়েছে। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। যে ব্যক্তি তা অনুসন্ধান করবে, সে তা পেয়ে যাবে।

.....

ব্যাখ্যা: (৯) ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিতে যত প্রকার শাফা'আত হবে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঐসব লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার শাফা'আত, যারা ইতিমধ্যেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) প্রথমে তাদের বিষয়টি উল্লেখ করার পর এখানে উল্লেখ করেছেন যে, শাফা'আত ছাড়াও অন্য একটি কারণে অনেক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে।

আর সেটি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার রহমত, অনুগ্রহ এবং তার দয়া। সুতরাং তাওহীদপন্থী যেসব গুনাহগার মুমিনের অন্তরে একটি দানার চেয়েও কম পরিমাণ ঈমান থাকবে, তারা জাহান্নাম থেকে বের হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন" *(সূরা আন নিসা ৪:৪৮)* ।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে রয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন:

«شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ»

"ফেরেশতাগণ শাফা'আত করেছে, নাবীগণ শাফা'আত করেছেন এবং মুমিনগণও শাফা'আত করেছেন। এখন সবচেয়ে দয়ালু আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো শাফা'আত বাকী নেই। অতঃপর তিনি জাহান্নামের আগুন থেকে একমুষ্ঠি গ্রহণ করবেন। এর মাধ্যমে তিনি জাহান্নাম থেকে এমন একদল মানুষকে বের করবেন, যারা কখনো কোন ভালো আমলই করেনি"।[২০৭]

ويبقى في الجنة فضل জান্নাতে কিছু বাড়তি জায়গা থাকবে: অর্থাৎ দুনিয়াবাসীদের থেকে যারা জান্নাতবাসী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার পরও তাতে প্রশস্ত জায়াগা খালি পড়ে থাকবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে খুব প্রশস্ত করে সৃষ্টি করেছেন।

তিনি সূরা আল ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"তোমরা দৌড়ে চলো তোমাদের রবের ক্ষমার পথে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা পৃথিবী ও আকাশের সমান। মুত্তাকী লোকদের জন্য তা তৈরী করে রাখা হয়েছে"।

فَيُنْشِئُ اللَّهُ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করবেন অনেক লোক। فيدخلهم الجنة অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কেননা জান্নাত হচ্ছে আল্লাহর রহমত। এর মাধ্যমে তিনি যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন। আর জাহান্নামে কেবল তাদেরকেই শাস্তি দিবেন, যারা হেদায়াতের দলীল পৌঁছার পর আল্লাহ তা'আলাহকে অস্বীকার করেছে এবং রসূলদেরকে অমান্য করেছে।

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ الخ..... আখিরাতের জগতে যেসব বিষয় হবে: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) আখিরাত দিবসের অবস্থা এবং তাতে যা হবে, তা থেকে অনেক বিষয় উল্লেখ করার পর বাকীগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। কেননা আখিরাতের বিষয়গুলো ইলমে গায়বের অন্তর্ভুক্ত, যা অহীর মাধ্যম ছাড়া অবগত হওয়া সম্ভব নয়।

---

২০৭. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৩।

الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান এবং তাতে যেসব বিষয় শামিল রয়েছে

[ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি হচ্ছে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ

নাজাতপ্রাপ্ত দল অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করে। তার মধ্যে যেসব ভালো রয়েছে তার প্রতি এবং যেসব মন্দ রয়েছে, তার প্রতিও। তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরই দু'টি জিনিসকে শামিল করে।

ব্যাখ্যা: القدر শব্দটি **قدرت الشيئ إذا أحطت بمقداره** এর মাসদার। অর্থাৎ যখন কোন জিনিস সম্পর্কে সকল দিক অবগত হওয়া যায়, তখন বলা হয় أحطت بمقداره "আমি তার পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হয়েছি"। এই কথা আপনি ঠিক ঐ সময়ই বলে থাকেন, যখন সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছুই আপনি অবগত হতে সক্ষম হন।

কাদার বা তাক্বদীর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার ইলম রয়েছে। মাখলুকসমূহ সৃষ্টি করার আগেই আযালে (আদিতে) আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে অবগত আছেন।[২০৮]

---

২০৮ . আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পূর্বের নির্ধারণ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন না কিংবা তাক্বদীর অনুযায়ী কাউকে পুরস্কারও দিবেন না। কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও এই কথা বলা হয়নি; বরং তিনি তাদের আমল অনুযায়ী শাস্তি দিবেন অথবা ছওয়াব দিবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ছওয়াব বা শাস্তি আমলের ফলাফল; ভাগ্যের নয়।

অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, তাক্বদীরে আছে বা ছিল কিংবা ভাগ্যে যা আছে তাই হবে এই কথার অর্থ হলো যা কিছু হবে, আল্লাহ তা'আলা আযাল (আগে) থেকেই তা জানেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার সকল অবস্থা ও পরিণাম জানেন, তার মানে এই নয় যে তিনি কোন

কিছুতে বান্দাকে বাধ্য করেন। তাই বান্দার ভালোমন্দ আমল কিংবা তার জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াতে আল্লাহর ইলম প্রভাবহীন।

এ ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের উত্তর বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝতে সহযোগিতা করে। তা হলো, আমরা যেসব কাজ করি সেগুলো আল্লাহ ভাগ্যে লিখেছেন বলে আমরা করি? নাকি আমরা তা করবো বলে তিনি জানতে পেরেছেন এবং সে অনুযায়ী লিখেছেন?

উত্তর হলো, আমরা করবো বলে আল্লাহ তা'আলা জেনেছেন বলেই লিখেছেন। অতএব ভাগ্যলিপিকে দায়ী বানানোর কোনো অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু বান্দাকে আকল তথা বোধশক্তি দিয়েছেন, আমল করা বা না করার স্বাধীনতা দিয়েছেন, শক্তিও দিয়েছেন, বান্দা যেহেতু সেই আকল খাটিয়ে কাজ করে, নিজস্ব ইচ্ছা ও স্বাধীনতার বলে ভালো বা মন্দটা নির্বাচন করে, তাই সে নিজেই ছওয়াব বা শাস্তির হকদার হয়। ছ্বলাত যেহেতু বান্দাই পড়ে, তাই ছ্বলাতের পুরস্কার সেই পাবে, কুরআন যেহেতু বান্দার মুখ দিয়ে পড়া হয়, তাই প্রতিটি হরফের বিনিময়ে বান্দাই দশটি নেকী পাবে।

বান্দাই যেহেতু যেনা করা এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে নিজের আকল, সুকুমারবৃত্তি, আপন ইচ্ছা ও এখতিয়ারের বদৌলতেই বিরত হয়, সে কারণেই প্রশংসিত হয় বান্দা নিজেই এবং উক্ত কাজগুলোতে লিপ্ত হলে নিন্দিত হয় কেবল বান্দাই।

অসৎচরিত্রের কোনো লোক যদি কারো মা-বোন বা স্ত্রীর সাথে যেনা করতে যায়, তখন বিবেকবান কোন লোক এই কথা বলে না যে, ঠিক আছে, আমার স্ত্রীর নসীবে যেনা-ব্যভিচার লেখা আছে। তাই আমি তাকে বাধা দিবো না। তার মন যা চায়, আমার ঘরে তাই করে যাক; বরং সে রাগান্বিত হয়, জান দিয়ে হলেও নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে সিংহের মত ক্ষেপে উঠে এবং অপরাধীকে প্রতিহত করে, হত্যা করতেও উদ্যত হয়। বাস্তবে এমনটিই হওয়া উচিত।

কারো ঘরে চোর ঢুকলে ঘরের মালিক এ কথা বলে না যে, চোরের মন যা চায় নিয়ে যাক, আমি বাধা দিবো না.....। বিচারকের আদালতে চোরকে হাযির করা হলে এবং সাক্ষী-প্রমাণের মাধ্যমে চুরি প্রমাণিত হলে চোর যদি বলে তাক্বদীরে লেখা ছিল, তাই চুরি করেছি। পৃথিবীর মুসলিম-অমুসলিম কোন আদালত চোরের এই কথার কোন মূল্যায়ন করবে না।

সুতরাং কোন মানুষের এই কথা বলা ঠিক নয় যে, তাক্বদীরে ছ্বলাত লেখা নেই, তাই পড়ছিনা। তাক্বদীরে জাহান্নাম লেখা থাকলে ছ্বলাত পড়েও লাভ হবে না। আর তাক্বদীরে জান্নাত লেখা থাকলে ছ্বলাত না পড়েও জান্নাতে যাওয়া যাবে। এটি কোন বিবেকবান মানুষের কথা হতে পারে না। ইবলীস ছাড়া অন্য কেউ মানুষের মাথায় এই কথা জাগ্রত করে না।

তাক্বদীরের মাসআলাটি অত্যন্ত বড়। ছাহাবীদের জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিশাল। তাই তারা সহজভাবে মাসআলাটি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছাহাবীদের যুগে সীমিত আকারে তাক্বদীরের বিষয়ে দু'একটি প্রশ্ন হলেও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবাব শুনে তাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। রসূলের পবিত্র জবানীতে জবাব শুনে কেউ আমল বর্জন করেননি; বরং আগের চেয়ে আরো বেশী আগ্রহ নিয়ে এবং জান্নাত লাভের আশায় সৎ আমলে মগ্ন হয়েছেন।

কিন্তু ছাহাবীদের পরবর্তী যুগসমূহে তাক্বদীরের মাসআলায় বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েই আসছে। আলেমগণ তাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি দিয়ে এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে যুগে যুগে মানুষের সেই প্রশ্নগুলোর বিভিন্ন জবাব দিয়েই আসছেন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে হিদায়াত করো এবং সেই পথে অবিচল রাখো। আমীন

পৃথিবীতে এমন কোন ঘটনা ঘটে না, যা আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করেননি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেই ঘটনার সাথে তার ইচ্ছাও রয়েছে। তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের ছয় রুকনের একটি। তাকাদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করা মানে তার ভালোমন্দ উভয়ের প্রতিই বিশ্বাস করা।

শাইখুল ইসলামের উক্তি: وتؤمن الفرقة الناجية ــ أهل السنة والجماعة ــ بالقدر خيره وشره নাজী ফির্কা অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাক্বদীরের ভালো ও মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করে: এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যারা তাক্বদীরের ভালোমন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না, তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন ও হাদীছের দলীলের দাবীও তাই। যেমন হাদীছে জিবরীলে এসেছে, জিবরীল যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি বললেন:

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

"তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তার ফেরেশতাদের উপর (৩) তার কিতাবসমূহের উপর (৪) তার রসূলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং (৬) তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর"।[২০৯]

এ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নকে ঈমানের ষষ্ঠ রুকন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করবে, সে মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না। তেমনি ঈমানের অন্য কোন রুকন অস্বীকার করলেও মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না।

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান দু'টি স্তরে বিভক্ত: শাইখুল ইসলাম এখানে উল্লেখ করেছেন যে, তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের সর্বমোট চারটি স্তর রয়েছে। সংক্ষিপ্তাকারে এই স্তরগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ।

(১) প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার আযালী ইলম। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগে থেকেই আল্লাহ তা'আলা মাখলুকের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, তা সম্পাদন করার পূর্বেই সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিও সেই ইলমে আযালীর অন্তর্ভুক্ত।

(২) সেই ইলম অনুযায়ী সবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা হয়েছে

২০৯. ছ্বহীহ মুসলিম ৮, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

(৩) যা কিছু ঘটে, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই আল্লাহর (সৃষ্টি ও নির্ধারণগত) ইচ্ছা শামিল থাকে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতাধীন।

(৪) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইলম, নির্ধারণ এবং ইচ্ছা মুতাবেক সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্টি। এই হচ্ছে সংক্ষিপ্তাকারে তাক্বদীরের স্তরসমূহ। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে।

تفصيل مراتب القدر:

الدرجة الأولى وما تتضمنه الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْقِ وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের স্তরসমূহের ব্যাখ্যা:

প্রথম স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি ও বান্দাদের আমল সম্পর্কে তার চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা পূর্ণ অবগত এ বিষয়ে ঈমান আনা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَالدَّرَجَةُ الْأُولَى: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْقِ وَهُمْ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ ثُمَّ كَتَبَ اللَّهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ : مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وَقَالَ تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا التَّقْدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ

তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের প্রথম স্তর হচ্ছে, অন্তর দিয়ে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত আছেন। আরো বিশ্বাস করা যে, বান্দারা যেসব আমল করে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন ও অবিনশ্বর ইলম দ্বারা আগে থেকেই অবগত আছেন। সর্বদাই তিনি এই বিশেষণে বিশেষিত। অর্থাৎ মাখলুক সৃষ্টি করার আগেও তিনি এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন, এখনো তা দ্বারা

বিশেষিত আছেন এবং আবাদুল আবাদ এই বিশেষণে বিশেষিত থাকবেন। এই কথা বিশ্বাস করাও তাক্বদীরের প্রথম স্তরের অন্তর্ভুক্ত যে, তিনি বান্দাদের সকল অবস্থা যেমন তাদের সকল প্রকার সৎ আমল, পাপাচার, রিযিক, বয়স ইত্যাদি সবকিছুই জানেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির তাক্বদীর সমূহ লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে কলমকে আদেশ করলেন যে, লিখো। কলম বলল: কী লিখবো? আল্লাহ তা'আলা বললেন: ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সবই লিখো।[২১০]

---

২১০ . সর্বপ্রথম সৃষ্টির ব্যাপারে আলেমগণ থেকে একাধিক কথা বর্ণিত হয়েছে। আলেমদের কেউ বলেছেন, আরশ এবং কুরসী হচ্ছে সর্বপ্রথম সৃষ্টি। কেউ বলেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ পানি সৃষ্টি করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, কলমই প্রথম সৃষ্টি। প্রখ্যাত আলেম ইবনে জারীর, ইবনুল আরাবী এ মতেরই সমর্থক ছিলেন। পরবর্তীদের মধ্যে ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা নিম্নের ছহীহ হাদীছগুলো দিয়ে দলীল গ্রহণ করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم وأمره أن يكتب كل شيء يكون»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে জিনিসটি সৃষ্টি করেছেন, তা হচ্ছে কলম। অতঃপর কলমকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে বললেন"। {(আবু ইয়ালা (১/১২৬) আল-আসমা ওয়াস ছিফাত লিল-বায়হাকী ২৭১), সিলসিলায়ে ছহীহা, হা/১৩৩)} তিনি আরো বলেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল: হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ বললেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বস্তুর তাক্বদীর লিখো"। (দেখুন: আবু দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী এবং অন্যান্য) মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত আলেম ইবনুল আরাবী বলেন, قبل القلم لم يكن شيء إلا هو سبحانه কলমের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (দেখুন আরেযাতুল আহওয়াযী) অপর পক্ষে আরেক দল আলেমের মতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর আরশ। আল্লামা ইবনে তাইমীয়া এবং অন্যান্য আলেম থেকে এই মত পাওয়া যায়। তাদের দলীল হচ্ছে, ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ»

আদিতে একমাত্র আল্লাহ-ই ছিলেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তার আরশ ছিল পানির উপর। তারপর তিনি প্রত্যেক জিনিস লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করলেন এবং তিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করলেন। (বুখারী, হা/৩১৯১) উপরের হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে আবার কেউ কেউ পানি সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটিই সর্বাধিক শক্তিশালী মত। কারণ এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট হাদীছ হলো, আবু রাযীন বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম,

সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই। আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখিত আছে। আল্লাহর জন্য এটা মোটেই কঠিন নয়"। (সূরা হজ্জ ২২:৭০) আল্লাহ তা'আলা সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা

«أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخلق عرشهُ عَلَى الْمَاءِ»

সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করার পূর্বে আমাদের রব কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, বাদলের উপর ছিলেন। যার উপর-নীচে কোনো বায়ু ছিল না। অতঃপর তিনি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছেন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, ثم خلق عرشه على الماء "অতঃপর তিনি তার আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করেছেন। (আহমাদ ২৬/১০৮) উপরোক্ত হাদীছকে ইমাম তাবারী, তিরমিযী, ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনে তাইমীয়া বিশুদ্ধ বলেছেন। আল্লাহই অধিক অবগত।

بعض الأمثلة من أوائل المخلوقات :প্রথম পর্যায়ের কতিপয় মাখলুক বা সৃষ্টি:

এ কথা সত্য যে, আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফুয, পানি, আসমান, ফেরেশতা, জিন ইত্যাদি প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত। মানুষ কোন ক্রমেই উপরোক্ত সৃষ্টিসমূহের পূর্বে সৃষ্টি হয়নি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নন। কলমও প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টি। তবে আমরা যে কলম দিয়ে লেখি সেই কলম সর্বপ্রথম সৃষ্টি নয়; বরং যে কলম দিয়ে লাওহে মাহফুয লেখা হয়েছে সেটিই সর্বপ্রথম সৃষ্টি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে কোন ছ্বহীহ দলীল না থাকায় তা মুসলিমের আক্বীদাহ হতে পারে না। তাই উপরোক্ত হাদীছগুলো এবং অন্যান্য ছ্বহীহ হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

«ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله أو يرد عليه إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم»

আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সকল কথাই গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ আমাদের কারো কথা গ্রহণ করা যেতে পারে আবার প্রত্যাখ্যানও করা যেতে পারে। তবে এই কবরের অধিবাসী ব্যতীত। এই কথা বলে তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন।

আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"। আল্লাহ তা'আলার ইলমের অনুগামী এই তাক্বদীর বিভিন্ন স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেছেন, লাওহে মাফুযে তাই লিখে রেখেছেন। আর যখন মাতৃগর্ভে শিশুর দৈহিক আকৃতি দান করেন, তখন তাতে রূহ ফুকে দেয়ার পূর্বে তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান এবং ফেরেশতাকে চারটি কথা লিখে দেয়ার আদেশ করা হয়। তাকে বলা হয়,

(১) রিযিক লিখে দাও,

(২) তার বয়স লিখে দাও,

(৩) সে কী আমল করবে তা লিখে দাও এবং

(৪) হতভাগ্য হবে না সৌভাগ্যবান হবে? তাও লিখে দাও। অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ও লিখার আদেশ করা হয়।

পূর্বকালের কাদারীয়াদের মধ্য হতে যারা তাক্বদীরকে অস্বীকার করায় সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করেছিল, তারা তাক্বদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করতো। তবে বর্তমানে তাতে অবিশ্বীদের সংখ্যা খুবই কম।

ব্যাখ্যাঃ الأزل দ্বারা অতীতের এমন প্রাচীনত্ব, পূর্ববর্তীতা, অগ্রগামীতা, অগ্রবর্তীতা ও চিরন্তনতা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শুরু নেই। আর الأبد দ্বারা ভবিষ্যতে এমন অবিনশ্বরতা, চিরন্তনতা, স্থায়িত্ব এবং টিকে থাকা বুঝানো হয়েছে, যার কোন শেষ নেই। الطاعات শব্দটি الطاعة এর বহুবচন।

শরী'আতের আদেশ মেনে নেওয়াকে **الطاعة** (আনুগত্য) বলা হয়।

আর শরী'আতের আদেশের বিরোধীতা করাকে **المعصية** (পাপাচার) বলা হয়। المعاصي শব্দটি المعصية এর বহুবচন। الأرزاق শব্দটি رزق (রিযিক) এর বহুবচন। মানুষের জন্য যা উপকারী হয়, তাই রিযিক। الآجال শব্দটি الأجل -এর বহুবচন। কোন বস্তুর কিংবা কাজের সময়সীমাকে আজাল বলা হয়। মানুষের আজাল বলতে মৃত্যুর মাধ্যমে তার দুনিয়ার জীবনে বয়সের পরিসমাপ্তি বুঝায়।

লাওহে মাহফুয অর্থ হচ্ছে **أم الكتاب** 'মূল কিতাব'। মাহফুয অর্থ সংরক্ষিত।

তাতে কোন কিছু বাড়ানো কিংবা তা থেকে কোন কিছু কমানো হতে এ কিতাবকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

ঈমান বিল কাদারের স্তর দু'টির মধ্য হতে প্রথম স্তরটি যেসব বিষয়কে শামিল করে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে ঐসব বিষয় উল্লেখ করেছেন। মোট কথা তাক্বদীরের প্রথম স্তর দু'টি জিনিস বা স্তরকে শামিল করে।

প্রথম স্তরঃ আল্লাহ তা'আলার ইলম বিশেষণে বিশ্বাস করা, যা অস্তিত্বশীল কিংবা অস্তিত্বহীন সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করে আছে। এই ইলম আল্লাহ তা'আলার ঐ সমস্ত ছিফাতে যাতীয়া বা সত্তাগত বিশেষণসমূহের মধ্যে গণ্য, যার মাধ্যমে তিনি সর্বদাই বিশেষিত। বান্দার ভালোমন্দ আমলগুলো সম্পর্কে তিনি অবগত, তাদের রিযিক, বয়স ইত্যাদি সকল অবস্থা সম্পর্কেও তিনি অবগত।

দ্বিতীয় স্তরঃ তাক্বদীরের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে লিখার স্তর। আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে সমস্ত সৃষ্টির তাক্বদীর অর্থাৎ ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মাখলুক সৃষ্টি হবে তাদের সকলের সমস্ত অবস্থা, হায়াত-রিযিক, আমল, পরিণতি-পরিণাম ইত্যাদি সবকিছুই লিখে রেখেছেন।

সুতরাং সৃষ্টিজগতে যা কিছু হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আগে থেকেই অবগত আছেন এবং তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত স্তর দু'টির পক্ষে কুরআন সুন্নাহর দলীল পেশ করেছেন। সুন্নাতের দলীলগুলো থেকে শাইখ এ ব্যাপারে একটি হাদীছের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

হাদীছের শব্দগুলো ইমাম আবু দাউদ স্বীয় সুনানে উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

«أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ وقَالَ: وَمَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"আল্লাহ্ তা'আলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেন: লিখো। কলম বলল: হে আমার প্রতিপালক! কী লিখবো? আল্লাহ্ বললেন: ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর তাক্বদীর লিখো"।[২১১]

এই হাদীছ তাক্বদীর লিখার স্তর সাব্যস্ত করে। সেই সাথে আরো প্রমাণ করে যে, সবকিছুই লিখা রয়েছে।

فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْتُبْ :এখানে أول এবং القلم শব্দ দু'টিকে এই হিসাবে নসব (যবর) দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে মোট বাক্য একটিই। তখন বাক্যটি হবে এ রকম: **أولَ ما خلق الله القلمَ قال لـه اكتـ ب** (কলম সৃষ্টি করে আল্লাহ কলমকে আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। এর অর্থ হলো কলম সৃষ্টির সময় কলমের প্রতি প্রথম আদেশ ছিল, তুমি লিখো।[২১২]

أول এবং القلم শব্দ দু'টিকে রফা (পেশ) দিয়েও বর্ণনা করা হয়েছে। তখন মোট বাক্য হবে দু'টি। তখন প্রথম বাক্যটি হবে **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَـ مُ** (সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন)। আর দ্বিতীয় বাক্যটি হবে **قَالَ لَهُ: اكْتُـبْ** (কলমকে আদেশ করলেন: তুমি লিখো)। সবগুলো শব্দ মিলে তখন হাদীছের অর্থ হবে, সৃষ্টিজগতের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হচ্ছে কলম।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া বলেন: فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَـامُ وَطُوِيَـتِ الصُّحُفُ। সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই। আর যা তার জন্য ঘটার নয়, তা ঘটবেই না। কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে:

সুতরাং মানুষের জন্য যা হবার, তা হবেই, এটি হাদীছের রাবী উবাদাহ ইবনে সামেতের উক্তি। অর্থাৎ মানুষ কল্যাণকর যেসব বিষয় অর্জন করে এবং

---

২১১ . ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৭০০, তিরমিযী হা/২১৫৫, সুনানুল কুবরা বাইহাকী ২০৮৭৫। তিরমিযী, অধ্যায়: আবওয়াবুল কাদ্‌র। তিরমিযী বলেন, হাদীছটি হাসান গরীব। তবে ইমাম আলবানী (ﷺ) ছ্বহীহ বলেছেন। দেখুন সিলসিলা ছ্বহীহা (১/৩০৭) আল্লাহর আরশ পানির উপরে থাকার অর্থ হলো সাত আকাশের উপরে রয়েছে পানি। আর সেই পানির উপর আল্লাহর আরশ। এখনো আরশ স্বীয় অবস্থানেই রয়েছে।

২১২ . এভাবে পড়া হলে কলম যে আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি তা এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করা যাবে না। কারণ তখন হাদীছ এটি বুঝাবে না যে কলমই প্রথম সৃষ্টি। তখন হাদীছের তাৎপর্য হবে কলম সৃষ্টির সময় কলমের প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম আদেশটি ছিল, তুমি লিখো।

ক্ষতিকর যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হয়, তা তার জন্য নির্ধারিত। তা অবশ্যই তার জন্য অর্জিত হবে। কখনো তার বিপরীত হবে না।

جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِيَتِ الصُّـــحُفُ কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং দফতর গুটিয়ে নেয়া হয়েছে: এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেই সবকিছু নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তা লিখে শেষ করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে এখানে সে কথাই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে,

رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ যা কিছু নির্ধারণ করা হয়েছে, তা লিখার পর কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।[২১৩] ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) কুরআনের দলীলগুলো উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"তুমি কি জান না, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসই আল্লাহ জানেন? সবকিছু একটি কিতাবে লিখা আছে। আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ"। (সূরা হজ্জ ২২:৭০)

এখানে জানার জন্য প্রশ্ন করা হয়নি; বরং আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম সাব্যস্ত করার জন্যই প্রশ্নটি করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি অবশ্যই অবগত আছো যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের সবকিছুকেই পরিবেষ্টন করে আছে। তাক্বদীরের এই স্তর হলো আল্লাহ তা'আলার ইলমের সম্পর্কে।

إن ذلك নিশ্চয়ই তা, অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহ তা'আলার অবগতিতে একটি কিতাবের মধ্যেই রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট যেই মূল কিতাব রয়েছে, তাতে সবই লিখা রয়েছে। এটি হচ্ছে তাক্বদীর লিখার স্তর।

---

২১৩ . ছহীহ: তিরমিযী হা/২৫১৬, মুসনাদে আহমাদ হা/২৬৬৯।

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ **আল্লাহর জন্য এটা একদম সহজ:** অর্থাৎ জ্ঞানের মাধ্যমে আসমান-যমীনের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করা এবং তা লিখে রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য মোটেই কঠিন নয়।

উপরের আয়াতে কারীমা থেকে জানা গেল, সবকিছু সম্পর্কে আল্লাহর ইলম রয়েছে এবং তা হওয়ার পূর্বেই লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাক্বদীরের প্রথম স্তরটি এই বিষয় দু'টিকেই শামিল করে।

শাইখ সূরা হাদীদের ২২ নং আয়াত থেকেও দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ আয়াতে আরো বলেন:

﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে বিশেষ একটি কিতাবে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ"।

অর্থাৎ যমীনে যেই অনাবৃষ্টি, ফসলের ঘাটতি, ফলফলাদির কমতি দেখা দেয়, তোমাদের শরীরে যেই ব্যথা, রোগ-ব্যাধি এবং জীবনোপকরণে যেই সংকীর্ণতা অনুভব করো, তা বিশেষ একটি কিতাবে লিখা রয়েছে। অর্থাৎ লাওহে মাহফুযে তা লিখিত আকারে রয়েছে।

مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا **সৃষ্টি করার পূর্বে:** অর্থাৎ সৃষ্টি করার আগেই আমি প্রত্যেক জিনিসকে লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছি। আল্লাহর জন্য তা একদম সহজ। অর্থাৎ মাখলুকের সংখ্যা ও পরিমাণ অনেক হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো লাওহে মাহফুযে লিখে রাখা আল্লাহ তা'আলার জন্য একেবারেই সহজ।

এই আয়াতে কারীমাতেও উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতের ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়ার আগেই লাওহে মাহফুযে লিখে রাখার দলীল পাওয়া যায়। এর দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, লিখার পূর্বেই উক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং আয়াতটি তাক্বদীরের দু'টি স্তর অর্থাৎ আল্লাহর ইলম এবং সে অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখার অন্যতম একটি দলীল।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, তাক্বদীর দুই প্রকার।

(১) সাধারণ তাক্বদীর, যা প্রত্যেক সৃষ্টিকেই একসাথে শামিল করে নিয়েছে। এটি হচ্ছে সেই তাক্বদীর, যা দলীল-প্রমাণসহ একটু পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। লাওহে মাহফুযে এই প্রকার তাক্বদীর লিখা আছে।

(২) খাস (নির্দিষ্ট) তাক্বদীর। সাধারণ তাক্বদীরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও শ্রেণী ইবন্যোসই হলো খাস তাক্বদীর। খাস তাক্বদীর আবার তিন প্রকার:

(ক) তাক্বদীরে উমুরী (تقدير عمري) তথা পুরো জীবনের তাক্বদীর

(খ) তাক্বদীরে হাওলী (تقدير حولي) তথা একবছরের তাক্বদীর এবং

(গ) তাক্বদীরে ইয়াওমী (تقدير يومي) তথা দৈনন্দিন তাক্বদীর।

শাইখুল ইসলামের উক্তি: وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا আল্লাহ তা'আলার ইলমের অনুগামী এই তাক্বদীর বিভিন্ন স্থানে লিখা হয়। একই সময় একসাথে লিখা এবং বিভিন্ন সময় আলাদাভাবেও লিখা হয়। সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর একসাথে একই সময় লাওহে মাহফুযে লিখা হয়েছে। এই আম তাক্বদীরকে আবার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে ভাগ ভাগ করেও লিখা হয়। আর সেই স্থান ও সময়গুলো হচ্ছে:

১। তাক্বদীরে উমুরী এবং তা লিখার স্থান ও সময়: যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীছে এসেছে, মায়ের পেটে থাকা অবস্থাতেই শিশুর উপর যে চারটি বাক্য লিখে দেয়া হয়, তাই হচ্ছে তাক্বদীরে উমুরী। **লিখে দেয়া হয় তার রিযিক, তার বয়স, তার আমল এবং তার হতভাগ্য হওয়া কিংবা সৌভাগ্যবান হওয়ার কথা।**

২। তাক্বদীরে হাওলী এবং তা লিখার সময়: লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক তাক্বদীর লিখিত হয়। তাতে পুরো বছরের সকল বিষয় একসাথে লিখা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾

"আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফায়ছালা হয় আমার আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী"। (সূরা আদ দুখান ৪৪:৩-৫)

৩। **তাক্বদীরে ইয়াওমী:** হায়াত, মওত, সম্মান, অপমান ইত্যাদি আরো যা

প্রতিদিন নির্ধারণ করা হয়, তাই দৈনন্দিন তাক্বদীর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

"তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহানকার্যে রত আছেন" (সূরা আর্-রহমান ৫৫:২৯)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

(إن الله خلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابته نور وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ}) رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم [رواه الحاكم (٢/٤٧٤) و (٥١٩) ــ وصححه! ــ وابن جرير الطبري (٢٧/١٣٥) وأبو الشيخ في (العظمة) (٢/٤٩٢) والبيهقي في (الأسماء والصفات) (٨٢٨)].

আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুয। সাদা মুক্তা দিয়ে তিনি এটি তৈরী করেছেন। তার উভয় পার্শ্ব তৈরী করা হয়েছে লাল রঙ্গের হিরা দিয়ে। কলমটি হচ্ছে নূরের তৈরী, কালিও নূরের। তার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান-যমীনের মধ্যকার প্রশস্ততার সমপরিমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাতে দৈনিক তিনশ ষাট বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার সময় কাউকে জীবিত রাখেন (কোন না কোন বস্তু সৃষ্টি করেন), কারো মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ "তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্যে রত আছেন", এর মর্মার্থ (সূরা আর্-রাহমান: ২৯)।[২১৪] ইমাম আব্দুর রায্যাক, ইবনুল মুনযির, তাবারানী এবং হাকেম এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

তাক্বদীর অস্বীকার করার ক্ষেত্রে পূর্বযুগের কাদারীয়া সম্প্রদায়ের যেসব লোক সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা উপরোক্ত আম ও খাস উভয় প্রকার তাক্বদীরকে অস্বীকার করেছে। সৃষ্টিজগতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তা ঘটার পূর্বে সেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম বা অবগতিকে তারা অস্বীকার করে। লাওহে মাহফুযে এবং অন্যান্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু পূর্বেই লিখে রেখেছেন, তারা তাও অস্বীকার করেছে।

---

২১৪. ছুহীহ: মুস্তাদরকে হাকিম হা/৩৯১৭

তারা আরো বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন এবং নিষেধ করেছেন। কিন্তু কারা সেই আদেশ মানবে, কারা সেই নিষেধ থেকে বিরত থাকবে, আদেশ বা নিষেধ বাস্তবায়ন হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তা জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে الأمر أنف "আল্লাহর কাছে সকল বিষয়ই নতুন"। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার ইলম ও তাক্বদীরে আগে থেকে কিছুই নির্ধারিত নয়। যারা এই কথা বলেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইমামগণ তাদেরকে কাফির ফতোয়া দিয়েছে।[২১৫] তবে সীমালঙ্ঘনকারী এই ফির্কার লোকেরা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের মাযহাবও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই শাইখুল ইসলাম বলেন: منكروه اليوم قليـــل বর্তমানে আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার কারীর সংখ্যা খুবই কম।

কাদারীয়াদের যেই ফির্কা এখনো রয়েছে, তারা আল্লাহর ইলমকে স্বীকার করে। তবে বান্দারা যেসব কাজ-কর্ম করে, তাদের মতে সেগুলো তাক্বদীরের মধ্যে শামিল নয়। এই ফির্কার লোকেরা মনে করে বান্দার কর্ম বান্দা নিজেই সৃষ্টি করে, আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেননি এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছাও করেননি। সামনে এ বিষয়ে আরো বিবরণ আসছে।

---

২১৫ . ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ তা'আলার ছিফাতে যাতীয়া তথা সত্তাগত গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান এতই বিশাল, গভীর ও ব্যাপক যে, সৃষ্টি জগতের ছোট-বড় কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। বান্দার সকল অবস্থা, সকল কর্ম এমন কি অন্তরের মধ্যে যা আছে তাও তিনি অবগত। এমনটি নয় যে, বান্দা আমল করার পরই আল্লাহ তা'আলা বান্দার কর্ম সম্পর্কে জানতে পারেন; বরং আমল করার আগেই আল্লাহ তা'আলা জানেন। শুধু তাই নয়; সৃষ্টি করার পূর্বেই তিনি বান্দার সকল অবস্থা ও কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সে অনুযায়ী লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন। এমনকি যে জিনিস আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেননি, তা সৃষ্টি করা হলে কেমন হতো, তাও তিনি জানেন।

الدرجة الثانية وما تتضمنه:مَشِيئَةُ اللَّه النَّافِذَةُ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ

তাক্বদীরের দ্বিতীয় স্তর ও তাতে যা শামিল রয়েছে: আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও তার ক্ষমতা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللَّه النَّافِذَةُ وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونٍ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللَّه سُبْحَانَهُ لَا يَكُونُ فِي مُلْكِه مَا لَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ لَا خَالِقَ غَيْرُهُ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের দ্বিতীয় স্তর বলতে আল্লাহ তা'আলার ঐ ইচ্ছাকে বুঝায়, যা প্রত্যেক জিনিসের উপরই বাস্তবায়ন হয় এবং তার ঐ সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এই বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনো সংঘটিত হয় না। আরো বিশ্বাস করা আবশ্যক যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা স্থির হয় না এবং তার রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান। আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন রবও নেই।

.....

ব্যাখ্যা: এখানে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তর বর্ণনা করেছেন।[২১৬] তৃতীয় স্তরের প্রতি তিনি এই বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, তা হলো আল্লাহ তা'আলার ঐ ইচ্ছা, যা অবশ্যই কার্যকর হয়

২১৬ . শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার মতে তাক্বদীরের প্রতি ঈমানের স্তর দু'টি। অর্থাৎ তিনি চারটি স্তরকে দু'টিতে পরিণত করেছেন। ইলম ও লেখাকে এক স্তরে পরিণত করেছেন। আর ইচ্ছা ও সৃষ্টি করাকে আরেক স্তরে পরিণত করেছেন। আল্লাহই অধিক অবগত।

এবং তার ঐ সার্বভৌম ক্ষমতাকে বুঝায়, যা সকল বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অবশ্যই বাস্তবায়ন হয়। তা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বুঝায়, যা অস্তিত্বশীল ও অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই বিদ্যমান।

وَهُوَ الْإِيمَانُ: তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের এই স্তরের অর্থ হলো এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা যা সৃষ্টি ও নির্ধারণ করতে চান, তাই সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয়। আর যা তিনি সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন না, তা কখনো সৃষ্টি ও নির্ধারণ হয় না।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত আসমান ও যমীনের কোন কিছুই নড়াচড়া করে না কিংবা স্থির হয় না: অর্থাৎ তার ইচ্ছা ব্যতীত উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোন একটিও সংঘটিত হয় না।

তার রাজ্যের মধ্যে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই সংঘটিত হয় না: অর্থাৎ তার সৃষ্টিগত ও নির্ধারণগত ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না।

আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাবান: কেননা আল্লাহ তা'আলা অনেক আয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন সকল বস্তুই এই ব্যাপকতার অধীন। অর্থাৎ তিনি অস্তিত্বশীলকে বিলীন করে দিতে এবং অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনয়ন করতে সক্ষম।

فَمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ আসমান ও যমীনে যত মাখলুক রয়েছে, তার সবগুলোর স্রষ্টাই একমাত্র আল্লাহ: এই অংশের মধ্যে শাইখুল ইসলাম তাক্বদীরের চতুর্থ স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটি হচ্ছে সৃষ্টি করা এবং অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নের স্তর। আল্লাহ ছাড়া যা আছে, সবই মাখলুক। বান্দার ভালোমন্দ সকল কর্মই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা নেই এবং তিনি ব্যতীত আর কোন রবও নেই।

শাইখ যখন তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের স্তরগুলো উল্লেখ করে শেষ করলেন, তখন এর সাথে সম্পৃক্ত আরো কিছু মাসআলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

প্রথম মাসআলা: তাক্বদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। তাই তাক্বদীর দ্বারা দলীল গ্রহণ করে শরী'আতের বিরোধিতা করা হারাম।

দ্বিতীয় মাসআলা: আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণে পাপাচার সংঘটিত হওয়া এবং পাপাচারের প্রতি আল্লাহর ঘৃণা থাকাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়। আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা। তাই ঈমান, সৎ আমল, কুফরী ও পাপাচার সবই তার সৃষ্টি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কুফরী ও পাপাচারকে ভালোবাসেন। তিনি পাপাচারকে কখনো ভালোবাসেন না; বরং ঘৃণা করেন।

তৃতীয় মাসআলা: আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সকল কাজ-কর্ম সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেন। বান্দারা তাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা সেই কাজ-কর্ম সম্পাদন করেন। এই দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়।

لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها

১-২। তাক্বদীর ও শরী'আত পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয় এবং পাপাচার নির্ধারণ করা এবং সেগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করাও পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক নয়

وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِه وَطَاعَةِ رُسُلِه وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِه وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে তার এবং তার রাসূলদের আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তার আদেশ অমান্য করতে এবং পাপাচারে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল এবং ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন। যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না এবং ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না। তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না, তার বান্দাদের কুফরী করাকে পছন্দ করেন না[২১৭] এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালোবাসেন না।

---

২১৭. আল্লাহ তা'আলা কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি তা পছন্দ করেন না; বরং কুফরী করাকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি কুফরী করতে নিষেধ করেছেন। কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করা এবং তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করার মধ্যে কোন বৈপরিত্য ও পারস্পরিক সংঘর্ষ ও বিরোধ নেই। তিনি তা সৃষ্টি করেছেন বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। যাতে করে মুমিনগণ অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তিনি মানুষের শত্রু ইবলীসকেও সৃষ্টি করেছেন। যাতে করে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন, কে ইবলীসের অনুসরণ করে আর কে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে। সুতরাং কুফরী ও অন্যান্য পাপাচার সৃষ্টি করার পিছনে হিকমতে ইলাহী হচ্ছে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা। কুফরী করার জন্যই কুফরী, পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার জন্যই পাপাচার সৃষ্টি করেননি এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার জন্যই তা সৃষ্টি করেননি। বরং অন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তা সৃষ্টি করেছেন, যা আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করেছি। কুফরী সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর সকল মানুষই মুমিন হয়ে যেতো। তাতে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতো না। সুতরাং পাপাচার সৃষ্টির মধ্যেও রয়েছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক হিকমত। তিনি পাপাচার সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে বান্দাদেরকে পরীক্ষা করা যায়।

কুফরী ও পাপাচার সৃষ্টি করার পিছনে আরো হিকমত হলো, যাতে করে আল্লাহ তা'আলার সকল অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ ছিফাতের প্রভাবই তার বান্দাদের উপর গিয়ে পড়ে। তার অন্যতম নাম হচ্ছে الغفار এবং الغفور (ক্ষমাকারী বা ক্ষমাশীল)। এই অর্থে আরো নাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এই প্রকার নাম ও বিশেষণের দাবী হচ্ছে তার কিছু বান্দা গুনাহতে লিপ্ত হবে। অতঃপর তারা অনুতপ্ত হবে ও তাওবা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সেই তাওবা কবুল করবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করবেন। মূলতঃ এর মাধ্যমেও আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"হে নাবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। (সূরা যুমার: ৫৩)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশি হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করলো। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম যখন তাক্বদীরের চারটি স্তর যথাক্রমে: ইলম, লিখা, ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা, এই চারটি বিষয় সাব্যস্ত করলেন এবং আরো সাব্যস্ত করলেন যে, সৃষ্টিজগতে যা কিছু সৃষ্টি ও সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে, আল্লাহ তা'আলা সেটা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত রয়েছেন, তিনি তা আগেই লিখে রেখেছেন, তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ও ইচ্ছা করেছেন এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন, পূর্বোক্ত বক্তব্যে ইহা সাব্যস্ত করার পর এখানে বর্ণনা করছেন যে, উক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এবং আল্লাহ তা'আলা যে তার বান্দাদেরকে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে কোন বৈপরিত্য, পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষ নেই। পাপাচার সংঘটিত হওয়ার নির্ধারণ করা এবং তাকে ঘৃণা করার মধ্যে কোন পারস্পরিক সংঘর্ষ, বিরোধ ও বৈপরিত্য নেই।

"তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করলো। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো: পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পাদ্রী। সে পাদ্রীর নিকট গিয়ে বলল যে, সে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছে। তার তাওবা করার সুযোগ আছে কি? পাদ্রী বলল: তোমার কোন তাওবা নেই। এই কথা শুনে লোকটি সেই পাদ্রীকেও হত্যা করে একশ পূর্ণ করলো। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলো: এ যুগের সবচেয়ে বড় আলেম কে? এবার তাকে একজন আলেমের সন্ধান দেয়া হলো। আলেমের কাছে গিয়ে বলল যে, সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। তার কোন তাওবা আছে কি? আলেম বললেন, হ্যাঁ, তাওবা আছে তো। তাওবার মাঝে এবং তোমার মাঝে কে বাধা সৃষ্টি করলো? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল লোক পাবে। তারা আল্লাহর ইবাদতে রত আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকো। আর নিজের এলাকায় কখনো ফিরে এসো না। সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। তখন রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেন, সে তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফেরত এসেছে। সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাবো। আযাবের ফেরেশতাগণ বললেন, সে কখনও ভালো কাজ করেনি। বরং সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। আমরা তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাবো। এমতাবস্থায় মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমন করলেন। তারা তাকে উভয় দলের মাঝে ফায়ছালাকারী নির্ধারণ করলেন। তিনি ফায়ছালা দিলেন যে, তোমরা এই স্থান থেকে দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখ। তারা দু'দিকের রাস্তা মেপে দেখলেন, যে এলাকার দিকে সে রওনা হয়েছিল, সেই স্থানের অধিক নিকটবর্তী। তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলেন। (ছুহীহ বুখারী, অধ্যায়: আহাদীছুল আম্বীয়া)

পাপ কাজ সৃষ্টি করার পিছনে এটিই হচ্ছে হিকমতে ইলাহী। আল্লাহ তা'আলার গাফুর, গাফ্ফার, التواب (তাওবা কবুলকারী) ইত্যাদি নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকা হবে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সেই ডাক শুনবেন এবং এই নামগুলোর প্রভাব বান্দাদের উপর পড়বে। সুতরাং পাপাচার না থাকলে কিভাবে আল্লাহ তা'আলার এই নামগুলোর প্রভাব হতো? (আল্লাহ অধিক অবগত আছেন)

শাইখুল ইসলামের উক্তি: ومع ذلك তা সত্ত্বেও: অর্থাৎ সকল বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতি, সবকিছু নির্ধারণ, সবকিছু লিখা এবং সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা ও সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তিনি তার বান্দাদেরকে তার ও তার রাসূলদের আনুগত্য করার হুকুম করেছেন এবং তার নাফরমানি করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহর কিতাব রাসূলের সুন্নাহতে এ বিষয়ে বহু দলীল রয়েছে। এগুলোতে তিনি তার আনুগত্য করার আদেশ এবং তার আদেশ-নিষেধের (শরী'আতের) বিরোধীতা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা শরী'আত ও হুকুম-আহকাম প্রেরণ করেছেন এবং সবকিছু সৃষ্টি ও নির্ধারণ করেছেন। এগুলোর মাঝে কোন প্রকার পারস্পরিক সংঘর্ষ, অসংগতি ও বিরোধ নেই। যেমন ধারণা করে থাকে ঐ সমস্ত গোমরাহ সম্প্রদায়, যারা শরী'আতকে তাক্বদীরের বিপরীত মনে করে।

শাইখুল ইসলাম এ বিষয়ে তার লিখিত অন্যতম একটি রিসালা 'তাদমুরিয়াতে' বলেন: গোমরাহ ফির্কার লোকেরা তাক্বদীরের বিষয়ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্নিপূজক, মুশরিক এবং ইবলীসের দল।

ক) مجوسية অগ্নিপূজক: যারা আল্লাহ তা'আলার তাক্বদীরকে অস্বীকার করে, তারা এই উম্মতের মাজুসী। যদিও তারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে বিশ্বাস করে। এই দলের সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইলম অনুযায়ী সবকিছু লিখে রাখাকে অস্বীকার করেছে। আর মধ্যমপন্থীরা ইলম ও লিখাকে স্বীকার করলেও তারা এই কথা স্বীকার করে না যে, সবকিছুর উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি এবং কুদরতের অধীন।[২১৮] এরাই হলো মু'তাযিলা এবং যারা তাদের অনুসরণ করে থাকে।

খ) مشركية মুশরিক: আর যারা তাক্বদীর ও আল্লাহ তা'আলার ফায়ছালায় বিশ্বাসী, কিন্তু শরী'আতের আদেশ ও নিষেধকে অস্বীকার করেছে, তারা হলো মুশরিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾

---

২১৮ . অর্থাৎ তারা বলেছে যে, বান্দার কর্ম আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং বান্দা তার কাজ-কর্ম নিজেই সৃষ্টি করে। এই কথার মাধ্যমে তারা একাধিক সৃষ্টিকর্তা নির্ধারণ করেছে বলেই তাদেরকে অগ্নিপূজকদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

"এ মুশরিকরা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর আমরা কোন জিনিসকে হারামও গণ্য করতাম না। এ ধরনের উদ্ভট কথা তৈরী করে এদের পূর্ববর্তী লোকেরাও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।[২১৯] তারা অবশেষে আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেছে। এদেরকে বলে দাও, তোমাদের কাছে কোন জ্ঞান আছে কি? থাকলে আমার কাছে পেশ করো। তোমরা তো নিছক ধারণার অনুসরণ করে চলছো। শুধু আন্দাজ করা ব্যতীত তোমাদের কাছে আর কিছুই নেই" (সূরা আন'আম ১৪৮)।

যারা তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে শরী'আতের আদেশ-নিষেধ বাতিল করে দেয়,

---

২১৯. আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহলের ৩৫ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"এ মুশরিকরা বলে, "আল্লাহ চাইলে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাপ-দাদারাও করতো না এবং তার হুকুম ছাড়া কোনো জিনিসকে হারামও গণ্য করতো না। এদের আগের লোকেরাও এমনি ধরনের বাহানাবাজিই চালিয়ে গেছে। তাহলে কি রসূলদের উপর সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব আছে? এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের একটি ধারণা ও ভুলের খণ্ডন করেছেন। তারা বলেছিল, আমরা আল্লাহকে ছাড়া অন্যান্য যেসব বস্তুর ইবাদত করছি কিংবা তার হুকুম ছাড়াই যেসব জিনিসকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিচ্ছি, তা যদি ভুল ও বাতিল হতো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার কুদরতে কামেলা প্রয়োগ করে তা থেকে বিরত রাখলেন না কেন? তিনি না চাইলে তো আমরা সেগুলো করতেই পারতাম না। তিনি যেহেতু আমাদেরকে বল প্রয়োগ করে বিরত রাখছেন না, তাতে বুঝা গেল আমরা এসবকিছু তার ইচ্ছা ও মর্জি মুতাবেক করছি!!।

তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আল্লাহর দীন পৌঁছিয়ে দেয়াই রসূলদের দায়িত্ব ছিল। বল ও শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে ঈমানের উপর বাধ্য করা তাদের কাজ ছিলনা। আসল কথা হলো, হে মুশরিক দল! তোমাদের এই ধারণা ঠিক নয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে শির্ক করা থেকে বাধা দেননি; বরং তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তোমাদের শির্কী কাজ-কর্মের প্রতিবাদ করেছেন। এই জন্যই তিনি প্রত্যেক জাতির কাছেই রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব নাযিল করেছেন। প্রত্যেক নাবীই তার কাওমকে সর্বপ্রথম এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার এবং শির্ক বর্জন করার দাওয়াত দিয়েছেন।

তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য বর্জন করার প্রচেষ্টা নতুন কোন কথা নয়। আজও কিছু মানুষ আল্লাহর ইচ্ছাকে নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের কারণ হিসেবে পেশ করছে। এটা অতি পুরাতন যুক্তি। বিভ্রান্ত লোকেরা যুগে যুগে নিজেদের বিবেককে ধোঁকা দেবার এবং উপদেশদাতাদের মুখ বন্ধ করার জন্য এ যুক্তি পেশ করছে। এটিই ছিল পূর্বযুগের মুশরিকদের যুক্তি। নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবনের পর থেকে আজ পর্যন্ত হাজার বার এ কথা বলা হয়েছে। এই যুক্তিতে কোন আধুনিকতা নেই এবং অভিনবত্বও নেই। এটি বহুকালের বস্তাপচা খোঁড়া যুক্তি। হাজার বছর থেকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টরা একই সুর তুলে আসছে। এখনো সেই পচা সুর তুলে আসছে কিছু মানুষ।

তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

গ) إبليسية **ইবলীসের দল:** এ বিষয়ে তৃতীয় দলটি হচ্ছে ইবলীসের দল। তারা তাক্বদীর ও শরী'আত উভয়কেই স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার শরী'আত ও তাক্বদীরকে পরস্পর সাংঘর্ষিক ও বিরোধী মনে করেছে। এর মাধ্যমে তারা হিকমাত ও আদালতে ইলাহীয়ার মধ্যে আপত্তি করেছে। যেমন তাদের প্রথম উস্তাদ ইবলীস থেকে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২২০]

মোটকথা আহলুস বাতিলরা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে উপরোক্ত কথা বলে থাকে। হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং সফলকাম লোকেরা তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করে এবং শরী'আতকেও বিশ্বাস করে। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রভু ও মালিক। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন না, তা কখনো হয় না এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। ইলমের মাধ্যমে তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন এবং প্রত্যেক জিনিসকে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে সংরক্ষিত করে রেখেছেন।

وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ **শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী, সৎকর্মশীল এবং ইনসাফ কারীদেরকে ভালোবাসেন:** অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রশংনীয় গুণে গুণান্বিত হয়, যেমন তাকওয়া, সৎকর্ম ন্যায়বিচার-ইনসাফ ইত্যাদি ভালো গুণে বিশেষিত হয়, তাকে ভালোবাসেন।

وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ **যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন:** যেমন অনেক আয়াতে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎ আমল করে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন ও তাদেরকে ভালোবাসেন।

وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ **কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না এবং ফাসিক সম্প্রদায়ের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট হন না:** অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে ঘৃণা করেন; যেমন কুফরী, পাপাচার এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট স্বভাব,

---

২২০. আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলেন, "তোমরা আদমকে সিজদা করো"। ইবলীসও এই আদেশের আওতায় ছিল। ফেরেশতারা সিজদা করলেন, কিন্তু ইবলীস স্বীয় উপাদান নিয়ে গর্ব-অহংকার করলো এবং আদেশের হিকমত উপলব্ধি করতে না পেরে আল্লাহ তা'আলার আদালত ও হিকমতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে সিজদা করা হতে বিরত থাকলো। সে বলেছিল, أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ "আমি আদমের চেয়ে ভালো। তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে। আর আমাকে সৃষ্টি করেছ আগুন থেকে"। (সূরা সোয়াদ: ৭৬)

যারা এ জাতীয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত হয়, তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।

وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ **তিনি অশ্লীলতার আদেশ করেন না:** অশ্লীলতা বলতে ঐসব গুনাহ ও পাপের কথা ও কাজ বুঝায়, যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত।

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ **তিনি তার বান্দাদের জন্য কুফুরী পছন্দ করেন না এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করাকে ভালোবাসেন না:** কেননা কুফরী ও ফাসাদ অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ এবং তাতে রয়েছে দেশ ও জাতির জন্য অনেক ক্ষতি।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা ঐসব লোকদের প্রতিবাদ করেছেন, যারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা ও ভালোবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন তখন তাকে ভালোবাসেন বলেই তার ইচ্ছা করেন এবং কোন জিনিসকে যখন ভালোবাসেন তখন তার অর্থ এ যে, তিনি তার ইচ্ছা পোষণ করেন, এ কথা একদম মিথ্যা।

সঠিক কথা হলো আল্লাহ তা'আলার الإرادة (ইচ্ছা) এবং المحبة (ভালোবাসা) পরস্পর সম্পৃক্ত নয়। অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছা ও তার ভালোবাসা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয়। এ দু'টির একটি অন্যটিকে আবশ্যক করে না। আল্লাহ তা'আলা কখনো এমন জিনিসের ইচ্ছা করেন, যা তিনি পছন্দ করেন না এবং এমন জিনিস পছন্দ করেন, যা সংঘটিত করার ইচ্ছা করেন না।

প্রথমটির উদাহরণ হলো যেমন ইবলীস ও তার সৈনিকদেরকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করা এবং আল্লাহ তা'আলার ঐ ব্যাপক ইচ্ছা, যা রয়েছে সৃষ্টিজগতের কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে। যদিও তিনি তাকে ঘৃণা করেন এবং অপছন্দ করেন।

আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো, যেমন তিনি কাফিরদের ঈমান আনয়ন করাকে ভালোবাসেন এবং তাদের থেকে আনুগত্যের কাজ সংঘটিত হওয়া পছন্দ করেন, কিন্তু তিনি তাদের থেকে তা বাস্তবায়ন হওয়ার ইচ্ছা করেননি।[২২১] তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদের দ্বারা তা বাস্তবায়ন হতো।

---

২২১. অর্থাৎ শরী'আতগত দিক থেকে তাদের থেকে ঈমান আনয়ন ও আনুগত্য পছন্দ করলেও সৃষ্টিগত দিক থেকে কুফরী ও পাপাচার সংঘটিত হওয়ার ইচ্ছা করেছেন। তাদের মধ্যে আল্লাহর শরী'আতগত পছন্দ ও ইচ্ছা বাস্তবায়ন হয়নি; বরং সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হয়েছে। (আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন)

لاتنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم يفعلونها باختيارهم

৩। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাক্বদীর নির্ধারণ করা (বান্দাদের কর্ম সৃষ্টি হওয়া) এবং প্রকৃতপক্ষেই বান্দাদের কাজ-কর্ম তাদের প্রতি সম্বন্ধ করার মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ নেই। বান্দারাই নিজস্ব ইচ্ছা ও এখতিয়ার দ্বারা তাদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

الْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً وَاللَّهُ خَالِقُهُم وخالق أَفْعَالِهِمْ وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَالْمُصَلِّي وَالصَّائِمُ وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَلَهُمْ إِرَادَةٌ وَاللَّهُ خَالِقُهُمْ وَقُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا

বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও স্রষ্টা। বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, সৎকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, মুসল্লী হয় এবং সিয়াম পালনকারী হয়। বান্দাদের কাজ-কর্ম করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে। রয়েছে তাদের ইচ্ছা। আর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ক্ষমতা এবং ইচ্ছারও স্রষ্টা তিনিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা তাকভীরের ২৮-২৯ নং আয়াতে বলেছেন:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

"এটা সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য একটা উপদেশ মাত্র। তোমাদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়। আর তোমরা ইচ্ছা করলেই সত্য সরল

পথে চলতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে সরল পথে চালানোর ইচ্ছা করেন"।[২২২]

তাক্বদীরের এই স্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেছে। এই জন্যই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই উম্মতের মাজুসী তথা অগ্নিপূজক হিসাবে নামকরণ করেছেন।

ঐদিকে তাক্বদীর সাব্যস্ত করতে গিয়ে আরেক দল লোক (জাবরীয়া সম্প্রদায়) খুব বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করে ফেলেছে। এমনকি কাজ-কর্ম করার জন্য বান্দার কোন শক্তি, ইচ্ছা ও এখতিয়ার থাকার কথাকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে থাকে। শুধু তাই নয়; আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তার হুকুম-আহকামের মধ্যে যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করে।[২২৩]

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে বর্ণনা করতে চাচ্ছেন যে, পূর্বোক্ত সকল স্তরসহ তাক্বদীর সাব্যস্ত করার মধ্যে এবং বান্দারাই যে তাদের এখতিয়ার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে এবং তারা যে তাদের ইচ্ছাতেই আমল করে, এর মধ্যে কোন বৈপরিত্য, পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং বিরোধ নেই।

এই অংশের মাধ্যমে শাইখুল ইসলামের উদ্দেশ্য হলো ঐসব লোকের প্রতিবাদ করা, যারা বলে, যদি এটি সাব্যস্ত করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন এবং বান্দারাও তাদের নিজস্ব ইচ্ছা দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাহলে উভয় কথার মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ধারণা থেকেই বাতিলপন্থীদের একটি দল তাক্বদীর (আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি, ক্ষমতা, সৃষ্টি করা,

---

২২২ . অর্থাৎ তোমরা সরল পথে চলতে চাইলেই হবে না এবং তোমরা ইচ্ছা করলেই হিদায়াতের পথ এখতিয়ার করতে পারবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার তাওফীক তোমাদের সহায়ক হয়। তোমাদের ইচ্ছার সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এবং তার তাওফীক এসে শামিল না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে সোজা পথে চলা সম্ভব নয়। সূরা কাসাসের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই কথাই বলেছেন,

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন"।

২২৩ . তারা যেহেতু মনে করে, বান্দার কাজে বান্দা স্বাধীন নয় এবং তার কোন ইচ্ছাও নেই; বরং বান্দার দ্বারা ভালোমন্দ যাই হোক, তা কেবল আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়, তাই আল্লাহ তা'আলা যা করেন এবং বান্দাকে যেই আদেশ-নিষেধ করেছেন, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন হিকমত এবং তাদের কোন কল্যাণও নেই। (নাউযুবিল্লাহ)

সবকিছুর উপর তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) সাব্যস্ত করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও কড়াকড়ি করেছে। এমনকি বান্দার উপর থেকে কাজ-কর্ম করার ক্ষমতা এবং এখতিয়ারকে সম্পূর্ণরূপে তুলে নিয়েছে!!

বাতিলদের আরেকটি দল বান্দাদের কাজ-কর্ম এবং এখতিয়ার সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছে। এমনকি তারা বান্দাদেরকেই তাদের নিজস্ব কাজ-কর্মের স্রষ্টা হিসাবে নির্ধারণ করেছে। তারা আরো বলেছে যে, বান্দাদের কর্মের সাথে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই এবং বান্দাদের কাজ-কর্মের উপর আল্লাহর কোন ক্ষমতাও নেই!!

উপরে পরস্পর বিপরীতমুখী যে দু'টি গোমরাহ দলের আলোচনা করা হলো, তাদের **প্রথম দলটিকে বলা হয় জাবরীয়া**। কেননা তারা বলে বান্দা থেকে যা প্রকাশিত হয় কিংবা সে যেই কাজ ও নড়াচড়া করে, তাতে সে মাজবুর (বাধ্যগত)। তাতে তার কোন নিজস্ব এখতিয়ার, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই। **আর দ্বিতীয় দলকে বলা হয় কাদারীয়া**। কারণ তারা তাক্বদীর তথা আল্লাহর সৃষ্টি ও নির্ধারণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে!!

সুতরাং শাইখের উক্তি: বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কাজগুলো সম্পাদন করে, -এর মাধ্যমে তিনি জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা বলে, বান্দারা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজই করে না। শুধু রূপকার্থে তাদের প্রতি কর্মসমূহের নিসবত (সম্বন্ধ) করা হয়েছে!!!

আর শাইখের কথা, وَاللَّهُ خَالِقُهُم وخالق أَفْعَالَهُمْ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কাজগুলোরও স্রষ্টা: এর মাধ্যমে তিনি দ্বিতীয় ফির্কা তথা তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী কাদারীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ করেছেন। কেননা তারা বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কর্মসমূহ সৃষ্টি করেন না; বরং বান্দারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও নির্ধারণ ছাড়াই নিজেদের কর্মগুলো নিজেরাই সৃষ্টি করে!!

বান্দাই মুমিন হয়, কাফির হয়, সৎকর্মশীল হয়, পাপাচারী হয়, ছ্বলাত আদায়কারী হয় এবং সিয়ামপালনকারী হয়। বান্দাদের কাজ-কর্ম করার নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, রয়েছে তাদের ইচ্ছা: এতে জাবরীয়াদের প্রতিবাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দারা উপরোক্ত আমলসমূহে মাজবুর (বাধ্যগত) নয়। কেননা তাই যদি হতো তাহলে তাদেরকে উপরোক্ত বিশেষণগুলো দ্বারা বিশেষিত করা হতো না। কেননা মাজবুরের কাজকে তার দিকে নিসবত (সম্বোধন) করা হয় না, তা দ্বারা তাকে

বিশেষিতও করা হয় না[২২৪] এবং মাজবুর (বাধ্যের) দ্বারা যা হয়, তাতে সে ছাওয়াবের হকদার হয় না কিংবা শাস্তিরও যোগ্য বিবেচ্য হয় না।

وَهَذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ يُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ **তাক্বদীরের এই স্তরকে কাদারীয়াদের অধিকাংশ ফির্কাই অস্বীকার করেঃ** এই স্তর বলতে আল্লাহ তা'আলার সার্বিক ও সার্বজনীন ইচ্ছা, প্রত্যেক জিনিসই তার ইচ্ছাতেই হওয়া এবং সবকিছুই তার সৃষ্টি, এই কথা বুঝায়। এই স্তরে ইহাও রয়েছে যে, বান্দারা প্রকৃতপক্ষেই তাদের কর্মসমূহ সম্পাদন করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের স্রষ্টা এবং তিনি তাদের কর্মেরও স্রষ্টা। কাদারীয়ারা তাক্বদীরের এই স্তরকে অস্বীকার করে। তাদের ধারণা মতে বান্দাই তার নিজের কর্ম সৃষ্টি করে। এতে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার প্রয়োজন পড়ে না। এদেরকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উম্মতের মাজুসী বলে নামকরণ করেছেন। কেননা এই মাসআলাতে অগ্নিপূজকদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। অগ্নিপূজকরা দু'টি স্রষ্টা সাব্যস্ত করে। তারা নূর বা আলোকে ন্যায় ও কল্যাণের স্রষ্টা মনে করে এবং অন্ধকারকে অন্যায় ও অকল্যাণের স্রষ্টা মনে করে। সুতরাং তারা বলে

---

২২৪ . সুতরাং যাকে জোর করে বিষ পান করানো হয়, তার ব্যাপারে এটি বলা হয় না যে, অমুক ব্যক্তি বিষ পান করেছে; বরং বলা হয় বল প্রয়োগ করে বিষ পান করিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে। মানুষ তাকে দোষরোপ করে না। ঐদিকে যে নিজ ইচ্ছায় হাতে বিষ নিয়ে তা পান করে এবং নিজের জান বের করে দেয়, তাকে মানুষ দোষারোপ করে। ছ্বহীহ হাদীছে তাকে জাহান্নামী বলা হয়েছে।

এমনি বাতাস যাকে ছাদের উপর থেকে ফেলে দেয়, সে মারা গেলেও কেউ তাকে দোষারোপ করে না; বরং তার জন্য আফসোস করে এবং দু'আ করে। অনিচ্ছায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে শহীদ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্ব-ইচ্ছায় কেউ ছাদের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করলে কিংবা গাড়ির নিচে নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করলে কোন মানুষ তাকে ভালোবাসে না।

এমনি বান্দা নিজ ইচ্ছাতে ছ্বলাত পড়ে বলে তাকে ছ্বলাতী বলা হয়, সে নিজেই ঈমান আনয়ন করে বলেই তাকে মুমিন বলা হয় এবং সে নিজেই রোজা রাখে বলেই তাকে রোযাদার বলা হয়। অনুরূপ যে চুরি করে তাকে চোর বলা হয়, কিন্তু যার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে চোর সাব্যস্ত করা হয়, তাকে কেউ চোর বলে না।

সুতরাং কোন্ কাজ মানুষের ইচ্ছাতে হয় আর কোন্ কাজ তাদের অনিচ্ছায় হয়, মানুষেরা তাদের বোধশক্তি দ্বারাই বুঝে ফেলে। তাদের ফায়ছালাও হয় তার আলোকেই। ইসলামী শরী'আত মানুষের উপর এমন আক্বীদাহ, বিশ্বাস ও আমল চাপিয়ে দেয়নি, যা মানুষের স্বাধীন বোধশক্তি উপলব্ধি করতে অক্ষম।

মোট কথা, তাক্বদীর দিয়ে দলীল পেশ করে পাপচারে লিপ্ত হয়ে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করে এই কথা বলা ঠিক নয় যে, আমার নিজস্ব ইচ্ছায় ছ্বলাত ত্যাগ করি না, মদপান করি না কিংবা পাপাচারে লিপ্ত হই না; বরং তাক্বদীরে লেখা আছে, তাই আমার দ্বারা এগুলো হচ্ছে এবং আমি এগুলো করতে বাধ্য। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি হিদায়াতের পথ দেখাও। আমীন

কল্যাণ নূরের সৃষ্টি আর অকল্যাণ অন্ধকারের সৃষ্টি। এর মাধ্যমে তারা দুই স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়েছে।

কাদারীয়ারাও অগ্নিপূজকদের মতোই। কেননা তারা আল্লাহর সাথে অন্যকেও স্রষ্টা সাব্যস্ত করেছে। তারা মনে করে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত বান্দারাই তাদের কর্ম সৃষ্টি করে থাকে। শুধু তাই নয়; তারা মনে করে বান্দারা নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ক্ষমতা বলেই তাদের কর্ম সৃষ্টি করে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই উম্মতের অগ্নিপূজক বলেছেন, -এই কথা এক বাক্যে ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়।[২২৫] কেননা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানা পার হয়ে যাওয়ার পর তাদের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের নিন্দায় যা বর্ণনা করা হয়, তার অধিকাংশই ছাহাবীদের উপর মাওকুফ। অর্থাৎ এগুলোর ছ্বহীহ সনদ শুধু ছাহাবীগণ পর্যন্তই পৌঁছে।

সুতরাং প্রথম দল অর্থাৎ কাদারীয়ারা বান্দার কর্ম সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এমনকি বান্দার কর্ম থেকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকে বের করে ফেলেছে। আর জাবরীয়ারা বান্দাদের কর্মকে একদম অস্বীকার করেছে। এমনকি কাজ-কর্ম করার উপর বান্দাদের কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার থাকাকেই অস্বীকার করেছে।[২২৬]

---

২২৫ . তবে ইমাম আলবানী নিম্নোক্ত হাদীছকে ছ্বহীহ বলেছেন,

«الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ»

"কাদারীয়ারা এই উম্মতের অগ্নিপূজক। তারা যদি অসুস্থ হয়, তাদেরকে দেখতে যাবে না এবং তারা মৃত্যু বরণ করলে তাদের জানাযায় উপস্থিত হবে না। (আবু দাউদ, হা/৪৬৯০) ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন। এই হাদীছের ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাকে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তার যুগে তাদের অস্তিত্ব না থাকা হাদীছ অসাব্যস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে না।

২২৬ . এই মতাদর্শের মাধ্যমে তারা বান্দাকে মরা কাঠ ও পাথরে পরিণত করেছে। তাদের মতে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ঘুরান বান্দা সেভাবেই ঘুরে। তার নিজস্ব কোন স্বাধীনতা বা এখতিয়ার নেই। তাই ভালোমন্দ সবই আল্লাহর একমাত্র ইচ্ছা ও ক্ষমতাতেই হয়। এ যেন শিশুর হাতে লাটিম এবং কাঠ-প্লাষ্টিকের পুতুলের মতোই। শিশুর হাতে লাটিম শিশুর সম্পূর্ণ অনুগত ও বাধ্যগত, পুতুলকে শিশু যেভাবে নাচায় পুতুল সেভাবেই নাচে। বান্দাও আল্লাহর হাতে ঠিক সেরকমই। (নাউযুবিল্লাহ)

সম্ভবতঃ এই জাবরীয়া মতবাদ থেকেই ভোগবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ওয়াহদাতুল উজুদ এবং বস্তাপচা সুফীবাদের সূচনা হয়েছে। কেননা সুফীবাদের মধ্যে যারা ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন কিছুকেই হারাম মনে করে না। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই তাদের জন্য বৈধ। তারা মনে করে সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। বান্দার এখানে কোন ইচ্ছা ও স্বাধীনতা নেই।

তাদের এই কথা মানুষের সুস্থ বিবেক ও বোধশক্তির সুস্পষ্ট বিরোধী। তাদের কথা মানা হলে নাবী-রসূল পাঠানো অযথা ও নিরর্থক হয়ে যায়। তাদের কথা যদি সঠিকই হতো, তাহলে অতীতে যারা নাবী-রসূলদের দাওয়াত অস্বীকার করলো, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিলেন কেন? ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন কেন? বান্দার কাজ অন্যের দ্বারা হলে তার কাজের জন্য মানুষ তাকেই দোষে কেন? তার ভালো কাজের প্রশংসা করে কেন? বান্দার কাজ যদি আল্লাহর দ্বারাই হয়ে থাকে, তাহলে কি বান্দাকে শাস্তি দেয়া কিংবা ছওয়াব দেয়া অন্যায় ও নিরর্থক হয় না? অথচ আল্লাহ তা'আলা যুলুম ও নিরর্থক কাজ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত।

মোটকথা জাবরীয়ারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও সবকিছুর উপর তার সার্বভৌমত্ব সাব্যস্ত করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার আদল-ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের কথা বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছে। তাদের কথা থেকে আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার বিশেষণ সাব্যস্ত হলেও আল্লাহ তা'আলার আরেকটি ছিফাত অচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার আদল তথা ন্যায় বিচারের দাবী হচ্ছে, তিনি বান্দাদের উপর মোটেই যুলুম করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

"আল্লাহ কারো উপর এক অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। যদি কেউ একটি সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন"। (সূরা আন নিসা: ৪০) আল্লাহ তা'আলা সুরা আনফালের ৫১ নং আয়াতে আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

"এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই প্রেরণ করেছো। আল্লাহ তার বান্দাদের উপর যুলুমকারী নন। এ রকম আরো অনেক আয়াত রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা যুলুম করা থেকে পবিত্র। সুতরাং বান্দাকে তার আদেশ বাস্তবায়ন করার স্বাধীনতা না দিয়ে এবং নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও ক্ষমতাবলে পাপ কাজে বাধ্য করে শাস্তি দিলে ন্যায় বিচারের ব্যঘাত ঘটে। তাই তিনি তার আদল বা ন্যায় বিচার ঠিক রাখার জন্য বান্দাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। যাতে করে স্বেচ্ছায় আনুগত্যের কাজ করে সে নিজেই পুরস্কার পায় আবার আনুগত্যের খেলাফ করলে সে নিজেই শাস্তি ভোগ করে। যাতে করে আল্লাহ তা'আলার উপর যুলুম করার কোন অভিযোগ না আসে। (আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত রয়েছেন)

আল্লাহ তা'আলার সবগুলো ছিফাতকেই একসাথে সাব্যস্ত করতে হবে। একটি মানতে গিয়ে আরেকটি ছেড়ে দিলে চলবে না। তাই আল্লাহর আদলের দাবী হলো তিনি কাজ করার বা না করার স্বাধীনতা বা এখতিয়ার না দিয়ে কাউকে শাস্তি দিবেন না। জাবরীয়াদের কথা মানতে গেলে আল্লাহর আদল ছিফাতটি ছুটে যায়।

সুতরাং বান্দার কাজ প্রকৃতপক্ষে বান্দা তার নিজস্ব ইচ্ছাতেই করে। যদিও তা আল্লাহর সৃষ্টি। আমরা সবাই জানি যে, বান্দার হাতে অস্ত্র থাকলে বান্দাই সেটি চালায়। সে অস্ত্র দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে নাকি ডাকাতি করবে অথবা নিরপরাধ মানুষকে খুন করবে এ ব্যাপারে সে স্বাধীন। তার হাতে পয়সা থাকলে সে পয়সা দিয়ে মদ ক্রয় করবে? না কুরআনের তাফসীর ক্রয় করবে? এটি তার এখতিয়ারাধীন।

আপনি যদি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, কোথায় যাচ্ছো? বন্ধু হয়তো জবাব দিবে জামাআতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের ইচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়েছি কিংবা বলবে বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা

وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا
শাইখুল ইসলাম বলেন: আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া-কর্ম এবং তার হুকুম-আহকামের মধ্যে যেসব হিকমত এবং কল্যাণ রয়েছে তারা সেগুলোও অস্বীকার করে: حكم শব্দটি حكمة এর বহুবচন। আর مصالح শব্দটি مصلحة এর বহুবচন। অর্থাৎ জাবরীরা যখন বান্দার কাজ-কর্ম থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং কাজ-কর্ম করার উপর বান্দার ক্ষমতা এবং এখতিয়ার থাকাকেও অস্বীকার করেছে, তখন এর মাধ্যমে তারা শরী'আতের আদেশ ও নিষেধের মধ্যে যেই হিকমত, ছওয়াব ও শাস্তি রয়েছে, তাও অস্বীকার করে ফেলেছে। তারা বলেছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজের ছওয়াব দেন, যা তাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এমন কর্মের কারণে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেন, যা তাদের কর্মের মধ্যে শামিল নয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে এমন কাজের আদেশ করেন, যা করতে বান্দারা সক্ষম নয়। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলাকে যুলুম এবং নিরর্থক কাজ করার অপবাদ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অপবাদের অনেক উর্ধ্বে।

করছি.....। সুতরাং জানা গেল যে, বান্দার ইচ্ছাতেই বান্দা কাজ করে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার মধ্যে সেই ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাকে যেই স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার অপব্যবহার করলে এবং আল্লাহর মর্জির খেলাফ চললে সে নিন্দিত হয়। আর তার ইচ্ছার সঠিক ব্যবহার করলে এবং তাকে আল্লাহর মর্জি মুতাবেক চালালে আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎপথে চলতে সাহায্য করেন। (আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত)

حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة

ঈমানের হাকীকত বা পরিচয় এবং কাবীরা গুনাহে[২২৭] লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ هُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ؛ بَلِ الْأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ

---

২২৭ . গুনাহ দু'প্রকার। কবীরা ও ছগীরা। কবীরা ঐ গুনাহকে বলা হয়, যার জন্য দুনিয়াতে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। যেমন, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারের শাস্তি কায়েম করা ইত্যাদি অথবা যার কারণে আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে। যেমন সুদখোরের শাস্তি, গীবত করার শাস্তি, টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার শাস্তি ইত্যাদি। দুনিয়াতে এই কাজগুলোর শাস্তি নির্ধারিত না থাকলেও আখিরাতে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। তাই এগুলোও কবীরা গুনাহ। আর যেসব গুনাহর কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে সুনির্দিষ্ট কোন শাস্তির কথা বলা হয়নি, সেগুলোই ছগীরা গুনাহ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল তাও হারাম করেছেন এবং তাতে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।

কবীরা গুনাহর জন্য তাওবা করা আবশ্যক। তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ ক্ষমা করা হয় না। ছগীরা গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাওবা জরুরী কিনা আলেমদের থেকে এই মর্মে দু'টি মত পাওয়া যায়। কোন কোন আলেম বলেছেন, কাবীরা ও ছগীরা উভয় প্রকার গুনাহর জন্য তাওবা আবশ্যক। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে ছগীরা গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য তাওবা জরুরী নয়। সৎকাজ দ্বারা তা এমনিতেই মাফ হয়ে যায়। এই মর্মে অনেক দলীল রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا﴾

"তোমরা যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকো, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের ছোট-খাটো খারাপ কাজগুলো আমি তোমাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়ে দেবো এবং তোমাদের সম্মান ও মর্যাদার জায়গায় প্রবেশ করিয়ে দেবো"। (সূরা আন নিসা: ৩১)

উপরোক্ত মত পোষণকারীদের সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হলো এই হাদীছটি, রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, "পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত, এক জুমু'আ থেকে অপর জুমু'আ এবং এক রামাযান থেকে অন্য রামাযানের মধ্যে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায় যদি ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে"। (ছহীহ মুসলিম, হা/৩৪৪)

অধিকাংশ বিদ্বানদের অভিমত এটাই যে, ছোট পাপ মোচনের জন্য বড় পাপ থেকে বিরত থাকা শর্ত। কাতাদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তো ক্ষমার অঙ্গিকার সেই ব্যক্তিদের জন্যই করেছেন যারা কবীরা বা বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ছোট ছোট পাপ একত্রিত হয়ে কবীরাতে পরিণত হয়। তাই সতর্ক থাকা জরুরী এবং সবগুলো থেকে তাওবা করা উচিত।

مَعَ الْمَعَاصِي. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِي آية القصاص: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [الآية (١٧٨) من سورة البقرة]. وَقَالَ تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ الآيتان (٩، ١٠) من سورة الحجرات. وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ؛ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ بَلِ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية (٩٢) من سورة النساء. وَقَدْ لاَ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الإِيمَانِ الْمُطْلَقِ؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ الآية (٢) من سورة الأنفال. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ [رواه البخاري (٢٤٧٥) ومسلم (٥٧) عن أبي هريرة]. وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلاَ يُعْطَى الاسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاسْمِ.

আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম মূলনীতি হলো দীন ও ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা; আর অন্তরের আমল, জবানের আমল এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের কারণে তা কমে যায়।

তা সত্ত্বেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান কমে গেলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত আহলুল কিবলার কাউকে কাফির বলেন না। যেমন বলে থাকে খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা। বরং পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানের বন্ধন ও ভ্রাতৃত্ব ঠিকই থাকে। যেমন কিসাসের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾

"তবে কোন হত্যাকারীর জন্য যদি তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ দানের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত (সূরা বাকারা: ১৭৮)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তারপরও যদি দু'দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তাহলে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারা যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করে দাও এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাত: ৯-১০)।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মুতাযিলারা। ফাসিকের মধ্যে মূল ঈমান বজায় থাকবে এবং তার জন্য 'মুমিন' নামও ঠিক থাকবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করতে হবে" (সূরা নিসা: ৯২)।[২২৮]

তবে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুমিন পূর্ণ ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। পূর্ণ মুমিন হবে তারাই যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় (সূরা আনফাল ৮:২)। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

২২৮ . উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে পরস্পর সংগ্রাম ও লড়াইরত উভয় দলকেই এবং হত্যা করার পরও হত্যাকারীকে আল্লাহ তা'আলা মুমিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাতে বুঝা গেল অন্যায় কাজ করলেই কেউ ঈমান থেকে বের হয়ে যায় না। যতক্ষণ না তার ভিতরে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়গুলো পাওয়া না যাবে।

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايسرق السارق حين يسرق وهو مـــؤمن وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ ولاينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»

"যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে। এমন কোন ভদ্র লোক ছিনতাই করতে পারে না, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে তাকিয়ে দেখে। সে যখন ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না"।[২২৯]

উপরোক্ত গুনাহ্সমূহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে আমরা বলবো, তারা ত্রুটিপূর্ণ মুমিন অথবা বলবো, তার মধ্যে ঈমান থাকার কারণে সে মুমিন এবং কাবীরা গুনাহ থাকার কারণে সে ফাসিক। সুতরাং তাদেরকে পূর্ণ ঈমানদার বলা যাবে না এবং মুমিন নামটি তার থেকে একেবারে ছিনিয়েও নেয়া হবে না।

.....

ব্যাখ্যা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি বলতে এখানে ঐসব মূলনীতি উদ্দেশ্য, যার উপর তাদের আক্বীদাহর ভিত্তি গঠিত। الدين শব্দের আভিধানিক অর্থ অবনত হওয়া ও বশীভূত হওয়া। আর শরী'আতের পরিভাষায় هو ما أمر الله به আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তাই দীন।

الإيمان শব্দের আভিধানিক অর্থ التصديق (সত্যায়ন করা)। আর শরী'আতের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা শাইখুল ইসলাম নিজেই উল্লেখ করেছেন। তা হলো: **قَوْلٌ وَعَمَلٌ স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম।**

قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ. وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ

"অন্তরের স্বীকারোক্তি ও জবানের ঘোষণা, আর অন্তরের আমল (বিশ্বাস), জবানের আমল (স্বীকারোক্তি) এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

---

২২৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৩৬, আবূ দাউদ হা/৪৬৮৯, তিরমিযী হা/২৬২৫। অন্য বর্ণনায় আছে, "যখন কোন হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, হত্যা করার সময় সে মুমিন থাকে না"। অন্য বর্ণনায় আছে, ছিনতাইকারী যখন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করে নেয়, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উঁচু করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না"।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলিমদের নিকট এটিই হলো ঈমানের সংজ্ঞা। তা হচ্ছে স্বীকারোক্তি ও আমলের সমষ্টিগত নাম। স্বীকারোক্তি দুই প্রকার।

(১) অন্তরের স্বীকারোক্তি। তা হলো অন্তরের বিশ্বাস।

(২) জবানের স্বীকারোক্তি। আর তা হচ্ছে জবান দিয়ে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করা।

আমল দুই প্রকার।

(১) অন্তরের আমল। নিয়ত এবং ইখলাসকে অন্তরের আমল বলা হয়।

(২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। যেমন ছ্বলাত, হাজ্জ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ইত্যাদি।

অন্তরের স্বীকারোক্তি এবং অন্তরের আমলসমূহের মধ্যে পার্থক্য হলো, অন্তরের আমল বলতে সেই আক্বীদাহ উদ্দেশ্য, যা অন্তর স্বীকার করে নেয় এবং বিশ্বাস করে। আর অন্তরের আমলসমূহ দ্বারা অন্তরের সেই নড়াচড়া ও স্পন্দন উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল ভালোবাসেন এবং পছন্দ করেন। অন্তরের নড়াচড়া ও স্পন্দন বলতে ভালো কাজের প্রতি হৃদয়ের টান, ঝোক, ভালোবাসা, সুদৃঢ় ইচ্ছা, খারাপ কাজের প্রতি অন্তরের ঘৃণা এবং তা বর্জনের প্রতি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করাকে বুঝায়। অন্তরের কাজ থেকেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ এবং জবানের উক্তিসমূহের উৎপত্তি হয়। এই কারণেই জবানের কথাসমূহ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহকে ঈমানের মধ্যে গণ্য করা হয়।

ঈমানের সংজ্ঞায় বিভিন্ন ফির্কার অভিমতঃ

(১) আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

(২) মুরজিয়াদের মতে শুধু অন্তরের বিশ্বাস এবং জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

(৩) কাররামীয়াদের মতে শুধু জবানের স্বীকারোক্তিকেই ঈমান বলা হয়।

(৪) জাবরীয়াদের মতে অন্তর দিয়ে শুধু স্বীকার করা কিংবা শুধু অন্তরের মারেফতকেই ঈমান বলা হয়।

(৫) মুতাযিলাদের মতে অন্তরের বিশ্বাস, জবানের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রতঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের সংজ্ঞায় মু'তাযিলা এবং আহলুস সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য হলো মু'তাযিলাদের মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ঈমানকে সম্পূর্ণরূপে ছিনিয়ে নেয়া হয় না; বরং তাকে ত্রুটিপূর্ণ মুমিন হিসাবে গণ্য করা হয়। মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেলেও সে তথায় চিরকাল থাকবেনা।

ঈমানের সংজ্ঞায় উপরোক্ত সব কথাই বাতিল। একমাত্র আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কথাই সঠিক। তাদের কথার স্বপক্ষে অনেক দলীল রয়েছে।

وَأَنَّ الإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ সৎকাজের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের কারণে ঈমান কমে যায়:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো ঈমানের তারতম্য হয়। কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে যায়। আনুগত্যের আমল ঈমানকে বাড়িয়ে দেয় এবং পাপাচার ও গুনাহ্‌র কারণে ঈমান কমে। কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনেক দলীল এই কথাকে সমর্থন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে"। (সূরা আনফাল ৮:২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾

"যাতে তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় (সূরা ফাতাহ ৪৮:৪) এ ছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে।

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ

তা সত্ত্বেও অর্থাৎ সাধারণ পাপকাজ এবং কাবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়ার কারণে ঈমান কমে গেলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত আহলুল কিবলার কাউকে কাফির বলে না। যেমন করে থাকে খারিজীরা:

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যদিও মনে করে যে, আমল ঈমানের মধ্যে শামিল এবং তা সৎ আমলের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কারণে কমে যায়, তথাপিও তারা শির্ক ও কুফরী ব্যতীত অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত এমন কোন মানুষকে কাফির বলে না, যে ইসলামের দাবী করে এবং কিবলামুখী হয়ে ছ্বলাত পড়ে। যেমন বলে থাকে খারিজীরা। তারা বলে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে সে কাফির এবং আখিরাতে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। জাহান্নাম থেকে সে কখনো বের হবে না।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মনে করে পাপাচারে লিপ্ত হলেও ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঠিক থাকে। সুতরাং কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আমাদেরই ঈমানী ভাই। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) কিসাসের আয়াতে আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা উক্ত কথার উপর দলীল গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তবে কোন হত্যাকারীর জন্য যদি তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছু মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রক্তপণ আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত (সূরা আল বাকারা ২:১৭৮)

আয়াতের তাৎপর্য হলো আঘাতকারীকে যদি আহত ব্যক্তি মাফ করে দেয় কিংবা নিহত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ ক্ষমা করে দেয় এবং কিসাসের বদলে রক্তপন নিতে রাজী হয়, তাহলে মালের হকদারের উচিত কঠোরতা পরিহার করে ন্যায়ভাবে তা তলব করা। অর্থ পরিশোধের দায়ভার যাদের উপর বর্তাবে তাদেরও উচিত হবে কোন প্রকার বাহানা ব্যতীত হকদারদের নিকট হক বুঝিয়ে দেয়া। উক্ত আয়াত থেকে এভাবে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হত্যা করা কাবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা গেল, হত্যা করার পরও হত্যাকারীর সাথে ঈমানের ভিত্তিতে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অবশিষ্ট থাকে।

শাইখুল ইসলাম আল্লাহ তা'আলার এই বাণী দ্বারা আরো দলীল গ্রহণ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯) বলেন:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾

"ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াই করে, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। উপরোক্ত আয়াতে কারীমা দু'টি দ্বারা এভাবে দলীল গ্রহণ

করা যেতে পারে যে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সীমালঙ্ঘন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মুমিন হিসাবেই নামকরণ করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ভাই হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

"অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও" (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো যখন মুসলিমদের দুই দল পরস্পর লড়াই শুরু করবে, তখন অন্যান্য মুসলিমদের উচিত তাদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুম মেনে নেয়ার আহবান জানানো। মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করার পরও যদি দুইদলের একদল অন্যদলের উপর যুলুম করে এবং মীমাংসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো এই বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহর হুকুম ও ফায়ছালা মানতে বাধ্য করা। অতঃপর বিদ্রোহী দল যদি সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহ পরিহার করে আল্লাহর হুকুমের দিকে চলে আসে এবং আল্লাহর কিতাব ও ফায়ছালা মেনে নিতে রাজী হয়, তাহলে মুসলিমদের উচিত, মীমাংসা ও ফায়ছালা করার সময় উভয় দলের মধ্যে ইনসাফ করা। তারা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মুতাবেক ফায়ছালা করার জন্য সঠিক রায়ের অনুসন্ধান করবে এবং বল প্রয়োগ করে সীমালঙ্ঘনকারী যালেম দলকে ফিরিয়ে আনবে। যাতে যুলুম থেকে তারা ফিরে আসে এবং অন্য দলের জন্য যেই হক তাদের উপর রয়েছে, তা পরিশোধ করে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করার আদেশ দেয়ার পর সমস্ত মুসলিমকেই তাদের সকল বিষয়ে ন্যায়নীতি অবলম্বন করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"তোমরা ইনসাফ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইনসাফকারীদেরকে ভালোবাসেন"(সূরা আল হুজুরাত ৪৯:৯)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই (সূরা আল হুজুরাত ৪৯:১০)।

এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্য। পূর্বের বাক্যে বিবাদরত দুই দলের মধ্যে মীমাংসা করার যেই আদেশ দেয়া হয়েছে, এই বাক্যে তাকেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ আয়াতের অর্থ হলো মুসলিমগণ মাত্র একটি বিষয়ের দিকেই ফিরে যাবে। সেটি হচ্ছে ঈমান। সুতরাং তারা সকলেই দীনী ভাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দাও (সূরা হুজুরাত ৪৯:১০)।

অর্থাৎ বিবাদ ও সংগ্রামরত প্রত্যেক দু'মুসলিমের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। এখানে দুইজনকে খাস করার মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, দুইয়ের অধিক মুসলিম লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করার আরো বেশী প্রয়োজন পড়বে।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা'আলা বলেন: واتقوا الله তোমরা তোমাদের সকল বিষয়েই আল্লাহকে ভয় করো। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করার কারণে لعلكم ترحمون আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হতে পারো।

: وَلاَ يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيَّ اسْمَ الإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلاَ يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ كَمَا تَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ

তারা মুসলিম মিল্লাতের কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন মনে করে থাকে মুতাযিলারা:

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হলো তারা মুসলিম মিল্লাতের কোন **ফাসিক** ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না এবং মৃত্যুর পর তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও মনে করে না। যেমন বলে থাকে মু'তাযিলারা।

الفسق শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর আনুগত্য বর্জন করা। তবে এখানে ফাসিক্ব বলতে উদ্দেশ্য হলো যে মুসলিম হারাম মনে করেও কাবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যেমন মদ পান করা, যেনা করা, চুরি করা ইত্যাদি।

যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামীয়ার উপর রয়েছে এবং কাফিরে পরিণত হওয়ার মতো কোন গুনাহে লিপ্ত হয় না তাকে الفاسق الملّي বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত কোন লোক কুফরী ব্যতীত অন্য গুনাহে লিপ্ত হলে তাকে ইসলামের বন্ধন থেকে খারিজ করে দেয় না এবং দুনিয়ায় জীবিত থাকা অবস্থায় তার উপর কুফরীর হুকুমও লাগায় না। যেমন খারিজীরা তাকে দুনিয়ার হুকুমে কাফির বলে থাকে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাকে মৃত্যুর

পর চিরকাল জাহান্নামীও মনে করে না। অর্থাৎ আখিরাতে তার উপর চিরকাল জাহান্নামী হওয়ার হুকুম লাগায় না এবং জাহান্নামে প্রবেশ করলেও সে চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে বলে বিশ্বাস করে না। যেমন বলে থাকে মু'তাযিলা এবং খারিজী সম্প্রদায়ের লোকেরা।

তবে মু'তাযিলারা কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ফাসেকের জন্য মুসলিম কিংবা কাফির কোন নামই ব্যবহার করে না; বরং তাদের মতে সে ঈমান ও কুফরীর মধ্যবর্তী একটি স্তরে অবস্থান করে। তাদের মতে দুনিয়ার জীবনে কাবীরা গুনাহে লিপ্ত মুসলিম উল্লেখিত হুকুমের মধ্যে থাকবে। তবে আখিরাতের হুকুমে খারিজীদের মতানুযায়ী তারা তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে থাকে। তাদের এই মাযহাব বাতিল। কুরআন ও হাদীছের একাধিক দলীল তাদের কথাকে বাতিল বলে সাব্যস্ত করে। কিছু দলীল পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর বাকী দলীলগুলো সামনে আসছে।

অতঃপর কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক দলীলের আলোকে মুসলিম মিল্লাতের **ফাসিক** লোকের জন্য যেই হুকুম প্রযোজ্য, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এখানে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: **ফাসিক** সাধারণত: ঈমানের মধ্যেই থাকবে। কেননা ঈমানকে কামেল (পূর্ণ) ঈমান এবং নাকেস (অপূর্ণ) ঈমান, -এই দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাই **ফাসিক** পূর্ণ মুমিন নয়; কিন্তু সে ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যায় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

"আর যে ব্যক্তি ভুলবশত কোন মুমিনকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা হিসেবে একজন মুমিনকে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিতে হবে"(সূরা নিসা ৪:৯২)।

দাসমুক্তির জন্য যেখানে ঈমান শর্ত করা হয়েছে, যেমন যিহার ও হত্যার কাফফারা, সেখানে আযাদকৃত দাস যদি **ফাসিক**ও হয়, তাহলে সকল আলিমের মতে সেই **ফাসিক** দাস মুক্ত করা যথেষ্ঠ হবে। কেননা আয়াতের সাধারণ অর্থ থেকে ইহাই বুঝা যায়। যদিও আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ ঈমানদার না হয়। কেননা দাসমুক্ত করার সময় দাসের মধ্যে পূর্ণ ঈমান থাকা জরুরী নয়।

শাইখুল ইসলাম বলেন: সাধারণভাবে ঈমান বলতে যখন পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য হবে, তখন ইসলামী মিল্লাতের **ফাসিক** লোক সেই পূর্ণ ঈমানের মধ্যে শামিল হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে পূর্ণ মুমিনের বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়" (সূরা আনফাল ৮:২)।

এই আয়াতে কারীমায় ঈমান বলতে ঈমানে কামেল (পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য)। **ফাসিক** এই প্রকার মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ তার ঈমান ত্রুটিপূর্ণ। এই আয়াতের তাফসীরের প্রতি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে إنما শব্দটি সীমাবদ্ধ করার অর্থ প্রদান করে। বাক্যের মধ্যে إنما -এর পরে যে বিশেষ্য উল্লেখ থাকে, إنما অব্যয় দ্বারা বাক্যের হুকুমকে শুধু তার জন্যই খাস করা হয় এবং অন্যদের থেকে তা অস্বীকার করা হয়।

الْمُؤْمِنُونَ মুমিনগণ: অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার তো তারাই, যাদের বৈশিষ্ট্য হলো, **إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ** "যখন আল্লাহর যিকির করা হয়" অর্থাৎ তার বড়ত্ব, ক্ষমতা এবং পাপীদেরকে যা দিয়ে তিনি ভীতি প্রদর্শন করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়, **وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ** তখন তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ "আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়", অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত আয়াতগুলো পাঠ করা হয় কিংবা তার সৃষ্টিগত নিদর্শনসমূহ উল্লেখ করা হয়, **زَادَتْهُمْ إِيمَانًا** তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার আয়াত ও নিদর্শন পাঠ করার কারণে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "তারা স্বীয় প্রভুর প্রতি ভরসা করে": অর্থাৎ তারা তাদের সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে; অন্য কারো নিকট নয়। অতঃপর শাইখুল ইসলাম হাদীছ থেকে এমন একটি দলীল পেশ করেছেন, যা প্রমাণ করে, মুসলিম মিল্লাতের ফাসিক ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদারদের মধ্যে গণ্য হবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ وَلاَ يَنْتَهِبُ نَهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর। সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে

না। এরপরও তার জন্য তাওবার দরজা উন্মুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি এমন কোনো মূল্যবান বস্তু ছিনতাই করে, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে দেখে, সে যখন তা ছিনতাই করে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।[২৩০]

অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার থাকে না। সুতরাং এখানে যেনাকারী, চোর এবং মদ্যপায়ী থেকে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা উদ্দেশ্য; মূল ঈমান উদ্দেশ্য নয়। কেননা ব্যভিচারী, চোর এবং মদ্যপায়ী মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং হাদীছটি প্রমাণ করে যে, এই সমস্ত লোক যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন তাদের থেকে ঈমানের পূর্ণরূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়; পুরোটাই বিলুপ্ত হয় না। কুরআন ও হাদীছের অনেক দলীল প্রমাণ করে যে, উপরোক্ত গুনাহসমূহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তারা মুরতাদ হয়ে যায় না। সুতরাং জানা গেল, এই হাদীছে যেই ঈমানকে নফী করা হয়েছে, তা দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা উদ্দেশ্য; মূল ঈমান উদ্দেশ্য নয়।

ولاينتهب نهبة ذات شرف ছিনতাইকারী এমন কোন মূল্যবান জিনিস ছিনতাই করতে পারে না, যার দিকে মানুষ দৃষ্টি উঁচু করে তাকিয়ে দেখে। সে যখন ছিনতাই করে, ছিনতাই করার সময় সে মুমিন থাকে না: النهبة শব্দটির নুন বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ছিনিয়ে নেয়া বস্তুকে নুহবাহ বলা হয়। শক্তি প্রয়োগ করে এবং জবরদখল করে মাল আত্মসাৎ করাকে النهب বলা হয়। ذات شرف বলতে দামী জিনিস উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেছেন, এখানে ذات شرف দ্বারা এমন উঁচু মানের জিনিস উদ্দেশ্য, যার দিকে লোকেরা তাকিয়ে থাকে এবং চোখ তুলে চেয়ে দেখে।

অতঃপর শাইখুল ইসলাম পূর্বোল্লেখিত আলোচনার ফলাফল উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে মুসলিম মিল্লাতের **ফাসিক** লোকের আসল হুকুম বের করেছেন। তিনি বলেছেন: আমরা বলি, সে হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ ঈমানদার অথবা তার মধ্যে যেহেতু ঈমান রয়েছে সে কারণে সে মুমিন এবং যেহেতু কবীরা গুনাহ রয়েছে, তাই সে **ফাসিক**। এটিই হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ হুকুম। এতে যেসব দলীল তাকে ঈমান থেকে খারিজ করে দিয়েছে যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না এবং যেসব দলীল তার জন্য ঈমান সাব্যস্ত করেছে, যেমন পূর্বোক্ত কিসাসের আয়াত এবং বিদ্রোহীদের হুকুম সম্পর্কিত আয়াত, -এই উভয় প্রকার দলীলের মধ্যে সমন্বয় হয়ে গেছে। এর উপর ভিত্তি করেই বলা যায় যে, তাকে المؤمن المطلق তথা পূর্ণ মুমিন নাম দেয়া যাবে না এবং مطلق المؤمن অর্থাৎ ত্রুটিযুক্ত

---

২৩০. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৭, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৩৬, আবূ দাউদ হা/৪৬৮৯, তিরমিযী হা/২৬২৫।

ঈমান থেকে তাকে খারিজ করে দিয়ে মুতাযিলা ও খারিজীদের মতো তাকে ঈমান থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিস্কারও করে দেয়া যাবে না। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, الإيمان المطلق বলতে কামেল (পূর্ণ) ঈমান উদ্দেশ্য এবং مطلق الإيمان বলতে ত্রুটিযুক্ত ঈমান উদ্দেশ্য।[২৩১]

---

২৩১. কোনো গুনাহগার মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির বলা বৈধ নয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহয় যার কুফরী হওয়ার কথা এসেছে এবং তার সামনে দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়েছে, তার কথা ভিন্ন এবং তার কুফরী জবরদস্তি বা অজ্ঞতা কিংবা সংশয়ের কারণে নয়। এমনিভাবে আল্লাহ এবং তদীয় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত মুশরিক, ইয়াহূদী এবং নাসারাদেরকে কাফির হিসাবে ঘোষণা করেছেন তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ করা বৈধ নয়।

এ থেকে জানা গেল, যে সমস্ত তাওহীদপন্থী মুমিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং তাদের মধ্যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন"। (সূরা আন নিসা: ৪৮)

শির্ক ব্যতীত অন্যান্য পাপের কারণে উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন লোক যদি ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে প্রবেশ করেও তবে চিরকাল জাহান্নামে থাকবেনা। যেমনটি মনে করে থাকে খারিজী ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা; বরং তাওহীদে বিশ্বাস করার কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এব্যাপারে যথেষ্ট দলীল রয়েছে। নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ يَقُولُ اللَّهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرَجُونَ قَدِ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ

"যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের কর। তারা জাহান্নামে পুড়ে কয়লা ও ছাই হয়ে বের হবে। অতঃপর তাদেরকে 'আবে হায়াত' তথা জান্নাতের একটি নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। বন্যার পানিতে ভাসমান আবর্জনার উপরে যেমনভাবে বীজ থেকে তৃণলতা গজিয়ে উঠে তেমনিভাবে তারা গজিয়ে উঠবে"। (ছ্বহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুর্ রিকাক)

যেমনিভাবে আমরা কবীরাগুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলি না তেমনিভাবে আমরা কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলেও ফায়ছালা প্রদান করি না। তবে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে যাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তাকে আমরা জান্নাতী বলে বিশ্বাস করি। যেমন দশজন জান্নাতী ছাহাবীর কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। বিনা প্রমাণে শুধু মাত্র ধারণার উপর ভিত্তি করে আমরা কাউকে কাফির, মুশরিক কিংবা মুনাফিক বলে ঘোষণা করি না। কেননা

الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضائلهم

ছাহাবীদের প্রতি ভালো ধারণা রাখা এবং তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা আবশ্যক

আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর মূলনীতি হলো, ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি থেকে তারা তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَصَفَهُمُ اللَّهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ الآية (١٠) من سورة الحشر. وَطَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»[رواه البخاري (٣٦٧٣) ومسلم (٢٥٤١) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة].

আহ্‌লে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরো একটি মূলনীতি হলো, তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি তাদের অন্তর ও জবান পবিত্র রাখে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি কোন প্রকার ঘৃণা রাখে না এবং জবান দিয়ে তাদের সমালোচনা ও কুৎসা রটনা করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তার এ বাণীতে ছাহাবীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

আমাদেরকে প্রকাশ্য বিষয় দেখে বিধান প্রয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ধারণা করে ও বিনা ইলমে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা গুনাহ"। (সূরা আল হুজুরাত: ১২)

"এবং যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে: হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু" (সূরা হাশর ৫৯:১০)।[২৩২]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীছের আনুগত্য করা। তিনি বলেন:

لَا تَسُبُّوا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِي فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

"তোমরা আমার কোন ছাহাবীকে গালি দিয়ো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ[২৩৩] পরিমাণ দান করার সমানও ছওয়াবও পাবে না"।[২৩৪]

এই হাদীছের আনুগত্য করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে ছাহাবীদের

---

২৩২ . আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ছাহাবীদের ফযীলত বর্ণনায় আরো বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর। নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপই"। (সূরা আল ফাতহ: ২৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾

"এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে তারা একে অপরের সহায়ক"। (সূরা আনফাল: ৭২)

২৩৩. নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওজন অনুসারে এক মুদের পরিমাণ হলো ৫১০ গ্রাম। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৩৬৩। ৪ মুদে এক ছা=২০৪০ গ্রাম পাকা পুষ্ট গম।

২৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪১।

জন্য পবিত্র রাখে।

.....

ব্যাখ্যা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম আক্বীদাহ হলো, তারা অন্তরকে ছাহাবীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ এবং ঘৃণাবোধ পোষণ করা থেকে পবিত্র রাখে। তারা তাদের জবানকেও ছাহাবীদেরকে দোষারোপ করা, লানত করা এবং গালি দেয়া থেকে মুক্ত রাখে। কেননা তাদের রয়েছে অনেক ফযীলত। তারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবী হয়ে ধন্য হয়েছেন। তাদের রয়েছে উম্মতের সমস্ত মুসলিমের উপর বিশেষ ফযীলত। কেননা তারাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি ইসলামী শরী'আত গ্রহণ করেছেন এবং তাদের পরবর্তীদের জন্য পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তারা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে জিহাদ করেছেন এবং তারা তাকে সাহায্য করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) ঐ সমস্ত রাফেযী এবং খারিজীদের প্রতিবাদ করার জন্যই এই অধ্যায় রচনা করেছেন, যারা ছাহাবীদেরকে গালি দেয়, তাদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদের ফযীলতগুলোর স্বীকৃতি দেয়না। এই নিকৃষ্ট মাযহাবের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণার বিষয়টিও শাইখুল ইসলাম অত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের নাবীর ছাহাবীদের ব্যাপারে ঐরূপ ব্যবহারই করে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"যারা এসব অগ্রবর্তী লোকদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু" (সূরা আল হাশর ৫৯:১০)।

অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের পরে আগমন করেছে। তারা উম্মতে ইসলামীয়ার ঐসব লোক, যারা ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত উত্তমভাবে ছাহাবীদের অনুসরণ করবে। তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দু'আ করতে থাকবে যে, ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ "হে আমাদের রব, আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করো, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করে এবং তাদের পূর্বে আগমনকারী মুহাজির ও আনসারদের জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করে। এখানে ভাই বলতে দ্বীনি ভাই উদ্দেশ্য এবং غِلًّا দ্বারা খেয়ানত, বিদ্বেষ, ঘৃণা এবং হিংসা উদ্দেশ্য। তারা আরো দু'আ করে যে, ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ "হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে"। সর্বপ্রথম ছাহাবীগণই এই শ্রেণীর মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা তারাই সর্বোত্তম মুমিন এবং এখানে তাদের ব্যাপারেই আলোচনা চলছে।

ইমাম শাওকানী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: যারা সকল ছাহাবীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলো না এবং তাদের জন্য আল্লাহর রেজামন্দি কামনা করলো না তারা এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করলো। সেই সাথে যার অন্তরে ছাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পাওয়া যাবে, সে শয়তানের প্ররোচনার কবলে পড়েছে এবং সে আল্লাহর অলীদের ও আখিরী নাবীর উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের সাথে দুশমনী করে আল্লাহ তা'আলার বিরাট নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং সে তার নিজের জন্য লাঞ্ছনার এমন দ্বার উন্মুক্ত করেছে, যা তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। যদি না সে স্বীয় নফসকে সংশোধন করে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তার কাছেই ফরিয়াদ করে। আর সর্বোত্তম মানুষ এবং উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি তার অন্তরের বিদ্বেষ টেনে বের না করে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। ছাহাবীদের প্রতি কারো অন্তরের বিদ্বেষ যদি সীমা অতিক্রম করে তাদের কাউকে গালি দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে সে শয়তানের রশিতে নিজেকে বেঁধে দিল এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিতে পতিত হলো। এই কঠিন রোগে কেবল ঐ ব্যক্তিই আক্রান্ত হতে পারে, যে রাফেযীদের কোন উস্তাদ কিংবা উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের দুশমনের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। তারাও এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে, যাদের সাথে শয়তান খেলতামাশায় লিপ্ত হয়েছে, তাদের জন্য হরেক রকম মিথ্যা রচনা করেছে, বানোয়াট কিচ্ছা তৈরী করেছে, নানা কুসংস্কার এবং অলীক কাহিনী রচনা করেছে। এগুলোর মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে আল্লাহর ঐ কিতাব থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যার সামনের দিক থেকে কিংবা পিছন দিক থেকে বাতিল আসতেই পারে না।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমায় ছাহাবীদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কেননা তারা ঈমান আনয়নে অগ্রণী ছিলেন। আয়াতে কারীমায় ঐসব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে, যারা ছাহাবীদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে। যারা ছাহাবীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদের নিন্দাও করা হয়েছে এখানে। আয়াতে কারীমায় ছাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাদের জন্য আল্লাহ

তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করাও শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি আহলুস সুন্নাতের লোকদের অন্তর ও জবানসমূহ পবিত্র থাকার কথাও জানা যায়। তাদের কথা:

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে। আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোন হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব, তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু" *(সূরা আল হাশর ৫৯:১০)।*

-এই কথার মধ্যে তাদের জবানের পরিশুদ্ধিতা পাওয়া যায়। তাদের কথা: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا﴾ "হে আমাদের রব! সেইসব মুমিনদের প্রতিও আমাদের অন্তরে কোন হিংসা ও ঘৃণাবোধ রেখো না, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছে", -এই কথার মধ্যে তাদের অন্তরের পরিশুদ্ধিতার এবং পবিত্রতারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

উপরোক্ত আয়াতে আরো দলীল পাওয়া যায় যে, ছাহাবীদেরকে গালি দেয়া এবং তাদেরকে ঘৃণা করা হারাম। তাদেরকে গালি দেয়া কিংবা ঘৃণা করা মুসলিমদের কাজ হতে পারে না। যারা এটি করবে, তারা 'ফাই'[২৩৫]এর সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না।

وَطَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীছের আনুগত্য করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি মূলনীতি, তা করতে গিয়েই তারা তাদের অন্তর ও জবানকে ছাহাবীদের জন্য পবিত্র রাখে:

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাতের লোকেরা ছাহাবীদের প্রতি জবান এবং অন্তর পরিশুদ্ধ রেখে এবং তাদেরকে গালি দেয়া ও তাদের মর্যাদায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করে থাকেন। কেননা তিনি তার ছাহাবীদেরকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেছেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي "তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো

২৩৫ . বিনা যুদ্ধে মুসলিমগণ কাফিরদের থেকে যেই সম্পদ হাসিল করে, তাকে ফাই বলা হয়। কাফিরদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে যেই সম্পদ হাসিল করে তাকেও ফাই বলা হয়। এমনি টেক্স, খিরাজ এবং উশরকেও ফাই হিসাবে নামকরণ করা হয়।

না"। أصحاب শব্দটি صـــاحب -এর বহুবচন। যেই মুসলিম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহচর্য লাভ করেছে, সেই ছাহাবী। সুতরাং ছাহাবী বলা হয়, ঐ মুসলিমকে, যে মুমিন অবস্থায় নাবীকে দেখেছে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করেছে।

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ঐ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। তিনি এই কসমের দ্বারা পরের কথাটিকে শক্তিশালী করতে চেয়েছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيفَهُ

"তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে, তাদের একজনের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দান করার সমান ছওয়াবও পাবে না"। উহুদ মদীনার একটি সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম। অন্যান্য পাহাড় থেকে আলাদা থাকায় এটিকে উহুদ পাহাড় বলা হয়। ذهبا শব্দটি তামীয হিসাবে মানসুব হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর 'সা'এর এক চতুর্থাংশকে মুদ বলা হয়। মুদ একটি পরিমাপ যন্ত্রের নাম। نِصْف কে نصيف ও বলা হয়। যেমন ثمين শব্দটি ثمن অর্থে ব্যবহৃত হয়। نِصْف ও نصيف উভয়ের অর্থই অর্ধেক। এমনি ثمين এবং ثمن উভয়েরই অর্থ মূল্যবান ও মূল্য।

হাদীছের সংক্ষিপ্ত অর্থ হলো, আল্লাহর রাস্তায় ছাহাবী ছাড়া অন্যদের প্রচুর দান ছাহাবীদের সামান্য দানের সমপরিমাণ হতে পারে না। এর কারণ হলো ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলিমদের সংখ্যা অল্প ছিল, ইসলামের সামনে প্রতিবন্ধক ছিল প্রচুর এবং দাওয়াত ছিল দুর্বল তখন ছাহাবীদের অন্তরের ঈমান যত বড় ছিল, পরবর্তীতে আগমনকারী কারো পক্ষে তত বড় ঈমান অর্জন করা সম্ভব হবে না।

মোটকথা হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, তাতে ছাহাবীদেরকে গালি দেয়া হারাম করা হয়েছে এবং অন্যদের উপরে তাদের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীছ থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, আমলকারীর নিয়ত এবং যেই সময়ে আমলটি করা হয়েছে, সেই অনুপাতে আমলের ফযীলত কমবেশী হয়। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)

এই হাদীছ থেকে আরো প্রমাণ পাওয়া গেল, যে ব্যক্তি ছাহাবীদেরকে ভালোবাসলো এবং তাদের গুণাবলী বর্ণনা করলো, সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে গালি দিলো এবং ঘৃণা করলো, সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ করলো।

فضل الصحابة وموقف أهل السنة والجماعة منه وبيان تفاضلهم

ছাহাবীদের ফযীলত সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান এবং তাদের ফযীলতের তারতম্য

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَيُفَضِّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ وَكَانُوا ثَلاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ "اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"[رواه البخاري (٣٠٠٧) ومسلم (٢٤٩٤) عن أنس]. وَبِأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ. وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، كَالْعَشَرَةِ، وَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بنِ شَمَّاسٍ، وَغَيْرِهِم مِنَ الصَّحَابَةِ وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ. وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَانَ: وَسَكَتُوا أَوْ رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيًّا وَقَوْمٌ تَوَقَّفُوا لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ

ছাহাবীদের ফযীলতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতে এবং মুসলিমদের ঐকমত্যে ছাহাবীদের যেসব ফযীলত এবং মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা কবুল করে নেন। যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে খরচ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ঐসব লোকের উপর প্রাধান্য দেন, যারা উক্ত ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। তারা মর্যাদার ক্ষেত্রে মুহাজিরদেরকে আনসারদের উপর প্রাধান্য দেন। তারা আরো বিশ্বাস করে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: فَقَدْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُم،

غَفَرْتُ لَكُمْ "তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি"।[২৩৬]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[২৩৭] শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।[২৩৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী, ছাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস এবং আরো যাদেরকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন, তাদেরকেও তারা জান্নাতী বলে।[২৩৯]

আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে মর্মে বর্ণিত হাদীছকে স্বীকৃতি দেয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে বলেছেন, নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আবু বকর ও উমারের পরে তারা উছমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তৃতীয় খলীফা এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে চতুর্থ খলীফা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।[২৪০] এ বিষয়ে একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং হুদায়বিয়ার দিন বাইআতের ক্ষেত্রে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর প্রাধান্য দেয়ার উপর ছাহাবীদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। যদিও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের কতিপয় আলিম উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মধ্যে কে অধিক উত্তম, এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। তবে তাদের দুইজনের চেয়ে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উত্তম ছিলেন। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সকল আলেমের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

একদল আলেম উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে।

---

২৩৬ . ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০০৭, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯৪, তিরমিযী হা/৩৩০৫, আবূ দাউদ হা/৪৬৫৪, দারিমী ২৮০৩।

২৩৭ . ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৮৬০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯৬।

২৩৮ . ছ্বহীহ বুখারী হা/৪১৫৪।

২৩৯. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৩৩-১৩৪, আবূ দাউদ হা/৪৬৪৮, তিরমিযী হা/৩৬৯৬।

২৪০ . ছ্বহীহ: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৫৫।

আরেক দল আলিম আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আরেক দল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অধিকাংশের মতে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: প্রথমে সকল ছাহাবীর ফযীলত একসাথে বর্ণনা করার পর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এ অধ্যায়ে ছাহাবীদের ফযীলতের তারতম্য বর্ণনা করেছেন এবং সে ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেন: কুরআন, হাদীছ এবং মুসলিমদের ইজমাতে ছাহাবীদের যেসব ফযীলত এবং মর্যাদার স্তরভেদ এসেছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা মেনে নেয়। ছাহাবীদের ফযীলত সাব্যস্ত করার জন্য উপরোক্ত তিনটি উৎসের দলীলই যথেষ্ট।

সকল ছাহাবীই মর্যাদা ও ফযীলতের ক্ষেত্রে সমান নয়। বরং ইসলাম কবুলে অগ্রণী হওয়া, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, হিজরত করা এবং তাদের নাবী ও দীনের হিফাযতের জন্য তারা যা করেছেন, সেই অনুপাতে তাদের ফযীলতের তারতম্য রয়েছে।

এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যারা বিজয় তথা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে খরচ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছে তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ঐসব লোকের উপর প্রাধান্য দেয়, যারা উক্ত ঘটনার পরে খরচ করেছে এবং লড়াই করেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা হুদায়বিয়ার ঘটনাকে মহান বিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহর ১নং আয়াতে বলেন:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"হে নাবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি"।

প্রসিদ্ধ মতে এখানে সুস্পষ্ট বিজয় বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরপরই সূরা ফাতাহ নাযিল হয়েছে।

হুদায়বিয়া মক্কার নিকটস্থ একটি কূপের নাম। এই কূপের কাছে একটি বৃক্ষ ছিল। মক্কার মুশরিকরা যখন রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাঁধা দিল, তখন এই বৃক্ষের ছায়াতলেই বায়আতুর্ রিযওয়ান সংঘটিত হয়।

তারা মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার উপর বাই'আত গ্রহণ করে। এই বাইআতকে সুস্পষ্ট বিজয় বলার কারণ হলো এই বাই'আতের কারণেই মুসলিমদের জন্য প্রচুর কল্যাণ বিজয় অর্জিত হয়েছে। এ বাই'আতে যারা শরীক ছিল, অন্যদের উপর তাদের ফযীলতের দলীল হলো যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾

"তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে" *(সূরা আল হাদীদ ৫৭:১০)*।[২৪১]

এ মুসলিমগণই হলো সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে" (সূরা তাওবা ৯:১০০)।

শাইখুল ইসলাম বলেন: وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَارِ তারা আনসারদের উপর মুহাজিরদেরকে প্রাধান্য দেয়:

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আনসারদের উপর মুহাজিরদের ফযীলত সাব্যস্ত করে। المهاجرون শব্দটি المهاجر এর বহুবচন। এখানে মুহাজির বলতে ঐসব মুসলিম উদ্দেশ্য, যারা মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিল।

---

২৪১. তাদের ফযীলতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আরো সুস্পষ্ট করে বলেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

"আল্লাহ ঐ সমস্ত মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাই'আত করলো। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন"। (সূরা আল ফাতহ: ১৮)

হিজরত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিত্যাগ করা। আর ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় কুফরীর দেশ ছেড়ে ইসলামের দেশে চলে যাওয়াকে হিজরত বলা হয়।

আর আনসার বলতে মদীনার ঐসব মুসলিম বুঝায়, যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য করেছিল। তারা ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ নামে নামকরণ করেছেন।

ফযীলতের ক্ষেত্রে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আনসারদের পূর্বে মুহাজিরদেরকে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ﴾

"যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে অগ্রণী" *(সূরা আত তাওবা: ১০০)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা তাওবার ১১৭ নং আয়াতে আরো বলেন:

﴿لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾

"আল্লাহ নাবীকে মাফ করে দিয়েছেন এবং অত্যন্ত কঠিন সময়ে যেসব মুহাজির ও আনসারগণ নাবীর আনুগত্য করেছে তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন।"। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّـهِ وَرِضْـوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ﴾

"এ ধন-সম্পদ ঐসব ফকীর মুহাজিরদের জন্য, যাদেরকে তাদের বসত-ভিটা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করে। তারাই সত্যবাদী। আর যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালোবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম" *(সূরা আল হাশর ৫৯: ৮-৯)*।

উপরের আয়াতগুলো একদিকে যেমন মুহাজির ও আনসারদের ফযীলত সাব্যস্ত করে, অন্যদিকে আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য সাব্যস্ত করে। কেননা

আল্লাহ তা'আলা আনসারদের আগে মুহাজিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্যের আরো কারণ হলো, তারা বিনিময়ের আশায় এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য করার জন্য নিজেদের দেশ ছেড়েছে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়া ত্যাগ করেছে। এসব কাজে তারা ছিলো সত্যনিষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন ছাহাবীর ব্যাপারে বলেছেন: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ﴾ "তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি":

যেমন ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনায় বিস্তারিত বিবরণ এসেছে।

মদীনা থেকে চার মারহালা (ষ্টেশন) দূরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম বদর। এই গ্রামের নিকট এমন একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাতে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। বদরের এই ঐতিহাসিক দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান তথা সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার দিন হিসাবেও নামকরণ করা হয়েছে।

তাদের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। ছ্বহীহ বুখারীতে তাদের সংখ্যা এটিই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করতে থাকো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাওয়ায়েদ' নামক কিতাবে বলেন: অনেক লোকের পক্ষে এই হাদীছের অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে আলেমদের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: এ বিষয়ে আমাদের ধারণা হলো, -বাস্তবে আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন-, এখানে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন, যাদের ব্যাপারে তিনি অবগত রয়েছেন যে, তারা কখনো দীন ছাড়বে না; বরং তারা ইসলামের উপর মরবে। কিন্তু অন্যরা যেমন গুনাহে লিপ্ত হয়, তারাও কখনো সেরকম গুনাহে লিপ্ত হতে পারে। তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুনাহর উপর অবিচল রাখবেন না; বরং তিনি তাদেরকে তাওবায়ে নাসুহা (খাঁটি তাওবা) এবং ক্ষমা প্রার্থনা করার তাওফীক দিবেন। সেই সাথে তিনি তাদেরকে এমন সৎ আমল করার তাওফীক দিবেন, যা তাদের গুনাহর চিহ্নগুলোকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিবে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরো বলেন: অন্যদেরকে বাদ দিয়ে তাদের ব্যাপারে খাস করে এই কথা বলার কারণ হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে। তবে

তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারা এমন করবে, যদ্বারা তাদের ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব নয়। এতে এটিও আবশ্যক হয় না যে, তারা মাগফিরাতের ওয়াদার উপর নির্ভর করে ফরয ইবাদত বর্জন করবে। শরী'আতের আদেশ পালন করা অব্যাহত রাখা ছাড়াই যদি মাগফিরাতের ওয়াদা অর্জিত হতো, তাহলে তারা মাগফিরাতের এই ওয়াদা পাওয়ার পর ছ্বলাত, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি কিছুই করতেন না। সুতরাং ইবাদত বর্জন করে ওয়াদার উপর নির্ভর করার ধারণা হতেই পারে না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিমের কথা এখানেই শেষ।

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সংবাদ অনুসারে আরো বিশ্বাস করে, যারা হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে বাইআত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন এবং তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।

বাই'আতুর রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে। মুশরিকরা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল, তখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে এ বাই'আতটি সংঘটিত হয়েছিল। পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ বাইআতে অংশগ্রহণকারী ছাহাবীদের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বৈশিষ্ট্য: যারা হুদায়বিয়ার বৃক্ষের নীচে বাই'আত করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ছ্বহীহ সনদে জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীছে এর দলীল রয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

"হুদায়বিয়ার দিন বৃক্ষের নীচে যারা বাইআত করেছে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না"।[২৪২]

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। কুরআনে সুস্পষ্ট করেই এ কথা বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার কাছে বাইআত করছিলো" (সূরা আল ফাতাহ ৪৮:১৮)।

---

২৪২. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৮৬০, আবূ দাউদ হা/৪৬৫৩, মুসনাদে আহমাদ হা/১৪৭৭৮।

তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন। বিশুদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে এটিই ছিল তাদের সংখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই অধিক অবগত আছেন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তারা তাদেরকে জান্নাতী বলে। যেমন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন ছাহাবী, ছাবেত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাস এবং আরো অন্যান্য ছাহাবী:

অর্থাৎ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাও তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়। আর তিনি যাকে জান্নাতের অধিবাসী বলে সাক্ষ্য দেননি, তারা তার জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য প্রদান করে না। কেননা তাকে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দেয়া আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা রচনা করার শামিল। তবে তারা সৎ লোকদের জন্য মঙ্গল কামনা করে এবং অসৎ লোকদের উপর আযাবের আশঙ্কা করে। এটিই আক্বীদাহর অন্যতম একটি মূলনীতি।

জান্নাতের সুখবর প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর নাম: তারা হলেন (১) আবু বকর ছিদ্দিক (২) উমার ইবনুল খাত্তাব (৩) উসমান ইবনে আফ্ফান (৪) আলী ইবনে আবু তালিব (৫) আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ (৬) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (৭) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (৮) সাঈদ ইবনে যায়েদ (৯) আবু উবায়দাহ ইবনে যাররাহ এবং (১০) তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।[২৪৩]

এ সমস্ত ছাহাবীদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা একাধিক ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। ছাবিত ইবনে কাইসকেও নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন। সুস্পষ্টভাষী হওয়ার কারণে তাকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তা বলে ডাকা হতো। তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ ছ্বহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা সুসাব্যস্ত।[২৪৪]

উপরে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে ছাড়াও আরো কতিপয় ছাহাবীকে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতী বলেছেন। যেমন উক্কাশা ইবনে মিহসান, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম এবং আরো অনেকেই।

তারা আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব এবং অন্যান্য ছাহাবী থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীছকে স্বীকৃতি দেয়। সেখানে বলা হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে আবু বকর, অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব:

---

২৪৩. ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/১৩৩-১৩৪, আবূ দাউদ হা/৪৬৪৮, তিরমিযী হা/৩৬৯৬।

২৪৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১১৯।

অর্থাৎ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর অতঃপর উমার ইবনুল খাত্তাব হওয়ার ব্যাপারে মুতাওয়াতির সনদে আলী এবং অন্যান্য ছাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তা বিশ্বাস করে। কেননা মুতাওয়াতির সনদ সর্বাধিক শক্তিশালী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উছমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফতের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় খলীফা হিসাবে গণ্য করে এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে গণ্য করে চতুর্থ স্থানে। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছে ঐসব রাফেযীদের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা তাকে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর চেয়ে উত্তম মনে করে এবং খিলাফাতের স্তর পরিক্রমায় তাকে আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উপর প্রাধান্য দেয়। অতঃপর তারা তাদের খিলাফতের সমালোচনা করে। মূলতঃ এই আলোচনায় দু'টি মাসআলা রয়েছে।

প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে খিলাফত সম্পর্কে। আর **দ্বিতীয় মাসআলাটি** হচ্ছে ছাহাবীদের মর্যাদার তারতম্য সম্পর্কে।

খিলাফতের ব্যাপারে কথা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুসারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর আবু বকর হচ্ছেন সর্বপ্রথম খলীফা,[২৪৫] অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। খলীফাদের এ স্তর পরিক্রমায় ঐকমত্য পোষণকারীদের মধ্যে ছাহাবীগণও শামিল ছিলেন।

---

২৪৫ . সুতরাং আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আবু বকরকে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করি। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর নাবীর পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তা ছাড়া আবু বকরের খিলাফতের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উক্তি রয়েছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ

"নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে একজন মহিলা আগমন করলো। তিনি তাকে পুনরায় আসতে বললেন। মহিলাটি বলল: আমি এসে যদি আপনাকে না পাই তাহলে কার কাছে যাব? মনে হচ্ছে সে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাওতকে উদ্দেশ্য করেছিল। তিনি তখন বললেন, তুমি এসে যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকরের কাছে যাবে"। (বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব) এখানে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল বর্তমান।

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আর ছাহাবীদের ফযীলতের তারতম্যের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ইজমা অনুসারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আবু বকর, অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তি। যেমন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত মুতাওয়াতির হাদীছে এই কথা বর্ণিত হয়েছে।

উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মতভেদ করেছে। তাদের দুইজনের মধ্যে কে অধিক উত্তম?

শাইখুল ইসলাম এখানে তিনটি মত উল্লেখ করেছেন।

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ

"আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমার- এই দু'জনের অনুসরণ করবে"। (তিরমিযী, অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব। সিলসিলায়ে ছ্বহীহা হা/১২৩৩) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তার ইমামতি করার হাদীছগুলো অতি প্রসিদ্ধ। মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি বলেছেন, مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ "তোমরা আবু বকরকে ছ্বলাতের ইমামতি করতে বল"। (বুখারী, অধ্যায়: আহাদীছুল আম্বীয়া) মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ

"রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে বললেন, তোমার পিতা আবু বকর ও তোমার ভাইকে ডাক। আবু বকরের জন্য একটি চিঠি লিখে যাব। আমার আশঙ্কা হচ্ছে অন্য কেউ এই বিষয়ে লালসা করবে এবং কেউ বলতে পারে আমি এব্যাপারে অধিক হকদার। আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কেউ খলীফা হওয়াকে অস্বীকার করেন"। (ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবাহ)

ইমাম ত্বহাবী বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে লিখিতভাবে খলীফা নিযুক্ত করে যাননি। যদি লিখতেন, তবে আবু বকরের জন্যই লিখতেন। তিনি লেখার ইচ্ছা পোষণ করেও লিখেননি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ও মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কেউ খলীফা হওয়াকে অস্বীকার করেন। লিখে দেয়ার চেয়ে একথাটি অধিক সুস্পষ্ট। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে খলীফা নিযুক্ত করার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। কথা ও কাজের মাধ্যমে ইঙ্গিতও দিয়েছেন। লিখে দিতে চেয়েও তা করেননি। কারণ তিনি জানতে পেরেছেন যে, মুসলমানগণ তার ব্যাপারে একমত হবে।

আনসার ও মুহাজিরগণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বাই'আত করেছেন। সা'দ ইবনে উবাদাহ ব্যতীত কেউ বাই'আত থেকে বিরত হননি। সুতরাং কোন ছাহাবীই একথা বলেননি যে, নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু বকর ছাড়া আলী বা অন্য কারো জন্য খিলাফতের অঙ্গীকার করেছেন। যেমনটি বলে থাকে বিদআতী সম্প্রদায়। (শরহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৪৮৪)

(১) একদল আলেম উছমানকে প্রাধান্য দিয়ে নিরবতা পালন করেছে এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে চতুর্থ খলীফা গণ্য করেছে।

(২) আরেক দল আলিম আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

(৩) আরেকদল নিরেপক্ষতা অবলম্বন করেছেন। এ হচ্ছে মতভেদের সারকথা। মর্যাদার ক্ষেত্রে উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়া, আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং তাদের দুইজনের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকা।

তবে শাইখুল ইসলাম প্রথম মতকে প্রাধান্য দেয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তা হলো একাধিক কারণে উছমানকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উপর প্রাধান্য দেয়া।

(১) উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ফযীলত বর্ণনার হাদীছগুলো এ মতকেই সমর্থন করে।

(২) বাইআতুর রিযওয়ানের সময় উছমানের বাইআত আগে নেয়ার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, উছমান আলীর চেয়ে উত্তম ছিলেন। সুতরাং ফযীলতের মধ্যে তাদের ধারাবাহিকতা খিলাফতের মধ্যে তাদের স্তরপরিক্রমা ও ধারাবাহিকতার মতোই।

(৩) উছমানকে আলীর উপর প্রাধান্য দেয়াই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের মত হিসাবে স্থির হয়েছে। যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ছাহাবীগণ উছমানকে বাইআতের ক্ষেত্রে প্রাধন্য দিয়েছেন।

আব্দুর রাহমান ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বললেন: আমি লোকদের প্রতি খুব গভীরভাবে দৃষ্টি দিলাম। দেখলাম তারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উর্ধ্বে স্থান দেয়নি।

আবু আইয়্যুব বলেন: যে ব্যক্তি উছমানকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উপর প্রাধান্য দিল না, সে মুহাজির এবং আনসারদেরকে অবজ্ঞা করলো। সুতরাং এটি প্রমাণ করে যে, উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উত্তম। কেননা তারা পরস্পর পরামর্শ করে তাকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। যারা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে বাই'আত করেছে, তাদের মধ্যে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও শামিল ছিলেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হুকুমে এবং তার সামনেই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শরী'আতের হদ তথা দণ্ডবিধি কায়েম করতেন।

حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة

খিলাফাতের ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে অন্য চার খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার বিধান

وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّة لَكِنِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا مَسْأَلَةُ الْخِلاَفَة، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ أَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلاَفَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلاءِ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِه

উছমান ও আলীর মধ্যে কে অধিক উত্তম, যদিও এ মাসআলাটি দীনের ঐসব মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে কেউ বিপরীত মত পোষণ করলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অধিকাংশ লোকের মতানুসারে তাকে গোমরাহ বলা যাবে। কিন্তু খিলাফতের মাসআলায় যে কেউ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করবে, তাকে গোমরাহ বলা হবে। কেননা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে খলীফা হলেন আবু বকর, অতঃপর উমার, অতঃপর উছমান, অতঃপর আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। সুতরাং যে ব্যক্তি এ সমস্ত খলীফার কারো খিলাফতের বিরোধিতা করবে, সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও বোকা বলে বিবেচিত হবে।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম এখানে দু'টি মাসআলার মধ্যে তুলনা করেছেন। একটি হলো সম্মান ও ফযীলতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দেয়ার মাসআলা এবং আরেকটি হলো খিলাফতের মাসআলায় আলীকে অন্য খলীফাদের উপর প্রাধান্য দেয়া। যার ফলে বড় ধরণের কোন ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং শাইখ বর্ণনা করেছেন যে, ফযীলতের ক্ষেত্রে আলীকে উছমানের উপর প্রাধান্য দিলে গোমরাহ বলা হবে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলীকে উছমানের চেয়ে উত্তম বলল, তাকে গোমরাহ বলে হুকুম লাগানো যাবে না। কেননা আহলুস সুন্নাতের লোকদের মধ্যে এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। যদিও প্রাধান্যযোগ্য মতে আলীর উপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর ফযীলত সাব্যস্ত। কিন্তু খিলাফতের মাসআলায় গোমরাহ বলা হবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি খিলাফতের মাসআলায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের খেলাফ করবে এবং আলীকে উছমান বা তার আগের কোন খলীফার উপর প্রাধান্য দিবে কিংবা

তাকে ফযীলতের ক্ষেত্রে আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উপর প্রাধান্য দিবে তার উপর গোমরাহীর হুকুম লাগানো হবে।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হলেন প্রথম খলীফা। কেননা তার রয়েছে অনেক ফযীলত এবং সৎকর্মে অগ্রগামিতা। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সমস্ত ছাহাবীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তার খিলাফতের বাই'আতের উপর ছাহাবীদের ইজমা হয়েছে।

অতঃপর আবু বকরের পরে উমার ইবনুল খাত্তাব হলেন দ্বিতীয় খলীফা।[২৪৬] কেননা তারও রয়েছে অনেক ফযীলত এবং সৎকর্মে অগ্রগামিতা। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

---

২৪৬. আবু বকরের পরে আমরা উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে যোগ্য খলীফা মনে করি। কারণ আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উমারকে খলীফা নিযুক্ত করে গেছেন। মুসলিম উম্মত তার খিলাফতের উপর একমত হয়েছে। তার ফযীলত বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«اقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ»

"আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমার- এই দু'জনের অনুসরণ করবে"।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খিলাফতের হকদার মনে করি। কেননা উমার শহীদ হওয়ার পর মুসলমানগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাকে খলীফা নির্বাচন করেছেন এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সহ সকল ছাহাবী তার হাতে খিলাফতের বাই'আত করেছেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। তিনি নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দু'জন কন্যাকে বিয়ে করেছেন। ছ্বহীহ মুসলিমে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা নিজের উরু উম্মুক্ত করে শুয়েছিলেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হল। কিন্তু নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেভাবেই রয়ে গেলেন। আবু বকরের সাথে কথা বললেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশ করলেন। তিনি সেভাবেই থেকে গেলেন। পরিশেষে যখন উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রবেশের অনুমতি চাইলেন তখন তিনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। উছমানকে অনুমতি দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন এবং রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে গেলে আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রবেশ করলো কিন্তু আপনি সতর্ক হলেন না। যখন উছমান প্রবেশ করলো তখন উঠে বসলেন এবং কাপড় ভাঁজ করলেন তখন নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, «أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ» অর্থাৎ আমি কি এমন একজন লোক থেকে লজ্জাবোধ করবো না? যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেন। (ছ্বহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস সাহাবাহ)

হুদায়বিয়ার দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রতিনিধি হিসেবে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর বাই'আতুর্ রিযওয়ান সংঘঠিত হয়েছিল। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এটি উছমানের হাত। অতঃপর

জীবিত থাকা কালেই তাকে পরবর্তী খিলাফতের দায়িত্বভার দিয়ে গেছেন। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পরে তার খেলাফতের উপর উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতঃপর উমারের পর খলীফা হলেন উছমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কেননা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর পক্ষ হতে নিযুক্ত শুরা পরিষদ তাকেই খিলাফতের জন্য প্রাধান্য দিয়েছে এবং মুসলিম উম্মত তার খিলাফতের উপর একমত হয়েছে। অতঃপর উছমান ইবনে আফফানের পরে খলীফা হলেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। কেননা তার রয়েছে অনেক ফযীলত। তার খিলাফতের উপর তার যুগের লোকদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

এ হলেন চারজন খলীফা। ইরবায ইবনে সারিয়ার হাদীছে তাদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে"।[২৪৭]

তা অন্য হাতের উপর রাখলেন এবং বললেন, এটি উছমানের বাই'আত। (শরহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৪৯২।)

অতঃপর উছমানের পরে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মুসলমানদের খলীফা মনে করি। কারণ উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিহত হওয়ার পর ছাহাবীগণ তার নিকট খিলাফতের বাই'আত করেছেন। তারও রয়েছে অনেক ফযীলত। নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

«أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى»

"তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার নিকট সেরকম যেমন ছিল হারুনের মর্যাদা মূসার নিকট"। (বুখারী, অধ্যায়: আল-মানাকিব)

খায়বরের যুদ্ধের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল আমি এমন একজন লোককে ঝান্ডা প্রদান করবো যিনি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তার রসূলও তাকে ভালোবাসেন। ছাহাবীগণ বললেন, আমরা এব্যাপারে সারা রাত আলোচনা করলাম। সকালে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলীকে ডাক। আলীকে ডেকে আনা হল। তার চোখ অসুস্থ ছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় চোখে থুথু দিলেন। এতে তিনি ভালো হয়ে গেলেন। তিনি আলীর হাতে ঝান্ডা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান করলেন। (শরহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ৪৯৫)

২৪৭. ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

এ জন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন: যে ব্যক্তি এ চারজনের কারো খিলাফতের স্বীকৃতি দিবে না সে তার গৃহে পালিত গাধার চেয়েও অধিক নির্বোধ। কেননা এতে বিনা কারণে শরী'আতের দলীল এবং ইজমার খেলাফ করা হবে। যেমন রাফেযীরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে আলী ইবনে আবু তালিবকেই খিলাফতের হকদার মনে করে।

আলীকে অন্য তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দেয়ার মাসআলায় শেষ কথা হলো,

(১) যারা খিলাফতের ক্ষেত্রে তাকে বাকী তিন খলীফার উপর প্রাধান্য দিলো, সে আহলুস সুন্নাতের ঐকমত্যে গোমরাহ বলে গণ্য হবে।

(২) যারা তাকে ফযীলতের ক্ষেত্রে আবু বকর সিদ্দীক এবং উমারের উপর প্রাধান্য দিবে, তারাও গোমরাহ হবে।

(৩) যারা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উপর ফযীলতের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিবে, তাদেরকে গোমরাহ বলা হবে না। যদিও এটি প্রাধান্যযোগ্য মতের বিপরীত।

مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী পরিবারের মর্যাদা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ، وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:حَيْثُ قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ: "أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي"[رواه مسلم (٢٤٠٨) عن زيد بن أرقم]. وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ وَقَد اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِمٍ– فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِي وَقَالَ: "إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ [رواه مسلم (٢٢٧٦) عن وائلة بن الأسقع].

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত নাবী পরিবারের সকল সদস্যকে ভালোবাসে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এবং তাদের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ অসীয়তকে হিফাযত করে, যা তিনি গাদীরে খুম্মের দিন করেছিলেন। তিনি সেদিন বলেছেন:

أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي

"আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"।[২৪৮]

তার চাচা আব্বাস যখন তার নিকট অভিযোগ করলেন, কুরাইশদের কিছু লোক বনী হাশেমদের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে, তখন তিনি বললেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ للهِ وَلِقَرَابَتِي

সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে ভালোবাসবে।[২৪৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

---

২৪৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০৮, সুনানে দারিমী হা/৩৩১৬, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা ২৩৫৭।

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের থেকে বনী ইসমাঈলকে বাছাই করে নিয়েছেন। ইসমাঈলের সন্তানদের থেকে বনী কেনানাকে নির্বাচন করেছেন। আর বনী কেননা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ বংশ থেকে নির্বাচিত করেছেন বনী হাশেমকে। আর হাশেমের বংশ থেকে নির্বাচন করেছেন আমাকে"।[২৫০]

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম এখানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট আহলে বাইত তথা নাবী পরিবারের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহলে বাইতকে ভালোবাসে। নাবী পরিবাবের ঐ সমস্ত সদস্য আহলে বাইতের মধ্যে শামিল, যাদের জন্য সাদকাহ গ্রহণ করা হারাম করা হয়েছে। তারা হলেন আলী, জা'ফর, আকীল, আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাদের পরিবারের সকল সদস্য। এমনি হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী এবং কন্যাগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের নাবী পরিবার থেকে ময়লা দূর করতে এবং তোমাদের পুরোপুরি পাক-পবিত্র করে দিতে" *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)।*

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী পরিবারের লোকদেরকে ভালোবাসে এবং তাদেরকে সম্মান করে। কেননা তাদেরকে ভালোবাসা ও সম্মান করা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালোবাসা ও সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সম্মান করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾

---

২৪৯. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/৩৭৫৮, মুসনাদে আহমাদ।

২৫০ . ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৭৬, তিরমিযী হা/৩৬০৫, মুসনাদে আহমাদ।

হে নাবী! এসব লোককে বলে দাও, এ কাজের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। তবে আত্মীয়তার ভালোবাসা অবশ্যই চাই (সূরা আশ শূরা ৪২:২৩)।

সুন্নাতে এ বিষয়ে অনেক দলীল রয়েছে। এগুলো থেকে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া কিছু উল্লেখ করেছেন। তবে ভালোবাসা পাওয়ার শর্ত হলো রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়দের সালাফগণের ন্যায় সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে এবং দীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে। যেমন ছিলেন আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সন্তানগণ এবং আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সন্তানগণ। পক্ষান্তরে যারা রসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা করবে এবং দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে না, তাদেরকে ভালোবাসা নাজায়েয। যদিও সে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ويتولونهم তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে: অর্থাৎ তাদেরকে ভালোবাসে। يتولون শব্দটি الولاء থেকে গৃহীত হয়েছে। الولاء শব্দের واو বর্ণে যবর দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো ভালোবাসা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসীয়তকে হিফাযত করে: তারা সেই অসীয়ত অনুযায়ী আমল করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। তিনি গাদীরে খুম্মের দিন বলেছেন: "আমি তোমরাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি"। বন্যার বা বৃষ্টির পানি যেখানে গিয়ে জমা হয়, তাকে غدير (গাদীর) বলা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, খুম্ম একজন ব্যক্তির নাম। তার দিকে সেই স্থানের পানিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে غدير خم 'খুম্মের জলাশয়'।

কেউ কেউ বলেছেন: বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি স্থানের নাম হলো খুম্ম। জলাশয়টিকে এই স্থানটির দিকে সম্বোধন করার কারণ হলো জলাশয়টি সেখানেই অবস্থিত ছিল। এই পুকুর বা জলাশয়টি মক্কা থেকে মদীনায় আসার রাস্তার পাশে (জুহফায়) অবস্থিত ছিল। বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার সময় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই জলাশয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন এবং সেখানে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণের মধ্যে উপরোক্ত কথাটিও ছিল, যা শাইখুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন: আল্লাহ তা'আলা আমার আহলে বাইতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এবং তাদের হক আদায় করার যে আদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে সেই আদেশ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

وَقَالَ أَيْضًا لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ তিনি তার চাচা আব্বাসকে বলেছিলেন: আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ। তিনি একটি অপছন্দনীয় বিষয়

দেখে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অবগত করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, কুরাইশদের কিছু লোক বনী হাশেমের লোকদের প্রতি দুর্ব্যবহার করছে।

الجفاء। অর্থ হলো সদাচরণ পরিহার করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কসম করে বললেন: ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে আত্মীয়তার কারণে তোমাদেরকে ভালোবাসবে। অর্থাৎ দুই কারণে আহলে বাইতের লোকদেরকে ভালোবাসতে হবে। (১) আহলে বাইতকে ভালোবাসার মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করবে। কেননা তারা আল্লাহর অলীদের অন্তর্ভুক্ত। (২) তারা ছিলেন রসূলের আত্মীয়।

সুতরাং তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি হবেন এবং এর মাধ্যমে তার প্রতি সম্মানও প্রদর্শন করা হয়। বনী হাশেমের ফযীলতের বর্ণনা দিতে গিয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তারা হলেন তারই আত্মীয়। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সাল্লামের বংশধর হতে উত্তম হিসাবে বাছাই করেছেন। আর ইসমাঈলের বংশধর থেকে বনী কেননাকে নির্বাচন করেছেন। কেনানা একটি গোত্রের নাম। তাদের পূর্ব পুরুষ ছিল কেনানা ইবনে খুযাইমা। কেনানা থেকে বাছাই করেছেন কুরাইশকে। কুরাইশরা হলো মুযার ইবনে কেনানার সন্তান। কুরাইশ থেকে আল্লাহ তা'আলা বনী হাশেমকে নির্বাচন করেছেন। এরা হলেন হাশেম ইবনে আব্দে মানাফের সন্তান। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বনী হাশেম থেকে বাছাই করেছেন।

সুতরাং তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আব্দে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব ইবনে লুআই ইবনে গালেব ইবনে ফিহির ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে কেনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরেকা ইবনে ইলয়াস ইবনে মুযার ইবনে নায্যার ইবনে মাআদ ইবনে আদনান। উপরোক্ত হাদীছ থেকে দলীল পাওয়া গেল যে, আরবদের ফযীলত রয়েছে। আর কুরাইশ বংশ হলো অন্যান্য আরব গোত্র হতে উত্তম। বনী হাশেম কুরাইশদের মধ্যে সর্বোত্তম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী হাশেমের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। সুতরাং তিনি ব্যক্তিগত দিক থেকে সর্বোত্তম আদম সন্তান এবং তার বংশ মর্যাদাও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হাদীছের মধ্যে বনী হাশেমেরও ফযীলত সাব্যস্ত হয়েছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আত্মীয়রাই হলো বনী হাশেম।

مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা

ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآخِرَةِ: خُصُوصًا خَدِيجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلاَدِه، وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِه وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه وَأَوَّلَ مَنْ آمَنَ بِه وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ وَالصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মাহাতুল মুমিনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তারা বিশ্বাস করে, আখিরাত দিবসেও তারা তার স্ত্রীরূপেই পরিগণিত হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশেষ করে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কারণ খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন তার অধিকাংশ সন্তানের জননী, তার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারীনী এবং দীনের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে সর্বাত্মক সাহায্যকারীনী। সর্বোপরি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ছিল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সুউচ্চ মর্যাদা। সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক আয়িশা সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সে রকমই, যেমন ছারীদ[২৫১] নামক খাবারের মর্যাদা সকল খাদ্যের উপর"।[২৫২]

.....

২৫১ . সেকালে সারীদ ছিল আরবের সর্বোত্তম খাদ্য, যা রুটি ও মাংস দ্বারা তৈরী হত।

২৫২. ছ্বহীহ বুখারী ৩৪১১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৪৩১, তিরমিযী ৩৮৮৭, নাসাঈ ৩৯৪৭, ইবনে মাজাহ ৩২৮০, সুনানে দারিমী ২১১৩।

ব্যাখ্যা: এ অংশে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের আক্বীদাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তারা নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের প্রতি অন্তর দিয়ে গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে সম্মান করে। কেননা তারা হলেন শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের দিক থেকে এবং উম্মতের কারো জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হওয়ার দিক থেকে জননী সমতুল্য। তবে বিবাহ ব্যতীত অন্যান্য হুকুম-আহকামের ক্ষেত্রে তাদের হুকুম অপরিচিত মহিলাদের মতোই। অর্থাৎ তাদের সাথে নির্জনে একত্রিত হওয়া, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা, ইত্যাদি সবই হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾

"নাবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা" (সূরা আহযাব ৩৩:৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তার পরে তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করাও জায়েয নয়। এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিরাট গুনাহ্" *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৩)।* আল্লাহ তা'আলা একই আয়াতে আরো বলেন:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

"তোমরা তার পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।" *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৫৩)।*

সুতরাং সম্মান পাওয়ার দিক থেকে তারা মুমিনদের জননী সমতুল্য। তবে মুমিনগণ আপন মাতার ন্যায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণের জন্য মাহরাম নয়। অর্থাৎ নিজের মাতা, বোন, কন্যা এবং অনুরূপ মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা জায়েয, সেরকম নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের সাথে নির্জনে মিলত হওয়া জায়েয নয়।

নয়জন স্ত্রী জীবিত রেখে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেছেন। তারা হলেন আয়িশা, হাফসা, যয়নব বিনতে জাহ্শ, উম্মে সালামা, সাফীয়া, মায়মুনা, উম্মে হাবীবা, সাওদা এবং জুআইরিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুন্না)।

তিনি খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে নবুওয়াতের পূর্বেই বিবাহ করেছিলেন। তিনি জীবিত

থাকতে আর কাউকে বিবাহ করেননি। যায়নাব বিনতে খুযাইমাকে বিবাহ করার কিছু দিন পরেই যায়নাব মৃত্যু বরণ করেন। এরাই হলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ সমস্ত স্ত্রী, যাদের সাথে তিনি ঘরসংসার করেছেন। তাদের সংখ্যা মোট ১১জন। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আরো বিশ্বাস করে যে, আখিরাত দিবসে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীগণ তার স্ত্রীরূপেই থাকবে। এতে করে তাদের জন্য বিরাট সম্মান ও ফযীলত হাসিল হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী খাদীজার রয়েছে বিশেষ ফযীলত । তার রয়েছে অনেক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা এবং ফযীলত। শাইখুল ইসলাম তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করেছেন।

(১) খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকাংশ সন্তানের মাতা। সুতরাং ইবরাহীম ব্যতীত তার বাকীসব সন্তানই খাদীজার গর্ভ থেকে। ইবরাহীম ছিলেন মারিয়া কিবতীর গর্ভ থেকে।

(২) এক মতানুসারে খাদীজাই সর্বপ্রথম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন। শাইখুল ইসলাম এখানে এই মতটিই উল্লেখ করেছেন। অন্যমতে তিনি মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাই সর্বপ্রথম সক্রীয়ভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য করেছিলেন। তিনি ঠিক সেই সময়ই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য করেছেন, যখন সাহায্যের খুব প্রয়োজন ছিল।

(৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ছিল উচ্চ মর্যাদা। তিনি খাদীজাকে খুব ভালোবাসতেন, তার কথা স্মরণ করতেন এবং তার খুব প্রশংসা করতেন।

আর সিদ্দীকাহ বিনতে সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সম্পর্কে কথা এই যে, তিনি হলেন আয়িশা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা। অত্যাধিক সত্যবাদীকে সিদ্দীক বলা হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে এ উপাধী দিয়েছেন। আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর রয়েছে অনেক ফযীলত। তার মধ্যে

(ক) তিনি ছিলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

(খ) তাকে ছাড়া রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কোন কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেননি।

(গ) আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর সাথে একই চাদরের নীচে থাকা অবস্থায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অহী নাযিল হতো।

(ঘ) মিথ্যুকরা তার উপর যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাকে সেই মিথ্যা অপবাদ থেকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন।

(ঙ) তিনি হলেন মহিলাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী।

(চ) বিজ্ঞ ছাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তার কাছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন।

(ছ) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে এবং তারই বুকের উপর মাথা রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন।

(জ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার গৃহেই দাফন করা হয়েছে। এ ছাড়াও তার আরো অনেক ফযীলত রয়েছে।[২৫৩] আর শাইখুল ইসলাম এখানে তার যেই ফযীলতটি উল্লেখ করেছেন, তা হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

"আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর মর্যাদা সব নারীর উপর ঠিক সেরকমই, যেমন ছারীদ নামক খাবারের মর্যাদা অন্যসব খাদ্যের উপর"।[২৫৪]

ছারীদ ছিল সে সময়ের সর্বোত্তম খাবার। কেননা তাতে থাকত গোশত ও রুটি। আটার রুটি সর্বোত্তম খাদ্য। আর গোশত হলো সর্বোত্তম সালন (তরকারী)। গোশত যেহেতু সর্বোৎকৃষ্ট তরকারী এবং আটা যেহেতু সর্বোত্তম খাদ্যদ্রব্য, আর ছারীদ যেহেতু এই উভয় প্রকার বস্তু দ্বারা তৈরী হয়, তাই ছারীদ সর্বোত্তম খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

---

২৫৩ . নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে কি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সর্বাধিক উত্তম? না খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সর্বাধিক উত্তম? এ বিষয়ে আলেমদের দু'টি কথা রয়েছে। (১) কতিপয় আলেম ফযীলতের ক্ষেত্রে খাদীজাকে আয়েশার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার অন্যরা খাদীজার উপর আয়েশাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তাদের দুইজনের একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন।

২৫৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪১১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৩১, তিরমিযী হা/৩৮৮৭, নাসাঈ হা/৩৯৪৭, ইবনে মাজাহ।

تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل البيت

ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে বিদ'আতীরা যা বলে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

وَيَتَبَرَّءُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُولُونَ: إنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إنْ صَدَرَ حَتَّى إنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ثُمَّ إذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ أَوِ ابْتُلِيَ بِبَلَاءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ ؛ فَكَيْفَ الْأُمُورُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ: إنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ ثُمَّ إنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْفُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ وَأَنَّهُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহ হলো, তারা ঐ সমস্ত রাফেযীর[২৫৫] পথ পরিহার করে, যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে গালি দেয়।[২৫৬] তারা ঐ সব নাওয়াসেবদের[২৫৭] সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে, যারা কথা কিংবা আচরণের মাধ্যমে আহলে বাইতকে কষ্ট দেয়। ছাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত মতবিরোধ, ফিতনা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে কথা বলা থেকে তারা বিরত থাকে।[২৫৮]

---

২৫৫. শিয়াদের একটি উপদলকে রাফেযী বলা হয়। তাদেরকে জা'ফারীয়া হিসাবেও নামকরণ করা হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, শিয়াদের একটি দল যায়েদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলীর কাছে এসে আবু বকর এবং উমারের প্রশংসা বর্জন করার আহবান জানালো। কিন্তু তিনি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার কারণে তারা বলল: إذا نرفضك অর্থাৎ তাহলে আমরাই আপনাকে বর্জন করলাম। এখান থেকেই তাদেরকে রাফেযী বলা হয়। এদের অন্যতম আক্বীদাহ হলো, তারা আহলে বাইত ছাড়া বাকী ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং তাদেরকে কাফির বলে।

২৫৬. শিয়া ও রাফেযীরা আমীরে মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মারাত্মক ঘৃণা করে, গালি দেয় এবং কাফির মনে করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় বিশ্বাসী মুসলিমগণ তাকে গালি দেয়া এবং ঘৃণা করাকেও বৈধ মনে করে না। কারণ তার ফযীলতে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

২৫৭. নাওয়াসেবরা রাফেযীদের বিপরীত। النصب শব্দের অর্থ হলো শত্রুতা পোষণ করা। তারা যেহেতু আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, তাই তাদেরকে নাওয়াসেব বলা হয়।

২৫৮. **উষ্ট্রের যুদ্ধ:** উছমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হওয়ার পর উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝিই এই যুদ্ধের মূল কারণ। এই যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অপর পক্ষে ছিলেন আয়েশা, তালহা এবং যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। এখানে যে কথাটি আমি বলতে চাই তা হলো কোন পক্ষেরই যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যুদ্ধের জন্য বের হননি। তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার জন্যে বের হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন তার বের হওয়ার মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতঃপর তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, বের না হওয়াটাই ভালো ছিল। তাই তিনি যখনই বের হওয়ার কথা স্মরণ করতেন তখন কেঁদে ওড়না ভিজিয়ে ফেলতেন। এমনিভাবে যারাই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুআবিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের সবাই পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বের হওয়া সম্পর্কে নাবী (ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বনী আমেরের বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন তাকে দেখে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করা শুরু করলো। তিনি বললেন, এই জলাশয়টির (পুকুরটির) নাম কি? লোকেরা বললো: এটির নাম 'হাও-আব'। একথা শুনে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আমার ফেরত যেতে ইচ্ছে করছে। যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন, অগ্রসর হোন! যাতে মানুষেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। তিনি পুনরায় বললেন, মনে হচ্ছে আমার ফেরত যাওয়া উচিত। কেননা আমি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি আমাদেরকে (নাবী পত্নীদেরকে) লক্ষ্য করে বলেছেন, "কেমন হবে তখনকার অবস্থা যখন তোমাদের কাউকে দেখে হাও-আবের কুকুরগুলো ঘেউ

ঘেউ করবে?"। (মুস্তাদরাকুল হাকীম। ইমাম ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, হাদীছের সনদটি বুখারীর শর্ত অনুযায়ী, ফাতহুল বারী, (১২/৫৫)

হাদীছের সরল ব্যাখ্যা এই যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "হে আয়েশা! সেদিন তোমার অবস্থা কেমন হবে? যেদিন তোমাকে দেখে 'হাও-আব' নামক জলাশয়ের নিকটস্থ কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণীটি মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি যখন ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছলেন তখন কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ভবিষ্যৎ বাণীটি স্মরণ করে জিজ্ঞেস করলেন এটি কোন জলাশয়? লোকেরা বলল: এটি হাও-আবের জলাশয়। এই কথা শুনে তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হলেন যে তিনি ফিতনায় পড়ে গেছেন এবং বার বার ফেরত আসার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে তিনি নিরাপদে মদীনায় ফেরত আসলেন। তিনি নিজেও যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে যুদ্ধের আদেশও দেননি।

সিফ্ফীনের ফিতনা:

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি নিহত হওয়ার পর গোলযোগের মধ্য দিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা নির্বাচিত হন। মদীনার বিজ্ঞ ছাহাবীগণ তার নিকট খিলাফতের বাইআত করেন। তাদের বাইআতের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর চতুর্থ ন্যায়পরায়ন খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু মুআবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং সিরিয়াবাসী আলী রাদ্বিয়াল্লাহুর আনুগত্য বর্জন করে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, খেলাফতের দাবীতে তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র আনুগত্য বর্জন করেননি, যেমনটি দাবী করে থাকে ইসলাম বিদ্বেষী কিছু এবং সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা; বরং তার দাবী ছিল, প্রথমে উছমান হত্যার বিচার হবে, অতঃপর তিনি বাইআত করবেন। ঐদিকে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা ছিল, তিনি যেহেতু নির্বাচিত খলীফা, তাই আগে তার প্রতি প্রথমে মুআবীয়া আনুগত্য প্রকাশ করবেন। অতঃপর শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হলে এবং প্রকৃত হত্যাকারীদেরকে সনাক্ত করা সম্ভব হলে হত্যার বিচার হবে। এ ক্ষেত্রে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর অবস্থান সঠিক ছিল। কিন্তু মুআবীয়া তা এই যুক্তিতে মানতে পারলেন না যে, ন্যায়পরায়ন খলীফা এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার অন্যতম ছাহাবীর রক্তের বদলা নেয়ার পূর্বে কোনভাবেই আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে বাইআত করা যায় না। এতে করে কুরআনের আয়াতে হত্যার বদলে হত্যার ফরযীয়াতই বাতিল হয়ে যায়। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দাবীর উপর অটল থাকার কারণেই মূলত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এখানে উভয় পক্ষই ইজতেহাদ করেছিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইজতেহাদে সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলে তিনি দু'টি পুরস্কার পাবেন। আর মুআবীয়ার ইজতেহাদ ভুল হয়েছিল। তাই তিনি একটি পুরস্কার পাবেন। এখানে কোন পক্ষই দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য যুদ্ধ করেননি। উভয়ের দাবীই ছিল এক ও অভিন্ন। সুতরাং আলী বা মুআবীয়ার কাউকেই দোষারোপ করা যাবে না। এতে করে শুধু পাপের বোঝাই বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

"আমার উম্মতের দু'টি বিশাল দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। কিন্তু উভয়ের দাবী হবে একটাই"। (বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান)

তারা বলে যে, ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি আলোচনায় যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর কিছু মিথ্যা, কোনটিতে সংযোজন করা হয়েছে, কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীছগুলো থেকে যা ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় তারা সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। মূলতঃ ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো তাতে ভুল করে থাকে আবার কখনো তারা সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়ে থাকে।

তা সত্ত্বেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, প্রত্যেক ছাহাবীই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ হতে নিষ্পাপ; বরং তাদের দ্বারা গুনাহ হতে পারে। তবে ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতা সহ এমনসব ফযীলত রয়েছে, যার দাবী এই যে, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য। এমনকি ছাহাবীদের এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের জন্য অর্জন করা অসম্ভব। সুতরাং ছাহাবীদের এই সৎকর্মগুলো তাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যে ছাহাবীগণ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ"।[২৫৯] তাদের পরবর্তী যুগের কোনো মুসলিম উহুদ

এখানে দুইটি দল বলতে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দলকে বুঝানো হয়েছে। হিজরী ৩৬ সালে ইরাকের ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত সিফ্ফীন নামক স্থানে এই দল দু'টি পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের প্রায় ৭০ হাজার লোক নিহত হয়"। (মু'জামুল বুলদান, (৩/ ৪১৪)

আলী ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে যে সমস্ত যুদ্ধ হয়েছে তার কোন একটিও তাদের ইচ্ছায় হয়নি; বরং উভয় দলের মধ্যে কিছু পথভ্রষ্ট, কুপ্রবৃত্তির অনুসারী এবং কুচক্রী লোক ছিল। তারা সর্বদাই মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উস্কানি দিতে থাকে। এতে করে বিষয়টি উভয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আলী ও মুআবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর দলের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল তাদের অধিকাংশই আলী বা মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কারো আনুগত্য করতোনা। আলী বা মুআবিয়া কখনোই মুসলমানদের রক্তপাত কামনা করেননি। কিন্তু যা কাম্য ছিল না অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা হয়েই গেল। কথায় আছে ফিতনা যখন শুরু হয়ে যায় জ্ঞানীরাও তার আগুন নিভাতে অক্ষম হয়ে যায়"। (মিনহাজুস্ সুন্নাহ, (২/২২৪)

২৫৯. ছহীহ বুখারী ৩৬৫০। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ "আমার উম্মতের মধ্যে আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম। অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা"। (ছহীহ বুখারী, অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিব)

পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে ছাহাবীদের কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছওয়াব পাবে না।[২৬০]

অতঃপর তাদের কারো দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ত্রুটিকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে কিংবা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আতের দ্বারা তার সে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেননা ছাহাবীরাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত পাওয়ার সর্বাধিক হকদার। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মুছীবতে ফেলা হয়েছে, যার কারণে উক্ত মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে।

সুতরাং তাদের দ্বারা নিশ্চিতরূপে সংঘটিত গুনাহর অবস্থা যদি এই হয়, তাহলে ঐসব ভুল-ত্রুটির কী অবস্থা হতে পারে, যাতে তারা ইজতেহাদ করেছিলেন? যদি তারা সেখানে হকে উপনীত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে দু'টি নেকী। আর ভুল করে থাকলে রয়েছে একটি নেকী। আর ভুল-ত্রুটি তো ক্ষমাযোগ্যই।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাদের কর্মসমূহ থেকে যে পরিমাণ কাজকে অপছন্দ করা হয়ে থাকে, তা অতি সামান্য ও নগণ্য। আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, ভালোবাসা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ, হিজরত, দীনের নুসরত (সাহায্য), উপকারী ইলম এবং সৎ আমলসহ তাদের আরো যেসব সুবিশাল ফযীলত ও সৎকর্ম রয়েছে, তা দ্বারা তা আচ্ছাদিত হয়েছে।

সুতরাং যে ব্যক্তি সজ্ঞানে ও জেনে-বুঝে ছাহাবীদের পবিত্র জীবনীর প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব ফযীলত দান করেছেন, তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই জানতে পারবে, তারাই নাবীদের পরে সর্বোত্তম মানুষ। অতীতে ছাহাবীদের মতো মর্যাদাবান ও ফযীলতের অধিকারী কেউ ছিল না। ভবিষ্যতেও তাদের মতো ভালো লোক আর আসবে না। তারা মুসলিম জাতির সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাশীল উম্মতের সর্বোৎকৃষ্ট মানব।

.....

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এই অংশে আহলে বাইত ও ছাহাবীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত: তাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো ইফরাত (বাড়াবাড়ি) ও তাফরীত (অবহেলা ও শৈথিল্য) এবং সীমালঙ্ঘন ও

২৬০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪০-৪১।

কঠোরতার মাঝখানে। তারা উম্মতের সকল মুমিনকেই ভালোবাসে। বিশেষ করে যেসব মুহাজির ও আনসার সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেছে এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, তারা তাদের সবাইকে ভালোবাসে। তারা আহলে বাইতের প্রতিও অন্তর দিয়ে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

তারা ছাহাবীদের মর্যাদা, ফযীলত ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে অবগত রয়েছে। সেই সাথে আহলে বাইতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যেসব হক নির্ধারণ করেছেন, তারা সেই হকগুলোও সংরক্ষণ করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা রাফেযীদের পথ বর্জন করে এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না। কারণ তারা ছাহাবীদেরকে গালি দেয়,[২৬১] তাদের সমালোচনা করে এবং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও আহলে বাইতের ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নাওয়াসেবদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করে। কেননা তারা আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাদেরকে কাফির বলে এবং তাদের সম্মানে আঘাত করে। ছাহাবী এবং আহলে বাইতের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের মাযহাব পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাবের বিরোধী ও ভ্রান্ত মাযহাবগুলোর সাথে তুলনা করার জন্যই শাইখুল ইসলাম এখানে তা পুনরাবৃত্তি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ফিতনার সময় ছাহাবীদের মধ্যে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল শাইখুল ইসলাম সেগুলোর ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। ছাহাবীদের দিকে যেসব দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধ করা হয় এবং তাদের নামে যেসব কুৎসা রটানো হয়, ইসলামের শত্রুরা সেগুলোকে ছাহাবীদের বিরুদ্ধে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট করার সুযোগ খুঁজেছে। যেমন করেছে পরবর্তী যুগের কিছু আলিম এবং সমসাময়িক কতিপয় লেখক, যারা নিজেদেরকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের মধ্যে ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করেছে এবং বিনা দলীলে কারো পক্ষ

---

২৬১. সুতরাং যে ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন এবং আওলীয়াদের সর্দারদের ব্যাপারে অন্তরে হিংসা রাখবে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? শুধু তাই নয় এই উম্মতের মধ্য হতে যারা ছাহাবীদেরকে ঘৃণা করবে তারা ইয়াহূদী এবং নাসারাদের চেয়েও নিকৃষ্ট। ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তারা বলল: মূসার ছাহাবীগণ। নাসারাদেরকে বলা হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সর্বশ্রেষ্ঠ? উত্তরে তারা বলল: ঈসা ইবনে মারইয়ামের সাথী হাওয়ারীগণ। শিয়াদের একটি দল রাফেযীদেরকে বলা হলো, তোমাদের ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কারা সবচেয়ে নিকৃষ্ট? উত্তরে তারা বলল: মুহাম্মাদের ছাহাবীগণ (নাউযুবিল্লাহ)। (দেখুন: শরহুল আক্বীদাহ আত্ তাহাবীয়া)

নিয়ে তাকে হকপন্থী বলেছে আবার কারো বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে তাকে ভ্রান্ত বলেছে। বরং তারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং ঐসব মতলববাজ ও সুবিধাবাদীদের অন্ধ অনুসরণ করেই এরূপ করেছে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে ও চক্রান্তে লিপ্ত। এর মাধ্যমে তারা মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের ব্যাপারে তাদেরকে সন্দিহান করে তুলতে চায় এবং তাদের সামনে সালাফে সালেহীনদের ঐসব লোকের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে দিতে চায়, যারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ কাজের পিছনে তাদের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা হলো ইসলামের বিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতায় আঘাত করা এবং মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরানো।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এখানে অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় সত্যকে প্রকাশ করেছেন এবং প্রকৃত ঘটনাকে খোলাসা করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন যে, ছাহাবীদের দিকে যেসব কথা সম্বন্ধ করা হয় এবং তাদের মধ্যে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা (ফিতনা, দলাদলি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) হয়েছে, সে ব্যাপারে তিনি দু'টি কথার মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব খোলাসা করেছেন।

এক. তিনি বলেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ছাহাবীদের মধ্যে সংঘটিত বাদানুবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে নিরব থাকে। অর্থাৎ তারা সে ব্যাপারে ঘাটাঘাটি করে না এবং তাতে খোঁজাখুঁজিও করে না। কেননা তাতে বেশী খোঁজাখুঁজি ও ঘাটাঘাটি করতে গেলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ ও হিংসা জন্ম নিতে পারে। আর ছাহাবীদের প্রতি অন্তরে হিংসা রাখা বড় ধরণের গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নিরবতা পালন করা এবং সে বিষয়ে কথা না বলাই তা থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র পন্থা।

দুই. তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনায় যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, শাইখুল ইসলাম সেগুলোর জবাব দিয়েছেন। ছাহাবীদের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে এবং তাদের শত্রুদের চক্রান্তকে প্রতিহত করার জন্যই তিনি তা করেছেন। শাইখুল ইসলামের জবাবগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১) যেসব হাদীছে তাদের দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কিছু মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা রয়েছে। ছাহাবীদের সুনাম নষ্ট করার জন্য তাদের দুশমনরা এসব হাদীছ রচনা করেছে। যেমন করে থাকে রাফেযীরা। আল্লাহ তা'আলা তাদের চেহারা কালো করুন! সুতরাং তাদের মিথ্যা বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি দেয়া যাবে না।

(২) এসব দোষ-ত্রুটি সম্বলিত বর্ণনার কোনটিতে সংযোজন করা রয়েছে, কোনটি হতে কিছু অংশ বিয়োজন করা হয়েছে আবার কোনটিকে সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এগুলোর মধ্যে মিথ্যা প্রবেশ করেছে এবং বর্ণনাগুলো বিকৃত করা হয়েছে। তাই এগুলোর উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা

ছাহাবীদের ফযীলত ও মর্যাদা সর্বজন বিদিত এবং তাদের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত। সুতরাং বিকৃত ও সন্দিহান বিষয়ের পিছনে পড়ে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত বিষয়কে পরিত্যাগ করা যাবে না।

(৩) ছাহাবীদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনার হাদীছগুলো থেকে যা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান হলো, তাতে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত। কেননা তারা ইজতেহাদ করেছিলেন। সুতরাং ইজতেহাদ করতে গিয়ে হয় তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন আর না হয় ভুল করেছেন। মূলতঃ ইজতেহাদের বিষয়টি এমন যে, মুজতাহিদগণ কখনো ভুল করে থাকেন আবার কখনো সঠিক সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়ে থাকেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ছাহাবীদের যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, তা ছিল এমন ইজতেহাদী বিষয় সমূহে, যাতে মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে দু'টি ছওয়াব পায় এবং ভুল করলেও একটি নেকী পায়।

ছ্বহীহ বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা ও আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». (بخارى:٧٣٥٢)

"কোন বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। পক্ষান্তরে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হলে তার জন্যও একটি পুরস্কার রয়েছে"।[২৬২]

(৪) ছাহাবীগণ মানুষ ছিলেন। সুতরাং বনী আদমের অন্যান্য মানুষ দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব, তাদের দ্বারাও তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিশ্বাস করে না যে, ছাহাবীদের প্রত্যেকেই কাবীরা ও সগীরা গুনাহ থেকে নিষ্পাপ। বরং তাদের কারো কারো দ্বারা গুনাহর কাজ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদের দ্বারা কোন গুনাহ হয়ে থাকলেও গুনাহ মোচনের অনেক আমল রয়েছে। নিম্নে তা থেকে কিছু আমল বর্ণনা করা হলো:

(ক) ইসলাম গ্রহণে তাদের অগ্রগামিতা সহ এমনসব ফযীলত রয়েছে, যার দাবী হলো, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে থাকলেও তা ক্ষমাযোগ্য। সুতরাং তাদের কারো দ্বারা যে ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তার অগণিত সৎ আমল থাকার কারণে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে গেছে। যেমন এসেছে হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনায়।

---

২৬২. ছ্বহীহ বুখারী ৭৩৫২, ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৬।

মক্কা বিজয়ের বছর তার পক্ষ হতে একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল। তিনি যেহেতু বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।[২৬৩] এমনকি ছাহাবীদের এমন গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যা পরবর্তীতে আগমনকারীদের বেলায় মাফ করা হবে না। কেননা তাদের রয়েছে এমন অনেক সৎ আমল, যা পরবর্তীদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। সুতরাং ছাহাবীদের এ সৎকর্মগুলো তাদের দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾

"সৎ কাজ অবশ্যই গুনাহসমূহকে দূর করে দেয় *(সূরা হুদ ১১:১১৪)*।

(খ) অন্যদের তুলনায় ছাহাবীদের সৎআমল বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফযীলতের ক্ষেত্রে কেউ ছাহাবীদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, ছাহাবীগণই ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাদের পরবর্তী যুগের কোন মুসলিম উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করলেও সে ছাহাবীদের কারোর একমুষ্টি পরিমাণ খাদ্য দান করার সমান ছওয়াব পাবে না।[২৬৪] বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

خَيْرُ القرون قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

---

২৬৩ . হাতেব ইবনে আবু বালতাআর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তখন বিশেষ উদ্দেশ্যে আক্রমণের বিষয়টি ছাহাবীদেরকে গোপন রাখতে বললেন। কিন্তু ছাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতাআ শুধু তার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গোপন সামরিক তথ্য শত্রুদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মক্কাবাসীদেরকে রসূলের উদ্দেশ্য জানিয়ে তিনি একটি চিঠি লিখে একজন মহিলার মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে হাতেবের এই কর্মের কথা জানতে পেরে সাথে সাথে কয়েকজন ছাহাবীকে চিঠিটি উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। তারা রাওযায়ে খাক নামক বাগানে মহিলাকে পাকড়াও করে চিঠি উদ্ধার করেন। এরপর হাতেবকে ডেকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠির বিষয়ে তার সাথে কথা বললেন। হাতেব বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কেবল আমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করার জন্যই এমনটি করেছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বলেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি তার গর্দান উড়িয়ে ফেলি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের মন যা চায় করতে পারো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

২৬৪. ছ্বহীহ বুখারী ৩৬৭৩, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৪০-৪১।

"আমার উম্মতের মধ্যে আমার যুগের মানুষেরা সর্বোত্তম। অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা, অতঃপর পরবর্তী যুগের লোকেরা"।[২৬৫]

القرون শব্দটি القرن এর বহুবচন। القرن বলা হয় একই যুগের বা কাছাকাছি যুগের এমন একদল মানুষকে, যারা বিশেষ কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কাজে অংশগ্রহণ করে। নির্দিষ্ট মেয়াদী একটি সময়কেও কার্ন বলা হয়।

(গ) তাদের কাছে গুনাহ মোচনের অনেক কাফ্ফারা এবং উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে, যা অন্যদের কাছে নেই। তাদের কারো দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকলেও তা থেকে তিনি তাওবা করেছেন অথবা এমন সৎ আমল করেছেন, যা তার ভুল-ত্রুটিকে মিটিয়ে দিয়েছে অথবা সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ ও সৎকর্মে অগ্রগামী হওয়ার কারণে তার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ গুনাহটি করার পূর্বে সে যত সৎ আমল করেছে, সেগুলোর তুলনায় গুনাহটি খুব নগণ্য হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিংবা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআতের দ্বারা তার সে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অথবা দুনিয়াতে তাকে কোন মুছীবতে ফেলা হয়েছে, যার কারণে উক্ত মুছীবত তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাকে পরীক্ষা ও মুছীবতে ফেলা হয়েছে। অতঃপর সেই গুনাহ উক্ত মুছীবতে ফেলে কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। যেমন ছ্বহীহ হাদীছে এসেছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»

"মুসলিম কোন ক্লান্তি, কষ্ট, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, নির্যাতন ও বিষণ্নতার শিকার হলে, এমনকি কাঁটাবিদ্ধ হলেও এর বদলে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দেন"।[২৬৬] ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং মুছীবতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সাধারণ মুমিনদের গুনাহ মাফ হলে ছাহাবীগণ তাতে পতিত হয়ে ক্ষমা পাওয়ার আরো বেশী হকদার হবেন।

সুতরাং ছাহাবীদের দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি নিশ্চিতভাবেই হয়েছে, তার ব্যাপারটি যদি এমন হয় যে, সৎকাজ থাকার কারণে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাহলে ঐসব গুনাহ কেন ক্ষমা করা হবে না, যাতে তারা মুজতাহিদ ছিলেন।

---

২৬৫. ছ্বহীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪।

২৬৬. ছ্বহীহ বুখারী ৫৬৪১।

শরী'আতের হুকুম জানার জন্য শ্রম ব্যয় করাকে الاجتهاد বলা হয়। মুজতাহিদগণ যদি ইজতেহাদ করতে গিয়ে সঠিক সিদ্বান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে তাদের দু'টি নেকী হবে আর ভুলের মধ্যে পড়ে গেলে একটি নেকী হবে। আর মুজতাহিদের ভুল ক্ষমা করে দেয়া হবে। যেমন একটু পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং ছাহাবীদের থেকে যে সামান্য পরিমাণ ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তাতে দু'টি অবস্থার একটি অবস্থা হতে পারে।

(১) হতে পারে ছাহাবী ইজতেহাদ করতে গিয়ে ভুলটি করে ফেলেছেন। তাতে তিনি বিনিময় প্রাপ্ত হবেন এবং তার ভুলটি মাফ করে দেয়া হবে।

(২) এও হতে পারে যে, গুনাহটি ইজতেহাদে ভুল করার কারণে হয়নি; এমনিতেই হয়েছে। কিন্তু তার কাছে এত বিশাল পরিমাণ আমলে সালেহ, অগণিত ফযীলত এবং সৎকাজে অগ্রগামিতা রয়েছে, যা তার গুনাহর কাফফারা হয়ে গেছে এবং গুনাহকে মিটিয়ে দিয়েছে।

মোট কথা, ছাহাবীদের দ্বারা যে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে, তা তাদের বিশাল বিশাল সৎকাজের তুলনায় খুবই কম। পূর্বে যদিও তা বর্ণনা করা হয়েছে, তারপরও এখানে সংক্ষিপ্তাকারে তাদের ফযীলত ও সৎকর্মগুলো পুনরাবৃত্তি করা হলো:

(১) আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূলের প্রতি ছিল তাদের অগাধ বিশ্বাস। এটি ছিল তাদের সর্বোত্তম আমল।

(২) তারা আল্লাহ তা'আলার কালেমাকে সুউচ্চ আসনে আসীন করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় সর্বোত্তম জিহাদ করেছেন। আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো এই জিহাদ।

(৩) তারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছেন। এটিও ইসলামের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আমল।

(৪) তারা আল্লাহর দীনের সাহায্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

﴿ وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

"আর প্রস্তুত থাকে আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য। এরাই হলো সত্যবাদী" *(সূরা আল হাশর ৫৯:৮)।*

(৫) তাদের রয়েছে উপকারী ইলম এবং সৎআমল।

(৬) তারা নাবীদের পরে আল্লাহ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা। উম্মতে মুহাম্মাদী হলো সর্বোত্তম উম্মত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে মানুষের জন্য" *(সূরা আলে ইমরান ৩:১১০)।*

আর ছাহাবীগণ হলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম মানুষ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলেন আমার যুগের লোকগণ, অতঃপর পরবর্তীগণ।[২৬৭]

(৭) ছাহাবীগণ হলেন শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্য হতে বাছাইকৃত এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি।

যেমন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

"তোমাদের দ্বারা বড় বড় উম্মাতের সংখ্যা সত্তরে পরিণত হয়েছে। তোমরা তাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত"।[২৬৮] *ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকিম তার মুস্তাদরকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।*

২৬৭. ছ্বহীহ বুখারী ২৬৫১-৫২, ৩৬৫০-৫১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৩৩-৩৪।

২৬৮. হাসান: মুসনাদে আহমাদ ২০০১৫। ইমাম তিরমিযী ৩০০১, ইবনে মাজাহ ৪২৮৮ এবং হাকেম তার কিতাব মুস্তাদরেকে (৬৯৮৭) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

مذهب أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء

কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব[২৬৯]

২৬৯. অলীদের কারামতের মাসআলাটি আক্বীদাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা তার অলীকে সাহায্য ও শক্তিশালী করা, তার ঈমানকে সুদৃঢ় করা অথবা দীনের সাহায্য করা ও কাফির-মুশরিকদেরকে পরাজিত করার জন্য আউলীয়াদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন। অলীদের সম্মান ও ফযীলত বৃদ্ধি করার জন্যও কারামত প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার দীনের সাহায্য এবং কাফির মুশরিকদেরকে পরাজিত করার জন্য যেসব কারামত প্রকাশ করেন তার মধ্যে আলা ইবনুল হাযরামীর ঘটনাটি অন্যতম। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফাতকালে একদল সৈনিক নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। শত্রু ও তার বাহিনীর মধ্যে একটি সাগর অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে সাগরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। সাগর পার হয়ে তিনি শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করে ফেরার পথে পুনরায় আল্লাহর কাছে দু'আ করে মুসলিম বাহিনী নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পার হলেন। (দেখুন আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬/১৬২)

আবু মুসলিম খাওলানীর কারামাতটিও এ প্রকারের মধ্যে গণ্য। আবু মুসলিমের ঘটনার বিবরণ এই যে, ভন্ড নাবী আসওয়াদ আনাসী আবু মুসলিম খাওলানীকে ডেকে নিয়ে বলল, তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রসূল? আবু মুসলিম বললেন, আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আসওয়াদ আনাসী পুনরায় বলল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? আবু মুসলিম বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আবু মুসলিমকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছ্বলাত পড়তে লাগলেন। ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ন্যায় আগুন তার জন্য ঠান্ডা হয়ে গেল। তার শরীরের একটি পশমও পুড়ল না। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এই ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

মাদায়েন (পারস্য) অভিযানের সময় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। জলযান ছাড়াই তিনি এবং তার সৈনিকগণ দিজলা নদী পার হয়েছিলেন। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটি উল্লেখিত হয়েছে। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালে মুসলিমগণ সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে যখন ইরাকের মাদায়েন অঞ্চলের পূর্বাংশ তাইসুন তথা পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদ জয় করার জন্য অগ্রসর হলো, তখন দিজলা নদী তাদের অগ্রযাত্রার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। ঐদিকে দিজলা নদীর পানিও তখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর অভিযানের খবর পেয়ে দিজলার পূর্ব তীরে অবস্থিত তাইসুন অঞ্চলের অধিবাসীরা নদী থেকে সকল নৌযান ও ফেরী উঠিয়ে নিলো এবং পারাপারের সমস্ত পুল ও সেতু ধ্বংস করে ফেলল। এতে করে দিজলা পার হওয়ার মত কোন উপকরণই আর মুসলিমদের জন্য অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং মুসলিম অশ্বারোহীগণ আল্লাহ তা'আলার করুণা ও রহমত থেকে নিরাশ হলো না। মাদায়েন (পারস্য) বিজয়ের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণীতে তারা পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলো। তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তাদের হাতেই সেই ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়ন হবে এবং পারস্য বিজয় হবে। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সে সময় স্বপ্নে দেখলেন যে, তার সৈনিকরা দিজলাতে ঝাপিয়ে পড়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে এবং আল্লাহ তা'আলার উপর ভালো ধারণা পোষণ করে তিনি নদীর উপর ঘোড়া ছুটানোর ইচ্ছা

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّة: التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاءِ وما يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِم مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ وَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ فِرَقِ الأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর অন্যতম মূলনীতি হলো অলীদের কারামাত এবং আল্লাহ তা'আলা তার অলীদের নিকট অলৌকিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বহির্ভূত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তা'আলা তার অলীদের নিকট বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান ও কাশ্‌ফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তার

পোষণ করলেন। তার আগে তিনি বিষয়টি মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে পেশ করলেন। সৈনিকরা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে পূর্ণ আস্থা রেখে বললো, আল্লাহ আপনাকে এবং আমাদেরকে সঠিক পথই দেখিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা করেছেন, তাই করুন।

ঐদিকে রাতের বেলায় হঠাৎ করে মুসলিম সৈনিকদের চোখে দিজলার পূর্ব তীরে অবস্থিত পারস্য সম্রাটের সাদা প্রাসাদটি চকচক করে ভেসে উঠেছিল। তখন তারা দিজলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থান করছিলো। পারস্য সম্রাটের সাদা রাজপ্রাসাদ দেখে আল্লাহু আকবার ধ্বনীতে তারা তাদের আশপাশের অঞ্চলকে মুখরিত করে তুলল। তারা বলতে লাগল, এই তো পারস্য সম্রাট কিসরার সাদা রাজ প্রাসাদ। আল্লাহ তা'আলা এবং তার রসূল ওয়াদা করেছেন যে, ইহা আমাদের হস্তগত হবে। এই বলে তারা সমগ্র রাত তাকবীর পাঠ করতে করতে কাটিয়ে দিলো। অতঃপর সা'দ তার সৈনিকদেরকে নদীতে ঘোড়াসহ ঝাপ দেয়ার অনুমতি দিলেন। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, তারা যেন নদীতে ঝাপ দেয়ার সময় এই কথাগুলো পাঠ করে,

نستعين بالله ونتوكَّل عليه حسبُنا الله ونعم الوكيل لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله العليِّ العظيم

সৈনিকরা ইহা পাঠ করতে করতে নদীতে ঝাপ দিল। স্বয়ং সা'দও ঝাপ দিলেন। সেসময় সালমান ফারসী পানির উপর দিয়ে সা'দের সাথে চলছিলেন। সা'দ তখন বলছিলেন,

حسبنا الله ونعم الوكيل واللهِ لينصرنَّ الله وليه وليظهرنَّ دينه وليهزمن عدوَّه إن لم يكن في الجيش بغيٌ أو ذنوب تغلب الحسنات

মোটকথা, মুসলিম সৈনিকরা দিজলাতে ঝাপ দিল। পানির উপর দিয়ে ঘোড়া তাদেরকে নিয়ে চলল এবং সৈনিকদের সকলেই নিরাপদে পার হয়ে গিয়ে মাদায়েন জয়ের মাধ্যমে পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ, তার রাজমুকুট এবং সেখানকার ধনভান্ডার অধিকার করলো। এর মাধ্যমে খন্দকের যুদ্ধের সময় নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীদেরকে পারস্য সাম্রাজ্য এবং সেখানকার ধনভান্ডার দখল করার যেই ওয়াদা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হলো। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। **(ঘটনার সূত্র:** তারীখে তাবারী, বালাযুরী, উস্‌দুল গাবা, তারীখে বাগদাদ, ইসাবা ইত্যাদি)

ক্ষমতা[২৭০] ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।

---

২৭০. আল্লাহর নাবী সুলায়মান আলাইহিস সালাম 'সাবা'র রাণী বিলকীসের কাছে চিঠি লিখলেন, তুমি আত্মসমর্পন করে আমার কাছে চলে আসো। চিঠি পেয়ে সে প্রথমে সুলায়মানকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালো এবং তাকে এগুলো দিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইলো। কিন্তু সুলায়মান আলাইহিস সালাম যখন উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং আত্মসমর্পন করে চলে না আসার ভয়াবহ পরিণতির কথা জানিয়ে দিলেন তখন সে দলবলসহ সুলায়মানের কাছে চলে আসার জন্য রওয়ানা দিল। রওয়ানা হওয়ার আগে সে তার সিংহাসনকে একটি সুরক্ষিত স্থানে রেখে দিল। সুলায়মান আলাইহি সালাম ইহা জানার পর বললেন, কে আছে বিলকীস আত্মসমর্পন করে এখানে চলে আসার আগেই তার সিংহাসনকে আমার সামনে হাযির করতে পারবে? তখন জিনদের মধ্য হতে শক্তিধর এক দানব বলল, আপনি এই মজলিস ত্যাগ করার আগেই তা এনে দিবো। সুলায়মান বললেন, আমি চাই যে আরো দ্রুত তা উপস্থিত করা হোক। তখন কিতাবের ইলমের অধিকারী একজন সৎলোক বলল, আমি আপনার চোখের পলকের পূর্বেই তাকে আপনার সামনে হাযির করবো। ইমাম সুহাইলী বলেন, সে ছিল সুলায়মান আলাইহিস সালামের খালাতো ভাই আসেফ ইবনে বারখীয়া। আল্লাহ তা'আলার অতি সুন্দর নামগুলো থেকে আসেফের ইসমে আযম জানা ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জিনদের দানব বিলকীসের সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য সময় চেয়েছিল। সুলায়মানের মজলিস শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময়। তা সম্ভবত এক ঘন্টা বা কয়েক ঘন্টা হতে পারে। দানব এই সময়ের মধ্যে সেখানে যেত। সেখানে গিয়ে সিংহাসনটি উঠিয়ে নিয়ে আসতো। কিন্তু সুলায়মান তাকে এত সময় দিলেন না। আরো দ্রুত আনতে চাইলেন। যাতে করে মহান আল্লাহর অতুলনীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাই আসেফ চোখের পলকের মধ্যে সেটি হাযির করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তা এনে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের মাধ্যমে এভাবেই তার অসীম ক্ষমতা থেকে কিছু কিছু ক্ষমতা প্রকাশ করেন। বিলকীসের দেশে গিয়ে সিংহাসন উঠিয়ে আনার প্রয়োজন হলো না। কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إن الله على كل شيئ قدير নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কোন কিছুই কঠিন নয়। তার সকল কাজ শুধু কাফ ও নূন অক্ষরের মাঝখানে। অর্থাৎ শুধু كن শব্দের দু'টি অক্ষরের মাঝখানে। এমনকি তা বলে শেষ করার আগেই তা হয়ে যায়।

এখানে ঐ লোকের ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ তা'আলা যার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন। একশ বছর পর্যন্ত সে মৃত অবস্থায় ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার অসীম কুদরতের কিছু সেই লোককে দেখানো এবং তার ঈমান মজবুত করার জন্য একশ বছর পর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন। সেই সাথে তাকে এর মাধ্যমে সম্মানিত করা এবং অন্যদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ করাও উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারা ২৫৯ নং আয়াতে এই লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ

পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামাত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামাতের কথা বর্ণনা করেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।

সে সাথে এ উম্মাতের প্রথম যুগে ছাহাবী, তাবেয়ী[২৭১] এবং পরবর্তীতে আগমনকারী উম্মাতের সকল ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামাতের কথা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এ উম্মাতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত কারামাত প্রকাশ অব্যাহত থাকবে।

يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই ব্যক্তিকে দেখো যে এমন একটি লোকালয় অতিক্রম করেছিল, যার গৃহের ছাদগুলো উপুড় হয়ে পড়েছিল। সে বললো, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জনবসতি! একে আল্লাহ আবার কিভাবে জীবিত করবেন? এ কথায় আল্লাহ তার প্রাণ হরণ করলেন এবং সে একশ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। তারপর আল্লাহ পুনর্বার তাকে জীবন দান করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো, তুমি কত বছর এখানে পড়েছিলে? সে জবাব দিল, এই তো এক দিন বা একদিনের চেয়েও কম। আল্লাহ বললেন, "বরং একশটি বছর এই অবস্থায় তোমার উপর দিয়ে চলে গেছে। এবার নিজের খাবার ও পানীয়ের উপর দৃষ্টি দাও। দেখো, এগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে তোমার গাধাটিকে দেখো। এটা আমি এ জন্য করেছি যে, মানুষের জন্য তোমাকে আমি একটি নিদর্শন হিসেবে দাঁড় করাতে চাই তুমি এর হাড়সমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে একে উঠিয়ে খাড়া করি এবং এর গায়ে গোশত ও চামড়া লাগিয়ে দেই। এভাবে সত্য যখন তার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি, আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান"।

এ ব্যক্তির নাম সম্পর্কে একাধিক কথা পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন সে ছিল বনী ইসরাঈলের হিযিকীল। আবার কেউ বলেছেন, উযায়ের আলাইহিস সালাম। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন।

২৭১. নাখঈ গোত্রের একজন লোকের গাধা রাস্তায় মারা গেল। সাথীরা তাকে বলল, তোমার আসবাবপত্র নিয়ে আসো। আমরা আমাদের বাহনের উপর বহন করবো। তুমিও আমাদের সাথে আরোহন করো। কিন্তু এতে সে রাজী হলো না। সাথীরা তাকে রেখেই চলে গেল। সাথীদের চলে যাওয়ার পর সে উযূ করে দু'রাকআত ছ্বলাত পড়ে গাধার মাথার কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলো যে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় বের হয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই মৃতকে জীবিত করে থাকো এবং তুমি নিশ্চয়ই মৃতদেরকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আজ কারো অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী করো না। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে, তুমি আমার গাধাটিকেই জীবিত করে দাও। অতঃপর গাধাটি তার দু'কান নাড়াতে নাড়াতে দাঁড়িয়ে গেল। গাধায় আরোহন করে সে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়ে সাথীদের সাথে মিলিত হলো। উল্লেখ্য যে, এটি ছিল উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালের ঘটনা। (ঘটনার সূত্রঃ বায়হাকী, তাযকিরাতুল হুফফায, বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইত্যাদি)

.....

ব্যাখ্যা: كرامات শব্দটি كرامـــة শব্দের বহুবচন। আল্লাহ তা'আলা তার অলীদের হাতে অলৌকিক ও অসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করেন, তারা তাতে বিশ্বাস করে। **সুতরাং প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে যা সংঘটিত হয়, তাই কারামত।** অর্থাৎ মানুষের নিকট পরিচিত ও চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম যা সংঘটিত হয়, তাই কারামত। أولياء শব্দটি ولي শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক মুমিন মুত্তাকীই আল্লাহর অলী। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾

"মনে রেখো যে, আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই। আর তারা বিষণ্নও হবে না। তারা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে" *(সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩)*

الولاء শব্দ থেকে অলী শব্দটি নির্গত হয়েছে। আর الولاء অর্থ ভালোবাসা অর্জন করা ও নৈকট্য হাসিল করা। **সুতরাং আল্লাহ তা'আলার পছন্দ এবং মর্জি মুতাবেক কাজ করে তার নৈকট্য হাসিলের মাধ্যমে যে মুমিন মুত্তাকী আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করেছে, সেই আল্লাহর অলী।**

অলীদের কারামাত সত্য। আল্লাহ তা'আলার কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা অলীদের কারামত সত্য বলে প্রমাণিত। অলীদের কারামতের ব্যাপারে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে।

প্রথম প্রকার: বিদ'আতীদের একটি দল অলীদের কারামত অস্বীকার করে। যেমন মু'তাযিলা, জাহমীয়া এবং আশায়েরাদের কিছু লোক কারামত অস্বীকার করে। তাদের দলীল হলো অলীদের হাতে যদি কারামত প্রকাশিত হওয়া জায়েয হয়, তাহলে যাদুকরের সাথে অলীর অবস্থা মিলে যাবে এবং নাবীদের থেকে অলীদেরকে পার্থক্য করা অসম্ভব হবে। কেননা মুজেযার মাধ্যমেই নাবী এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাধারণ ও চিরাচরিত প্রথার বাইরে যা বের হয়, তার নামই মুজেযা।

দ্বিতীয় প্রকার: সুফী তরীকার লোকেরা এবং কবর পূজারীরা কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। তারা মানুষের সাথে মিথ্যা বলে এবং তাদেরকে শয়তানের তেলেসমাতি দেখায়। যেমন আগুনে ঝাপ দেয়া, নিজেদের শরীরে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা, বিষাক্ত সাপ ধরে ফেলা ইত্যাদি। এমনি কবর পূজারীদের আরো অনেক কাজ-কর্মকে তারা কারামত নাম দিয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকার: শাইখুল ইসলাম তৃতীয় আরেক প্রকার লোকদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তারা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। তারা অলীদের কারামতে বিশ্বাস করে এবং কুরআন সুন্নাহর দলীল মুতাবেক তাকে সাব্যস্ত করে। নাবীদের সাথে অন্যদের সাদৃশ্য ঠেকানোর দোহাই দিয়ে যারা কারামত অস্বীকার করে, তাদের জবাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে থাকে যে, নাবীদের মাঝে এবং অন্যদের মধ্যে কারামত ছাড়াও আরো অনেক বিষয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অলী কখনো নবুওয়াতের দাবী করে না। যদি নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে সে অলী হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারে পরিণত হয়; সে তখন আর অলী থাকে না। আল্লাহ তা'আলার অন্যতম রীতি হলো, তিনি নবুওয়াতের দাবীদারকে অপদস্ত করেন। যেমন অপদস্ত হয়েছিল মুসাইলামা কায্যাব এবং অন্যরা।

আর যারা কারামত সাব্যস্ত করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করে এবং ভেলকিবাজ ও মিথ্যুকদের জন্যও তা সাব্যস্ত করে তাদের জবাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বলে যে, আসলে তারা আল্লাহর অলী নয়; বরং শয়তানের অলী। তাদের হাতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা হয়তো মিথ্যা ও ধোঁকাকাবাজি অথবা তাদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ফিতনা স্বরূপ। অথবা তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে ধীরে ধীর পাকড়াও করবেন। এই বিষয়ে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) এর একটি মূল্যবান কিতাব রয়েছে। কিতাবটির নাম: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (আল্লাহর অলী এবং শয়তানের অলীদের মধ্যে পার্থক্য)।

আল্লাহ তা'আলা অলীদের হাতে বিভিন্ন প্রকার ইলম ও কাশ্‌ফ থেকে যা প্রকাশ করেন এবং তার ক্ষমতা ও প্রভাব থেকে তাদের মাধ্যমে যা কিছু প্রকাশ করেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে: এখানে শাইখুল ইসলাম ইঙ্গিত করেছেন যে, কারামতের কিছু অংশ ইলম ও কাশফের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অলীগণ এমন কিছু শুনলেন যা অন্যরা শুনলোনা কিংবা তারা এমন কিছু দেখলেন, যা অন্যরা দেখেনি। এটি জাগ্রত অবস্থায় হতে পারে কিংবা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা অলীগণ এমন কিছু জানতে পারলেন, যা অন্যরা জানতে পারল না। আবার কারামতের কিছু অংশ কুদরত ও ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

প্রথম প্রকারের উদাহরণ হলো, যেমন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর উক্তি يا سارية الجبل হে সারিয়া! পাহাড়ে আশ্রয় নাও।[২৭২] এ কথা বলার সময় তিনি মদীনার মিম্বারে দাঁড়িয়ে

২৭২. সিলসিলাহ ছ্বহীহা হা/ ১১১০।

জুম'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। আর সারিয়া ছিল পূর্বের কোন একটি অঞ্চলে।[২৭৩] আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন যে, তার স্ত্রীর পেটে কন্যা সন্তান রয়েছে।[২৭৪] উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

---

২৭৩. সারিয়ার সাথে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কারামাতের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদল সৈনিক পাঠালেন এবং সারিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনার মিম্বারে জুমআর দিন খুৎবারত অবস্থায় ইয়া সারিয়াতা! আল-জাবালা ইয়া সারিয়াতা! আল-জাবালা বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন। সৈনিকরা এই ডাক শুনে আশ্চর্যবোধ করলেন। তারা মদীনায় এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করতে গেলে তারা আমাদেরকে পরাজিত করে ফেলে। আমরা প্রায় ধ্বংস হয়েই গিয়েছিলাম। তখন আমরা একজন লোককে চিৎকার করে বলতে শুনলাম, ইয়া সারিয়াতা! আল-জাবাল। অর্থাৎ হে সারিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নাও। আওয়াজটি আপনার আওয়াজের মতোই মনে হচ্ছিল। এতে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। শত্রুদের আক্রমণের কবল হতে নিরাপদ হলাম। আল্লাহ তা'আলা শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, তার জন্য সারিয়ার অবস্থা উন্মুক্ত করা হয়েছিল। তাই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সারিয়াকে শত্রুরা ঘেরাও করে ফেলেছে। তিনি তাকে এই বলে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিতে বলেছেন যে, يا سارية! الجبل হে সারিয়া! পাহাড়ে উঠে যাও। সারিয়া তা শুনেছে এবং পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন। (মাজমূআ ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া, ১১/২৭৮)

২৭৪ . মুয়াত্তা মালিক ৪০, বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একাধিক কারামত থাকার কথা জানা যায়। শাইখ ড. ছুলিহ ইবনে ফাওযান আক্বীদাহ ওয়াসেত্বীয়ার ব্যাখ্যায় এখানে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একটি কারামতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে গাবা নামক স্থানের খেজুরের বাগান থেকে বিশ ওয়াসাক খেজুর কেটে নিতে বললেন। কিন্তু এরই মধ্যে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যু শয্যায় উপনীত হলেন। তখন তিনি তার কন্যা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ডেকে এনে শয্যা থেকে উঠে বসলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও তার গুণাবলী বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি বললেন,

وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا من مالي فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الْأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً

"হে আমার মেয়ে! আল্লাহর শপথ! মানুষের মধ্যে আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। আমার পরে তোমার চেয়ে অন্য কেউ অধিক অভাবমুক্ত থাকবে, আমি এই কামনা করি না। আর আমার পরে তুমি অভাবী থাকলে আমার যত কষ্ট লাগবে, অন্য কারো অভাবে আমি তত কষ্ট অনুভব করবো না। আমি তোমাকে আমার বাগান থেকে বিশ ওয়াসাক খেজুর কেটে নিতে বলেছিলাম। তুমি যদি তখনই তা পেড়ে নিতে এবং নিজের দখলে নিয়ে নিতে, তাহলে তা তোমারই হয়ে যেত। কিন্তু আজ সেই মাল ওয়ারিছদের মালে পরিণত হয়েছে। তোমার রয়েছে দুইজন ভাই এবং দুইজন বোন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ ভাগ করে নাও। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন বললেন, হে আমার পিতা! তাই যদি হয়, তাহলে আপনি আমাকে

যা দিয়েছেন, তা অবশ্যই ফেরত দিবো। তবে কথা হলো, আমার ভাই দুইজন, তা তো আমার জানা আছে। আর আমি এবং আমার বোন আসমা ব্যতীত অন্য কোন বোন তো দেখছি না। সুতরাং অন্য (তৃতীয়) বোন্‌টি কে? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, আমার স্ত্রী হাবীবা বিনতে খারেজার পেটে যে সন্তান রয়েছে, তার ব্যাপারে আমার ধারণা হলো সেটি কন্যা হবে।

উল্লেখ্য যে, হাবীবা বিনতে খারেজা ছিলেন আবু বকরের স্ত্রী। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। আবু বকরের মৃতুর পর তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। এই কন্যার নাম রাখা হলো উম্মে কুলছুম। তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ তাকে বিবাহ করেন।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের ধারণাকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং সন্তান প্রসব করার পূর্বে তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন যে, তার স্ত্রী মেয়ে সন্তান প্রসব করবেন। তা হুবহু বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এটিকে তার কারামত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

এখানে আরেকটি কথা বলে রাখা দরকার যে, আবু বকরের এই সংবাদ প্রমাণ করে না যে, তিনি গায়েব জানতেন। ইলমে গায়েব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। তবে আল্লাহ তা'আলা তার অলীদেরকে দীনি ইলম এবং অন্যান্য বিষয় থেকে এমন কিছু জানান, যা অন্য কাউকে জানান না। বলা হয়ে থাকে যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, তার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে। তাই তিনি ধারণা করে বলেছিলেন যে, তার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তার সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তার জন্য তাকে কারামত হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন।

এখানে আরেকটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, হাদীছের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর রেখে যাওয়া সম্পদ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সঠিকভাবে বণ্টন করার জন্য তার মোট পুত্র ও কন্যা সন্তানদের সংখ্যা জানার প্রয়োজনও ছিল। আল্লাহই অধিক অবগত রয়েছেন। (দেখুন: মুআত্তা ইমাম মালেক, ইস্তেযকার, শারহু মা'আনীল আছার, ইরওয়াউল গালীল ইত্যাদি)

আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আরেকটি কারামতের কথা বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীছ থেকে জানা যায়। আব্দুর রাহমান ইবনে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আসহাবে সুফ্‌ফাগণ ছিলেন দরিদ্র মানুষ। একদা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বললেন, যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্‌ফা থেকে) তৃতীয় একজন সাথে নিয়ে যায়। এমনি যার কাছে চার জনের খাদ্য আছে সে যেন (আসহাবে সুফ্‌ফা থেকে) একজন বা দু'জনকে সাথে নিয়ে পঞ্চম বা ষষ্ট ব্যক্তি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনজনকে সাথে নিয়ে গেলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে গেলেন দশজনকে। আব্দুর রাহমান বলেন, সে সময় আমাদের পরিবারে আমি, আমার পিতা এবং আমার মাতা ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, আব্দুর রাহমান এ কথাও বলেছেন কি না যে, আমার স্ত্রী ও খাদেম ছিল। যে খাদেমটি আমার ও আবু বকরের বাড়ীতে কাজ করত। (যাই হোক) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রাতের খাবার গ্রহণ করে সেখানেই কিছুক্ষণ দেরী করলেন। ইতিমধ্যেই ইশার ছ্বলাত পড়া হয়ে গেল। ছ্বলাত শেষে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে গিয়ে তার রাতের খানা গ্রহণ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ীতে ফিরলেন। তখন তার স্ত্রী বললেন, আপনার মেহমানদের অথবা বলেছেন, মেহমান থেকে কিসে আপনাকে আটকিয়ে রেখেছিল? অর্থাৎ বাড়ীতে মেহমান পাঠিয়ে দিয়ে এত দেরী করলেন কেন? তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি কি তাদেরকে রাতের খাবার দাওনি? তার স্ত্রী বললেন, তুমি না আসা পর্যন্ত তারা খানা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

তার সন্তানদের থেকে কে কে ন্যায়পরায়ণ হবে, তা আগেই বলে দিয়েছিলেন।[২৭৫] মূসা ও খিযির এর ঘটনায় রয়েছে যে, খিযির আলাইহিস সালাম যে ছেলেটিকে হত্যা করেছিলেন, তার অবস্থা তিনি জানতে পেরেছিলেন।

তাদের সামনে খানা পেশও করা হয়েছিল। তথাপিও তারা অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আব্দুর রাহমান বলেন, আমি তখন ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কোথাও আত্মগোপন করেছিলাম। আবু বকর রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে গুনছার (আহম্মক, বোকা, মূর্খ ইত্যাদি অর্থে)! তোমার নাক কাটা যাক এ ধরণের বাক্য দ্বারা আরো গালি গালাজ করলেন। অতঃপর মেহমানদেরকে বললেন, তোমরা খাদ্য গ্রহণ কর। তোমরা যেন পরিতৃপ্ত না হও (আল্লাহ যেন তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত না করেন)! আবু বকর শপথ করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কখনও খাবো না। আব্দুর রাহমান ইবনে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যখনই কোন লোকমা উঠাতাম নীচের দিক থেকে তার চেয়ে বেশী বৃদ্ধি হতে লাগল। তিনি বলেন, মেহমানদের সকলেই তৃপ্তি সহকারে খাদ্য গ্রহণ করার পরও প্রথমে যে খাদ্য ছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত খাদ্য রয়ে গেল। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অবশিষ্ট খাদ্যের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খাদ্য সেভাবেই অথবা আগের চেয়ে বেশী রয়ে গেছে। তাই তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, হে বনী ফেরাসের বোন! ব্যাপার কি? (মেহমানদের খাবার পরও দেখছি খানা পূর্বের চেয়ে বেশী রয়ে গেছে)। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী বললেন, আমার চক্ষু শীতলকারীর শপথ! এ খাদ্য নিঃসন্দেহে পূর্বের চেয়ে তিনগুণ অধিক। তা থেকে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খেলেন এবং বললেন, আমার শপথ ছিল শয়তানের পক্ষ হতে। এ কথা বলে তিনি আরো এক লোকমা খেলেন। অতঃপর অবশিষ্ট খাদ্য বহন করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলেন। সেগুলো সকাল পর্যন্ত নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছেই ছিল। আব্দুর রাহমান বলেন, আমাদের এবং অন্য একটি গোত্রের মাঝে চুক্তি ছিল। চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা বারোজন লোককে আলাদা আলাদা করে দিলাম। তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো অনেক লোক ছিল। আল্লাহই ভালো জানেন তাদের প্রত্যেকের সাথে কতজন করে লোক ছিল। (যাই হোক) তা থেকে তারা সকলেই খেলেন। (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬০২) উল্লেখ্য যে, খাবারে বরকত হওয়ার কারামত অন্যান্য ছাহাবীর জন্যও প্রকাশিত হয়েছিল।

আবু বকরের হাতে প্রকাশিত আরেকটি কারামত হচ্ছে, আবু যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনুসন্ধান করার জন্য মদীনার কোন বাগানে গেলাম। গিয়ে দেখলাম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন। আবু যার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলেন। আবু যার্ বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কতগুলো পাথর রাখা ছিল। তিনি সেগুলো হাতে নিলে সেগুলো তাসবীহ পাঠ করা শুরু করলো। অতঃপর তিনি তা মাটিতে রাখলে তাসবীহ পাঠ বন্ধ করে দেয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো হাতে নিয়ে আবু বকরের হাতে রাখলে আবার তাসবীহ পাঠ শুরু করে দেয়। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেগুলো মাটিতে রাখলে চুপ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, পাথর দানাগুলো উমার ও উছমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছিল। (ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস্ সুন্নাহ। ইমাম আলবানী হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন, দেখুন সিলসিলায়ে ছ্বহীহা হা/১১৪৬)

২৭৫. বাস্তবেও তাই হয়েছে। উমাইয়া খিলাফতের সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ খলীফা উমার ইবনে আব্দুল আযীয তার সন্তানদের মধ্য হতেই ছিলেন।

দ্বিতীয় প্রকার কারামতের উদাহরণ: আর কারামতের যেই প্রকার হলো ক্ষমতা ও প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত, তার উদাহরণ হলো যেমন ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল এবং চোখের পলকে বিলকীসের আরশ সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর সামনে হাযির করেছিলেন, আসহাবে কাহাফের ঘটনা।[২৭৬] মারইয়াম এর ঘটনা,[২৭৭]

---

২৭৬. পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এতে রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। তাই ঘটনাটি এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

সে যুগে কোন এক ঈদের দিন লোকগণ মূর্তি পূজার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বের হল। এতে তারা তাদের মূর্তিগুলোর নৈকট্য লাভের জন্য পশু যবাই বা অন্যান্য যা করার তাই করবে। কিন্তু তাদের সভ্রান্ত ও সম্মানিত বংশের এক যুবক মূর্তি পূজার এ মহড়া কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা যে সমস্ত কল্পিত মাবুদের উপাসনা করছিল, তা দেখে তিনি বিবেকের কাছে থমকে দাঁড়ালেন। সন্দেহ তার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার চিন্তা ও চেতনায় এক নতুন গতির সঞ্চার হল। তিনি জন সমাবেশ ত্যাগ করে চুপ করে বের হয়ে গেলেন। একটি গাছের নীচে গিয়ে পেরেশান হয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তার মতোই আরেকজন যুবক এসে তার সাথে বসে পড়লেন। তার মনেও একই সন্দেহ। এক এক করে সাতজন যুবক এসে একত্রিত হলেন। সকলের মনে প্রশ্ন একটাই। নিজ হাতে গড়া কাঠের ও পাথরের মূর্তি কি করে আমাদের মাবুদ হতে পারে? কল্যাণ অকল্যাণের ক্ষমতাই বা কোথায় পেল তারা? যিনি এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এই আকাশ-বাতাস তৈরী করেছেন, যিনি আমাদের জীবন ও মরণের একমাত্র মালিক, তাঁকে বাদ দিয়ে এগুলোর ইবাদত কি করে সম্ভব? এই সাত জনের মধ্যে কোন প্রকার রক্তের সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈমানের বন্ধনে তাদের একজন অন্যজনের সাথে আটকে গেলেন। তারা সকলেই এক বাক্যে পরস্পরের নিকট জাতির লোকদের মূর্তি পূজা ও শির্কের প্রতি মনের সন্দেহের কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর তারা মহা বিশ্বের মাঝে তাদের প্রখর দৃষ্টি ঘুরালেন। এতে তাদের অন্তরসমূহ তাওহীদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল এবং আল্লাহর মনোনিত দীনের সন্ধান পেয়ে তারা এক অনাবিল প্রশান্তি লাভ করলো। তারা সকলেই ঈমান গোপন রাখার উপর একমত হলেন। কারণ তাদের বাদশাহ ছিল মূর্তি পূজক, মুশরিক এবং শিরকের উপর প্রজাদেরকে বাধ্যকারী। তারা সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথেই বাস করতে থাকলেন। কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই যখন একাকী হন তখন আল্লাহর ইবাদতের দিকে মনোনিবেশ করেন। কোন এক রাতে তারা যখন একত্রিত হলেন, তখন তাদের একজন নীচু আওয়াজে এবং পূর্ণ সতর্কতার সাথে বললেন, হে আমার বন্ধুগণ! গতকাল আমি একটি খবর শুনেছি। এটি যদি সত্য হয়, (আমার ধারণাও তাই) তাহলে অচিরেই আমাদেরকে আমাদের দীন হতে ফিরিয়ে রাখা হতে পারে অথবা আমাদের জীবন নাশ করা হতে পারে। আমি শুনলাম, আমাদের ব্যাপারটি এখন আর বাদশাহর কাছে গোপন নয়, আমাদের দীন ও আক্বীদাহর বিষয়টি এখন তার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। যেই দীনকে আমরা হৃদয়ে গেঁথে নিয়েছি এবং যা আমাদের চিন্তা-চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে, তা এখন বিপন্ন হওয়ার পথে। সুতরাং তোমরা চিন্তা কর এবং তোমাদের সিদ্ধান্ত তোমরাই গ্রহণ কর। দ্বিতীয়জন বললেন, খবরটি আমিও শুনেছি। তবে তা মুনাফিক এবং অজ্ঞদের অপপ্রচার মনে করে উড়িয়ে দিয়েছি।

পরক্ষণেই খবরটির সত্যতা প্রমাণিত হল। তারা বললেন, আমরা আমাদের দীনের উপর অবিচল থাকবো। যে বিপদই আসুক না কেন, তা মাথা পেতে মেনে নিবো। আল্লাহর সত্য দীনকে জানার পর কোনভাবেই পূর্বের মূর্তি পূজার দিকে ফেরত যাবো না। গুজব এখন সত্যে পরিণত হল। বাদশাহ তাদের খবরটি জেনে ফেলল। তাদেরকে ঘর থেকে বের করে বাদশাহর দরবারে হাজির

করা হল। বাদশাহ বলল, তোমরা তোমাদের ব্যাপারটি গোপন রাখতে চেষ্টা করেছ। কিন্তু সফল হতে পারোনি। আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা বাদশাহ এবং তার প্রজাদের দীন ছেড়ে দিয়েছ। তোমরা এমন এক নতুন দীনে প্রবেশ করেছ, যে সম্পর্কে আমি জানি না। কোথা থেকে তা তোমাদের কাছে আগমন করেছে? আমি তোমাদেরকে কখনোই এভাবে ছেড়ে দিবো না। আমি জানি তোমরা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাই অন্যরা তোমাদের কারণে বিভ্রান্ত হতে পারে। এমন আশঙ্কা যদি না থাকত তাহলে তোমাদেরকে বাঁধা প্রদান করতাম না। যাই হোক আমি তোমাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে চাচ্ছি না। তোমরা চিন্তা করো। হয় তোমরা আমার দীনে ফিরে আসবে অন্যথায় তোমাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ মজবুত করে দিলেন। ঈমানকে শক্তিশালী করে দিলেন। তারা বললেন, হে বাদশাহ! আমরা এই দীনে কারও অন্ধ অনুসরণ করে প্রবেশ করিনি, বাধ্য হয়েও নয় এবং অজ্ঞাতসারেও নয়। আমাদের সুস্থ বিবেক ও ফিতরাত আমাদেরকে ডাক দিয়েছে। আমরা সেই ডাকে সাড়া দিয়েছি। বিবেক আমাদেরকে আলোকিত করেছে। তার আলোতেই আমরা চলছি। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। আমরা তাকে ছাড়া আর কাউকেই ডাকবো না। আর আমাদের জাতির লোকেরা অন্ধ হয়ে অন্যের তাকলীদ করে মূর্তি পূজা করছে, যে ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল-প্রমাণ নেই। এই হল আমাদের শেষ কথা। এখন আপনার যা খুশি করতে পারেন।

এরপর বাদশাহ বলল, এবার যাও। আগামীকাল অবশ্যই আসবে। আমি তোমাদের ব্যাপারে ফায়ছালা প্রদান করবো। তারা ফিরে এসে পরামর্শ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকেই স্বীয় মতের চাকা ঘুরাতে লাগলেন। তাদের একজন বললেন, বাদশাহ যেহেতু আমাদের ব্যাপারটি জেনে ফেলেছে, তাই তার ধমকি ও হুমকির মধ্যে থেকে আমাদের কোন লাভ নেই। আমরা ঐ গুহার দিকে দীন নিয়ে পালিয়ে যাবো। যদিও তা হবে এই প্রশস্ত দেশের তুলনায় খুব অন্ধকার ও সংকীর্ণ। কিন্তু আমরা সেখানে প্রশস্ত মনে এক আল্লাহর ইবাদত করতে পারবো, যা আমরা এই বিশাল রাজ্যে করতে পারছি না। এমন দেশে আমাদের বসবাস করাতে কোন কল্যাণ নেই, যেখানে আমরা নিরাপদে আমাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস অনুযায়ী দীন পালন করতে পারি না এবং এমন ভূমিতেও আমাদের বসবাস করা ঠিক হবে না, যেখানে আমাদের সঠিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অন্য একটি বাতিল মত চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। সুতরাং সকলেই এই কথায় একমত হয়ে গেলেন। তারা সফর সামগ্রী তৈরী করে নিজ দেশ ছেড়ে এক অজানা পথের উদ্দেশ্যে দীন নিয়ে হিজরত শুরু করলেন। পথে একটি কুকুর তাদের সাথী হয়ে গেল, একই পথে চলতে লাগল, তাদের সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আটকে গেল এবং তাদের প্রহরী হওয়ার দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিজেই মনোনিত করলো। ভালোকে ভালোবাসলে এবং সৎলোকের সাহচর্যে গেলে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়, এই প্রাণীটি হয়তোবা তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল। পথ চলতে চলতে এক সময় তারা গুহায় পৌঁছে গেলেন। হয়তোবা সেখানে তারা আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে ফল-ফলাদি পেয়ে গেলেন এবং ঝর্ণার পরিচ্ছন্ন মিষ্টি পানি পান করলেন। দীর্ঘ পথ চলার পর সফরের ক্লান্তি দূর করার জন্য পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে সেখানে তারা সামান্য বিশ্রামের নিয়তে গুহার মধ্যকার যমীনে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই হালকা ঘুম অনুভব করলেন এবং সেই হালকা ঘুমের পথ ধরেই গভীর নিদ্রা চলে আসল।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহর দরবারে হাজির না হওয়াতে তার লোকেরা তাদের অনুসন্ধানে বের হল। এমন কি তারা সেই গুহার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। কিন্তু হিজরতের পথে মক্কার মুশরিকরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সন্ধানে বের হয়ে গারে ছাওর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েও যেভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তা'আলা সেভাবেই তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। দিনের পর আসে রাত। রাতের পর দিন। পার হয়ে গেল বছরের পর বছর। যুবকগণ

শুয়ে আছেন। গভীর নিদ্রা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে আছে। বাইরের কর্ম ব্যস্ত জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, বিজলির গর্জন, বাতাসের প্রচন্ডতা এবং পৃথিবীর কোন ঘটনাই তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। সূর্য উদিত হওয়ার সময় ডান পাশে হেলে গিয়ে গুহার ছিদ্র দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করে এবং আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে সামান্য আলো ও তাপ প্রদান করে। কিন্তু সূর্যের প্রখর উত্তাপ তাতে প্রবেশ করে না। আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের শরীরকে হেফাজতের জন্য অস্ত যাওয়ার সময়ও সূর্য একটু বাম দিকে হেলে যায়। কুকুরটি তার দুই বাহু প্রসারিত করে বীরের মত প্রহরীর কাজে গুহার বাইরে অবস্থানরত। তারা সেখানে মাঝে মাঝে ডানে বামে পার্শ্ব পরিবর্তন করছেন। কে আছে এমন যে এই দৃশ্য দেখে ভয় পাবে না? গভীর নিদ্রায় তিনশত নয় বছর পার হয়ে গেল। এবার তারা ক্ষুধা ও পিপাসায় দুর্বল শরীর নিয়ে জাগ্রত হলেন। তারা ভাবলেন সময় বেশী অতিক্রম হয়নি এবং ইতিহাসের চাকা গুহার মুখেই থমকে রয়েছে। তাদের একজন বললেন, হে আমার বন্ধুগণ! আমার মনে হয় এখানে আমরা দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে পার করেছি। তোমাদের মতামত কী? অন্যজন বললেন, আমার মনে হয় পূর্ণ একদিন আমরা নিদ্রিত ছিলাম। কারণ যে ধরণের ক্ষুধা ও পিপাসা আমরা অনুভব করছি, তাতে তাই মনে হয়। তৃতীয়জন বললেন, সকালে ঘুমিয়েছি। এই দেখো সূর্য এখনও ডুবে যায়নি। আমার মনে হয় একটি দিবসের কিয়দাংশই আমরা নিদ্রায় অতিক্রম করেছি। চতুর্থজন বললেন, ছাড়ো এ সব মতভেদ। আল্লাহই ভালো জানেন, আমরা কতকাল এখানে ঘুমিয়েছি। মূল কথা হচ্ছে আমার প্রচুর ক্ষুধা অনুভব হচ্ছে। মনে হচ্ছে কয়েক দিন যাবৎ না খেয়ে আছি। আমাদের একজনের উচিত এখনই শহরে গিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে নিয়ে আসা। তবে তাকে অবশ্যই সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ লোকেরা যদি আমাদের অবস্থান সম্পকে জেনে ফেলে তবে তারা আমাদেরকে হত্যা করতে পারে কিংবা আমাদেরকে ফিতনায় ফেলে দীন পালন থেকে বিরত রাখতে পারে। তাকে আরেকটি বিষয়ে সাবধান হতে হবে। কোনভাবেই যেন হারাম খাদ্য ক্রয় করা না হয়। সে জন্য সে যাচাই-বাছাই করে হালাল খাদ্যটিই ক্রয় করবে। তাদের একজন সাবধান ও পূর্ণ সতর্কতার সাথে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন কোন কিছুই আর আগের মত নেই। ঘরবাড়িগুলো পরিবর্তন হয়েছে। পুরাতন পরিত্যক্ত ঘরের স্থলে বিশাল প্রাসাদ শোভা পাচ্ছে। আগের রাজপ্রাসাদগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি এখন যে সমস্ত চেহারা দেখছেন সেগুলো পরিচিত কোন লোকের চেহারা নয়। নদীর স্রোত আগের মতোই চলছে বয়ে, পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে ঘরবাড়ি ও বন-বনানী ঠিকই আছে। শুধু নেই আগের মানুষগুলো। তার দৃষ্টি বিচলিত হল, এদিক সেদিক চোখ ঘুরানোতে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করতে লাগল এবং তার চলার ভঙ্গিতে মানুষের সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। পরিশেষে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। উপস্থিত লোকদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি এখানে অন্য দেশ থেকে এসেছেন? এত চিন্তা করছেন কি নিয়ে? অনুসন্ধানই বা করছেন কী? তিনি বললেন, আমি এখানে অপরিচিত কেউ নই। আমি কিছু খাদ্য ক্রয় করতে চাই। কিন্তু কোথায় তা বিক্রি হচ্ছে আমি তা জানি না। একজন লোক তার হাত ধরে খাদ্যের দোকানে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তিনি রুপার তৈরী কয়েকটি দিরহাম বের করলেন। দোকানের মালিক দিরহামগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন, তা তিনশ বছরের অধিক সময় পূর্বে নির্মিত হয়েছে। সে ভাবল এই ব্যক্তি হয়তো কোন গুপ্তধন পেয়েছে। সম্ভবতঃ এই দিরহামগুলো ছাড়াও তার কাছে বিপুল পরিমাণ দিরহাম রয়েছে। দোকানের মালিক বাজারের লোকদেরকে ডেকে একত্রিত করলো। এবার গুহাবাসী লোকটি বললেন, হে লোক সকল! দেখুন, আপনারা যা ভাবছেন, বিষয়টি আসলে তেমন নয়। এই মুদ্রাগুলো লুকায়িত অসংখ্য সম্পদের কোন অংশ নয়। গতকাল মানুষের সাথে কোন এক লেনদেনের সময় তা আমার হস্তগত হয়েছে। আর এই তো আজ আমি তা দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করতে চাচ্ছি। আপনারা তাতে এত আশ্চর্যবোধ করছেন কেন? এর কোন কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আর কেনই বা সন্দেহের

উপর নির্ভর করে আমার বিরুদ্ধে গুপ্তধন পাওয়ার এবং তা লুকিয়ে রাখার অপবাদ দিচ্ছেন? এই কথা বলে তাদের ব্যাপারটি মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিতে রাজি হল না। ভীড় ভেঙ্গে দিয়ে একাকী তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে লাগল। কথা-বার্তার এক পর্যায়ে তারা যখন জানতে পারল যে, তিনি হচ্ছেন তিনশত নয় বছর পূর্বে জালিম ও কাফির বাদশাহর পাকড়াও থেকে পলায়নকারী সম্ভ্রান্ত বংশের সাতজন যুবকের একজন তখন তারা আরো আশ্চর্যান্বিত হল। তারা আরো জানতে পারল যে, তারা হলেন ঐ সমস্ত যুবক যাদের তালাশে বাদশাহ সকল প্রচেষ্টাই করেছিল, কিন্তু তাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। যুবকটি এবার আরো শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কারণ এখন লোকেরা তাদের ব্যাপারটি জেনে ফেলেছে। তাই তিনি নিজের ও তার সাথীদের জীবন নাশের ভয়ে পালাতে উদ্যত হলেন। লোকদের মধ্য হতে একজন বলল, হে ভাই! তুমি ভয় করো না। তুমি যেই যালিম বাদশাহর ভয় করছ, সে তো প্রায় তিনশ বছর আগেই ধ্বংস হয়েছে। এখন যিনি এই রাজ্যের বাদশাহ তিনি আপনি ও আপনার সাথীদের মতোই একজন মুমিন বান্দা। এবার বলুন, আপনার অন্যান্য সাথীগণ কোথায়? যুবকটি এবার আসল ঘটনা জানতে পারলেন। ইতিহাসের সেই দীর্ঘ দূরত্বও তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন, যা তাকে মানব সমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এখন তিনি মানুষের মাঝে চলমান একটি ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নন। এরপর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমাকে গুহার অভ্যন্তরে বন্ধুদের কাছে যেতে দাও। আমি তাদেরকে আমার ও আপনাদের অবস্থা সম্পকে সংবাদ দেব। তারা দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আমার অপেক্ষায় আছেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তারা আমার ব্যাপারে চিন্তিত আছে।

তখনকার বাদশাহও তাদের খবরটি জেনে ফেললেন। তিনি গুহাবাসীদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন এবং দ্রুত গুহার দিকে চলে আসলেন। তিনি তাদেরকে উজ্জল চেহারায় জীবিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তাদের সাথে মুসাফাহা ও আলিঙ্গন করলেন। তিনি তাদেরকে রাজপ্রাসাদে আহবান জানালেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাসের আমন্ত্রন জানালেন। তারা সাফ জানিয়ে দিলেন, নতুনভাবে জীবন যাপনে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমাদের ঘরবাড়িগুলো বিলীন হয়ে গেছে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ জীবিত নেই এবং আমাদের মাঝে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনের মাঝে দীর্ঘ দিন যাবৎ কোন যোগসূত্রও নেই। সুতরাং এই পার্থিব জীবনের দিকে ফিরে গিয়ে আর লাভ কী? অতঃপর তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের আবেদন করলেন, তার কাছে ফেরত যাওয়াকেই পছন্দ করলেন এবং তার প্রশস্ত রহমত দ্বারা তাদেরকে ঢেকে নিতে প্রার্থনা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দেহ থেকে তাদের প্রাণ চির দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এই ঘটনায় যে সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে:

১) তাওহীদকে মেনে নেওয়া মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব। অর্থাৎ কোন মানুষকে যদি তার স্বভাবজাত ধর্মের উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং বাইরের কোন গোমরাহ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাকে বিভ্রান্ত না করে, তাহলে সে আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিবে, তারই ইবাদত করবে এবং তার ইবাদতে অন্য কিছুকে শরীক করবে না। যেমনটি হয়েছিল ঘটনায় বর্ণিত যুবকদের ক্ষেত্রে।

২) পৃথিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠায় যুবকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩) মূর্তি পূজা, অলী-আওলীয়াদের পূজা এবং শিরকের পক্ষে কোন দলীল নেই।

৪) প্রয়োজনে সত্য গোপন করা জায়েয আছে। কিন্তু তা সকল সময়ের জন্য নয়।

৫) সাহসের সাথে তাওহীদের বাণী প্রকাশ্যে প্রচার করা জরুরী।

৬) নিজ দেশে দীন পালন করতে গিয়ে ফিতনার ভয় থাকলে দীন নিয়ে পলায়ন করা আবশ্যক।

৭) আসহাবে কাহাফের ঘটনা আল্লাহর বিশেষ একটি বড় নিদর্শন। তবে তার চেয়েও বড় নিদর্শন হচ্ছে, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্যের সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আগমন ও প্রস্থান।

৮) বিপদাপদে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং তার দয়া কামনা করা জরুরী।

৯) কোন মতবাদ, মাযহাব ও আমল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কারও অন্ধ অনুসরণ না করে দলীল অনুসন্ধান করা জরুরী।

১০) আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের খেদমতের জন্য বড় বড় মাখলুককে বাধ্য করেন।

১১) একজন দাঈ প্রয়োজনে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। বিশেষ করে যখন তার পিছনে শত্রুরা ষড়যন্ত্র শুরু করে।

১২) সুখে-দুঃখে হালাল রুজী অনুসন্ধান করা জরুরী।

১৩) চিন্তা ও গবেষণা করে কুরআন ও কুরআনে বর্ণিত ঘটনাগুলো অধ্যয়ন করা উচিত।

১৪) বিনা প্রয়োজনে মতভেদ করা অর্থহীন। যেমন গুহাবাসীদের নাম, কুকুরটির নাম ও তার রং সম্পকে ঘাটাঘাটি করে কোন লাভ নেই।

১৫) ভবিষ্যতে কোন কাজ করতে ইচ্ছা করলে প্রথমে ইনশা-আল্লাহ বলতে হবে।

১৬) প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সত্যের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৭) আসহাবে কাহাফের স্থান ও কাল কুরআন ও ছ্বহীহ হাদীছে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং তা খুঁজে বেড়ানোতে আমাদের কোন লাভ নেই। ঘটনাটি ঐ প্রকার গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা তার নাবীকে জানিয়েছেন। তবে তার স্থান ও কাল আমরা জানতে পারিনি।

১৮) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েবের সকল খবর জানতেন না। যদি জানতেন, তাহলে অহীর অপেক্ষায় না থেকে প্রশ্ন করার সাথে সাথেই তাদেরকে ঘটনাটি বলে দিতেন।

১৯) আসহাবে কাহাফগণ যে গুহায় অবস্থান করেছিলেন তাও গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। এর ঠিকানা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। কেউ যদি এর স্থান নির্দিষ্ট করে বলে সে আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনাকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

২০) কারামতে আওলীয়া সত্য। তাতে বিশ্বাস করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহর অন্তর্ভুক্ত।

২১) তাওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা অর্জন করা জরুরী। অন্যথায় তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়।

২২) তিনশত নয় বছর পর তাদেরকে জীবিত করা এটাই প্রমাণ করে যে মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সত্য, ক্বিয়ামত সত্য। এতে কোন সন্দেহ নেই।

২৩) রূহ এবং দেহ উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। কেননা আসহাবে কাহাফগণ এভাবেই জীবিত হয়েছিলেন।

২৪) রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ঈমানের সম্পর্ক অধিক মজবুত হওয়া আবশ্যক। ঘটনায় বর্ণিত যুবকদের মধ্যে রক্তের কোন সম্পর্ক না থাকলেও ঈমান ও তাওহীদের বন্ধনে তারা আবদ্ধ হয়ে একই পথের পথিক হয়ে যান।

২৫) হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ হতে তার বান্দার প্রতি বিরাট একটি নিয়ামত। বান্দার উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করা।

২৬) ঘরের মধ্যে কুকুর রাখা নিষিদ্ধ। তাই কুকুরটিকে গুহার বাইরে রাখা হয়েছিল।

২৭) ভালো লোকের সঙ্গে থাকলে ভালো হওয়া যায় এবং ভালো হিসাবে পরিচিতি পাওয়া যায়। কুকুরটি তাদের সাথে থাকার কারণে কুরআনে তার নাম উল্লেখিত হয়েছে। অপর পক্ষে অসৎ লোকের সঙ্গে থাকলে অসৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ নয়।

২৮) কবরের উপর মসজিদ বা গম্বুজ নির্মাণ করা আমাদের শরী'আতে নিষিদ্ধ।

২৯) বাতিল পন্থীরা সন্দেহ এবং অনুমানের অনুসরণ করে থাকে। সঠিক কোন দলীল তাদের হাতে নেই।

৩০) বয়স বৃদ্ধি হলে এবং অভিজ্ঞতা দীর্ঘ হলেই মানুষ জ্ঞানী হয়ে যায় না। এই যুবকগণ বয়সে কম হলেও তারা সত্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছেন। অথচ সেই জাতির মধ্যে অসংখ্য বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোক থাকা সত্ত্বেও সঠিক পথের সন্ধান পায়নি।

৩১) এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে সূর্য চলমান; স্থির নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়।

৩২) প্রহরী হিসাবে কুকুর প্রতিপালন করা জায়েয আছে।

৩৩) কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তা আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে বলতে হবে আল্লাহই ভালো জানেন।

৩৪) আল্লাহ কখনও দীনের দাঈদের ঈমানী শক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদেরকে শক্তিশালী করে দেন। তখন দাঈদের উচিত ধৈর্য ধারণ করা।

৩৫) তারা সংখ্যায় ছিলেন সাত জন। কারণ আল্লাহ তা'আলা প্রথম দু'টি সংখ্যার প্রতিবাদ করে তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কিছুই বলেননি। এতে বুঝা গেল শেষ সংখ্যাটিই সঠিক।

৩৬) যে ব্যক্তি ফতোয়া দেয়ার যোগ্য নয়, তার কাছে ফতোয়া চাওয়া ঠিক নয়।

২৭৭. তাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) যখনই তার নিকট প্রবেশ করতেন, তখনই সেখানে বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি দেখতে পেতেন। মৌসুম না হওয়া সত্ত্বেও তার কাছে সবসময় মৌসুমি ফল পাওয়া যেত। তিনি মারইয়ামকে জিজ্ঞেস করতেন, হে মারইয়াম তুমি এগুলো কোথায় পেলে? তিনি জবাব দিতেন, এগুলো আল্লাহর তরফ থেকে। তিনি যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে রিযিক দিয়ে থাকেন। স্বামী ছাড়াই ঈসা (আলাইহিস সালাম) কে প্রসব করাও মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) এর অন্যতম একটি কারামত। আরো যেসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রসব ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে খেজুর গাছের গোড়ায় ধরে ঝাকি দিতে বললেন। এতে করে খেজুর গাছ থেকে তোমার নিকট তরতাজা খেজুর ঝড়ে পড়বে। উল্লেখ্য যে, খেজুর বৃক্ষের কাঁচা ফল ও পাতা এত শক্তভাবে ডালার সাথে যুক্ত থাকে যে, তা কখনোই ঝড়ে পড়ে না। সেই সাথে একজন দুর্বল মহিলার নাড়ানোতে

খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর ঘটনা, তিনি যখন বিষ পান করলেন, তখন তার কোন ক্ষতি হয়নি।[২৭৮]

খেজুর গাছ নড়াচড়া করার কথা নয় এবং তা থেকে কাঁচা খেজুর ঝড়ে পড়ারও কথা নয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার রিযিকের ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাকে সম্মানিত করার জন্যই তা করেছেন।

২৭৮ . খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর বিষপানের ঘটনা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তার মধ্যে 'তারিখে দিমাশক' নামক কিতাবেই সবচেয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ইয়ামামার যুদ্ধ হতে ফেরার পথে নাজাফ নামক স্থানে সৈন্যরা যাত্রা বিরতি করলো। তখন হীরার অধিবাসীরা একটি সাদা দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলো। নাজাফের অধিবাসীরা প্রাসাদের ভিতর থেকে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকলো। পাথর শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা মাটির নির্মিত পাতিলগুলো নিক্ষেপ করতে লাগলো। খালেদ ইবনে ওয়ালীদ তখন তাদের কাছে একজন লোক পাঠিয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের জ্ঞানী ও সম্মানীদের মধ্য হতে একজনকে আলোচনার জন্য পাঠাও। তারা আব্দুল মাসীহ ইবনে আমরকে পাঠালো। তার বয়স হয়েছিল তখন ৩৫০ বছর। রক্ষীরা তাকে খালেদের কাছে নিয়ে গেল। তার হাতে ছিল এক বোতল সাপের বিষ। খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কী? সে বলল: সাপের বিষ। খালেদ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ দিয়ে কী করবে? সে বলল: তোমার কাছে যদি আমার জন্য এবং আমার গোত্রের জন্য ভালো কিছু পাই, তাহলে আল্লাহর প্রশংসা করবো এবং তা গ্রহণ করবো। আর যদি অন্য কিছু পাই, তাহলে আমার গোত্রের কাছে অপছন্দনীয় কোন বিষয় নিয়ে ফিরে যেতে চাই না। আমার বয়সও আর বেশী বাকী নেই। সুতরাং অপছন্দনীয় কিছু দেখলে আমি নিজেই এই বিষ পান করবো এবং নিজের জান নিজেই বের করে দিবো।

খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তখন বললেন, তা আমার হাতে দাও। সে তা দিল। তিনি বিষ হাতে নিয়ে এই দু'আ পাঠ করলেন, «بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ» অতঃপর তিনি তা পান করলেন। এরপর তিনি পানি পান করলেন। এতে করে তার শরীর থেকে সামান্য পরিমাণ ঘাম নির্গত হলো। একটু পরেই সেই ঘাম শুকিয়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে আব্দুল মাসীহ তার গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল: আমি এমন একজন লোকের কাছ থেকে ফিরে এলাম, যে সাপের বিষ পান করেছে। অথচ এতে তার কোন ক্ষতি হয়নি। সুতরাং সে যা বলে তোমরা তা মেনে নাও এবং তোমাদের অঞ্চল হতে তাকে সন্তুষ্ট অবস্থায় বিদায় করো। কেননা অচিরেই তাদের ব্যাপারটি বিরাট আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ তারা জয়লাভ করবে। উল্লেখ্য যে, তারা ছিল আরব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত খ্রিষ্টান। সুতরাং তারা বছরে এক লাখ রোপ্য মুদ্রার বিনিময়ে খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করলো।

আরো উল্লেখ করা হয় যে, খালেদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেই প্রকার সাপের বিষ পান করেছিলেন, তা কাউকে কামড় দিলে মৃত্যু হবেই হবে। তবে আল্লাহ যদি অন্য কিছু করার ইচ্ছা করেন, সে কথা ভিন্ন। এর চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি বলে ধারণা করা হয়।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ইসলামের বিশুদ্ধতা এবং রসূলের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য সালাফদের কেউ কেউ কারামত দেখিয়েছেন। যেমন উল্লেখ করা হয় যে, খালেদ ইবনে ওয়ালীদের কাছে যখন নিদর্শন চাওয়া হলো, তখন তিনি বিষ পান করে দেখিয়েছেন। এতে তার কোন ক্ষতি হয়নি।

শাইখুল ইসলাম বলেনঃ পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে যেসব কারামত সংঘটিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনের সূরা কাহাফে এবং অন্যান্য সূরায় যেসব কারামতের কথা বর্ণনা করেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতে বিশ্বাস করে।[২৭৯] সেই সাথে এই উম্মতের প্রথম যুগে ছাহাবী, তাবেয়ী এবং

শাইখুল ইসলাম আরো বলেন, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একটি সুরক্ষিত দূর্গ ঘেরাও করলেন। দূর্গের ভেতর থেকে তারা বলল, তুমি বিষ পান না করা পর্যন্ত আমরা আত্মসমর্পন করবো না। অতঃপর তিনি বিষ পান করলেন। এতে তার কোন ক্ষতি হলো না।

সুতরাং এই ঘটনা যদি ছুহীহ হয়, তাহলে বলবো যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর আস্থা এবং তার উপর পরিপূর্ণ ভরসা করেই খালেদ ইবনে ওয়ালীদ বিষ পান করেছিলেন। আল্লাহর দীনের সাহায্য, কাফিরদের মনে ভয় ঢুকানো এবং মুসলিমদের ঈমানকে শক্তিশালী করার জন্যই তিনি বিষ পান করেছিলেন। এটি হতে পারে খালেদের একটি কারামত অথবা তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সেই আদেশ পালন করেছেন। ফাতহুল বারীতে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ইহা বর্ণনা করেছেন। (ঘটনার সূত্রঃ ফাযায়েলে সাহাবায়, তাবারানী, মারেফাতুস সাহাবাহ, কারামাতুল আওলীয়া, তারিখে দামেস্ক ইত্যাদি। ইমাম যাহাবী, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং আরো অনেকেই এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন।)

২৭৯. পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামত ছুহীহ সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, তার মধ্য হতে কতিপয়ের উদাহরণ এখানে পেশ করা হলো।

জুরাইজের কারামতঃ

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয নামের একজন আবেদ লোক ছিল। সে ইবাদতের জন্য একটি গীর্জা তৈরী করে তথায় সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত ছিল। এক দিন ছ্বলাতরত থাকাবস্থায় তার মা এসে তাকে ডাক দিল। জুরাইজ বললঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার ছ্বলাত। অর্থাৎ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না ছ্বলাতে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে ছ্বলাতের মধ্যে রয়ে গেল। মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা। মা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। পরের দিন তার মা আবার আগমন করলো। সেদিনও জুরাইয ছ্বলাতে ছিল। তার মায়ের কণ্ঠ শুনে সে বললঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার ছ্বলাত। অর্থাৎ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না ছ্বলাতে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে ছ্বলাতের মধ্যে রয়ে গেল। মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা। মা ব্যর্থ হয়ে আজও চলে গেল। তৃতীয় দিনেও তার মা এসে তাকে ছ্বলাত রত পেল। জুরাইজ তার মার ডাকে সাড়া না দিয়ে ছ্বলাতেই রয়ে গেল। এবার তার মা রাগান্বিত হয়ে জুরাইযের উপর এই বলে বদ্ দু'আ করলো যে, হে আল্লাহ! জুরাইয যেন বেশ্যা মহিলার মুখ দেখার পূর্বে মৃত্যু বরণ না করে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয এবং তার ইবাদতের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যকার কিছু লোক তাকে পথভ্রষ্ঠ করার জন্য চক্রান্ত শুরু করলো। একজন বেশ্যা মহিলা সেসময় সেজেগুজে ঘুরে বেড়াত। সে প্রস্তাব করলো যে, তোমরা যদি চাও আমি তাকে গোমরাহ করতে পারি। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর সেই মহিলা জুরাইযের কাছে গিয়ে নিজেকে পেশ করলো। কিন্তু জুরাইয সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই করলো না। জুরাইযের গীর্জায় একজন ছাগলের রাখাল আসা-যাওয়া করত। মহিলাটি জুরাইযের কাছে কোন সুযোগ না পেয়ে রাখালের কাছে গিয়ে তার সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। সন্তান প্রসব করার পর সে বলল এটি জুরাইযের সন্তান। লোকেরা দলে দলে আগমন করে জুরাইযকে গীর্জা থেকে টেনে বের করলো এবং গীর্জাটিও ভেঙ্গে চুরমার করে দিল ও তাকে মারতে শুরু করলো । জুরাইয জিজ্ঞাসা করলো,

তোমাদের কি হল? আমাকে মারছ কেন? আমার ইবাদতখানাটিই বা কেন ভেঙ্গে ফেললে? লোকেরা বলল: তুমি এই মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছ। যার কারণে মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। জুরাইয জিজ্ঞাসা করলো, শিশুটি কোথায়? তারা শিশুটিকে নিয়ে আসল। জুরাইয বলল আমাকে ছ্বলাত পড়ার জন্য একটু সময় দাও। তারা তাকে ছ্বলাত পড়ার সুযোগ দিল। ছ্বলাত শেষ করে শিশুটির কাছে গিয়ে তার পেটে খুচা দিয়ে বলল: এই ছেলে? তোমার বাপ কে? ছেলেটি বলে দিল, ছাগলের রাখাল।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একথা শুনে লোকেরা আসল তথ্য অনুধাবন করতে পেরে জুরাইযকে চুম্বন করতে শুরু করলো এবং তাকে জড়িয়ে ধরল। তারা নিজেদের ভুলের কারণে জুরাইযের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো এবং বলল আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার গীর্জাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দিব। জুরাইয বলল: স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করার দরকার নেই; বরং যেমন ছিল তেমন করেই মাটি দিয়ে তৈরী করে দাও। তারা তাই করলো।

গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির কারামত:

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অতীত কালে তিনজন লোক পথ চলতেছিল। পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল। উপর থেকে বিশাল আকারের একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইলনা। তাদের একজন অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উসীলা দিয়ে দু'আ কর। এতে হয়তো আল্লাহ আমাদের জন্য বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল, আমার কতিপয় শিশু সন্তানও ছিল। আমি ছিলাম তাদের জন্য একমাত্র উপার্জনকারী। আমি প্রতিদিন ছাগল চরানোর জন্য মাঠে চলে যেতাম। বিকালে ঘরে ফেরত এসে দুধ দহন করে আমি প্রথমে পিতা-মাতাকে পান করাতাম, পরে আমার শিশু সন্তানদেরকে পান করাতাম। এটি ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার অভ্যাসমত আমি দুধ দহন করে দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে দাড়িয়ে রইলাম। আমি তাদেরকে ঘুম থেকে জাগ্রত করাকে অপছন্দ করলাম। যেমন অপছন্দ করলাম পিতা-মাতার পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানোকেও। শিশু সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করতেছিল। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল। আমার পিতা-মাতা ঘুম থেকে জাগলেন। আমি তাদেরকে প্রথমে পান করালাম অতঃপর আমার ছেলে-মেয়েদেরকে পান করালাম।

হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি একাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করেছি। এই আমলটির উসীলায় আমাদের জন্য বের হওয়ার রাস্তা করে দিন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, তারা আকাশ দেখতে পেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মতো রাস্তা হয়নি। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং একজন পুরুষ কোন মহিলার প্রতি যতদূর আসক্ত হতে পারে, আমি ছিলাম তার প্রতি ততটুকু আসক্ত। আমি তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম। সে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার শর্তে তাতে সম্মত হল। আমি অনেক পরিশ্রম করে একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে তার কাছে গমণ করলাম। সে সম্মতি প্রকাশ করার পর আমি তার উভয় উরুর মধ্যে বসে পড়লাম। এমন সময় সে বলে উঠল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, আমার স্বতীত্ব নষ্ট করো না। একথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। এমনকি স্বর্ণ মুদ্রাও তাকে দিয়ে দিলাম।

পরবর্তীতে আগমনকারী ফির্কার লোকদের মধ্যে প্রকাশিত যেসব কারামতের কথা ছ্বহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাতেও বিশ্বাস করে।

এখানে শাইখুল ইসলাম ঐসব কারামতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা অতীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং কুরআনুল কারীম ও অন্যান্য গ্রন্থে ছ্বহীহভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী জাতির কারামতগুলো থেকে কুরআনুল কারীমে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে স্বামী ছাড়াই মারইয়ামের গর্ভধারণ করা, সূরা কাফির আসহাবে

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার ভয়ে সেদিন পাপের কাজ থেকে বিরত হয়েছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়ার মতো রাস্তা হয়নি।

তৃতীয়জন বলল: হে আল্লাহ! নির্ধারিত বেতনের বিনিময়ে আমি একজন শ্রমিক নিয়োগ করলাম। কাজ শেষ করে সে আমার কাছে পারিশ্রমিক চাইলে আমি তা প্রদান করলাম, কিন্তু সে তা গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে থাকলাম। একপর্যায়ে তা একপাল গরুতে পরিণত হল। আমি গরুগুলো মাঠে চরানোর জন্য একজন রাখালও নিয়োগ করলাম।

অনেক দিন পর সেই লোকটি আমার কাছে এসে তার মজুরী চাইল। আমি বললামঃ তুমি রাখালসহ উক্ত গরুর পালটি নিয়ে চলে যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। আমি বললাম, বিদ্রুপ করি নাই। বরং এগুলো তোমার। আমি তোমার এক দিনের মজুরী দিয়ে এগুলো করেছি। তাই তুমি রাখালসহ গরুর পালটি নিয়ে চল। অতঃপর সে গরুর পালটি নিয়ে চলে গেল। একটিও রেখে যায়নি।

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য একাজটি করেছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল। তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল।

একজন বৃদ্ধ লোকের কারামত:

অতীত কালে একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলছিল। হঠাৎ মাথার উপর মেঘমালা থেকে একটি শব্দ শুনল যে, অমুকের বাগানে বর্ষণ কর। লোকটি মেঘমালাকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকল। অবশেষে একটি যমিনে বৃষ্টি বর্ষণ হল। সে খানে দেখতে পেল একজন লোক কোদাল হাতে নিয়ে বাগানে কাজ করছে। লোকটি বাগান ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমার নাম কি? সে বলল: আমার নাম অমুক। যে নামটি সে মেঘ থেকে শুনেছিল। তারপর বাগানের মালিক জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ? উত্তরে সে বলল: যে মেঘ থেকে এই বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে, আমি তোমার নামটি সেই মেঘের ভিতরে শুনতে পেয়েছি। তাই আমি তোমার নাম জিজ্ঞেস করছি। তোমার কাছে আমার আরো একটি প্রশ্ন হল, তুমি কিভাবে এই বাগানের ফসল ব্যয় কর, তাও আমি জানতে চাই।

সে বলল: আমার যমিনে উৎপাদিত ফসলকে তিনভাগে বিভক্ত করি। একভাগ আমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করি। একভাগ পুনরায় ফসল আবাদের কাজে ব্যয় করি। আর এক ভাগ ফকীর, মিসকীন এবং মুসাফিরদের মাঝে বন্টন করে দেই।

কাহাফের ঘটনা, মূসার সাথে খিযির আলাইহিস সালামের ঘটনা[২৮০] এবং যুল কারনাইনের ঘটনা অন্যতম।

---

২৮০ . খিযির আলাইহিস সালামের কারামতের ঘটনা ছ্বহীহ বুখারীতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা মূসা (আলাইহিস সালাম) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হল: বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক জ্ঞানী কে? (মূসা (আলাইহিস সালাম) এর জানা মতে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউ ছিল না) তাই তিনি বললেন, আমিই বর্তমানে সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তার এই কথাকে অপছন্দ করলেন। কারণ তিনি এ কথা বলেন নি যে, আল্লাহই ভালো জানেন কে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ বললেন, হে মূসা! দুই সাগরের মিলনস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মূসা বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে আমি তার কাছে যেতে পারবো? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে ভ্রমণ শুরু কর। যেখানে পৌঁছে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানে তার সন্ধান পাবে। আল্লাহর কথা অনুযায়ী মূসা (আলাইহিস সালাম) থলের ভিতর একটি (ভাজা) মাছ নিয়ে বের হলেন। সাথে ছিল তার খাদেম ইউসা ইবনে নূন। পথিমধ্যে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ মাছটি লাফিয়ে উঠল এবং থলের ভিতর থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। (ইউশা ইবনে নূন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখছিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তখন ঘুমন্ত ছিলেন। জাগ্রত হলে ইউশা ইবনে নূন এই ঘটনা মূসাকে বলতে ভুলে গেলেন) তারা সেখান থেকে পুনরায় রওয়ানা হলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলা মূসা (আলাইহিস সালাম) তার সঙ্গীকে বললেন, আমাদের নাস্তা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যে স্থানে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে মূসা (আলাইহিস সালাম) ক্লান্তি বোধ করেননি। (নাস্তা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূন মাছের ঘটনা স্মরণ করলেন) তিনি বললেন, আমরা যে পাথরের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলাম, সেখানে মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। আর আমি আপনাকে এই সংবাদটি দিতে ভুলে গিয়েছি। শয়তানই আমাকে আপনাকে বলতে ভুলিয়ে দিয়েছে। মাছটি চলে যাওয়ার পথে একটি ছিদ্র ছিল এবং মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং ইউসা ইবনে নূনের জন্য ছিল এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা।

তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। তখন তারা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, একজন লোক আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) তাকে সালাম দিলেন। খিযির (আলাইহিস সালাম) সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, এই জনমানবহীন প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি মূসা। খিযির প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মূসা। আল্লাহ্ আপনাকে যেই জ্ঞান শিখিয়েছেন, তা থেকে কিছু শেখার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি।

খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আপনার কাছে নেই। পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা আমি জানিনা। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমি কি আপনার কাছ থেকে তা শেখার জন্য আপনার সাথে চলতে পারি? খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় বুঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মূসা বললেন, আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করবো না। কোন কাজে আমি আপনার

বিরোধিতা করবো না। খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি যদি আমার সাথে থাকতে চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তা আপনার কাছে ব্যক্ত করি।

এ কথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে থাকলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে সাগরের তীরে থামল। তারা নৌকায় আরোহনের ব্যাপারে কথা বললেন। মাঝিরা খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। তারা যখন নৌকায় আরোহন করলেন তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার কিনারায় বসল এবং সাগর থেকে এক ঠোকর বা দুই ঠোকর পানি পান করলো। খিযির (আলাইহিস সালাম) বললেন, এই পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে বিশাল সাগর থেকে যে পরিমাণ পানি পান করেছে আমি এবং আপনি আল্লাহর জ্ঞানের সমুদ্র থেকে ঠিক ততটুকু জ্ঞানই অর্জন করেছি। নৌকায় উঠেই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে মূসা স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন, আপনি কি করলেন? তারা আমাদেরকে বিনা ভাড়ায় (পয়সায়) নৌকায় তুলে নিয়েছে আর আপনি তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়। আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন, আমি কি পূর্বেই আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) যুক্তি পেশ করে বললেন, আমার ভুলের কারণে আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না। আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন না। প্রথম সমস্যাটি হয়েছিল মূসা (আলাইহিস সালাম) এর ভুলের কারণে।

তারা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কুল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্ব-হস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। আপনি নিঃসন্দেহে একটি অপছন্দনীয় কাজ করেছেন। খিযির বললেন, আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না। মূসা (আলাইহিস সালাম) দেখলেন, এব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই তিনি বললেন, এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর তারা আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীর কাছে খাবার চাইলেন। ওরা মেহমানদারী করতে সোজা অস্বীকার করলো। খিযির এই গ্রামে একটি পুরাতন প্রাচীর দেখলেন, যা উল্টে পড়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটিকে সোজা করে দিলেন। মূসা (আলাইহিস সালাম) বললেন, আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করলো। অথচ আপনি তাদের বড় একটি কাজ করে দিলেন। ইচ্ছা করলে আপনি এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন, এখন শর্ত পূরণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মাঝে বিচ্ছেদের সময়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা মূসার উপর রহমত নাযিল করুন। আমাদের আকাঙ্খা ছিল, তিনি যদি ধৈর্য ধারণ করে আরো কিছু সময় থাকতে পারতেন, তাহলে তাদের আরো কিছু ঘটনা আল্লাহ আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন।

সূরা কাহাফে ঘটনার বিবরণ এভাবে এসেছে যে, নৌকাটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বল প্রয়োগে প্রত্যেকটি নতুন নৌকা ছিনিয়ে নিত। বালকটির ব্যাপার- তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালোবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার- সেটি

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের থেকে ছ্বহীহ সনদে বর্ণিত কারামতগুলোর প্রতি বিশ্বাস করে। তাদের প্রথমে রয়েছেন ছাহাবী ও তাবেঈগণ।[২৮১] যেমন উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনার মিম্বার থেকে

ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন নিজেরাই উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা।

২৮১. ছাহাবীদের চেয়ে তাবেয়ীদের মধ্যেই বেশী পরিমাণ কারামত প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ ছাহাবীদের নিকট ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা এবং আল্লাহর পক্ষ হতে শক্তি ও সাহায্য আসার এমন মাধ্যম বিদ্যমান ছিল, যা তাবেয়ীদের মধ্যে ছিল না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যেই ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তাই তাদেরকে শক্তিশালী করার জন্য, ঈমানের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য এবং তারা যেই সত্যের উপর ছিলেন, তার সাহায্যের জন্য কারামত প্রকাশের প্রয়োজন ছিল ছাহাবীদের তুলনায় বেশী। তাবেয়ীদের মধ্যে যত কারামত প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ওয়াইস আল-কারণীর কারামত অন্যতম।

উসাইর ইবনে যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখনই ইয়ামান থেকে কোন যুদ্ধের কাফেলা মদীনায় আগমন করতো, তখন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মাঝে ওয়াইস ইবনে আমের আল-কারণী নামে কোন লোক আছে কি? কোন এক সময় ওয়াইস ইবনে আমের আগমন করেছেন জানতে পেরে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ওয়াইস ইবনে আমের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কার্ন গোত্রের মুরাদ শাখার লোক? উত্তরে তিনি বললেন হ্যাঁ। তোমার শরীরে কি শ্বেত রোগ ছিল, যা থেকে তুমি সুস্থ হয়েছ, কিন্তু সামান্য স্থানে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। তিনি বললেন হ্যাঁ। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতা জীবিত আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে ওয়াইস ইবনে আমের নামে একজন লোক আগমন করবে। তার ছিল শ্বেত রোগ। সামান্য স্থান ব্যতীত তার শরীরের চামড়া ভালো হয়ে গেছে। সে তার মায়ের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। সে তার মায়ের প্রতি খুবই সদাচরণকারী এবং আনুগত্যশীল। সম্ভবতঃ সে কারণেই সে আমার কাছে আসতে পারছে না। সে যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দেন। তুমি যদি তাকে পাও, তার কাছে তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন করিও। সুতরাং তুমি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। ওয়াইস আল-কারণী উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখন কোথায় যাবে? তিনি বললেন, কূফার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, কূফার গভর্ণরের কাছে তোমার জন্য কিছু লিখে দিব কি? তিনি বললেন, না কোন কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। আমি দারিদ্র হালতে এবং ফকীর-মিসকীনদের সাথে বসবাস করা পছন্দ করি। পরবর্তী বছরে কূফার একজন লোক হজ্জ করতে আসল। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে ওয়াইস আল-কারণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল: আমি তাকে একটি পুরাতন ঘরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় বসবাস করতে দেখে এসেছি। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাছে ওয়াইস ইবনে আমের নামে একজন লোক আগমন করবে। তার শ্বেত রোগ ছিল। সামান্য স্থান ব্যতীত তার শরীরের চামড়া ভালো হয়ে গেছে। সে তার মাতার খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে। সে তার মায়ের

প্রতি খুবই সদাচরণকারী এবং আনুগত্যশীল। সম্ভবতঃ সে কারণেই সে আমার কাছে আসতে পারছে না। সে যদি আল্লাহর নামে কোন শপথ করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করে দেন। তুমি যদি তাকে পাও, তার কাছে তোমার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করার আবেদন করিও। সুতরাং তুমিও তার কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করিও। কূফাবাসী লোকটি দেশে ফিরে গিয়ে ওয়াইস আল-কারণীর সাথে সাক্ষাৎ করে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। প্রথমে তিনি এই বলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন যে, তুমি হাজ্জের সফর থেকে কেবল আগমন করেছ। সুতরাং তুমিই আমার জন্য দু'আ করো। এ কথাটি তিনি কয়েকবার বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি উমার (রাঃ) এর সাথে দেখা করেছ? কূফাবাসী বলল: হ্যাঁ। অতঃপর ওয়াইস আল-কারণী তার জন্য দু'আ করলেন। মানুষের কাছে ওয়াইসের বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে গেলে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী উসাইর ইবনে যাবের বলেন, আমি তাকে একটি চাদর দান করেছিলাম। যখনই মানুষ তাকে এই চাদরটি পরিহিত অবস্থায় দেখত, তারা বলতঃ ওয়াইস এই চাদরটি কোথায় পেলেন? (মুসলিম, অধ্যায়: ফাযায়িলুস্ সাহাবাহ।)

আরো যেসব তাবেয়ীর হাতে কারামত প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে সিলাত ইবনে আশয়াম রাহিমাহুল্লাহ অন্যতম। তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তার ইবাদত-বন্দেগী ও বিভিন্ন প্রকার সৎআমলের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। সারা রাত তিনি ছ্বলাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন। তার হাতে প্রকাশিত হয়েছিল একাধিক কারামত। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তার 'ইগাছাতুল লাহফান' নামক কিতাবে জা'ফর ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে সিলাত ইবনে আশয়ামের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

জা'ফর ইবনে যায়েদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার কাবুলের (বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী) দিকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমাদের মধ্যে সিলাত ইবনে আশয়াম নামে একজন সৎ লোক ছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা বেলা লোকেরা একটি স্থানে অবতরণ করলো এবং মাগরিব ও ইশা ছ্বলাত আদায় করলো। অতঃপর তারা সকলেই শুয়ে পড়লো।

জা'ফর বলেন, আমি তখন মনে মনে বললাম, আজ রাতে আমি অবশ্যই সিলাতের প্রতি খেয়াল রাখবো এবং দেখবো আজ রাতে তিনি কী কী আমল করেন? দেখলাম সিলাত ইবনে আশয়াম লোকদের অমনোযোগিতা ও বিশ্রামের সময়ের অপেক্ষা করছেন। লোকেরা যখন নিজ নিজ শয্যা গ্রহণ করলো, তখন তিনিও শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে পড়ার বাহানা করলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, লোকেরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছে, তখন বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং তাঁবু থেকে বের হয়ে বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত একটি স্থানের দিকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বৃক্ষ দ্বারা বেষ্টিত স্থানে লুকিয়ে পড়লেন। জা'ফর বলেন, আমি নিজেকে তার থেকে আড়াল করে তাকে অনুসরণ করছিলাম ও তার সকল অবস্থা নিবিড়ভাবে অবলোকন করছিলাম। দেখলাম তিনি প্রথমে অযু করলেন অতঃপর এদিক ওদিকে না তাকিয়ে সরাসরি ছ্বলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।

সিলাত ইচ্ছা করলে দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি দূর করার জন্য বন্ধুদের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা স্বীয় শরীরকে আরাম দিতে পারতেন। কিন্তু তা পরিত্যাগ করে একান্তে নির্জনে তার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। কারণ সিলাত ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন, এই পার্থিব জীবনের নিদ্রা আরামদায়ক হলেও তা কেবল সীমিত সময়ের জন্যই। তার সামনে রয়েছে এমন জীবন, যেখানে ঘুমানোর যথেষ্ট সময় রয়েছে। সেখানে চিরদিন অবিরাম ঘুম ও আরাম-আয়েশ করার যথেষ্ট সুযোগও রয়েছে। সেই সুমধুর, সুদীর্ঘ ও সুগভীর নিদ্রা উপভোগ করার কামনায় তিনি এই পার্থিব জগতের ক্ষণিকের নিদ্রা পরিত্যাগ করলেন।

জা'ফর বলেন, সিলাত ছ্বলাত আদায় করেই যাচ্ছিলেন। অদূরে লুকিয়ে থেকে আমি তা দেখছিলাম। এমন সময় গভীর জঙ্গলের দিক থেকে একটি সিংহকে তার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। সিংহটি যখন ক্রমাগত তার দিকেই আসতে লাগল, তখন প্রাণের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আমি একটি গাছে উঠে গেলাম। গাছের উপর থেকেও আমি সিংহটির গতিবিধি এবং সিলাতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। অবশেষে সিংহটি সিলাতের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। আমি মনে মনে বললামঃ সিলাতের জন্য আফসোস!! ঐদিকে সিলাত সামান্যতম নড়াচড়া করছেন না। তিনি ছ্বলাতেই গভীরভাবে মনোযোগী রইয়ে গেলেন। তার মধ্যে ভয় কিংবা আতঙ্কের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হলো না। আবু জা'ফর বলেন, আমি ভাবলাম সিংহটি সম্ভবতঃ সিলাতের সিজদায় যাওয়ার অপেক্ষা করছে। সিজদায় গেলেই আক্রমণ করবে এবং তাকে চিরে-ফেড়ে খেয়ে ফেলবে। সিলাত সিজদায় গেলেন। সিজদা থেকে মাথা উঠালেন। সিংহটি তার সামনে দাঁড়িয়েই রইল। অবশেষে তিনি সালাম ফিরালেন। অতঃপর সিংহকে লক্ষ করে বললেন, ওহে সিংহ! এখান থেকে চলে যাও এবং অন্য স্থান থেকে তোমার রিযিক তালাশ করে নাও।

জা'ফর বলেন, এই কথা শুনে সিংহটি এমন জোরে গর্জে উঠলো, যাতে আশপাশের পাহাড় ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। অতঃপর সিংহ সেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। সিলাত পুনরায় ছ্বলাত শুরু করে দিলেন।

অবশেষে যখন সকাল ঘনিয়ে আসল, তখন সিলাত ছ্বলাত বন্ধ করে বসে গেলেন। বসে বসে সে আল্লাহর প্রশংসা ও সুউচ্চ গুণাবলী বর্ণনায় মশগুল হলেন। তিনি এমন কিছু যিকির-আযকার ও প্রশংসা করলেন, যা আমার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব হলো না। সবশেষে তিনি পাঠ করলেন

اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فمثلي لا يجترئ أن يسألك الجنة

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাই। আমার মতো অধমের পক্ষে তোমার কাছে জান্নাত চাওয়ার দুঃসাহস নেই"।

সিলাত আল্লাহর সামনে ইবনেয়-নম্রতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন করতে গিয়েই এই কথা বলেছেন। সিলাতের এই কথা প্রমাণ করে না যে, আমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবো না। আমরা অবশ্যই জান্নাত চাইবো। কারণ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউছ চাও। কারণ জান্নাতুল ফেরদাউছ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ জান্নাত। তবে কখনো কখনো বান্দার অবস্থা এমন হয়, যেখানে সে তার প্রভুর সামনে বিনয় ও দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য উপরোক্ত কথা বলে থাকে।

যাই হোক, ঘটনার বর্ণনাকারী জা'ফর ইবনে যায়েদ বলেন, অতঃপর সিলাত তাঁবুতে ফিরে এসে এমনভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি সারা রাত বিছানাতেই শুয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি ফজরের সময় সকলের সাথে প্রফুল্ল মন ও সতেজ শরীরসহ শয্যা ত্যাগ করলেন। ঐদিকে আমি রাত জেগে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে যে ভয়াবহ ও ভীতিকর দৃশ্য দেখেছিলাম, তাতে আমি একদম দুর্বল হয়ে পড়লাম।

জা'ফর ইবনে যায়েদ সিলাত ইবনে আশয়াম সম্পর্কে আরো বলেন, কাবুলের যুদ্ধে সিলাত আমাদের সাথে ছিলেন। শত্রুদের দেশের নিকটবর্তী হলে সেনাপতি আমাদেরকে বললেন, কেউ যেন সেনাবাহিনী থেকে আলাদা না হয়। ঐ সময় সিলাতের খচ্চরটি তার সমুদয় আসবাবপত্রসহ পলায়ন করলো। সিলাত তখন ছ্বলাত শুরু করার জন্য অগ্রসর হলেন। তাকে বলা হলো, তুমি ছ্বলাত শুরু করছো? লোকেরা তো চলে যাচ্ছে। সে বলল: খুব সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকআত ছ্বলাত পড়বো। জা'ফর বলেন, ছ্বলাত শেষে সিলাত দু'আ করতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে

সারিয়াকে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন মদীনার মিম্বারের উপর দাঁড়ানো। আর সারিয়া ও তার বাহিনী ছিল ইরাকের নাহাওয়ান্দে যুদ্ধরত। তিনি সেনাপতি সারিয়াকে "ইয়া সারিয়াতা আল-জাবাল" বলে ডাক দিলেন। সারিয়া এই ডাক শুনতে পেল এবং উমারের দিক নির্দেশনা পেয়ে উপকৃত হলো। মুসলিম বাহিনী শত্রুদের চক্রান্ত থেকে বেঁচে গেল।[২৮২]

এই প্রার্থনা করছি যে, তুমি অবশ্যই আমার খচ্চরটি মালপত্রসহ ফিরিয়ে দিবে। জা'ফর বলেন, এই কথা বলার সাথে সাথেই খচ্চরটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

সিলাত ইবনে আশয়াম সম্পর্কে আরো বলা হয় যে, সে কোন এক যুদ্ধে শরীক ছিল। সেই যুদ্ধে তার ঘোড়াটি মারা গেল। তিনি তখন আল্লাহর কাছে এই দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! কোনো সৃষ্টির প্রতি তুমি আমাকে মুখাপেক্ষী করো না। এই বলে তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার ঘোড়াটি জীবিত করলেন। ঘোড়ায় আরোহন করে তিনি বাড়িতে ফিরে এসে তার ছেলেকে বললেন, ঘোড়া থেকে গদিটি নামিয়ে রাখো। কারণ তা ভাড়া করে আনা হয়েছে। ঘোড়া থেকে গদিটি নামানোর পরপরই সেটি মৃত্যুমুখে পতিত হলো। এটি ছিল সিলাতের কারামত। তাকে সাহায্য ও সম্মানিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে এই কারামতটি দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে সাহায্য করা, কাফিরদেরকে পরাজিত করা, তার কুদরত প্রকাশ করা, তার বন্ধুদের সম্মান বৃদ্ধি করা এবং আরো অনেক কারণে অলীদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন।

২৮২ . ছাহাবীদের মধ্যে যেসব কারামত প্রকাশিত হয়েছে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। একটু পূর্বে আমরা আবু বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর একাধিক কারামত আমরা বর্ণনা করেছি। আরো যেসব ছাহাবীর কারামত প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে উসায়েদ ইবনে হুযায়ের এবং আব্বাদ ইবনে বিশরের কারামত অন্যতম।

উসাইদ ইবনে হুজাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি একদিন রাত্রি বেলায় সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলাম। আমার ঘোড়াটি কাছেই বাধা ছিল। হঠাৎ করে ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। ঘোড়াটিও থেমে গেল। পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলাম। ঘোড়াটি পুনরায় লাফাতে শুরু করলো। আমি এবারও কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। ঘোড়াটিও থেমে গেল। তারপর আমি একেবারেই তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। কারণ আমার শিশু পুত্র ইয়াহয়া ঘোড়াটির পাশেই ঘুমন্ত ছিল। আমার ভয় হল যে, ঘোড়াটি হয়তো ইয়াহয়াকে আঘাত করতে পারে, এই ভয়েই আমি মূলত কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, মাথার উপরে অসংখ্য আলোক বর্তিকার মত কি যেন দেখা যাচ্ছে। আলোক বর্তিকাগুলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে গেল। একটিও অবশিষ্ট রইলনা।

সকাল বেলা আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। বললাম হে আল্লাহর নাবী! গত রাত্রে আমি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। আমার ঘোড়াটি কাছেই বাধা ছিল। হঠাৎ করে ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। ঘোড়াটিও থেমে গেল। আবার তিলাওয়াত শুরু করলাম। আবার ঘোড়াটি লাফাতে শুরু করলো। আমি আবার কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। ঘোড়াটিও থেমে গেল। তারপর আমি একেবারেই তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। কারণ আমার শিশু পুত্র ইয়াহয়া ঘোড়াটির পাশেই ঘুমন্ত ছিল। আমার ভয় হল যে, ঘোড়াটি হয়তো ইয়াহয়াকে আঘাত করতে পারে, এই ভয়েই আমি মূলত কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। অতঃপর আমি ঘর থেকে বের হয়ে দেখলাম, মাথার উপরে

তারা আরো বিশ্বাস করে যে, এই উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত প্রকাশিত হওয়া অব্যাহত থাকবে।[২৮৩] অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার বেলায়াত পাওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে এই উম্মতের লোকদের মধ্যে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত কারামত প্রকাশিত হতেই থাকবে।

অসংখ্য আলোক বর্তিকার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। আলোক বর্তিকাগুলো আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে গেল। একটিও অবশিষ্ঠ রইলনা।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি জান এগুলো কী? তারা হলো আল্লাহর ফেরেশতা। তোমার কুরআন তিলাওয়াত শুনার জন্য তারা আগমন করেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তাহলে দুনিয়ার মানুষেরা তাদেরকে দেখতে পেত। কারণ কুরআন তিলাওয়াত শোনা ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হতনা।

আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র এবং উসাইদ ইবনে হুজাইর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ইশার ছ্বলাত আদায় করার পর অনেক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে কথাবার্তা বললেন। এতে অনেক রাত হয়ে গেল। রাত্রিটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কথাবার্তা শেষে তারা যখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবার থেকে বের হলেন তখন তাদের সামনে একটি আলোকবর্তিকা প্রকাশিত হয়ে রাস্তা আলোকিত করে দিল। আলোকবর্তিকাটি তাদের আগে আগে চলতে লাগল। রাস্তায় যখন তাদের পৃথক হওয়ার সময় হল একটি আলোকবর্তিকা দু'টিতে পরিণত হয়ে গেল। একটি আব্বাদ ইবনে বিশরের রাস্তাকে আলোকিত করে তার আগে আগে চলতে লাগল। তিনি উক্ত আলোতে পথ চলতে চলতে বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। এমনিভাবে অন্য আলোটি উসাইদ ইবনে হুজাইরের রাস্তাকে আলোকিত করলে তিনিও নির্বিঘ্নে বাড়িতে চলে গেলেন। (বুখারী, অধ্যায়: আব্বাদ ইবনে বিশর ও উসাইদ ইবনে হুযায়েরের ফযীলত।)

২৮৩. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ঘটনায় সংবাদ দিয়েছেন যে, সে একজন যুবক মুমিনকে ডাক দিবে। যুবক তার কাছে এসে বলবে, তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল। তোমার সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পূর্বেই সংবাদ দিয়েছেন। দাজ্জাল তখন তাকে হত্যা করে দুই টুকরা করে ফেলবে এবং তার মাঝখানে হাঁটবে। অতঃপর দাজ্জাল যুবকটিকে ডাক দিবে। তখন যুবকটি আল্লাহর একত্বের ঘোষণা দিতে দিতে উঠে দাঁড়াবে। দাজ্জাল পুনরায় তার নিজের জন্য যুবকটির কাছ থেকে উলুহীয়াতের স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করবে। লোকটি বলবে, তোমার সম্পর্কে আজকের চেয়ে অধিক অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে ছিল না। অর্থাৎ তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল, আমার এই বিশ্বাস আগের চেয়ে এখন আরো বেশী মজবুত হয়েছে। দাজ্জাল তখন দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে চাইবে। কিন্তু সে আর তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। দাজ্জাল দ্বিতীয়বার ঐ যুবকটিকে হত্যা করতে না পারা বিনা সন্দেহে যুবকের কারামতের অন্তর্ভুক্ত।

فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولم سموا بذلك

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তাদেরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত বলা হয়?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَاتِّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)[رواه أحمد (١٢٦/٤) وأبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وابن ماجه (٤٢) عن العرباض وصححه جماهير علماء الأمة].

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِ أَصْنَافِ النَّاسِ وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالدِّينِ وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الِاخْتِلَافُ وَانْتَشَرَتِ الْأُمَّةُ

অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম পথ হলো তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মুহাজির ও আনসারদের পথে চলে এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐ অসীয়ত মেনে চলে, যেখানে তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার পরবর্তীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের পথে চলবে। তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সাবধান! তোমরা দীনের মধ্যে নতুন বিষয়াদি উদ্ভাবন করা থেকে দূরে থাকবে। কেননা দীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন রীতিই ভ্রষ্টতা।[২৮৪]

তারা জানে যে, সর্বাধিক সত্য কথা হলো আল্লাহর কালাম এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হচ্ছে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত-পথ নির্দেশনা।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা আল্লাহর কালামকে সকল প্রকার মানুষের কালামের উপর প্রাধান্য দেয় এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ নির্দেশনাকে মানুষের সকল মতাদর্শের উপর অগ্রাধিকার দেয়। এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। তাদেরকে আহলুল জামা'আতও বলা হয়। কেননা জামা'আত অর্থ হলো ঐক্যবদ্ধ থাকা।[২৮৫] এর বিপরীত হলো ফির্কাবন্দী হওয়া বা দলাদলি করা। যদিও জামা'আত শব্দটি ঐক্যবদ্ধ একদল মানুষের পরিচয় সূচক নামে পরিণত হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের তৃতীয় মূলনীতি হলো ইজমা। ইলম অর্জন এবং দীন পালনের ক্ষেত্রে এ ইজমার উপর নির্ভর করা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দীন সম্পর্কিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও আমল তুলনা করে থাকে। উম্মাতের সালাফে সালেহীনের ইজমাই কেবল দীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য। কেননা তাদের পরে অনেক মতভেদ হয়েছে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়েছে।

.....

ব্যাখ্যা: পূর্বের অধ্যায়সমূহে আক্বীদাহর মাসআলাগুলোতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পথ আলোচনা করার পর এ অধ্যায় এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে শাইখুল ইসলাম দীনের সমস্ত মূলনীতি এবং শাখা-প্রশাখাগুলোর ক্ষেত্রে তাদের পথ বর্ণনা করেছেন। সে সাথে আহলুস সুন্নাতের লোকদের ঐসব বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করেছেন, যার মাধ্যমে তারা বিদ'আতী এবং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতাকারীদের থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে। সুতরাং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

---

২৮৪ . ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

২৮৫. তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলার কারণ হলো, তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং দলে দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয় না। তাদের সংখ্যা কম হলেও তারা একটি জামা'আত। মূলতঃ জামা'আত বলতে হকের উপর একাবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়। সংখ্যা কম হোক বা বেশী হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। সংখ্যা বেশী হলেও যারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দূরে তাদেরকে শরী'আতের পরিভাষায় জামা'আত বলা হয় না।

(১) প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের অনুসরণ করা: অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তারীকা অবলম্বন করে এবং তার মানহাজের (নিয়ম-পদ্ধতি) উপরেই চলে। এতে করে তারা ঐসব মুনাফেক থেকে আলাদা হয়ে যায়, যারা শুধু প্রকাশ্যভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করে থাকে; তারা গোপনে তার অনুসরণ করে না।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতকে আছার বলা হয়। আছার দ্বারা বাহ্যিক আছার তথা তার বাহ্যিক স্মৃতি ও রেখে যাওয়া জিনিসগুলো উদ্দেশ্য নয়। যেমন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বসার স্থানসমূহ, তার ঘুমানোর স্থানসমূহ ইত্যাদি। এগুলো খুঁজে বেড়ানো হলে শির্কে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন অবস্থা হয়েছিল পূর্বের জাতিসমূহের। [সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেই কথা, কাজ অথবা সমর্থন বর্ণিত হয়েছে, তাকেই সুন্নাত বলা হয়।]

(২) সর্বপ্রথম ইসলাম কবুলকারী মুহাজির ও আনসারদের পথ অবলম্বন করা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ইসলামের প্রথম যুগের এবং সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আনসার ও মুহাজিরদের পথেই চলে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাদেরকে দীনের জ্ঞান ও বোধশক্তি দিয়েছিলেন। তারা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জবানিতে ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করেছেন। তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারা সত্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে তারাই সর্বাধিক অনুসরণীয়। সুতরাং রসূলের পরে অনুসরণের দিক থেকে তাদের স্থান দ্বিতীয় স্তরে।

ফলে দীনের কোন মাসআলায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দলীল না পাওয়া গেলে ছাহাবীদের কথাই ঐ বিষয়ে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার অনুসরণ করা আবশ্যক হবে। কেননা তাদের পথ হলো সর্বাধিক নিরাপদ, সর্বাধিক জ্ঞান সম্পন্ন, অত্যাধিক সুস্পষ্ট এবং খুব মজবুত।

পরবর্তী যুগের কতিপয় লোকের ন্যায় এই কথা বলা ঠিক হবে না যে, সালাফদের পথ সর্বাধিক নিরাপদ হলেও পরবর্তীদের পথ সর্বাধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সুদৃঢ়। এতে করে তারা সালাফদের পথ পরিহার করে খালাফ তথা পরবর্তীদের পথেই চলে।

(৩) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসীয়ত মেনে চলা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর সেই অসীয়ত মেনে চলে যেখানে তিনি বলেছেন,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ من بعدي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح.

"তোমরা আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমরা দীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক বিদআতের পরিণাম গোমরাহী"।[২৮৬]

এখানে শাইখের উদ্দেশ্য হলো এই কথা বর্ণনা করা যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও সৎকর্মে অগ্রগামী সকল আনসার ও মুহাজিরদের পথ অনুসরণ করার সাথে সাথে বিশেষভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনেরও অনুসরণ করে থাকে। কেননা এ হাদীছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এখানে তিনি তার সুন্নাতকে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বুঝা গেল, খোলাফায়ে রাশেদীন বা তাদের কারো একজনের সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

الخلفاء الراشدون খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে চারজন খলীফা উদ্দেশ্য। আবু বকর, উমার, উছমান ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। তাদেরকে রাশেদীন তথা সুপথগামী বলার কারণ হলো তারা সত্যকে চিনতে পেরেছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন।

যে ব্যক্তি সত্যকে চিনতে পেরেছে এবং অনুসরণ করেছে, সেই রাশেদ বা সুপথপ্রাপ্ত। এর বিপরীত হলো, পথভ্রষ্ট। অর্থাৎ সত্যের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু সে আনুযায়ী আমল করেনি, সেই হলো পথভ্রষ্ট।

المهديين হিদায়াতপ্রাপ্ত: অর্থাৎ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সত্যের দিকে হিদায়াত করেছেন। تمسكوا بها তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। وعضوا عليها بالنواجذ অর্থাৎ এখানে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে ধারণ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাড়ির শেষপ্রান্তের দাঁতগুলোকে আযরাস বলা হয়।

محدثات الأمور নতুন বিষয়সমূহ: অর্থাৎ তোমরা সকল প্রকার বিদআত পরিহার

২৮৬. ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৬৭৬, দারিমী ৯৫, ইবনে মাজাহ ৪২।

করবে। فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ কেননা প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।

البدعة বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ماليس له مثال سابق "যার কোন পূর্ব নুমনা নেই"।

আর শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আতের পরিচয় হলো, যার পক্ষে শরী'আতের দলীল নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নতুন কিছু তৈরী করে দীনের দিকে সম্বন্ধ করবে, যার পক্ষে কোন দলীল নেই, তাই বিদআত ও গোমরাহী। চাই তা আক্বীদাহর ক্ষেত্রে হোক কিংবা কথা ও কাজের মধ্যে হোক।

(৪) আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করে, দলীল উপস্থাপন করার সময় মানুষের কথা ও কর্মের উপর এ দু'টিকে প্রাধান্য দেয় এবং তার অনুসরণ করে। কেননা তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর কালামই হলো সর্বাধিক সত্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا "আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্য আর কার কথা হতে পারে"? *(সূরা আন নিসা ৪:১২২)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا "আল্লাহর কথার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? *(সূরা আন নিসা ৪:৮৭)*

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াত হলো সর্বোত্তম হিদায়াত।

الهدي শব্দের 'হা' বর্ণে যবর ও 'দাল' বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়েছে। এর অর্থ হলো পন্থা, পথ, জীবন পদ্ধতি। الهدى শব্দটির هاء বর্ণে পেশ এবং دال বর্ণে যবর দিয়ে পড়াও জায়েয আছে। তখন অর্থ হবে রাস্তা দেখানো বা সঠিক পথ প্রদর্শন করা।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষের কথার উপর আল্লাহ তা'আলার কালামকে প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহর কালামকে প্রাধান্য দেয় এবং তাকেই গ্রহণ করে। মানুষের কথা আল্লাহর কালামের বিরোধী হলে তারা মানুষদের কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথাকেই গ্রহণ করে। তাদের মর্যাদা ও পদবী যত বড়ই হোক না কেন। রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা আলিম-ইমাম অথবা ইবাদতকারী, যেই হন না কেন, আল্লাহর কথার মোকাবেলায় তারা কারো কথা গ্রহণ করে না।

সেই সাথে তারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিদায়াতকে সকল মানুষের মতো ও পথের উপর প্রাধান্য দেয়। অর্থাৎ তারা তার সুন্নাত, জীবন চরিত, শিক্ষা ও উপদেশকে মানুষের আচরণের উপর প্রাধান্য দেয়।

সেই সাথে মানুষের পদমর্যাদা যত বড়ই হোক না কেন। বিশেষ করে যখন সেই মানুষের আচরণ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর উপর আমল করতে গিয়েই তারা তা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা শাসক (কর্তৃত্বশীল ও বিদ্বান) তাদেরও। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে যাও, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*।

وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ এ জন্যই তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে: আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে, মানুষের কথা ও আচরণের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে এবং আল্লাহর রসূলের হিদায়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কারণে ও সমস্ত মানুষের আচরণের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদেরকে আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ বলা হয়।

এ কারণেই তাদেরকে এই সম্মানজনক উপাধী দেয়া হয়েছে। এই সম্মানজনক উপাধী থেকে বুঝা যায়, যারা কুরআন ও সুন্নাহর পথ থেকে সরে গিয়ে পথভ্রষ্ট মু'তাযিলা, খারিজী, রাফেযী এবং অন্যান্য গোমরাহ লোকদের মতামতকে বা তার অংশ বিশেষকে সমর্থন করে, তারা ব্যতীত শুধু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআতের লোকেরাই আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণের বিশেষণে বিশেষিত।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদেরকে যেমন আহলুল কিতাব ওয়াস্ সুন্নাহ বলা হয় তেমনি আহলুল জামা'আতও বলা হয়।

الجماعة শব্দটি الفُرْقَة (ফির্কাবন্দী, বিভেদ ও দলাদলি) শব্দের বিপরীত। আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরলে ঐক্য ও সংহতি তৈরি হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ থাকার আদেশ দিয়ে বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রুজ্জুকে মজবুতভাবে আকঁড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" *(সূরা আলে ইমরান: ১০৩)*।

সুতরাং এখানে জামা'আত বলতে হকের উপর ঐক্যবদ্ধ লোকদেরকে বুঝায়।

(৫) আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত থেকে দলীল গ্রহণ করে, হকের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকে এবং কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে। এর ফলেই ইসলামী শরীয়তে তৃতীয় মূলনীতি ইজমার উৎপত্তি হয়েছে। দ্বীনি ইলম অর্জন ও আমলের ক্ষেত্রে এই তৃতীয় মূলনীতি ইজমাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

উসূলবিদগণ ইজমার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন যে, الأجماع هو اتفاق علماء العصر على أمر ديني দীনের কোন বিষয়ে একই যুগের আলেমদের ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়। ইজমা একটি অকাট্য দলীল। ইহার উপর আমল করা জরুরী। ইজমার স্থান যেহেতু আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের পরে, তাই ইহাকে তৃতীয় মূলনীতি বলা হয়।

(৬) আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাত এবং আলেমদের ইজমা দ্বারা মানুষের কথাসমূহকে যাচাই করা: আহলুস আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই তিনটি মূলনীতির মাধ্যমে মানুষের দীন সম্পর্কিত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও আমল তুলনা করে থাকে। তারা এই তিনটি মূলনীতিকে হক ও বাতিলের মাঝে এবং হিদায়াত ও গোমরাহীর মাঝে পার্থক্য করার মানদণ্ড হিসাবে নির্ধারণ করে। সুতরাং তাদের থেকে আক্বীদাহ কিংবা আমল সম্পর্কিত যেসব কথা, কাজ ও আচরণ প্রকাশিত হয়, সেগুলোকে তারা এ দাড়িপাল্লায় রেখে ওজন করে। দীন সম্পর্কিত সকল বিষয়ই তারা এ তুলাদন্ডের সাহায্যে যাচাই করে। যেমন ছ্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত এবং অন্যান্য আচার-ব্যবহার। আর জাগতিক যেসব বিষয়ের সাথে দীনের কোন সম্পর্ক নেই, যেমন মানুষের সাধারণ অভ্যাসসমূহ এবং দুনিয়াবী বিষয়াবলী, সেগুলোর ব্যাপারে মূলনীতি হলো ঐ সমস্ত কিছুই বৈধ।

অতঃপর যে ইজমাকে দীনী বিষয়ে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে ধরা হবে, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) তার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: বাস্তবে যেসব বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হয়েছে, তা দ্বারা কেবল ঐসব বিষয় উদ্দেশ্য, যার উপর ছিলেন উম্মতের সালাফে সালেহীনগণ। অর্থাৎ সালাফে সালেহীনদের ইজমাই কেবল দীনের মূলনীতি হিসাবে গণ্য। কেননা তারা ছিলেন আরব উপদ্বীপের হিজায অঞ্চলের একস্থানে একত্রিত অবস্থায়। তাদের সকলকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং দীনী বিষয়ে তাদের সকলের মতামত জানা সম্ভব ছিল। তাদের

পরে বহু মতভেদ হয়েছে এবং উম্মাত দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। সুতরাং সালাফে সালেহীনের পরে নিম্নের দু'টি কারণে ইজমাকে নিয়ন্ত্রিণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

(ক) সালাফে সালেহীনের যুগের পরে ইখতেলাফ-মতানৈক্য এত বেশী হয়েছে যে, আলিমদের সকল কথা আয়ত্তে আনয়ন ও সংরক্ষণ করা অসম্ভব।

(খ) ইসলামী বিজয় অভিযানের পর মুসলিম জাতির আলিমগণ পৃথিবীর সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছেন যে, কোন বিষয় তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছা এবং তাদের সকলের পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভব ছিল না। দৃঢ়তার সাথে তা বলা সম্ভব নয় যে, তারা সকলেই উক্ত বিষয়ে এক ও অভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

একটি সতর্কতা: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া দীনের মূলনীতি তিনটিকেই উল্লেখ করেছেন।

চতুর্থ মূলনীতি কিয়াস উল্লেখ করেননি। কেননা কিয়াস শরী'আতের মূলনীতি হওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। যেমন মতভেদ রয়েছে দীনের অন্যান্য মূলনীতির ব্যাপারে। এ বিষয়ে উসূলে ফিক্বহের কিতাবসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে সেগুলো পড়তে হবে।[২৮৭]

২৮৭. মূলতঃ আক্বীদাহ বিষয়ে মূলনীতি উক্ত তিনটিই মাত্র। কিয়াস দ্বারা আক্বীদাহ সাব্যস্ত হয় না। তাই এখানে চতুর্থটির উল্লেখ করা হয়নি।

فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة

আক্বীদাহর বিষয়গুলোর পরিপূরক হিসাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যেসব সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎকাজ করে থাকে, সে ব্যাপারে এ অনুচ্ছেদ

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ

পূর্বে যেসব মূলনীতির কথা আলোচনা করা হলো, তা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয়, শরী'আতের অপরিহার্য দাবী মুতাবেক অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে এবং শাসক গোষ্ঠির সাথেই হজ্জ পালন করে, জিহাদ করে, জুমু'আ ও ঈদের ছ্বলাত আদায় করে। এটিকে তারা আবশ্যক মনে করে। শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ন হোক কিংবা যালেম ও পাপাচারী হোক, -উভয় অবস্থাতেই তারা উপরোক্ত কাজগুলো তাদের সাথেই সম্পাদন করে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে, উম্মতের সকল শ্রেণীর মানুষকে নছীহত করাকে ইবাদত ও দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। তারা এই হাদীছ দু'টির মর্মার্থ বাস্তবায়ন করাকে আক্বীদাহর অংশ মনে করে, যাতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ»

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ। তারা একে অপরকে শক্তিশালী

করে। এই বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন"।[২৮৮] তিনি আরো বলেন:

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (بخارى:٦٠١١)

"পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি ঈমানদারদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়"।[২৮৯]

সেই সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা বালা-মুছীবত ও বিপদাপদের সময় সবর করা, সুখ-শান্তির সময় আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাক্বদীরের তিক্ত বিষয়গুলো সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়ার উপদেশ প্রদান করে।

.....

ব্যাখ্যা: এই অধ্যায়টি পূর্বের অধ্যায়ের পরিপূরক স্বরূপ। এতে শাইখুল ইসলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের ঐসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, যা তাদের আক্বীদাহর বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। শাইখুল ইসলাম বলেন: অতঃপর আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই মূলনীতিগুলোর সাথে অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেসব মূলনীতি অতিক্রান্ত হলো, তারা সেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার সাথে সাথে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জন করে, যা তাদের আক্বীদাহর মৌলিক বিষয় না হলেও আক্বীদাহর বিষয়গুলোকে পূর্ণতা দান করে। সেগুলো তাদের গৃহীত আক্বীদাহর ফলাফলও বটে। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের এই বৈশিষ্ট্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম জাতি। তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে মানুষের হিদায়াত

---

২৮৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৮১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৮৫, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৩১, সুনানুর কুবরা বাইহাকী ১১৫১১।

২৮৯. ছ্বহীহ বুখারী ৬০১১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৮৬।

ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা উত্তম কাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে" *(সূরা আলে ইমরান ৩:১১০)*

ঈমান ও সৎ আমল সম্পর্কিত যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, তাই উত্তম কাজ বলে বিবেচিত। আর আল্লাহ তা'আলা যা অপছন্দ করেন এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেন, তাই অপছন্দীয় কাজ বলে বিবেচিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শরী'আতের দাবী মুতাবেক অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতা থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে এবং সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ হতে বারণ করতে গেলে কল্যাণ অর্জিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি সামনে রেখে প্রথমে শক্তি প্রয়োগ করে, শক্তি না থাকলে জবানের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, তাও না থাকলে অন্তর দিয়ে অন্যায়ের অপসারণ কামনা করে ও আল্লাহর নিকট অন্যায়ে লিপ্তদের হিদায়াতের জন্য দু'আ করে। মু'তাযিলারা এ বিষয়ে শরী'আতের দাবী ও বাধ্যবাধকতা মানে না। তারা মনে করে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ বলতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকেই বুঝায়।

শাসক গোষ্ঠি ন্যায়পরায়ণ কিংবা **ফাসিক** যাই হোক না কেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের সাথেই হাজ্জ পালন, জিহাদ, জুমু'আ ও ঈদাইনের ছ্বলাত সম্পন্ন করে। মুসলিমদের শাসকদের অধীনে থেকে দীনের এ নিদর্শন বা অনুষ্ঠানগুলো পালন করাকে তারা আক্বীদাহর অংশ মনে করে। শাসকরা যদি সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয় এবং দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে অথবা তারা যদি এমন পাপাচারী হয়, যা তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না, তাহলেও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা শাসকদের অনুগত থাকে এবং তাদের সাথেই উপরোক্ত কাজগুলো সম্পাদন করে।

ফাসিক্ব ও পাপাচারী শাসকদের সাথে ঐ কাজগুলো করার পিছনে মুসলিমদের উদ্দেশ্য হলো ঐক্য ঠিক রাখা এবং দলাদলি ও ফির্কাবন্দী থেকে দূরে থাকা। আর **ফাসিক** শাসক নিজের পাপাচারের কারণে শাসন ক্ষমতা থেকে নেমে যাবে না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কেননা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গেলে মানুষের হক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রচুর রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: অতীতে যেসব ফির্কা শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাদের বিদ্রোহের কারণে যে পরিমাণ লাভ হয়েছে, তার চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে অনেক বেশী।

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এ বিষয়ে ঐসব খারিজী, মু'তাযিলা, শিয়া এবং বিদ'আতীদের থেকে আলাদা, যারা মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিদ্রোহ করাকে বৈধ মনে করে। বিশেষ করে যখন তারা শাসকদেরকে

এমন কিছু করতে দেখে, যা যুলুম কিংবা যুলুম বলে ধারণা করা হয়। তারা এই বিদ্রোহকে সৎকাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত মনে করে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের প্রতি বিশেষ যত্নবান থাকে: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ফরয ছ্বলাত জামা'আতের সাথে আদায় করার জন্য মসজিদে উপস্থিত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। চাই তা জুমু'আর ছ্বলাতের জামা'আত হোক বা ওয়াকতীয়া ছ্বলাতের জামা'আত হোক। কেননা জুমু'আ ও জামা'আত ইসলামের বৃহৎ নিদর্শনসমূহের অন্যতম এবং তাতে রয়েছে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আনুগত্য। তারা ঐসব শিয়াদের মত করে না, যারা নিষ্পাপ ইমাম ছাড়া অন্য কারো সাথে ছ্বলাত পড়াকে বৈধ মনে করে না। তারা মুনাফেকদের থেকেও ভিন্ন, যারা জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে। জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের অনেক ফযীলত রয়েছে, জামাআতে শরীক হওয়ার আদেশ এসেছে এবং তা থেকে পিছিয়ে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি যেহেতু জামা'আতের সাথে ছ্বলাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনার স্থান নয়, তাই বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হলো।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকদেরকে নছীহত করাকে ইবাদত ও দীনের অংশ মনে করে। النصح শব্দের মূল অর্থ আন্তরিকতা, খাঁটিত্ব বিশুদ্ধতা ইত্যাদি। আর শরী'আতের পরিভাষায়: هي إرادة الخير للمنصوح له وإرشاده إلى مصالحه অর্থাৎ উপদেশ দানকৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করা এবং তার উপকার সাধনকারী বিষয়দির দিকে পথ নির্দেশ দেয়াকে নছীহত বলা হয়। সুতরাং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উম্মতের জন্য শুভ কামনা করে এবং যাতে তাদের কল্যাণ রয়েছে, তার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে।[২৯০]

---

২৯০. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: لِلّٰهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُوْلِهِ وَ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ عَامَّتِهِمْ

"দীন হলো নছীহত বা নছীহত দীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছাহাবীগণ বলেন: আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য নছীহত? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা, তার কিতাব, তার রসূল, মুসলিমদের শাসক এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য"। (ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৮২)

আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহতের অর্থ কী:

আল্লাহ তা'আলার জন্য নসীহতের অর্থ হল, সত্যিকার ভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্ কুরআন এবং রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন

তা সত্য বলে মেনে নেয়া। নিষ্ঠার সাথে এককভাবে তার ইবাদত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা। তিনি যেসব বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো বাস্তবায়ন করা, নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকা, তিনি যা ভালোবাসেন তা ভালোবাসা এবং তার অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করা। মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আর কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা। যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করলো সে স্বীয় প্রভুর জন্য নছীহত আদায় করলো। পবিত্র কুরআন থেকে এই হাদীছের সমর্থনে নিম্নের আয়াতটি সাক্ষ্য হিসেবে প্রযোজ্য:

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা আল্লাহ্ ও তার রসূলের জন্য কল্যাণ কামনা করবে এবং তাদের সাথে মনের দিক থেকে পবিত্র হবে।" (সূরা তাওবা: ৯১)

আল্লাহ্র কিতাবের নছীহত:

এ কথার অর্থ হলো, কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা। যেমন ঈমান রেখেছিলেন সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ। ইমাম ত্বহাবী (রহ:) বলেন: আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। তা আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে। অহী আকারে তিনি তা অবতীর্ণ করেছেন। মুমিনগণ সত্য হিসেবে তা বিশ্বাস করে এবং দৃঢ় আস্থা রাখে যে আল্কুরআন সৃষ্টি জগতের ন্যায় আল্লাহ্র সৃষ্ট নয় বরং তা প্রকৃতই আল্লাহ্র কালাম সুতরাং তা শুনে কেউ যদি ধারণা করে যে তা মানুষের কথা তাহলে সে কুফরী করলো। এ ধরণের লোকদেরকে আল্লাহ্ তায়া'লা দুষ্কৃতিকারী ও পাপাচারী বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদেরকে "সাকার" নামক জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছেন। তিনি বলেন: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر যে এ কথা বলে ইহা মানুষের কথা বৈ কিছু নয়, তাকে অচিরেই আমি "সাকার" নামক জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (শরহুল আক্বীদাহ আত্ ত্বহাবীয়া)

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, আল্-কুরআন নিঃসন্দেহে মানুষের স্রষ্টার বাণী, তা মানুষের কথার সাথে কোন ভাবেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত বা পঠনও তার জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্গত। আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا "এবং কুরআন তিলাওয়াত করো তারতীল সহকারে সুবিন্যস্ত ভাবে"। (সূরা মুযাম্মিল: ৪) এমনিভাবে মুসলিমদেরকে তা শিক্ষাদান করাও মঙ্গল কামনার অন্তর্গত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং তা অন্যকে শিখায়"। (ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪৬৩৯)

রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য নছীহত:

আল্লাহ তা'আলার বাণী: إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ইমাম কুরতুবী (রহ:) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: আল্লাহ্র রসূলের জন্য নসীহতের অর্থ হলো তার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তার আদেশ ও নিষেধের আনুগত্য করা, তার বন্ধুকে বন্ধু এবং শত্রুকে শত্রু ভাবা, তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, তাঁকে এবং তার পরিবারকে ভালোবাসা, তার সুন্নাতের তাযীম করা, তার ইন্তেকালের পর তার সুন্নাতের লালন করা, গভীর জ্ঞানলাভের জন্য তার গবেষণা করা,

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কল্যাণের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করে এবং তাদের কেউ আহত হলে কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার ব্যথায় ব্যথিত হয়। সুতরাং তারা এই হাদীছের মর্মার্থে বিশ্বাস করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য এমন প্রাচীর সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।[২৯১] তিনি আরো বলেন:

প্রচার-প্রসার এবং তার প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া এবং তার মহান চরিত্রে চরিত্রবান হতে সচেষ্ট থাকা। {(তাফসীরে কুরতুবী, (৮/২২৭)}

মুসলিম শাসকদের জন্য নছীহত:

মুসলিম শাসকদের মঙ্গল কামনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, শাসকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদেরকে সহযোগিতা করা, উদাসীনতার মুহূর্তে সতর্ক করা, ভুল-ত্রুটির মুহূর্তে বিদ্রোহ না করে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে তাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। তাদের জন্য সর্বোত্তম কল্যাণ কামনা হলো, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যায় ও যুলুমের পথ থেকে তাদেরকে বাধা দান করা। {(ফতহুলবারী, ১/১৩৮)}

সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা:

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলজনক বিষয়ে নির্দেশনা দান, দীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞান দান করা এবং এ ব্যাপারে কথা ও কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপন রাখা এবং তা সংশোধন করার ব্যবস্থা করা। ক্ষতি এবং কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা তথা তাদের হিতসাধন করার চেষ্টা করা। দয়া ও নিষ্ঠার সাথে তাদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা। সকলের প্রতি সহনশীল হওয়া। বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি দয়া করা। উত্তম পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া, ধোঁকা ও হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করা। নিজের অপছন্দনীয় বস্তু তাদের জন্য অপছন্দ করা। তাদের ধন-সম্পদ ও ইজ্জতের হিফাযত করা। মোটকথা সার্বিক দিক থেকে সাধারণ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করা।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, কল্যাণকামিতা শুধু মুসলিমদের সাথেই সীমিত নয়, বরং অমুসলিমদের জন্যও তা অপরিহার্য। কেননা রসূলুল্লাহ্ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জাতির কল্যাণ কামনা করেছেন তথা তাদেরকে শির্ক ও মূর্তি পূজার অন্ধকার থেকে তাওহীদের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

২৯১. ছ্বহীহ বুখারী ৪৮১, ছ্বহীহ মুসলিম ২৫৮৫, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান ২৩১।

«تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» (بخارى:٦٠١١)

"পরস্পরের প্রতি দয়া-মায়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ অনিদ্রা এবং জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়"।[২৯২]

উপরের হাদীছ দু'টি দেখিয়ে দিচ্ছে যে, মুসলিমদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা কেমন হওয়া উচিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা এই হাদীছ দু'টির দাবী অনুযায়ী আমল করে।

এক মুমিনের সাথে অন্য মুমিনের সম্পর্ক এবং মুমিনদের দৃষ্টান্ত: এখানে ঈমান বলতে পূর্ণ ঈমান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একজন পূর্ণ মুমিনের সাথে অন্য একজন পূর্ণ মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হলো, যেমন একটি মজবুত প্রাচীর, যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত ও লাগানো। মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তা সহজভাবে বুঝানোর উদ্দেশ্যে এই দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।

যার এক অংশ অন্য অংশের সাথে মজবুতভাবে যুক্ত: এই বাক্যে মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

وشبك بين أصابعه তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহকে জালের মত বানালেন: এটি হলো মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের আরেকটি দৃষ্টান্ত। এ কথা বুঝোনোর উদ্দেশ্যে এই উদাহরণটি পেশ করা হয়েছে। তারা সকলেই একটি মাত্র দেহের মত হবে। অর্থাৎ একটি শরীরের সমস্ত অঙ্গ যেমন পরস্পর জড়িত এবং আরাম ও কষ্ট অনুভব করার মধ্যে যেমন শরীরের সবগুলো অঙ্গই শরীক হয়, ঠিক তেমনি সমস্ত মুমিন মিলে একটি দেহের মতোই। তাদের একজনের সুখ-শান্তি সকলেরই সুখ-শান্তি এবং একজনের দুঃখ-বেদনা সকলেরই দুঃখ-বেদনা।

তারা পরস্পরকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে এবং পরস্পরের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনে একই দেহের মত। দেহের কোন অঙ্গ যখন অসুস্থ হয় এবং ব্যথা অনুভব করে তখন এক অঙ্গের ব্যথায় অন্য অঙ্গ শরীক হয়। অর্থাৎ শরীরের সকল অঙ্গই ব্যথিত হয়। সেই ব্যথার কারণে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অনিদ্রায় রাত কাটাতে হয়। এমনি কোন মুসলিম যদি ব্যথিত হয়, তখন বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সেই ব্যথায় শরীক হবে, এটিই ঈমানের দাবী।

---

২৯২. ছহীহ বুখারী ৬০১১, ছহীহ মুসলিম ২৫৮৬।

এই হাদীছে মুসলিমদের পারস্পরিক বন্ধনের স্বরূপ তুলে ধরা হলেও তাতে মূলত আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ শরীরের এক অংশ ব্যথিত হলে সমস্ত শরীরেই যেমন সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে, মুমিনদের অবস্থাও ঠিক একই দেহের মত হওয়া উচিত। তাদের কেউ কোন মুছীবতে আক্রান্ত হলে সকলেরই তার সাথে ব্যথিত হওয়া উচিত এবং তার সেই মুছীবত অপসারণের জন্য সকলে মিলে চেষ্টা করা উচিত। এখানে বিষয়টিকে সহজভাবে পেশ করার জন্য উপমা প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের তাৎপর্যকে দৃশ্যমান চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা বিপদাপদ ও মুছীবতের সময় দৃঢ়পদ থাকে এবং মুছীবতের সময় পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেয়।

الصبر শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আটকিয়ে রাখা, বাধা দেয়া। এখানে সবর অর্থ হলো মুছীবতের সময় নফসকে অস্থিরতা প্রকাশ করা হতে বিরত রাখা, অভিযোগ ও বিরক্তি প্রকাশ করা হতে জবানকে আটকিয়ে রাখা এবং গালে চপেটাঘাত করা ও বুকের দিক থেকে শরীরের জামা ছিড়ে ফেলা থেকে হাতকে বিরত রাখা।

البلاء অর্থ হলো মুছীবত ও কঠিন অবস্থায় ফেলে পরীক্ষা করা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিয়ামত ও সুখ-শান্তিতে থাকার সময় তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে।

الشكر বলা হয় এমন কাজকে, যা নিয়ামত প্রদান করার কারণে নিয়ামত প্রদানকারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তা আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে ব্যয় করার নামই الشكر (কৃতজ্ঞতা)। প্রচুর ও ব্যাপক নিয়ামতকে বলা হয় الرخاء (স্বাচ্ছন্দ্য)।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তারা তাক্বদীরের তিক্ত ফায়ছালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। الرضا (সন্তুষ্ট থাকা) السخط (অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ) করার বিপরীত। القضاء শব্দের আভিধানিক অর্থ হুকুম করা, ফায়ছালা করা। সকল সৃষ্টি এবং তার আসল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ইলম ও সে অনুযায়ী

তা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করাকেই শরী'আতের পরিভাষায় القضـــاء বলা হয়।[২৯৩] তাক্বদীরের তিক্ত বিষয় দ্বারা ঐসব অপছন্দনীয় বিষয় উদ্দেশ্য, যা বান্দার উপর আপতিত হয়। যেমন রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র, মানুষের কষ্ট, গরম, ঠান্ডা এবং নানা রকম ব্যথা-বেদনা।

২৯৩. আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেন, القدر ও القضاء (ক্বদ্বা-আল্লাহর ফায়ছালা ও ক্বদর-ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা) এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, أزل বা আদিতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সবকিছু নির্ধারণ করে রাখাকে ক্বদর বলা হয়। আর যথাসময়ে তা সৃষ্টির ফায়ছালাকে ক্বদ্বা বলা হয়। আল্লাহ যখন নির্দিষ্ট কোনো জিনিস অমুক সময় হবে বলে নির্ধারণ করেন, তখন তাকে ক্বদর বলা হয়। আর যখন ঐ জিনিসটি সৃষ্টি করার নির্দিষ্ট সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন তার ফায়ছালা করা এবং অস্তিত্বে নিয়ে আসাকে ক্বদ্বা বলা হয়। কুরআনুল কারীমে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقُضِيَ الْأَمْرُ "তখন সবকিছুর ফায়ছালা হয়ে যাবে"। (সূরা আল-বাকারা: ২১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ﴾ "আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়ছালা করেন"। (সূরা গাফের: ২০) এ রকম আয়াত আরো রয়েছে। সুতরাং ক্বদর হলো আদিতেই আল্লাহর নির্ধারণের নাম। আর ক্বদ্বা হলো সংঘটিত হওয়ার সময় সে সম্পর্কে ফায়ছালা করার নাম।

কেউ কেউ বলেছেন, ক্বদ্বা ও ক্বদরের অর্থ একই। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কথা হলো, উভয় শব্দকে একসঙ্গে উল্লেখ করা হলে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে উভয়টি দ্বারা একই অর্থ বুঝতে হবে। ঈষৎ পরিবর্তনসহ শাইখের কথা এখানেই শেষ। কেউ কেউ বলেছেন, ভবিষ্যতে সৃষ্টিসমূহের যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার অবগতিকে ক্বদর বলা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার ইলম ও ইচ্ছা অনুযায়ী সবকিছু সৃষ্টি করাকে ক্বদ্বা বলা হয়। (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا﴾ وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَحُسْنِ الْجِوَارِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ وَالْبَغْيِ وَالِاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلْقِ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأَخْلَاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا هُمْ فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র, সুমহান আচরণ এবং সৎ আমলের প্রতি আহবান করে। তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বাণীর মর্মার্থকেও বিশ্বাস এবং বাস্তবায়ন করে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম"।[২৯৪]

যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার আহবান জানায়, যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তাকে দান করার আদেশ করে এবং যে তোমার উপর যুলুম করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার উপদেশ দেয়।[২৯৫]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার বন্ধন ঠিক রাখা এবং প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, ইয়াতীমদের প্রতি, মিসকীনদের প্রতি দয়া করার উপদেশ দেয়, মুসাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করার আদেশ করে এবং দাস-দাসী ও অধস্তনদের প্রতি কোমল ব্যবহার করার আহবান জানায়। একই সাথে তারা গর্ব, দাম্ভিকতা, অহংকার, যুলুম এবং ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করে।

---

২৯৪. ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭।

২৯৫. দানের বদলে দান করা এবং সদ্ব্যবহারের পরিবর্তে সদ্ব্যবহার করা প্রকৃত সদাচরণ ও বদান্যতা নয়; বরং তা ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই। দুর্ব্যবহারের মোকাবেলায় উত্তম ব্যবহার করা এবং বঞ্চিত করার বদলে দান করাই প্রকৃত বদান্যতা ও উদারতার পরিচয়।

তারা সুমহান চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করার আদেশ করে এবং মন্দ স্বভাব বর্জন করার আহবান জানায়। মোটকথা, উপরোক্ত বিষয়গুলো এবং অন্যান্য বিষয় থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে।

.....

ব্যাখ্যা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উত্তম চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। তারা নিজেরা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে, অন্যদেরকেও তা অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয় এবং সুন্দরতম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি মানুষকে আহবান জানায়। الأخلاق শব্দটি خلق -এর বহুবচন। خلق শব্দের خاء ও لام বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হলে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলী।

আর যদি خاء বর্ণে যবর এবং لام বর্ণে সাকীন দিয়ে পড়া হয়, তাহলে তা দ্বারা বাহ্যিক গঠন ও আকৃতি উদ্দেশ্য হবে। বাহ্যিক আকৃতি বলতে মানুষ্যের প্রকাশ্য স্বভাব-চরিত্র উদ্দেশ্য।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সর্বোত্তম কাজ যেমন ভদ্রতা, বীরত্ব, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর প্রতি আহবান জানায়। তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণীর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং উক্ত বাণীর দাবী অনুযায়ী আমল করে, যেখানে তিনি বলেছেন:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"ঐ ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র উত্তম"।[২৯৬]

ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী ইহাকে হাসান ছ্বহীহ বলেছেন। সর্বোত্তম চরিত্র বলতে কোমল, নরম ও সুন্দরতম চরিত্র উদ্দেশ্য।

সুতরাং এ হাদীছে সুন্দরতম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ হাদীছ থেকে আরো জানা গেল যে, বান্দাদের আমলসমূহ ঈমানের মধ্যে গণ্য। আরো জানা গেল, ঈমান বৃদ্ধি পায়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা একদিকে যেমন মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার আহবান জানায়, হকদারদের হক আদায় করার আদেশ

২৯৬. ছ্বহীহ: আবু দাউদ ৪৬৮২, তিরমিযী ১১৬২, দারিমী ২৮৩৪, মুসনাদে আহমাদ ১০৮১৭।

করে, অপর দিকে এর বিপরীত বিষয়গুলো যেমন অহংকার, দাম্ভিকতা ও যুলুম করা হতে সতর্ক করে।

সুতরাং যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং দুর্ব্যবহার করে তারা তোমাকে ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা ও সদ্ব্যবহার করার আহবান জানায়, যে তোমাকে মাহরুম করে, তোমাকে ঐ ব্যক্তির জন্য খরচ করা, তাকে উপঢৌকন এবং অন্যান্য বস্তু দান করার আহবান জানায়। কেননা ইহাই প্রকৃত ইহসান ও ভদ্রতার পরিচয়।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তোমাকে আরো আহবান জানায় যে, তোমার উপর যে ব্যক্তি যুলুম করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। অর্থাৎ তোমার জান-মাল ও মান-সম্মানের কোন ক্ষতি করলেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দিবে। কেননা তাকে ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে তুমি তার ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে এর বিনিময় পাবে।

بر الوالدين পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হকদারদের হকসমূহ আদায় করার যে আদেশ করেছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সে হকগুলো আদায় করার আদেশ করে।

যেমন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা, পাপাচারের আদেশ ব্যতীত তাদের অন্যান্য আদেশ পালন করা এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া প্রদর্শন করা।

صلة الأرحام আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা: তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখার অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের প্রতি সুন্দরতম আচরণ করার আহবান জানায়। الأرحام শব্দটি رحم শব্দের বহুবচন। যার সাথে আপনার আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে, সেই আপনার رحم (নিকটাত্মীয়)।

حسن الجوار প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার: যারা আপনার আশপাশে বসবাস করে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়ার আহবার জানায়।

وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ইয়াতীমদের প্রতি, মিসকীনদের প্রতি এবং মুসাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করা: اليتامى শব্দটি يتيم -এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে অনাথ শিশুকে ইয়াতীম বলা হয়।

ইসলামী পরিভাষায় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যে শিশুর পিতা মারা যায় তাকে ইয়াতীম বলা হয়। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা ইয়াতীমের প্রতি অনুগ্রহ করার আহবান জানায়। ইয়াতীমদের খোঁজ-খবর নেয়া, তাদের ধন-সম্পদের দেখা-শোনা করা এবং তাদের প্রতি দয়া করাই হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার নামান্তর।

মিসকীনদের প্রতি দয়া করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। **مَسَاكِيْن** শব্দটি مسكين শব্দের বহুবচন।

মিসকীন বলা হয় সে অভাবী লোককে, দরিদ্রতা এবং অভাব যাকে দুর্বল করেছে, তাদেরকে দান-খয়রাত করা এবং কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে হয়।

মুসাফিরের প্রতি সদ্ব্যবহর করা ও তার হক আদায় করাও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যে মুসাফিরের পথের সম্বল শেষ হয়েছে কিংবা তার টাকা-পয়সা হারিয়েছে অথবা চুরি হয়েছে, তাকেই কেবল সাহায্য করা আবশ্যক।[২৯৭]

কেউ কেউ বলেছেন: কুরআনের যে আয়াতে মুসাফিরের হক আদায় করতে বলা হয়েছে, সেখানে মুসাফির বলতে মেহমান উদ্দেশ্য।

الرفق بالمملوك। দাস-দাসী ও অধস্তনদের প্রতি কোমল ব্যবহার করা: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা দাস-দাসী ও অধস্তনদের প্রতি সদাচরণ করার আহবান জানায়। চতুস্পদ জন্তুও অধস্তনদের মধ্যে গণ্য। সুতরাং জীব-জন্তুর প্রতিও অনুগ্রহ করতে হবে এবং তাদের অধিকার পুরোপুরি দিতে হবে।[২৯৮] الرفق ضد العنف অর্থাৎ কঠোরতার বিপরীত ব্যবহারই হলো কোমল ব্যবহার অর্থাৎ নম্রতা।

---

২৯৭. তবে যে মুসাফিরের কাছে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য সম্পদ রয়েছে, তার জন্য ছদাকা ও মানুষের অন্যান্য অনুগ্রহ গ্রহণ করা জায়েয নেই।

২৯৮ . অন্যথায় পরিণাম কী হতে পারে, এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে জান্নাতের ফলসমূহ থেকে এক ছড়া ফল তোমাদের কাছে নিয়ে আসতে পারতাম। এমনিভাবে জাহান্নামও আমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আমি বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও কি তাদের সাথে রাখা হবে? হঠাৎ আমি সেখানে একটি মহিলা দেখতে পেলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, একটি বিড়াল মহিলাকে নখ দিয়ে খামচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি বললাম, এই মহিলাটির অবস্থা এমন কেন? তারা বললেন, মহিলা বিড়ালটিকে অনাহারে মৃত্যু পর্যন্ত বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে খেতে দেয়নি এবং যমীন থেকে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি। (ছহীহ বুখারী)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা গর্ব, অহংকার এবং যুলুম করতে নিষেধ করে। বংশমর্যাদা এবং আভিজাত্য নিয়ে বড়াই করার নাম গর্ব। الخيلاء শব্দের خاء বর্ণে পেশ দিয়ে পড়া হয়েছে। ইহার অর্থ হলো অহংকার ও দাম্ভিকতা। মানুষের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর আক্রমণ করাকে البغي বলা হয়।

الاستطالة على الخلق ন্যায়ভাবে কিংবা অন্যায়ভাবে নিজেকে বড় মনে করা ও অন্যকে ছোট মনে করা হতে নিষেধ করা: অর্থাৎ মানুষের উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা, মানুষকে তিরস্কার করা এবং তাদের মান-সম্মানে আঘাত করা হতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা নিষেধ করে। সেটি ন্যায় সংগতভাবেই হোক আর অন্যায়ভাবেই হোক। ন্যায় সংগতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা হলে তা অহংকার ও দাম্ভিকতা বলে গণ্য হবে। আর অন্যায়ভাবে হলে তা যুলুম হিসাবে গণ্য হবে। দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা জায়েয নেই।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মানুষকে সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর দিকে আহবান জানায় এবং নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত স্বভাব-চরিত্র হতে তাদেরকে নিষেধ করে। প্রত্যেক জিনিসের নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত অংশকে السفساف বলা হয়। এটি সুমহান ও সুউচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর বিপরীত। চালনি দিয়ে আটা চালার সময় আটা থেকে যা উড়ে যায় এবং শুকনো যমীন চাষ করার সময় যে ধুলা উড়ে তাকে سفساف বলা হয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে তারা যা বলে ও বাস্তবায়ন করে, তাতে তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে: অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা উপরোক্ত বিষয়গুলো থেকে যা কিছু বলে ও বাস্তবায়ন করে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহ থেকে যা কিছুর আদেশ করে ও যা থেকে নিষেধ করে, সেগুলো তাদের প্রভুর কিতাব কুরআনুল কারীম ও তাদের নাবীর পবিত্র সুন্নাত থেকেই নিয়েছে। চাই তা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে উল্লেখিত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত হোক কিংবা এর বাইরে যা রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত হোক। তারা নিজেদের পক্ষ হতে তাদের আক্বীদাহ তৈরী করেনি এবং এ বিষয়ে তারা অন্যদের তাকলীদও করেনি। উপরোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে বলেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

"আর তোমরা সবাই আল্লাহর বন্দেগী করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করো, নিকট আত্মীয় ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বসাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাধীন বাদী ও গোলামদের প্রতি সদয় ব্যবহার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না" *(সূরা আন নিসা ৪:৩৬)।*

এ অর্থে অনেক হাদীছ রয়েছে। সেগুলো থেকে শাইখ কিছু হাদীছ উপরে উল্লেখ করেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَطَرِيقَتُهُمْ هِيَ دِينُ الإِسْلاَمِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلاَّ وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ. وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَومَ وَأَصْحَابِي﴾ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْلاَمِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَفِيهِمُ الصِّدِّيقُونَ، وَالشُّهَدَاءِ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمُ أَعْلاَمُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْثُورَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِمُ الأَبْدَالُ وَفِيهِمْ أَئِمَّةُ الدِّينِ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: "لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ، وَلاَ مَنْ خَذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَنْ لاَ يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِن لَّدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

ইসলামের পথ হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের একমাত্র পথ, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু সংবাদ দিয়েছেন, তার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, একটি দল ব্যতীত সবগুলোই জাহান্নামে যাবে, আর সেটি হলো জামা'আত এবং অন্য এক হাদীছে তিনি বলেছেন,

«هم من كان على مثل مَا أَنَا عَلَيْهِ اليوم وَأَصْحَابِي»

"আজ আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর রয়েছি, যারা সেই পথেই চলবে তারাই হলো নাজাত প্রাপ্ত।"[২৯৯]

তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই কেবল ভেজালমুক্ত খাঁটি ইসলামের ধারক বলে গণ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। এই উম্মতের মধ্যে রয়েছে এমন সব ব্যক্তি, যারা হিদায়াতের নিদর্শন, আধাঁরের প্রদীপ, হাদীছে বর্ণিত কৃতিত্ব, মহৎ গুণাবলী এবং অনেক মর্যাদার

২৯৯. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান।

অধিকারী। তাদের মধ্যে আরো রয়েছে আবদাল (অলী-আওলীয়া) এবং দীনের এমনসব ইমাম, যাদের হিদায়াতের উপর মুসলিমদের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তারাই হলো আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত সেই দল, যাদের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ مَنْ خَـــذَلَهُمْ؛ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে। যেসব লোক তাদের বিরোধীতা করবে কিংবা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সে দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।[৩০০]

আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমাদেরকে হিদায়াত করার পর তিনি যেন আমাদের অন্তরকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে না দেন এবং আমাদেরকে যেন তার বিশেষ রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। তিনিই মহান দাতা। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং তার সাথীদের উপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করো! আমীন

ব্যাখ্যা: শাইখুল ইসলাম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনার শেষ পর্যায়ে বলেন: তাদের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা দীন ইসলামের পথেই চলে। এ ইসলামই তাদের মাযহাব এবং আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে পৌঁছার এটিই তাদের একমাত্র পথ। এ উম্মতের মধ্যে যে মতভেদ ও দলাদলি হবে বলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, সে দলাদলির সময় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সঠিক ইসলামের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই তারা দলাদলিরত ফির্কাগুলোর মধ্য হতে নাজাতপ্রাপ্ত দলে পরিণত হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবী যে পথের উপর ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরা সে পথের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ পথ নির্ভেজাল ও খাঁটি ইসলামের পথ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এ পথের অনুসরণ করার কারণেই তারা 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' নামক সম্মানজনক পদবী লাভ করেছে। তাদের মধ্যেই রয়েছে সিদ্দীকগণ অর্থাৎ অতিশয় সত্যবাদী ও সত্যের অনুসরণকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদগণ এবং বহু সৎকর্ম সম্পাদনকারী মহৎ ব্যক্তিবর্গ।

---

৩০০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩১২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৫, ইবনে মাজাহ হা/৬, তিরমিযী ২১৯২।

وَمِنْهُمْ أَعْلاَمُ الْهُـدَى এমন সব ব্যক্তি, যারা হিদায়াতের নিদর্শন: আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকদের মধ্যে রয়েছে এমনসব আলিম, যারা ইলম ও আমলের প্রতিটি প্রশংসিত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর দ্বারা বিশেষিত। তাদের মধ্যে রয়েছে আবদাল।

আবদাল বলতে অলীগণ এবং আবেদগণ উদ্দেশ্য। তাদেরকে আবদাল বলার কারণ সম্পর্কে একাধিক মত পাওয়া যায়। أبـــدال শব্দটি بدل শব্দের বহুবচন। এ উম্মতের একজন অলী ও আবেদ মারা গেলে তার বদলে আরেকজন আগমন করে। অলীগণের একজন যেহেতু অন্যজনের বদলে আগমন করে, তাই তাদেরকে আবদাল বলা হয়।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, মুহাদ্দিছগণই হলেন আবদাল।[৩০১] তাদের মধ্যে রয়েছে দীনের ইমামগণ। তারা ছিলেন ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে অনুসরণীয়। যেমন সুপ্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চারজন সম্মানিত ইমাম এবং অন্যান্য ইমামগণ। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লোকেরাই সেই দল, যাদের কথা হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي..

"আমার উম্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর বিজয়ী থাকবে"।[৩০২]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর কাছে দু'আ এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত (দরুদ) ও সালাম পেশ করার মাধ্যমে এ বরকতময় কিতাবটি সমাপ্ত করেছেন। এভাবে কোন কাজ শেষ করাকেই সর্বোত্তম পরিসমাপ্তি বলা হয়।

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

---

৩০১ . সুতরাং আবদালের এই বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যাচ্ছে, সুফীরা গাউছ, কুতুব ও আবদালের যেসব বিশেষণ বর্ণনা করে থাকে, তার সাথে প্রকৃত আবদালদের দূরতম সম্পর্কও নেই এবং আবদালদের প্রতি তারা যেসব কাজ-কর্ম সম্বন্ধিত করে, তা থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত।

৩০২. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৬, ইবনে মাজাহ হা/৬, আবূ দাউদ হা/২৪৮৪, তিরমিযী হা/২১৯২।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
   - শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা
   - শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৩. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৪. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৫. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৬. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৭. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
   - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৮. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
   -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
৯. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
১০. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১১. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১২. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী
১৩. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
   -ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১৪. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
   -ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১৫. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি
   - মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৭. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

১৮. খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২০. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

২১. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

২২. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৫. ফিক্বহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৬. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৭. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

২৮. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ
-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩০. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-মুহাম্মাদ আল আমীন ইবনে মুহাম্মাদ মুখতার শানক্বীতী

৩২. তাইসীরুল 'আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম